[অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অখণ্ড সংস্করণ

অরুণকুমার সেন, এম্. এ (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম্.এস্-সি. ইকন্. (লণ্ডন), ব্যারিস্টার অ্যাট্-ল
সুশীলকুমার সেন, এম্. এ.
শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.
সম্পৎ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ, এম্. এস্-সি. ইকন্. (লণ্ডন)
প্রণীত

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অতিরিক্ত বিষয়ের সংযোজনসহ
নূতন কাঠামোয় সম্পূর্ণ পরিমার্জিত উনবিংশ সংস্করণ,

নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
৮/১, চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা-৭০০০০৯

বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

১. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আকার
২. আলোচ্য বিষয়সমূহের যুক্তিসিদ্ধকরণ
৩. জিজ্ঞাসা দিয়া প্রত্যেক অধ্যায় সুরু
৪. অধ্যায়ের শেষে জিজ্ঞাসার উত্তর
৫. প্রান্তিক টীকার পরিবর্তে সাব-হেডিং ব্যবহার
৬. নূতন মুদ্রণ-শৈলী
৭ কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী অধ্যায় অনুসারে সাজানো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাসংকেত
৮. অনুধাবন পরীক্ষার প্রশ্নাবলীরও পৃষ্ঠাসংকেত

---

৯. বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের নূতন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।

নবপর্য্যায় সংস্করণের ভূমিকা

বহুদিন প্রচেষ্টার পর পশ্চিমবংগের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সিলেবাসের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিমার্জিত পূর্ণ সংস্করণ বাহির করা হইল। নূতন সিলেবাস-সমূহের সংস্করণটি কতটা মিটাইতে পারিবে, সে-বিচারের ভার অবশ্য আমাদের উপর নহে। আমরা শুধু বলিতে পরি যে প্রামাণ্য পুস্তকসমূহের সহায়তায় আমরা যথাসাধ্য প্রচেষ্টাই করিয়াছি, এবং আলোচনা যাহাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সে-দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছি।

সংস্করণটি প্রণয়নে অনেকের নিকট হইতেই সাহায্যলাভ করিয়াছি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। তবে বিশেষ করিয়া রামমোহন কলেজের অধ্যাপক দেবাশিষ চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশা করি ইঁহাদের এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আমাদের অন্যান্য সহকর্মীর নিকট হইতে ভবিষ্যতেও অনুরূপ সাহায্যে বঞ্চিত হইব না। ইতি—

গ্রন্থকারগণ

কলিকাতা

ঊনবিংশ সংস্করণের ভূমিকা

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ঊনবিংশ সংস্করণ বাহির হইল। সংস্করণটির বৈশিষ্ট্য মোটামুটি তিনটি : (ক) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আকার, (খ) অধ্যায়ের সুরুতে জিজ্ঞাসা ও অধ্যায়ের শেষে স্মর্তব্যের মাধ্যমে জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান এবং (গ) আলোচ্য বিষয়-সমূহের তারতম্যমূলক গুরুত্ব নির্দেশের জন্য নূতন মুদ্রণশৈলী ব্যবহার।

সংস্করণটি আকারে ক্ষুদ্র হইয়াছে প্রধানত এই কারণে যে কয়েক স্থানে বিস্তারিত আলোচনাকে প্রয়োজনমতই সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে—তবে কোন বিষয়কেই বাদ দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক টীকার (marginal notes) পরিবর্তে ছোট ছোট শিরোনামাও ব্যবহার করা হইয়াছে—ইহাতেও গ্রন্থখানির আয়তন কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে ইহার ফলে পঠনপাঠনে সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে করি। অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাসার উত্তরের মাধ্যমে প্রতি অধ্যায় সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। অনেক আধুনিক বিদেশী গ্রন্থে ইহা করা হয়। নূতন মুদ্রণশৈলীর ফলে ছাত্রছাত্রীরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উক্তিসমূহকে সহজে বাছিয়া লইতে পারিবে বলিয়া মনে করি—অর্থাৎ উহাদের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে অনুশীলনী ও অনুধাবন-পরীক্ষার প্রশ্নাবলীকেও অন্যভাবে সাজানো হইয়াছে এবং প্রতি ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা সংকেত বা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেও গ্রন্থখানির উপযোগিতা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

সংক্ষেপে বলিতে পারি, প্রত্যেক নূতন সংস্করণই গ্রন্থের উৎকর্ষসাধনের সুযোগ আনিয়া দেয়। বর্তমান সংস্করণে যথাসম্ভব সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টাই করিয়াছি।

গ্রন্থকারগণ

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর বন্দেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর অমলকুমার মুখোপাধ্যায়,
প্রেসিডেন্সী কলেজ
অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার ঘোষ,
হুগলী মহসিন কলেজ
অধ্যাপিকা দীপ্তি গুহ,
রামমোহন কলেজ
অধ্যাপিকা চিত্রা ঘোষ,
লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ
অধ্যাপক তাপস বসু,
রামমোহন কলেজ
অধ্যাপক স্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,
সিটি কলেজ
অধ্যাপক মৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
সিটি কলেজ
অধ্যাপক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়,
সিটি কলেজ
অধ্যক্ষ পবিত্র গুপ্ত

অধ্যাপক পবিত্র ঘোষ,
বেহালা কলেজ
অধ্যাপক বাসবলাল সরকার,
জয়পুরিয়া কলেজ

অধ্যাপক নির্মল বসু

ডক্টর সুনন্দা ঘোষ,
বেথুন কলেজ
অধ্যাপক ভগবতীপ্রসাদ ঘোষ,
বঙ্গবাসী কলেজ
অধ্যাপক কৃশাণু দাসগুপ্ত,
রাজা প্যারীমোহন কলেজ
অধ্যাপক অমর সিংহরায়,
শ্রীরামপুর কলেজ
অধ্যাপক নির্মলকৃষ্ণ সান্যাল,
আমতা রামসদয় কলেজ
অধ্যাপিকা আভা গুপ্ত,
শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ
অধ্যাপক নিরঞ্জন ভুঁইয়া,
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির,
বেলুড় মঠ
অধ্যাপক শিশিরকুমার সান্যাল,
রামমোহন কলেজ
অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ মাইতি,
ময়না কলেজ
অধ্যাপক কল্যাণ সেনগুপ্ত,
হাওড়া গার্লস কলেজ
অধ্যাপক শৈলকুমার ঘোষ
অধ্যাপক অশোক সরকার
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বসু,
কৃষ্ণনগর কলেজ

Detailed Syllabuses for the Degree Course in Political Science

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

Pass Course

Paper I

1. Nature and limits of Political Science—different approaches to Political Science—The problem of methods in Political Science.
2. Individual, society and the State.
3. Stages of social development and the State ,
   (*a*) Primitive communal system,
   (*b*) the slave system,
   (*c*) the feudal system,
   (*d*) the capitalist system, and
   (*e*) the socialist system.
4. Nature of the State—(*a*) Organismic theory, (*b*) Idealist theory & (*c*) Marxist theory.
5. Sovereignty of the State : origin and development of sovereignty—kinds of sovereignty—Monistic and Pluralistic theories—general will and sovereignty—Theory of divided sovereignty—Doctrine of popular sovereignty—theory of limited sovereignty—Marxist approach.
6. Nationalism—Origin of the ideal of Nationalism—Nationalism as a political ideal—internationalism.
7. Imperialism—Imperialism and national liberation movements—the problems of world peace—the role of the U.N.
8. Law : the meaning and nature of law—Analytical, Historical, Sociological and Marxist—International Law—its meaning and nature.
9. Rights : meaning and nature—theories of rights—natural, legal, idealist and Marxist rights in different social systems—rights to private property in different social systems—rights to resistance.
10. Liberty and Equality : origin and development of the ideas of liberty and equality—nature of liberty and equality in different social systems.

11. Ends and functions of the State : theories of State functions : (*a*) the individualist theory, (*b*) the socialist theory, (*c*) theory of State regulation—the welfare State.
12. Marxism—materialist interpretation of history—the theory of class and class struggle—theory of revolution—Lenin's contribution to Marxism.
13. Democratic socialism.
14. Gandhi's concept of the State and *Sarvodaya.*
15. Classification of political systems—characteristics of liberal democratic, authoritarian and socialist systems.
16. Unitarianism and Federalism—problems of decentralisation—modern tendencies.
17. Organs of Government—Legislature and its functions, modern trends. Executive : different types—political and non-political, their functions—Judiciary : recruitment and independence—its functions.
18. Democracy and dictatorship—origin and development of the ideal of democracy, liberal democracy and socialist democracy—attacks upon democracy—Fascism. Dictatorship and its classification.
19. Political Parties and Interest Groups : their functions and role in modern States.
20. Electorate and representation—functional and territorial—problems and methods of minority representation—different theories regarding the nature of representation—modern instruments of control over the representatives.
21. Public opinion—its nature and role in different political systems.

THE UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Pass Course

Paper I

(Political Analysis and Theory)

A. *Political Analysis* :

1. Nature and scope of Political Science—Moves towards inter-disciplinary study—Relation with other Social Sciences like Economics, History, Sociology, Geography.
2. Approaches to the study of Political Science—Normative and Empirical, Philosophical, Institutional, Behaviourial and Marxist—Choice of approach.
3. Meaning and Role of Political Theory—Distinction between Political theory and Political philosophy.

B. *Concepts and Ideologies* :

4. Nature of State : Idealist and Marxist theories ; State and Society ; Nationalism—Idea and Impact ; Sovereignty—Monism and Pluralism ; Law—Nature of Law, Schools of Law—Analytical, Historical and Sociological ; Rights—meaning and forms ; Liberty—Concept ; Equality—Concept and relationship with liberty ; Functions of the State ; contending theories : Individualistic and Welfare.
5. Major Political idealogies—Democracy, Socialism ; Scientific and Democratic—Fascism.

C. *Political Forms, Institution and Structures* :

6. Forms of government : Democracy and Dictatorship—a comparative study—Federal/Unitary/Parliamentary/Presidential.
7. Institutions of Government—Legislature/Executive/Bureaucracy/Judiciary.
8. Contemporary party system—Interest groups : nature and role.
9. Electoral systems.

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Pass Course

Paper I

(Political Theory and Institutions)

I. Definition and scope of political science. Methods of Political Science. The State and Society.

II. Nature of the State, Organic Theory, The Idealist Theory, Marxist conception of the State.

III. Nature of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty De jure and De facto Sovereignty—Doctrine of popular Sovereignty—Austinian theory of Sovereignty—its critical estimates—Theory of Limited Sovereignty. Attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty.

IV Definition and nature of Law : relation between Law and Morality—Law and Liberty—The concept of Liberty—Safeguards of Liberty in a Modern State—Concepts of Natural Law and Natural Rights—Rights and equality.

V. Democracy and Dictatorship : the spheres of the State—Individualism and socialism.

VI Meaning of Nationality—Essential Elements of Nationality—Rights of Self-determination. Mono-national State vs. Poly-national State—Nationalism and Internationalism.

VII. Constitution—meaning and types—Unitary and Federal—Parliamentary and Presidential Governments.

VIII. Political parties—public opinion—Electorate—Universal Suffrage—Methods of Minority Representation—Direct and Indirect Elections—Relation between the Representative and his Constituency.

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Syllabus

(Pass Course)

PAPER—I

POLITICAL SCIENCE

1. The discipline of Political Science : Nature and scope.
2. Society, Nation and the State : Concepts and inter relations.
3. The nature of the State : The Liberal view : State as on agency of common interests. The Marxist view—State as an organ of class domination.
4. The State as Sovereign : Austinian theory. The Pluralist view point. Marxist approach to the problem of sovereignty. Sovereignty and the international order.
5. Nature of Law : Different school of Law—analytical, historical and sociological. Marxist view of law.
6. Rights : meaning and nature. Theories of rights—natural, legal and idealist. Marxist view point.
7. Liberty and Equality : Nature, meaning and inter-relationships. Liberal and Marxist views.
8. Unitarianism and Federalism : Basic features. Recent trends in federalism.
9. The Legislature, the Executive and the Judiciary—Functions and inter-relations.
10. Political parties—Types and functions. The liberal and Marxist views about party functions.
11. Pressure groups—Nature and functions.
12. Public opinion : Nature and functions of Public opinion in different Political systems.
13. Electorate and representation : Functional and territorial representation. Minority representation. Instruments of control over the representatives.
14. Types of state systems : Liberal—democratic, socialist states. The authoritarian state : Fascist & Military dictatorships.
15. Political change : The liberal view and the Marxist view.

* উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের জন্য

** " " " "

* উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের জন্য

** বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের জন্য

রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ

| অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

> *"Until wisdom and political leadership meet in the same man ··· cities [city-states] will never cease from evil, nor the human race."* Plato

ব্যাপকভাবে মানব-সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে মানুষ ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া ক্রমে বুদ্ধি ও যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসকে বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্ত্তনের ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ দ্বারা মানুষ নিজ জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে; নিজ পরিবেশকে ইচ্ছামত যথাসম্ভব পরিবর্ত্তিত করিয়া মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে এই ধারা অল্পবিস্তর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্র মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের একটি প্রকাশ। যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহার ভিতর রাষ্ট্রই সর্ব্বপ্রধান। রাষ্ট্র যে শুধু সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, রাষ্ট্র মানুষের নৈতিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত আবশ্যক ও শক্তি অনুযায়ী নানা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ামকরূপে অগ্রসর হইয়াছে। তাই সর্ব্বদেশে রাষ্ট্রশক্তি বিপুলভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রভাবের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব এত বেশি যে তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব। জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরাট অবদান আছে বলিয়াই চিন্তানায়কেরা রাষ্ট্রের রূপ, গঠন, প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে নিজ নিজ চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১]

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে আরও দেখা যায় যে বিভিন্ন কালের রাষ্ট্র-চিন্তার উপর তৎকালীন যুগধর্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিভিন্ন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রাষ্ট্রদর্শনের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই কোন যুগের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই যুগের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সহিত পরিচয় স্থাপন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্লেটোর মহান্ আদর্শ বুঝিতে হইলে গ্রীসের খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ধারণা অপরিহার্য্য। রুশোর

১. অবশ্য মার্ক্সবাদীদের মতে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র হইল শ্রেণীশোষণের যন্ত্র। ইহা সকলের স্বার্থসাধন করে একথা মার্ক্সবাদীরা স্বীকার করেন না। একমাত্র শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র সকলের কল্যাণসাধন করিতে প্রয়াসী হয়। ··· এই পাদটীকাটি লেখকগণের, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নহে।

রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ববর্তী পটভূমিকায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। রাষ্ট্রিক আদর্শ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির ফলস্বরূপ। অন্যপক্ষে, যে-সকল রাষ্ট্রাদর্শ জনসাধারণের মনের উপর ব্যাপকভাবে ক্ষমতা বিস্তার করে তাহা সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়। রুশোর ভাবধারা ফরাসী দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর যে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারই ফলে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। মার্কসীয় দর্শন নিষ্পেষিত জনসাধারণের মানসলোকে যে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে তাহারই জন্য বৈপ্লবিক সমাজবাদ আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রিক আদর্শ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। অনেক সময় রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে একশ্রেণীর রাষ্ট্রবিদেরা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাতে বিধিদত্ত অধিকার আছে। রাজার সকল আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই প্রজাগণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নৃপতির আদেশ লঙ্ঘন করা ও ভগবানের বিরোধিতা করা একই বস্তু। বলা বাহুল্য, এই নীতি প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গকে স্বৈরাচারে সহায়তা করিয়াছে। আর একশ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তাকে সমালোচনামূলক রাষ্ট্রচিন্তা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তাধারা পুরাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের প্রতিকূল। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এই শ্রেণীর চিন্তাধারার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই গোষ্ঠীর চিন্তানায়কেরা ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তনসাধন করিতে চান। ইহারা ক্রমবিবর্ত্তনে বিশ্বাসী। মিল প্রভৃতি উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিদেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ আছেন যাঁহারা বিপ্লবপন্থী। বৈপ্লবিক রাজনৈতিকেরা রাষ্ট্র, সমাজ বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কামনা করেন এবং তদনুযায়ী নীতি ও কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। রুশো, কার্ল মার্কস প্রভৃতি দার্শনিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বিবর্ত্তনের ফলে কোন সুদূর অতীতে মানুষ পৃথিবীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কে জানে! মানবসমাজ সভ্যতার অভিযানে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানকালে উপনীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ বিবর্ত্তনে মানুষের অর্থনৈতিক পরিবেশ একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থনৈতিক দিক হইতে মানব ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শিকারের যুগ মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ; এই যুগে মানুষ কোন কোন বন্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় ছোট ছোট দল গঠন করিয়া পশুশিকারের দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দ্বিতীয় যুগকে সমাজতত্ত্ব-বিদেরা পশুপালনের যুগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই যুগে মানুষ বন্য পশুকে আয়ত্তে আনিয়া গৃহপালিত করিবার বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। এই দুই যুগেই মানুষ যাযাবর; তাহার কোন স্থায়ী বাসস্থান নাই। তৃতীয় যুগে মানুষ কৃষিবিদ্যার সন্ধান লাভ করিয়াছে এবং উর্ব্বরা নদী উপত্যকায় স্থায়ীভাবে নিজ বসবাস স্থাপন করিয়াছে। চতুর্থ যুগই

বর্ত্তমান শিল্পের যুগ। প্রতিযুগের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের জীবনপদ্ধতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। আদিম মানুষ যখন আত্মরক্ষার জন্য সাহসী নেতার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে, যখন প্রাকৃতিক শক্তির রোষ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে, আদিম পুরোহিতের আদেশে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই রাষ্ট্রদর্শনের সূত্রপাত হইয়াছে। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস আদিম শিকারের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। রাষ্ট্রচিন্তার ধারা মানব ইতিহাসের ন্যায়ই সুপ্রাচীন। গিরি-নির্ঝরিণী যেমন সুদূর নিভৃত গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া নানা গিরিসংকটের সঙ্কীর্ণ পন্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং বিশালতা ও পুষ্টিলাভ করে তেমনি অজ্ঞাত অতীতে আদিম মানুষের জগতে যে নগণ্য চিন্তাটুকু আরম্ভ হইয়াছিল, যে শাসনপদ্ধতি আদিম মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী যুগসমূহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক কালে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিকেরা নানা সূত্র হইতে তাঁহাদের চিন্তার মালমশলা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শাসনপদ্ধতি, দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী, রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়ক-দিগের বক্তৃতাবলী, সাহিত্য, সরকারী দলিল, সাময়িক পত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে। 'এ্যাথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা', প্রজাতান্ত্রিক এ্যাথেন্সের রাষ্ট্রপতি পেরিক্লিসের বক্তৃতা, দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলী, ইউরিপাইডিস ও এ্যারিষ্টোফেনীসের নাটকাবলী, থুকিডিডিসের ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র হইতে গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

প্রাচ্য জগতেই সর্ব্বপ্রথম স্থায়ী ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন মিশর, আসীরীয়া, ব্যাবিলনীয়া ও পারস্যে যদিও স্থায়ী শাসনপদ্ধতি দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল তথাপি রাষ্ট্রদর্শন বলিলে যুক্তিমূলক যে সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে সূচিত করে এই সকল দেশে তাহার উদ্ভব হয় নাই। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ও মহাচীনের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এই দুইটি দেশে শুধু যে স্থায়ী রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নহে, সুচিন্তিত রাষ্ট্রদর্শনও জন্মলাভ করিয়াছিল। এমনকি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতবাদ এবং সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের সুস্পষ্ট আভাস প্রাচীন হিন্দু ও চৈনিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও বিশেষত এ্যারিষ্টটলের প্রভাবে রাষ্ট্রদর্শন যেমন একটি বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল প্রাচীন ভারত ও চীনে রাষ্ট্রচিন্তার তেমন উন্নতি সম্ভব হয় নাই। প্রাচীন গ্রীসকে সত্যই বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির জন্মস্থান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে কয়েকটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যায়।

(১) গ্রীসীয় যুগ: এই যুগে যে-সকল চিন্তানায়কেরা রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মতে প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল সর্ব্বপ্রধান। প্লেটোর

কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদের আদর্শ সেই যুগের মানুষের কাছে এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। এ্যারিষ্টটল যদিও প্লেটোর সাম্যবাদমূলক মতবাদের বিরোধিতা করেন তথাপি প্লেটোর ন্যায় তিনিও রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য ও ক্ষমতা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গ্রীসের কোন কোন সোফিষ্ট এবং ষ্টোইক ও এপিকিউরিয়ান নামক দার্শনিক সম্প্রদায়দ্বয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

(২) রোমক যুগ: রোমের রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির মূলীভূত আদর্শ ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে। আইন ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই রোমের মৌলিকতা; চিন্তার ক্ষেত্রে সিসেরো প্রভৃতি রোমক লেখকগণ বিভিন্ন গ্রীসীয় দার্শনিকদের মতামত সসম্ভ্রমে ও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) মধ্যযুগ: মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিপুলভাবে ইউরোপীয় জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে তদানীন্তন খ্রীষ্টধর্ম্মের সর্ব্বাধিনায়কেরা অর্থাৎ পোপগণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়িয়া খ্রীষ্টধর্ম্মসম্মত এক বিরাট ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। হিল্‌ডেব্র্যাণ্ড বা পোপ সপ্তম গ্রেগরী এই মতাবলম্বীদের মুখপাত্র। এই মতবাদের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তাই রাষ্ট্রের স্বাধিকারকামী দার্শনিকেরা ইহার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় কবি বিশ্বশান্তিকামী দান্তে ও গণতন্ত্রের উপাসক মার্সিগ্‌লিও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন।

(৪) রেনেইসান্স যুগ: রেনেইসান্স যুগে মানুষের মন মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার মুক্ত হইয়া প্রাচীন গ্রীস-রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন ও শিল্পকলার বিশ্বাসী হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার মানুষের দৃষ্টিকে সুদূর-প্রসারী করিয়া তোলে। এই সময়ে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। রেনেইসান্স যুগের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন মেকিয়াভেলি। ইটালীকে বহিঃশত্রুর অধিকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মেকিয়াভেলি প্রচার করেন যে জাতীয় একতা ও মঙ্গল সাধনকল্পে নীতিমূলক বা নীতিবিরুদ্ধ যে কোন উপায় অবলম্বন করা সকল রাজারই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিদ্ স্যার টমাস্ মোর মানবহিতৈষণা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া লোক সমাজে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেন।

(৫) রেফরমেশন যুগ: এই যুগে লুথার প্রভৃতি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পোপের একনায়কত্বে উত্যক্ত ইউরোপের রাজন্যবর্গের সাহায্যে নূতন ধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হন। লুথার প্রভৃতি প্রচার করেন যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রজাশাসন করা রাজন্যবর্গের ঈশ্বরদত্ত অধিকার। এই প্রচারের ফলে অনেক দেশে নৃপতিদিগের স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়। হল্যাণ্ডে স্পেনীয় নৃপতিবর্গের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যক্তি-স্বাধীনতামূলক ও

রাজতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রনীতি প্রসার লাভ করিতে থাকে। রেফরমেশনের যুগে বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা দেখা দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোদাঁ সার্ব্বভৌমত্বের নীতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠিত করেন।

(৬) বিপ্লবের যুগ : এই যুগে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে দুইটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। একটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং অপরটি ঐ শতাব্দীর শেষভাগে। মহাকবি মিল্টন, জন লক প্রভৃতি মনীষীরা চুক্তিবাদ বা Contract Theory-র ভিত্তিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণ-সার্ব্বভৌমত্ব বা Popular Sovereignty-র বাণী প্রচার করেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌, স্যার রবার্ট ফিলমার প্রভৃতি বিধিদত্ত অধিকারের দোহাই পাড়িয়া রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টমাস্‌ হবস্‌ রাজার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার সপক্ষে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Contract Theory বা চুক্তিবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণ-সার্ব্বভৌমত্বের বাণী ফরাসী দেশে এবং আমেরিকায় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইংরাজ অধিকৃত আমেরিকার উপনিবেশবাসিগণ ১৭৭৬ সালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয় ও দীর্ঘ সাত বৎসর যুদ্ধের পর জয়লাভ করে। রাষ্ট্রদর্শনের দিক হইতে আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্র অতিশয় মূল্যবান কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা। ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্‌কিউয়ে ও রুশোর সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ফরাসী বিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিকতার অবসান এবং গণতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়।

(৭) উনবিংশ শতাব্দী : এই যুগে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্লব জয়যুক্ত হয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সামন্তবর্গ ও জমিদারশ্রেণীর হস্ত হইতে ক্রমে শিল্পপতিগণের করায়ত্ত হয়। মিল, স্পেন্‌সার প্রভৃতি ইংরাজ মনীষিগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করিতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মানী বহুধাবিভক্ত ও ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অনগ্রসর ছিল। অল্পসময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিবিধানের জন্য কয়েকজন জার্ম্মান দার্শনিক এই সময়ে জার্ম্মানীতে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সামগ্রিক নায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হেগেলের রাষ্ট্রদর্শন জার্ম্মানীর জাতীয় প্রয়োজনীয়তার মূর্ত্ত প্রকাশ। তিনি প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের ন্যায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনের সর্ব্বময় নিয়ন্তা হিসাবে গ্রহণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। ধনিক ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থের ভিতরে এক বিরাট সংঘাতের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ প্রমাণ করেন যে শ্রেণীবিভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ধনিকতন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাঁহারা

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ communist manifesto-তে শ্রেণী-সংগ্রামের পথে ধনিকতন্ত্রের অবসান সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্যবাদ ব্যতীত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গঠিত হইতে থাকে। ইহার ভিতর বিবর্ত্তনবাদী সমাজতন্ত্র, গিল্ড সমাজতন্ত্র ও সিণ্ডিক্যালিজম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রদর্শন বিভিন্ন দিক হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়া দৃঢ় ও পুষ্ট হইয়া ওঠে। সমাজতত্ত্ববাদ, বিবর্ত্তনবাদ, মনস্তত্ত্ববাদ, ভৌগোলিক ভাবধারা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববাদ রাষ্ট্রদর্শনকে প্রভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিকেরা নিজ নিজ মতবাদ গড়িয়া তোলেন।

(৮) বিংশ শতাব্দী: উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রবাদের সহিত মিলিত হইয়া পরদেশলোভী সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এই বর্ব্বর জাতীয়তাবাদ, শোষণশীল ধনতন্ত্রবাদ ও পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদেরই নগ্ন প্রকাশ। এই শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা রুশ বিপ্লবকে উপরি-উক্ত তিনটি মতবাদের বৈপ্লবিক প্রতিবাদ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। রুশ-বিপ্লবে লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন জয়যুক্ত হয় এবং সাম্যবাদ শক্তিশালী হইয়া শ্রেণী সংগ্রামের পথে বিভিন্ন দেশে প্রসারলাভ করিতে থাকে।

(৯) দুই মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে আর একটি রাজনীতি দ্রুত প্রসারলাভ করে এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ (Communism) উভয়েরই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দণ্ডায়মান হয়। এই নীতি ফাশীজম্ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইটালীর মুসোলিনী ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ ও জনসাধারণের সার্ব্বভৌমত্ব এবং অন্যদিকে কমিউনিজমের আন্তর্জ্জাতিকতা এবং আর্থিক ও সামাজিক সাম্যের আদর্শকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া ফাশীজম্ একনায়কত্বের ভিত্তিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধনতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায়। হিট্‌লার প্রবর্ত্তিত জার্ম্মানীর নাৎসীজম্ এই নীতির সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র প্রকাশ। ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান—এই তিনটি প্রধানতম ফাশীবাদী দেশ বিশ্বজয়ের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা করে। রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের যুক্ত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফাশীবাদের পতন ঘটে।

ফাশীবাদ ধ্বংসের পর ধনতন্ত্রবাদ বনাম সাম্যবাদ বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য যে চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর ধনতন্ত্র অতিমাত্রায় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

(১০) সাম্যবাদী একনায়কত্ব ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদের দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রদর্শনের একটি লক্ষণীয় বিষয়। অন্যপক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীকে আন্তর্জ্জাতিকতার যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে দুইটি মহাযুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতির ফলে মানুষ আজ সর্ব্ববিধ্বংসী আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার সন্ধান পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কিন্তু সর্ব্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের আস্ফালনে এবং রাশিয়া ও আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে।

সমগ্র দৃষ্টিতে যদি রাষ্ট্রদর্শনের বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে কয়েকটি সত্য স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হয়। বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রতি যুগের মানব-মনের গঠন ও গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই যুগের রাষ্ট্রদর্শনের ভিতর। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের মনোরাজ্যের সঙ্গে সংযোগ ও পরিচয় স্থাপন করিতে পারি। ইহাও সামান্য কথা নহে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্ত্তনের ধারার সুস্পষ্ট আভাস দেয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রদর্শন ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে আলোকপাত করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রাকে সহজ করিয়া তুলিতে পারে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ও সমাজ-ব্যবস্থার অসাম্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দরিদ্রের উপর ধনিকের দাম্ভিক অবিচার মানবসভ্যতাকে কলুষিত করিয়াছে। আজ গণতন্ত্র ও ন্যায়-যুদ্ধের নামে পৃথিবীব্যাপী হত্যার বিরাট ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। সাধারণ মানুষের সুখশান্তি মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। সভ্যতার এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রিক আদর্শ দীপবর্ত্তিকার ন্যায় বিভ্রান্ত মানবসমাজকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারে।

"*World history is the world court of justice.*" Schiller

ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শ

> "*A right knowledge of the facts disposes at once of the contention of Occidental critics that the Indian mind, even if remarkable in metaphysics, was sterile in political experiment.*" Sri Aurobindo

ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা ভারতীয় সভ্যতার ন্যায় পুরাতন। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ শূন্যতার মধ্য হইতে কোন চিন্তা বা তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে না। চিন্তা বা তত্ত্ব বাস্তব জীবনের সমস্যা হইতেই উদ্ভূত হয় এবং ঐ সকল সমস্যার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত থাকে।

সেদিন পর্যন্ত কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার এই প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করা হইত না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেন যে প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং যেটুকু রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে 'বর্বরসুলভ' বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়।

সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন মনীষীর গবেষণা এই ভ্রান্ত ও হীন ধারণা দূর করিয়া আমাদিগকে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। বহির্বিশ্বও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অধ্যাপক ব্যাশাম (Prof. A L Basham) বলেন, মানুষে মানুষে ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ভারত সকল দেশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এমন কোন প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা জানি না যেখানে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল এত অল্প এবং তাহাদের অধিকার ছিল বিধিশাস্ত্র (law book) দ্বারা এরূপভাবে সংরক্ষিত। পরাজিত শত্রুর প্রতি এত উদার ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আমাদের জানা নাই।[১]

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বিদেশীয় দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের মূলে আছে বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল অধ্যাপক ঘোষালের 'হিন্দু রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস' (A History of Hindu Political Theories), জয়াসয়ালের (K. P. Jayaswal) 'হিন্দু রাষ্ট্র-ব্যবস্থা' (Hindu Polity), ভাণ্ডারকারের 'প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্র-ব্যবস্থা' (Ancient Hindu Polity), বেণীপ্রসাদের 'প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র' (State in Ancient India), অঙ্গারিয়ার 'হিন্দু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের প্রকৃতি ও ভিত্তি' (The Nature and Grounds of Political Obligation in the Hindu State), পণ্ডিতপ্রবর কানের (Pandurang Vaman Kane) 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' (History of Dharmashastra), রামস্বামী আয়ারের 'ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব' (Indian Political Theories), আনন্দকুমারস্বামীর 'ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও ইহলৌকিক ক্ষমতা' (Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government), অধ্যাপক

---

১. গ্রন্থের নাম *Wonder that was India*

রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'প্রাচীন ভারত' (Ancient India) ও 'প্রাচীন ভারতে সংঘ-জীবন' (Corporate Life in Ancient India), অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও পুসালকার সম্পাদিত 'ভারতীয় জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (History and Culture of the Indian People), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'প্রাচীন ভারতীয় আইনের ক্রমবিকাশ' (Evolution of Ancient Indian Law), অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের 'ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সাধারণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান' (Democratic Ideals and Republican Institutions in India), 'সৃজনশীল ভারত' (Creative India) ও 'শুক্রনীতি' (Sukraniti), স্বামী অভেদানন্দের 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (India and Her People),[১] আয়েংগারের 'রাজধর্মকাণ্ড' (Rajadharmakanda) এবং রাধাকৃষ্ণাণের 'হিন্দু জীবনদর্শন' (Hindu View of Life)। ইহা ছাড়া আছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি মূল গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা।

উল্লিখিত গ্রন্থ ও ভাষ্যসমূহ আমাদের প্রাচীন ঐশ্বর্যবান রাজনৈতিক ধ্যানধারণার উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছে। ইহার সহিত আবার বর্তমান যুগের সেতু রচনা করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজির রাজনৈতিক চিন্তামূলক মৌলিক অবদান। এই সকল রচনা মৌলিক হইলেও ইহাদের মধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার বিশিষ্টতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, এই রাজনৈতিক সাহিত্য মূলত ভারতীয় আদর্শ দ্বারাই অনুরঞ্জিত।

ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা সনাতন ও ঐতিহ্যময় হইলেও ইহাতে সুসংবদ্ধতা ও ক্রমানুবর্তিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার মূলে আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উত্থানপতন। বিদেশী শাসকের অধীনতাপাশ বা অন্য কারণে যখনই বৃহত্তর সমাজজীবনে বিশৃংখলা সুরু হইয়াছিল, রাজনৈতিক চিন্তাতেও তখনই যেন সংগে সংগে ছেদ পড়িয়াছিল। আবার শান্তিপ্রতিষ্ঠা, শৃংখলার পুনরাবৃত্তির হাত ধরিয়া আসিয়াছিল রাজনৈতিক চিন্তা। এই কারণে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের শান্তিপর্বেই আমরা পাই প্রকৃত রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় এবং ব্রিটিশ যুগে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চিন্তার সুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে। মেকিয়াভেলির মত বিশৃংখলার যুগে ব্যাধিগ্রস্ত ইতালীর নিরাময়ের জন্য 'প্রিন্স' (Prince) রচনার মত প্রচেষ্টা ভারতীয় চিন্তাবিদগণ করেন নাই। 'প্রিন্সে'র সহিত অনেকাংশে তুলনীয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও শান্তিশৃংখলার যুগে রচিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

বৃহত্তর সমাজজীবনের উত্থানপতনের সংগে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার গতি ও ছেদের যে একপ্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, ইহার কারণের সন্ধান করিতে হয় ভারতীয় জীবনদর্শনেরই মধ্যে। এই ভারতীয় জীবনদর্শন প্রধানত হিন্দুরই জীবনদর্শন এবং ইহার রূপ সম্পূর্ণ অখণ্ড। গান্ধীজির ভাষায়, হিন্দুর

১. স্বামী অভেদানন্দ বংগানুবাদের ঐরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

জীবনদর্শনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কোনরূপ কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করা হয় নাই। স্যার রামস্বামী এবং অন্যান্য পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে, সনাতন ভারতীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনেরই অংগীভূত এবং পুনর্জন্মবাদ ও কর্মবাদের (doctrines of rebirth and *karma*) পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া ভারতীয়গণের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না। জীবনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি যখনই ইহলৌকিক অবস্থায় উন্নয়ন সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিককে হতাশ করিয়া তুলিয়াছে তখনই তিনি উহাকে কর্মফল মনে করিয়া পুনর্জন্মের মাধ্যমে নবজীবনের পথ খুঁজিয়াছেন। এই দৃষ্টিভংগিকে কেহ কেহ পলায়নী মনোবৃত্তি (escapism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাবিদের মতে, ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হিন্দুর জীবনদর্শনেরই মধ্যে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, হিন্দুরা 'রাজনীতি ও ধর্মনীতি'র মধ্যে পার্থক্য করে নাই। তাহাদের বিশ্বাস, ভাল কাজ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এই জীবনে দুঃখভোগ করিতে হইলে হিন্দুরা তাহাকে পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফল বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। সুতরাং কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে না। বরং ধৈর্য ক্ষমা নিরহংকার প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া এই জীবনে 'সুকৃতি করিতেই চেষ্টিত' থাকে। ইহাতে সমাজে "বিদ্বেষাদি ভাব বিনষ্ট হইয়া সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করে।"[১]

সুতরাং হিন্দুরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে এড়াইয়া যাইতে চাহে না। তাহারা নৈতিক জীবন অনুসরণ করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতেই চাহে। ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত গল্পকার দণ্ডী তাঁহার 'দশকুমারচরিতে' সরল অনাড়ম্বর কিন্তু সুখময় গার্হস্থ্য জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই হইল প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শ দ্বারা অনুরঞ্জিত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও ছিল সুনীতি সুরুচি শান্তিশৃংখলা এবং সুন্দরের অভিমুখে প্রসারিত।

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনকে মোটামুটি দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়—প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রদার্শনিকগণের মধ্যে মনু, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, কৌটিল্য এবং শুক্রাচার্য সমধিক প্রসিদ্ধ। আধুনিকদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী। অবশ্য রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, র‍্যাণাডে এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তায় উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল সুরটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে প্রথমোক্ত চারিজনের মধ্যেই।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও রাজনৈতিক চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই চিন্তাপ্রবাহ ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের সম্পূর্ণ অংগীভূত হয় নাই। বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রের উপর ভগবান বুদ্ধ যে উপদেশ বাণী বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা গণতান্ত্রিক ধারণায় ভরপুর সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা সনাতন ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ দ্যোতক নহে।

১. সামাজিক প্রবন্ধ

বস্তুত, গণতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা নহে। পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে (History of Dharmashastra) দেখাইয়াছেন, প্রাচীন ভারতে যে 'সভা', 'সমিতি' প্রভৃতি সংস্থা ছিল তাহা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিচয় প্রদান করে না, কারণ উহারা ছিল ধর্মসম্প্রদায়েরই বিভিন্ন সংস্থা।

এইভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন গণতান্ত্রিক ধারণা হইতে বিচ্যুত হইলেও উহা যে আদর্শবাদমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুত, এখানেই রহিয়াছে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের সহিত ভারতের রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম মৌলিক পার্থক্য। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তা অনেকাংশে ভূয়োদর্শনমূলক (empirical) ও মেকিয়াভেলিবাদভিত্তিক। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন কিন্তু ভূয়োদর্শন বা মেকিয়াভেলিবাদকে বিশেষ সমাদর কোনকালেই করে নাই। এমনকি কৌটিল্য, যাঁহাকে অনেক সময় মেকিয়াভেলির সহিত তুলনা করা হয়, নৃপতিকে নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে ইহা ব্যতিরেকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরও বিনষ্ট হইবেন। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন নৃপতি প্রথমে নিজেকে নিয়মানুবর্তী করিয়া পরে অপরকে নিয়মের অধীনে আনয়ন করিবার প্রচেষ্টা করিবেন। এইভাবে 'ধর্মশাস্ত্র' বা বাস্তব শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যা গিয়া পড়িয়াছে 'ধর্মশাস্ত্র' বা চরম বিধি (Supreme Law) সম্পর্কিত বিদ্যার ক্ষেত্রে।

এই চরম বিধি বা ধর্মের নিকট দায়িত্বশীলতাই হইল ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল সুর—মনু হইতে গান্ধীজি পর্যন্ত সকল চিন্তাবিদের রচনাতেই ইহা পরিব্যাপ্ত। ধর্ম বলিতে ভারতীয়েরা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা উপাসনা-পদ্ধতি বুঝেন নাই, বুঝিয়াছিলেন চরম লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত জীবন-পদ্ধতি বা সামাজিক আচার-ব্যবহারের রীতিনীতিকে। লক্ষ্য যখন চরম তখন এই সম্পর্কিত বিধিও চূড়ান্ত হইবে এবং সকলকে উহার অনুবর্তী হইয়াই চলিতে হইবে। শান্তিপর্বে ব্যাসদেব এ-সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, ন্যায়ই ধর্ম ··· জীবের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ঈশ্বর ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন ··· শেষ পর্যন্ত সকল নৃপতিকেই ধর্মের (Supreme Law) নিকট দায়ী হইতে হইবে।

ভারতীয় জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য যে উদারতা সংস্কৃতি ও ক্ষমাশীলতা তাহা স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রদর্শনে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর যে প্রার্থনা 'সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরময়াঃ'—সকলেই সুখী, সকলেই নীরোগ হউক, অথবা তর্পণের মন্ত্রে যে 'দেবতা যক্ষ হইতে সুরু করিয়া ক্রূর সর্প পর্যন্ত' সকলকেই পরিতৃপ্ত করিবার প্রচেষ্টা তাহা রাষ্ট্রদর্শনেও প্রতিভাত হইয়াছে। ধর্মের নভোমণ্ডলে (Firmament of Law—MacIver) অবস্থান করিয়া সকলেই সম্প্রসারিত হউক—চরম লক্ষ্যের পথে চলুক ইহাই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহারই উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, আমরা আবার জাগিব, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক উত্থানপতনের পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য নয়—আমরা জাগিব সেই আদি শাশ্বত শক্তিকে বিকশিত করিয়া ধর্মের পূর্ণ অর্থ ও ব্যাপকতর রূপ প্রচারের জন্য।

ধর্ম বা চরম বিধির নিকট অনুবর্তিতার এই মতামত হইতেই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মের উদ্দেশ্য মহৎ বলিয়া ইহা মানুষের নিকট হইতে মহৎ প্রকৃতিই দাবি করে। সত্য যুগে মানুষ ছিল পূর্ণ বিশুদ্ধ, ফলে তখন ধর্মের ধ্বজা বহন করিবার জন্য নৃপতি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয় নাই। ক্রমে ত্রেতা দ্বাপর ও কলি যুগে মানুষ যত 'পাপকর্মে'র পথে চলিতে লাগিল, ধর্মের ক্ষেত্রে ততই দেখা দিতে লাগিল সংকট। এই সংকট হইতে পরিত্রাণের পথ হইল নৃপতির শাসনাধীন বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন সংঘবদ্ধ হওয়া।

এই মতবাদ লক ও রুশোর পতনবাদেরই (doctrine of fall) অনুরূপ। লক ও রুশোর মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের বিশুদ্ধ প্রকৃতি ক্রমশ বিকৃত হইয়াছিল বলিয়াই সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শন অনুসারে সত্যযুগের পর পথভ্রষ্ট মানুষকে আবার অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় মুক্ত 'ধর্মপথে' পরিচালিত করিবার জন্যই নৃপতি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল।

নৃপতি এইভাবে অপরিহার্য বিবেচিত হইলেও 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ' ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন দ্বারা মোটেই সমর্থিত হয় নাই; এরূপ চুক্তির কল্পনাও বিশেষ করা হয় নাই।[১] ইহার কারণ, রাজশক্তি ও জনসাধারণ উভয়ই ছিল ধর্মশাসিত। সুতরাং লকের মতবাদের ন্যায় সামাজিক চুক্তি দ্বারা রাজক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রাখা বা হবসের মতবাদের ন্যায় চুক্তি দ্বারা রাজ্যকে চূড়ান্ত অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করিয়া তোলা—কোনটিরই প্রয়োজন হয় নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অধিকার নহে—কর্তব্য। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ বিশেষ মাথা ঘামান নাই এবং ফলে সিংহাসন যে রাজার নিজের সুখের জন্য নহে রাজা যে 'প্রজা'র শক্তিতেই শক্তিমান্, তাঁহার অধিকারের উপরে যে আছে তাঁহার কর্তব্য—এই নীতিই সমগ্র ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। বলা হয়, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রদর্শন রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি গল্প এবং বিসর্জন নাটকের সুরে ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজি এই কথাই বার বার বাহবিশ্বকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

অবশ্য ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন হইতে অধিকারের প্রশ্ন সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় নাই; তবে যেখানেই অধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেখানেই মোটামুটিভাবে দেখা হইয়াছে যেন উহা সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নারীকে সমানাধিকার প্রদান করার আদর্শের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সায়নাচার্যের ভাষ্য অনুসারে, ঋগ্বেদের যুগে অধিকারভোগের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইত না, সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে উভয়ে সমাংশ গ্রহণ করিত। পরে অবশ্য নারীর

১. মহাভারতে অবশ্য বিভিন্ন নায়কের কোন কোন উক্তিকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্যোতক বলিয়া ধরা যাইতে পারে—যেমন ভীষ্মের নিম্নলিখিত উক্তিটি: "যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।" অনুশাসন পর্ব। ১৩ পরিচ্ছেদ। (রাজশেখর বসুর সারানুবাদ)

সমানাধিকার ব্যাহত হয়; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও চলিতে থাকে। বিখ্যাত প্রাচীন কথাসাহিত্য 'কথাসরিৎসাগরে'র (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) নায়িকা রত্নাবতী (রত্নপ্রভা নামেও অভিহিত) বলিয়াছেন, নারীর সমানাধিকার হরণ ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষের নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ।

যাহা হউক, প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট অধিকারের পরিবর্তে কর্তব্যই অধিকতর মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় গণতান্ত্রিকতার নীতি জনসাধারণের মনে কখনও বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে নাই। ইহার অবশ্য আরও একটি কারণ আছে। প্রাচীন গ্রীসের মত ভারত সমাজ ও রাষ্ট্রকে কখনও অভিন্ন বলিয়া গণ্য করে নাই; বরং উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সর্বদা স্মরণ রাখিয়াছিল। সমাজ ছিল 'অন্তঃশাসনে শাসিত'। সুতরাং রাজশক্তি এক হাত হইতে অন্য হাতে গেলেই সমাজের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটিত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্বদেশী সমাজে' (১৯০৫) বলিয়াছেন, রাজার কার্য ছিল রাজ্যরক্ষা ও শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা এবং প্রজাদের কর্তব্য ছিল করপ্রদান করা। সুতরাং রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ চলিত তখন সমাজের কাজকর্ম স্থগিত থাকিত না। একদিকে রাজা যেমন করিতেন রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা, অপরদিকে আবার তেমনি সমাজ করিত জলসেচের ব্যবস্থা। জলসেচের জন্য সমাজ রাজশক্তির মুখাপেক্ষী ছিল না বলিয়া যুদ্ধের সময় জলসেচ ব্যবস্থায় কোন ব্যাঘাত ঘটিত না।

এইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর হইতে পৃথক হওয়ায়, উভয়ের স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হওয়ায় রুশোর সামাজিক তত্ত্বের ন্যায় 'জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতা' (popular sovereignty) বা গণতন্ত্রের ব্যাপকতর কথার প্রশ্নের অবতারণার প্রয়োজন হয় নাই। রাজা তাঁহার রাজধর্ম পালন করিবেন, প্রজারা আনুগত্য করপ্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিবে এবং 'সমাজ' তাহার কর্মে রত থাকিবে—এইরূপ কর্মবিভাগের মধ্যেই প্রাচীন ভারত স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের (liberty and authority) সমন্বয়ের মূলসূত্রটি খুঁজিয়া পাইয়াছিল; রুশোর মত 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছা (general will of the community) কল্পনা করিবার প্রয়োজন তাহাদের হয় নাই। ইহা অবশ্য সত্য যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি কারণে প্রাচীন ভারতে শাসন বিভাগের ক্ষমতা, ফলে রাজকর্তৃত্ব, বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রদর্শনের দিক দিয়া রাজাকে স্বৈরাচারী হিসাবে দেখা হয় নাই বলিলেই চলে। ধর্মশাসিত রাজা তাঁহার রাজধর্ম যথোপযুক্তভাবে পালন করিবেন—ইহা হইল ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজকর্তৃত্ব ব্যাপক না সীমাবদ্ধ হইবে, তাহা লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিক মাথা ঘামান নাই।

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন আবার বর্ণকর্তৃত্বের চক্রাকার নিয়মে (cycle of castes) বিশ্বাস করে। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হরিবংশে ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের উপর সাধারণ ক্ষেত্রে শাসনভার থাকিলেও ক্ষত্রিয়ই যে চিরকাল

কর্তৃত্ব করিয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই, কারণ নৃপতি ধর্মশাসিত হইলেও তাঁহার পদস্খলন ঘটিতে পারে। ক্ষত্রিয়ের নৈতিক অধঃপতন হইলে বৈশ্য এবং বৈশ্যের পতন ঘটিলে শূদ্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরে আবার শূদ্রকে সরাইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জোট ক্ষমতা পুনরধিকার করে। এই দিক দিয়াই সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শূদ্র বা সর্বহারা শ্রমিকদের (proletariat) অভ্যুত্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।[১]

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ণশাসনের কথা স্বীকার করিলেও অন্যান্য বর্ণ বা শ্রেণীর শোষণ বা নিষ্পেষণের কথা ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে নাই। বরং আছে অন্যান্য বর্ণের সহিত সমন্বয়ের সুস্পষ্ট ইংগিত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্র যে বর্ণই ক্ষমতাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, উহা যে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োজিত করে—ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন একথা স্বীকার করে না। এইভাবে শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তে 'সমন্বয়ের আদর্শ'ই হইল ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সনাতন ধর্মের দিক দিয়া একদিন ভারতের বর্ণভেদ প্রথা ও আনুষংগিক কর্মবিভাগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কালক্রমে ইহা কিন্তু শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনষ্টকারক রূপে দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ আবার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দিল মুক্তি পথের সন্ধান। বর্ণভেদপ্রথা, বাল-বৈধব্য, লৌকিক ধর্মের নামে কুসংস্কার অত্যাচার অবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন ভারতীয় চিন্তাবিদগণ। সুরু হইল উদারনৈতিক তত্ত্বের (liberalism) ভিত্তিতে স্বাধীনতা ও অধিকারের আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোধাদের অধিকাংশ কিন্তু মূল ভারতীয় সুরটি হারাইয়া ফেলেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজি সকলেই নিজস্ব সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে (one's own law of growth—Vivekananda) অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের চরম লক্ষ্য নহে, চরম লক্ষ্য হইল প্রকৃত স্বাধীনতা (true freedom)। "আমাদের পক্ষে কখনই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, বর্তমান দিনে যাহারা স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত তাহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নহে—শক্তিমান্ মাত্র," কারণ তাহারা এই শক্তিমত্তারই দাস।

বলা হয়, স্বাধীন ভারতে কিন্তু গতির মোড় অন্যদিকে ফিরিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতীয় সংবিধানেরই উল্লেখ করা যায়। এই সংবিধানের অংগীভূত রাজনৈতিক আদর্শসমূহ মূলত পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আহৃত। ইহাতে উল্লিখিত নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং এমনকি ৪২-তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট নাগরিকের কর্তব্যে প্রাচীন ভারতীয় ভাবাবেগ বিশেষ প্রতিফলিত হয় নাই। সংবিধানের 'নির্দেশমূলক নীতি' (Directive Principles) সংক্রান্ত অধ্যায়ে শাসকের কিছু কিছু কর্তব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বলবৎযোগ্য করা হয় নাই। স্বতই

১. বর্তমান ভারত। ইংরেজী অনুবাদের নাম *Modern India*

ভারতীয় সমাজজীবনের সহিত, ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শের সহিত ভারতীয় সংবিধানের যোগসূত্র নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বর্তমান জীবনের সহিত অতীতের যোগসূত্র কি একেবারেই ছিন্ন হইয়া যাইতে বসিয়াছে? এখন এ-সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ না করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আশা করা যাইতে পারে, নূতনের মোহ যখন কাটিয়া যাইবে, সনাতনকে আবার যখন ভালভাবে চিনিতে পারিব—তখন সেই সনাতনকেই আবার বরণ করিব।

শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া এই 'সনাতনে'র প্রতিপাদ্য বিষয় হইল মাত্র দুইটি: শাসকের ব্যক্তিগত সততা ও ধর্মচেতনা এবং নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র। শাসক যদি শাসনভারকে পবিত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অগ্রসর হন এবং নাগরিকগণের নৈতিক চরিত্র যদি কাম্য স্তরে উন্নীত হয়—তবে সুশাসনের কোন সমস্যাই থাকিতে পারে না। অপরদিকে এ-দুটি ব্যতিরেকে কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কোন কলাকৌশলই মানুষের রাজনৈতিক যাত্রাপথ সুগম করিতে পারে না। অতএব, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিতে শাসন-ব্যবস্থার সমস্যা হইল শাসক ও শাসিত উভয়েরই নৈতিক ভিত্তি (moral compass) প্রস্তুতকরণের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান রহিয়াছে ধর্ম (*Dharma*) বা জীবন-পদ্ধতির চরম বিধির মধ্যে।

> *"The basis of all systems, social or political, rests upon the goodness of men. No nation is good or great because Parliament enacts this or that, but because its men are good and great."*
> Swami Vivekananda

> *"The lifeless attempt of the last generation to imitate and reproduce with a servile fidelity the ideals and forms of the West has been no true indication of the political mind and genius of the Indian people. But again all the mist of confusion there is still the possibility of a new twilight, not of an evening but a morning* yuga-sandhya." Sri Aurobindo

১

রাষ্ট্রবিজ্ঞান—প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র
(POLITICAL SCIENCE— ITS NATURE AND SCOPE)

> *"The study of politics differs from scientific study in that, in addition to the desire to understand, the desire to ameliorate, to reform or to defend is implicit in the nature of investigation."*
> Michael Curtis

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা কিভাবে নির্দেশ করা যায় ?

২ উহার বিষয়বস্তু কি, এবং ঐ বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিকই বা কি কি ?

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদানের বিষয়ের পূর্ণ তালিকা কিভাবে প্রদান করা যাইতে পারে ?

৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র ক্রমপ্রসারিত না ক্রমসংকুচিত হইতেছে ?

৫ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে মার্ক্সীয় অভিমতের বক্তব্য কি ?

৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক কতটা ?

৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে নির্দেশ করা যায় ?

৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং (ক) রাজনৈতিক ধারণা ও (খ) রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ?

১০. এই বিজ্ঞানে অতীতের ধ্যান-ধারণার মূল্য কতটুকু ?

পূর্বাভাষ : পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব অলিখিত ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ঘটনা, বানর-জাতীয় জীব গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া মানুষ বলিয়া পরিচিত হওয়ার পর সুরু হইল এক নূতন অধ্যায়। প্রথমে সে ছিল অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল। চারিদিকে তাহার ছিল প্রতিকূল পরিবেশ, যাহার সহিত সংগ্রামে সে টিকিয়া থাকার সূত্র খুঁজিয়া পাইল সংঘবদ্ধতার মধ্যে। তারপর ব্যক্তি-মানব (individual) হিসাবে নয়, সংঘবদ্ধ জীব বা সমাজ-সংস্থার সদস্য হিসাবেই ক্রমশ সে জীবন-সংগ্রামে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া চলিল।[১]

প্রথম স্তর ছিল খাদ্যাহরণের জীবন (food-gathering life)। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহাকিছু সংগ্রহ হইত (ফলমূল পশুপক্ষী ইত্যাদি) তাহা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল সামান্যই, তবে যাহা সংগ্রহ করা হইত তাহা দল বা গোষ্ঠীর সকলেই সমভাবে ভোগ করিত। তারপর যত দিন যাইতে

১. R. L. Heilbroner : *Worldly Philosophers*

জাগিল মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য এবং উৎপাদনের কলাকৌশল শিখিল। সংগে সংগে হইল শ্রমবিভাগের উন্নতি এবং পণ্যবিনিময়-ব্যবস্থার উদ্ভব। ইহার ফলে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির হইল উদ্ভব, গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিল ধনবৈষম্য এবং বাধিল স্বার্থের সংঘাত।

বিশেষ শক্তি : তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ শক্তির। রাষ্ট্র তাহার বিধি-ব্যবস্থা রক্ষীবাহিনী বিচারালয় আমলাবৃন্দ প্রভৃতি লইয়া এই বিশেষ শক্তিরূপে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে—আজ মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য। তাহার সুখদুঃখ, আশা-আকাংক্ষা রাষ্ট্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচ্য বিষয়—প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা : এই রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ এবং উহার 'এজেন্সি' সরকারই এতদিন ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান ধারণা অনুসারে কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়াও যে-কোন বিষয় মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।[১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনাক্ষেত্র (Definition and Scope of Political Science): রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

পরম্পরাগত ধারণা : প্রাচীন বা পরম্পরাগত (traditional) ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল কেবলমাত্র রাষ্ট্র। গার্ণারের ভাষায়, (১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুরু ও সমাপ্তি হইল রাষ্ট্রকে লইয়া ("Political Science begins and ends with the State")। গেটেলও মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্রের বিজ্ঞান ("Political Science may be defined as the science of the State")। ইহাতে রাজনৈতিক সংগঠন, সরকারের গঠন ও কার্যাবলী এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পর্যালোচনা করা হয়।

পরম্পরাগত ধারণায় আলোচ্য বিষয়ের উপাদান : সংক্ষেপে, রাষ্ট্র সরকার এবং আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অবশ্য রাজনৈতিক তত্ত্ব (political theories) এবং রাজনৈতিক ধ্যানধারণার (ideas) আলোচনাও এই পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত, কারণ ইহারা রাষ্ট্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

এই ধারণা সমর্থনকারী লেখকগণের মধ্যে আছেন ব্লুন্টস্‌লি (Bluntschli), পল জেনেট (Paul Janet), সিলি (Seely) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ব্লুন্টস্‌লির ভাষায়, রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ("Political Science is the science which is concerned with the State")। ফরাসী লেখক পল জেনেটের মতে,

---

১. "Political science concerns itself with the life of men in relation to organised states. We cannot omit from the field of relevant interest whatever may affect that life." H. J. Laski : *On Study of Politics*

রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহাতে রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সরকার সম্পর্কিত নীতিসমূহের আলোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর তিনটি দিক: এই সকল অভিমতের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনায় তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়: (ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলী; (খ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, ইতিহাস ও গঠন; (গ) রাজনৈতিক সম্প্রসারণের সাধারণ সূত্রাবলী।

পরম্পরাগত ধারণার সমালোচনা: আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের মতে, উপরি-উক্ত ধরনের সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে না।

প্রথমত, এইরূপ সংজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত—অর্থাৎ ইহাতে মাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনাই করা হয়, এবং ব্যক্তি ও উপদলের রাজনৈতিক আচরণ (political behaviour of individuals and groups) প্রভৃতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ বা ইংগিত থাকে না। অথচ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের আচরণ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের (pressure groups) আচরণ, দলীয় কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

এই সমালোচনার উত্তর: অবশ্য অনেকে এই সমালোচনার উত্তরে বলেন যে ব্যক্তি ও উপদলের রাজনৈতিক আচরণ রাষ্ট্রের কার্যাবলীর—যেমন, আইন-প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যাপ্রদান—সংগে কোন-না-কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন, ভোটদাতারা ভোটদানের সময় ঠিক করে যে কাহাদের লইয়া আইনসভা গঠিত হইবে। মোটকথা, সমস্ত রাজনৈতিক আচরণের ধারা সমাজের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্র করিয়াই প্রবাহিত হয়।[১] সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পর্যালোচনায় এগুলিও আসিয়া পড়ে—পৃথকভাবে ইহাদের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় সমালোচনা হইল যে পরম্পরাগত সংজ্ঞায় প্রাচীন সমাজের—যেমন উপজাতীয় সমাজের—রাজনৈতিক কার্যকলাপের ইংগিত পাওয়া যায় না, কারণ ঐরূপ সমাজে যাহাকে আমরা সংগঠিত রাষ্ট্র বলি তাহা ছিল না। কিন্তু এইরূপ সমাজের রাজনৈতিক কাজকর্ম এবং ফলে রাজনৈতিক আচরণ বলিয়া কিছু ছিল না ইহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। যেমন, উপজাতীয় সমাজে প্রধানদের নিয়মকানুন প্রণয়নের এবং বিচারসংক্রান্ত অনেক ক্ষমতাই ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে শুধু 'রাষ্ট্রের' পর্যালোচনা বলিয়া অভিহিত করা ঠিক নহে।

একটি আধুনিক সংজ্ঞা—ক্ষমতার পর্যালোচনা: 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের পর্যালোচনা'—এই অভিমতের বিরুদ্ধে সমালোচনা হওয়ায় কোন কোন আধুনিক

১. "The whole process of political behaviour turns on the fact that there is the set of institutions called government for regulating the affairs of the society." D. D. Raphael: *Problems of Political Philosophy*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'ক্ষমতার পর্যালোচনা' (study of power)—কিভাবে ক্ষমতা দানা বাঁধে এবং বণ্টিত হয়—তাহারই আলোচনা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

এইরূপ সংজ্ঞার অসুবিধা: এইরূপ অভিমতের অসুবিধা হইল যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা অন্যতম প্রধান উপাদান হইলেও কখনই একমাত্র উপাদান নয়। ইহা ব্যতীত 'ক্ষমতা' (power) শব্দটি বিশেষ অস্পষ্ট। ব্যাপকভাবে ইহা দ্বারা 'সকল প্রকার প্রভাবের সম্পর্ক'কে (all relations of influence) বুঝায়—অর্থাৎ ইহা সামাজিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, পিতাপুত্রের সম্পর্ক প্রভাবের সম্পর্ক হইতে পারে। পিতা পুত্রকে দিয়া ইচ্ছামত কার্য করাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া পিতাপুত্রের এই প্রভাবের সম্পর্ককে রাজনৈতিক সম্পর্ক বলা যায় না।[১]

ক্ষমতার ভূমিকা তবুও কিন্তু শাসন-পদ্ধতিতে (governmental process) ক্ষমতা (power) বা কর্তৃত্বের (authority) বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দাবিদাওয়ার মধ্য হইতে সরকার যে-সকল নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কার্যকর করার ব্যবস্থা করে, তাহা ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত রূপ গ্রহণ করে না।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ তালিকা: উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে. রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র যাহা রাষ্ট্র, সরকার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংঘ, রাজনৈতিক দল, চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure groups), ভোটদাতাগণের আচরণ, রাজনীতি-কারীদের ব্যক্তিত্ব (personality of the politicians), সামাজিক আচরণ ও রীতিনীতি, সম্প্রদায়সমূহের সাধারণ কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রকৃতি, যোগাযোগ ও প্রভাববিস্তারের পদ্ধতি, অর্থনৈতিক, কলাকৌশলগত ও জনসংখ্যাসংক্রান্ত অবস্থা প্রভৃতির বিচারবিশ্লেষণ করিয়া থাকে।

চারি প্রকার বিষয়: দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অতি ব্যাপক। এই ব্যাপক বিষয়বস্তু মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত: (১) রাজনৈতিক তত্ত্ব (political theory), (২) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (political institutions); (৩) দল উপদল ও জনমত (parties, groups and public opinion); এবং (৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (international relations)।[২]

---

১. "A parent is often (or should I say sometimes?) able to get his children to do what he says, so is a teacher with his pupils. ... All these examples may be called instances of the exercise of power, but it would be absurd to say that they are examples of political power." D. D. Raphael: *Problems of Political Philosophy*

২. UNESCO Report '52—*Contemporary Political Science*

(১) রাজনৈতিক তত্ত্ব: রাজনৈতিক তত্ত্বই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে কাম্য সম্পর্ক কি, তাহা লইয়া আলোচনা করে। লোকে রাষ্ট্র বা সরকারের অধীনে কি কারণে বসবাস করে—অর্থাৎ ইহাতে তাহার সুবিধা কি? রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের ভিত্তি কি এবং কতদূর পর্যন্তই বা সে আনুগত্য প্রদর্শন করিবে? রাষ্ট্র বর্তমান আকার ধারণ করিল কোন্ কারণে? ইহার আদর্শ রূপ কি হওয়া উচিত? রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কি কি কর্তব্য রহিয়াছে?—এই সকল প্রশ্নের আলোচনাই রাজনৈতিক তত্ত্বের অংগীভূত।[১]

তত্ত্বের স্থান লইয়া মতবিরোধ: এইরূপ তত্ত্বগত ধ্যানধারণা হইল মূল্যবোধের (values) প্রশ্ন। ইহা কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাভুক্ত হইতে পারে? যাঁহারা বাস্তবধর্মী আলোচনায় বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে নয়। তবুও কিন্তু স্বীকার করা হয় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজনৈতিক তত্ত্বের বিশেষ স্থান রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে মাত্র বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে চলিবে না, তাঁহাকে কাম্য রাজনৈতিক জীবনের কথাও ভাবিতে হইবে।[২]

একটি অভিমত. রাজনৈতিক আলোচনায় কিছুটা আদর্শবাদ আনয়ন হয়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কিছুটা কম কঠোর এবং কম সুসম্বদ্ধ করিবে, কিন্তু ইহার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে সুখপাঠ্য বিষয় হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—হেনরী কেরিয়েলের (Henry S. Kariel) এই অভিমত বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সিদ্ধান্তসমূহ কিভাবে গৃহীত হইল তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে না, সিদ্ধান্তের গুণাগুণও বিশ্লেষণ করিতে হইবে—বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে।[৩] সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মূল্যবোধ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকিতে পারেন না।

(২) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান: রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (political institutions) আলোচনার মধ্যে পড়ে শাসনতান্ত্রিক আইন, কেন্দ্রীয় সরকার, আংগিক সরকার, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন-পদ্ধতি (public administration) এবং শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা।

(৩) দল উপদল ও জনমত: সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আরও প্রসারিত হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনার পর তিনি মাত্র

১. অনেক সময়ই রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের তত্ত্বগত ও রাষ্ট্রদর্শনবিদগণের তত্ত্বগত আলোচনাকে বুঝায়। আবার অনেকে ইহাকে পৃথক করিয়া দেখেন। এখানে আমরা ব্যাপক অর্থেই রাজনৈতিক তত্ত্ব কথাটি ব্যবহার করিব।

২. "Political Scientists are still very much interested in the character of the 'good' order as well as of the 'empirical' order." H. Victor Wiseman: *Political Science*

৩. "The actual and the ideal are the dough and the yeast. It is in unison that they become a fit food for consumption." Leslie Lipson: *The Great Issues of Politics*

অনুসন্ধান করিয়া থাকেন যে রাষ্ট্রযন্ত্র বা শাসনযন্ত্রের পশ্চাতে কি কি শক্তি কার্য করে। এই কারণে তাঁহাকে দল উপদল স্বার্থগোষ্ঠী ও জনমতের বিশ্লেষণ করিতে হয়। আজিকার দিনের রাজনীতিতে এগুলি বিশেষ সক্রিয় শক্তি বা প্রভাব দলের মাধ্যমে জনসাধারণ কিভাবে রাজনৈতিক কার্যপদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে, ভোটদাতৃগণের আচরণ ও চাপসৃষ্টিকারী উপদলগুলির স্বার্থ কিভাবে কার্য করে, জনমত কিভাবে সৃষ্ট হয় ও শাসন-পদ্ধতিকে কিভাবে স্পর্শ করে, ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাঁহাকে আলোচনা করিতে হয়।

(৪) **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক**: বর্তমানে রাজনীতি আবার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিশেষ সম্প্রসারিত হইয়াছে। জাতীয় নীতি বা উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য বা নীতির সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত—বিচ্ছিন্ন পর্যালোচনায় কোন দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না।[১]

রাজনৈতিক পদ্ধতি বা ঐতিহাসিক পটভূমির প্রয়োজনীয়তা: আরও স্মর্তব্য যে শাসন-পদ্ধতির গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, যাহার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইল ঐতিহাসিক পটভূমির। এই পটভূমি ব্যতিরেকে বর্তমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা অথবা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইংগিত দেওয়া সম্ভব নয়।[২] যেমন, গণতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা না করিলে বর্তমানে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা বা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া একরূপ অকল্পনীয়।

তুলনামূলক আলোচনা: রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ আবার মাত্র অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বস্তুত, অ্যারিস্টটলের সময় হইতে সুরু করিয়া এ পর্যন্ত তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনামূলক আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছেন, এবং আধুনিক কালে এই গুরুত্ব আরোপের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই তুলনামূলক আলোচনা হইতে কোন্ কোন্ বিষয় মাত্র আকস্মিক বা সাময়িক (accidental or transitory) এবং কোন্‌গুলি স্থায়ী বা মৌল (permanent or fundamental) তাহা বুঝা যায়, এবং এই আলোচনার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রের অনুসন্ধান সম্ভব। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সাধারণ কারণগুলি কি, তাহার ইংগিত আমরা সুইজারল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা হইতেই পাইতে পারি। আবার বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার কারণ কি তাহাও

১. "... the mood of politics today is basically internationalist or transnationalist, rather than isolationist." Michael Curtis : *The Nature of Politics*

২. "One cannot properly grasp the meaning of the present—still less can one chart a course of action for the future—without delving into the past." Leslie Lipson

বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বিশ্লেষণের ফলে আমরা অকাম্য শাসন-ব্যবস্থাকে (যেমন, ফ্যাসীবাদী বা নাৎসীবাদী শাসন-ব্যবস্থা) কিভাবে পরিহার করা যায় সে-সম্বন্ধে নির্দেশ লাভ করিতে পারি।[১]

আলোচনাক্ষেত্রের ক্রমবিস্তৃতি : দেখা গেল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র শুধু যে ব্যাপক তাহা নহে, দিন দিন উহা ব্যাপকতরও হইতেছে।

সমাজবদ্ধ মানুষের একশ্রেণীর সামাজিক সম্বন্ধ (social relations) লইয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এই সম্বন্ধকে 'রাজনৈতিক সম্বন্ধ' (political relations) বলা হয়। বর্তমান জগতে মানুষের এই রাজনৈতিক সম্বন্ধ উত্তরোত্তর জটিল রূপ ধারণ করিতেছে।

ইহা ব্যতীত মানুষের রাজনৈতিক দিককে সমাজের অন্যান্য দিক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে আলোচনা অবাস্তব হইবে। অতএব, আলোচনাকালে আমাদিগকে রাজনৈতিক জীবনের উপর অন্যান্য দিকের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। বস্তুত, আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে একাধারে অর্থবিজ্ঞাবিদ (economist), সমাজবিজ্ঞাবিদ (sociologist), মনোবিজ্ঞাবিদ (psychologist), ঐতিহাসিক (historian), ভাষাবিদ (linguist) এবং এমনকি প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিকও (a natural scientist) হইতে হইবে। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে এতগুলি ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়, অতএব তাঁহাকে নিজস্ব ক্ষেত্র ব্যতীত প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লইতে হইবে।[২]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে মার্ক্সীয় অভিমত (The Marxist View of Political Science) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম কথাই হইল যে ইহা রাজনীতি লইয়া আলোচনা করে (Political Science is the study of Politics)।

লেনিন : লেনিনের মতানুসারে রাজনীতির বিষয়বস্তু হইল বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।[৩] দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীগুলির উদ্দেশ্য বা স্বার্থ এবং এই উদ্দেশ্যসাধন বা স্বার্থসাধনের জন্য শ্রেণীগুলি যে-সকল উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহাই রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

১. "... the desire to understand the rise of old-fashioned dictatorships or of modern totalitarian rule has been accompanied by the wish to provide means of avoiding for the future and of limiting in the present the spread of tyranny." Jean Blondel : *Comparative Government*

২. "Ideally the political scientist would need to be a sociologist, a psychologist, an economist, an historian, often a linguist and even a physical scientist, but since this is impracticable, he must be content with a personal acquaintance with some of these fields of knowledge and the possibility of drawing upon the remainder whenever necessary." Michael Rush

৩. Politics is "the sphere of relationships of all classes and strata to the state and the government, the sphere of the interrelations between all classes." V. I. Lenin : *Collected Works*, Vol. 5, p. 422

রাজনীতি মাত্র শ্রেণীসম্পর্ক লইয়াই আলোচনা করে না, জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী (social groups) এবং দলসমূহের মধ্যে সম্পর্কও রাজনীতির আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা (state power)। রাষ্ট্র এবং উহার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে ঘিরিয়াই গড়িয়া উঠে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর দৃষ্টিভংগি। ইহা ব্যতীত এক রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রাষ্ট্র শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের সহায়তাতেই প্রতিপত্তিশালী নিজের স্বার্থসাধন করে ও শোষকশ্রেণীর প্রচেষ্টা চলে এই রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করিবার অবশ্য পূর্ণাংগ সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং সকলেই হইয়া দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার। রাষ্ট্র তখন সমাজতন্ত্র সুদৃঢ় করিয়া কমিউনিজমের পথে অগ্রসর হয়।

রাজনীতির তাৎপর্য : উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করা এবং রাষ্ট্রকার্যের গতিপ্রকৃতি, লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারিত করার মধ্যেই রাজনীতির তাৎপর্য নিহিত।[১]

এই প্রসংগে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় যে, সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি ইত্যাদির গোড়ায় রহিয়াছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।[২] শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার জন্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অধিকার করিবার প্রচেষ্টা করা হয়, এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রেণীসংগ্রাম চলে এবং রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কারণেই লেনিন একসময় উক্তি করিয়াছিলেন "অর্থনীতির ঊর্ধ্বে হইল রাজনীতি" (politics must take precedence over economics)।

দ্বন্দ্বের ধারণা : যাহা হউক, মার্ক্সীয় রাজনীতির আসল বিষয়বস্তুর অন্তস্থলে রহিয়াছে দ্বন্দ্বের ধারণা (the notion of conflict)। অ-মার্ক্সীয় লেখকদেরও মত হইল, দ্বন্দ্বই (conflict) রাজনীতির বিষয়বস্তু। তবে মার্ক্সবাদী ও অন্যান্য লেখকের মধ্যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। উদারনৈতিক লেখকদের মতে, এই দ্বন্দ্ব বিশেষ গভীর নয় এবং আপস-মীমাংসার মাধ্যমে ইহার সমাধান হইয়া যায়। অপরপক্ষে মার্ক্সবাদীরা বলেন, আপস-মীমাংসার দ্বারা নহে, মাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাইয়া ইহার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব।[৩] কারণ, শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যেই রহিয়াছে দ্বন্দ্বের উৎস।

১. "Politics is participation in the affairs of the state, the control of the state, the determination of the forms, tasks and content of its activity" Lenin : *Miscellany* XXI, p. 14

২. 'There remains in Marxism an insistence on the 'primary' of the 'economic base' which must not be understated." R. Miliband

৩. For the Marxists "It is not a matter of 'problems' to be 'solved' but of a state domination and subjection to be ended by a total transformation of the conditions which give rise to it." R. Miliband

অতএব মার্ক্সীয় রাজনীতির মূলে বিষয়বস্তু হইল শ্রেণীসংগ্রাম এবং লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা।

কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতির কোন স্থান থাকিবে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাজনীতি (Political Science and Practical Politics): এখন মৌল প্রশ্ন হইল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে মাত্র রাজনীতির আলোচনায় গণ্ডিবদ্ধ করা হইবে, না তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করিবেন? এই প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কতকটা মতবিরোধ থাকিলেও অধিকাংশের ধারণায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা সমীচীন। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাত্র রাজনীতির চর্চায় আবদ্ধ থাকিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সার্থকতা সংকুচিত হইবে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা: রাজনীতির চর্চাই শুধু কাম্য নয়, বর্তমান জগতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রাজনীতিবিদ্‌দের জ্ঞানকে প্রয়োগ করারও প্রয়োজন আছে। ইহা করা হইলে দেশের সম্মুখে যে সকল বহুমুখী সমস্যা রহিয়াছে তাহাদের মোকাবিলা করার সুবিধা হইবে। ইহাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধিক বাস্তবমুখী হইয়া উঠিবে।

অ্যারিস্টটল ও মার্ক্স: এই সকল কারণেই অ্যারিষ্টটল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজনীতির উদ্দেশ্য মাত্র জ্ঞানলাভ করা নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে কার্য করা (the end of politics is not knowledge but action)। এই প্রসংগে মার্ক্সের অভিমতেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি উক্তি করিয়াছেন: দার্শনিকরা বিভিন্নভাবে অবস্থা-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আসল কথা হইল অবস্থা-ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করা।[১]

অবশ্য মার্ক্সবাদীদের মতে, মার্ক্সীয় তত্ত্ব হইল বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব। ইহা বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই তত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া মানব-মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইতে হইবে এবং শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাইতে হইবে। বুদ্ধিজীবীই হউন বা সাধারণ মানুষই হউক, সকলকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে ঐ দেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারী কার্যকলাপের সহিত অধিকমাত্রায় সংযুক্ত করিবার পক্ষপাতী। বস্তুত, বহু রাজনীতিবিদকেই কোন-না-কোন ভাবে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সহিত জড়িত করা হয়। আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানীই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দপ্তরে কার্য করিয়াছেন এবং করিয়া চলিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডেও একাধিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিয়াছেন

১. "The philosophers have only interpreted the world in various ways, the point, however, is to change it." Marx.

এবং নানাভাবে পরামর্শ প্রদান করিয়া সরকারের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করিয়াছেন। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরাসরি স্থানীয় সরকার ও পার্লামেণ্টের সদস্য, এমনকি মন্ত্রীও হইয়াছেন। বর্তমানে বহু কমিটি ও কমিশনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের স্থান দেওয়া হয়।

• **তত্ত্বগত সমর্থন :** লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce), চার্লস মেরিয়াম (Charles Merriam) প্রমুখ লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বাস্তব রাজনীতির সংগে জড়িত থাকা সমীচীন বলিয়া মনে করেন। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অধ্যাপক ওয়াইসম্যান (H. V. Wiseman) উপরি-উক্ত মতকে সমর্থন করেন। তাঁহার যুক্তি হইল যে বর্তমান দিনের জটিল আংগিকের দিক দিয়া এবং বিশেষভাবে প্রায়োগিক (technical) সরকারী কার্যাবলীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিতে সমর্থ। কোন বিশেষ নীতি অনুসৃত হইলে উহার ফলাফল কি হইবে না-হইবে তাহার ইংগিতও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দিতে পারেন—এমনকি রাজনৈতিক কার্যের দ্বারা সমাজের কিভাবে উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহার সন্ধানও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নিকট হইতে মিলিতে পারে।[১]

উদ্দেশ্যসাধক বিজ্ঞান : রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্যসাধক বিজ্ঞান' (policy-science) বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে এ কার্য সম্পাদন করিতেই হইবে।[২]

বিরোধিতা : অনেক লেখকই অবশ্য এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। মিলেট (John D. Millet), ফেয়ার্লি (Henry Fairlie) প্রমুখ লেখকের মতে, ব্যবহারিক রাজনীতির সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সম্পর্কিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ইহার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে রাজনীতির নিরপেক্ষ বিচারবিবেচনা করা সম্ভব হইবে না, এবং স্বাধীন বিদ্যাচর্চার পরিবেশও (academic atmosphere) বলুপ্ত হইবে।

উপসংহার . ইহা সত্ত্বেও আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অধিকাংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত সম্পর্কিত করিবার পক্ষপাতী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন (Political Science and Political Philosophy) : রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত অনেক সময় রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। যাঁহারা এই প্রকার পৃথকীকরণের

১. "I would strongly support the view that one very significant role of the political scientist is to provide the knowledge and understanding that will, hopefully, be useful to those who have to make the dicisions." Wiseman : *Politics—The Master Science*

২. "A policy-scientist can only counsel other people ··· because he has an extensive knowledge of political reality. He is an expert in political behaviour, and he is willing to predict which policies are more suitable for obtaining ends that men might want to secure." Andrew Hacker : *Political Theory*

পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে রাজনৈতিক আলোচনা দুই প্রকারের হইতে পারে : বর্ণনামূলক (descriptive) এবং নির্দেশমূলক (prescriptive)।

বর্ণনামূলক রাজনৈতিক আলোচনা : বর্ণনামূলক আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবধর্মী—ইহাতে বাস্তব জীবনে মানুষের রাজনৈতিক আচরণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্বন্ধ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ, সমাজে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা ইত্যাদির বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই করা হয়, এবং মানুষের কি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে কোন নির্দেশই দেওয়া হয় না।

নির্দেশমূলক আলোচনা : অপরদিকে নির্দেশমূলক আলোচনায় এইরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়—বলা হয় যে নাগরিকগণের পক্ষে এইরূপ আচরণ করা উচিত, রাষ্ট্রের পক্ষে এইভাবে কার্য করা উচিত, ইত্যাদি।

সীমারেখা সম্বন্ধে অন্যতর ধারণা : সাম্প্রতিক লেখকগণের কেহ কেহ উপরি-উক্ত বর্ণনামূলক আলোচনাকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science) এবং নির্দেশমূলক আলোচনাকে 'রাষ্ট্রদর্শন' (Political Philosophy) বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষপাতী।

অপর ধারণা : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে সীমারেখা টানিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থকে সংকুচিত করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। ইহাদের মতে, কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কেবলমাত্র বাস্তব রাজনৈতিক আচরণ অথবা কাম্য আচরণেই সমাপ্ত হইতে পারে না—উভয়কে লইয়াই ইহার কাজকারবার। যাঁহাকে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা হয়—অর্থাৎ যিনি শুধু বাস্তব আচরণের আলোচনা করেন—তাঁহাকে নিজের ধ্যানধারণা অনুসারে কতকগুলি আচরণ বা বিষয় নির্বাচন করিতে দেখা যায়। নিজের ধ্যানধারণা অনুসারে নির্বাচন করেন বলিয়া নির্বাচনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায় নির্দেশমূলক বা দার্শনিক (prescriptive or philosophical)। অপরদিকে যাঁহারা শুধু নির্দেশই দিয়া থাকেন তাঁহারাও মানুষের বাস্তব রাজনৈতিক আচরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। সুতরাং পুরাপুরি বর্ণনামূলক বা পুরাপুরি নির্দেশমূলক রাজনৈতিক আলোচনা বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। উভয় প্রকার আলোচনা পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে এবং এই দুই প্রকার আলোচনাই বর্তমানে সামগ্রিকভাবে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত।[১]

অতএব, রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একাধারে বর্ণনামূলক ও নির্দেশমূলক শাস্ত্র।[২]

---

১. Leslie Lipson : *The Great Issues of Politics*

২. "Political Science is generally understood to include the field of political philosophy. In doing so it enters the field of value-judgements." Pennock and Smith : *Political Science*

রাজনৈতিক ধারণা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Ideas and Political Science) : অনেকের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিয়া কোন শাস্ত্র নাই বা থাকিতে পারে না। যাহা আছে তাহা হইল রাজনৈতিক চিন্তার কতকগুলি ফল' বা রাজনৈতিক ধারণা—রাষ্ট্রের গঠন, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, আনুগত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা। এই সকল ধারণার প্রত্যেকটির বিশেষ প্রকারভেদ (variation) লক্ষ্য করা যায় বলিয়া এই শ্রেণীর লেখকগণ 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইঁহারা বলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্যমত দেখা যাইবে, কিন্তু রাজনৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে ঐক্যমতের পরিবর্তে দেখা যায় বিশেষভাবে মতবিরোধ। অতএব, যাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত তাহা পরস্পরবিরোধী বহু সংখ্যক ধারণার সংকলন মাত্র। এইরূপ সংকলনকে রাজনৈতিক চিন্তাসমষ্টি (politi-c l thought) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ (Political Science and Political Ideologies) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বহু উপাদানের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ অন্যতম। কয়েকটি সুসম্বদ্ধ রাজনৈতিক বিশ্বাসকেই (political beliefs) বলা হয় রাজনৈতিক ভাবাদর্শ—যেমন, গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ (democra tic ideology), সমভোগবাদী ভাবাদর্শ (communist ideology), উদারনৈতিক ভাবাদর্শ (liberal ideology) ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে সংগ্রামের প্রেরণা এবং মর্ত্যে স্বর্গ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক ভাবাদর্শেরই বক্তব্য হইল যে, মাত্র উহারই মাধ্যমে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গঠন সম্ভব। ফলে প্রত্যেকটি ভাবাদর্শই অঙ্গীকার জেহাদের (crusade) রূপ ধারণ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য? (Is Political Science a Science ?) : পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেই এ-ধারণা করা যাইবে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায় কি না তাহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ : অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে (Politics) চরম বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতেন এবং তৎকালীন গ্রীক রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন বোদাঁ (Bodin), হবস্ (Hobbes), মন্টেস্কু (Montesquieu), সিজউইক, ব্লুন্টস্‌লি, লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আধুনিক আচরণবিজ্ঞানিগণ (Modern Behaviourists)। আচরণবিজ্ঞানিগণ দাবি করেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। অপরদিকে বাকল (Buckle), কোঁত (Comte), মেটল্যাণ্ড (Maitland) প্রভৃতি চিন্তাবিদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

১. C. L. Wayper : *Political Thought*

বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যালোচনা সম্ভব নয়। অতএব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য নহে। মেটল্যাণ্ড একসময়ে বলিয়াছিলেন: "যদি আমি পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি যাহার শিরোনাম হিসাবে লেখা আছে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science), তখন আমার ঐ শিরোনামের জন্য বিশেষ দুঃখ হয়, প্রশ্নগুলির জন্য নহে।"[১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধে যুক্তি: সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার বিরোধীদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহ বিশেষ অনিশ্চিত, জটিল ও সংখ্যায় বিপুল বলিয়া ইহাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না করাই যুক্তিযুক্ত।

বার্ক: বার্ককে (Burke) অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, সৌন্দর্যানুভূতির বিজ্ঞান বলিয়া যেমন কিছু নাই, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই ("There is no science of politics any more than there is a science of aesthetics.")।

পোলক: বিরুদ্ধবাদিগণের এই যুক্তির বিরুদ্ধে স্যার ফ্রেডরিক পোলক বলেন, যাঁহারা এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণাই অসম্পূর্ণ।

বিজ্ঞান কাহাকে বলে: ইহার পর প্রশ্ন উঠে বিজ্ঞান কাহাকে বলে? সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল 'কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান' (Science is a systematic study of a group of interrelated problems)। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত। এবং এইভাবে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা যায়।

বিজ্ঞান পদবাচ্য করিবার সপক্ষে যুক্তি: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেলায় দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ শ্রেণীবিভক্তীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

ব্রাইস: লর্ড ব্রাইস বলেন, মানুষের রাজনৈতিক আচরণ জটিল হইলেও তাহার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই সামঞ্জস্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি।[২] মানুষের রাজনৈতিক আচরণে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া এ-বিষয়ে শৃংখলিত জ্ঞানলাভ সম্ভব। এই শৃংখলিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়মের

১. "When I see a ··· set of examination questions headed by the word 'Political Science', I regret not the questions but the title."

২. "The tendencies of human nature are the permanent basis of study which gives to the subject called political science whatever scientific quality it may possess." Bryce

প্রতিষ্ঠাও করা যায় এবং এই সূত্রগুলি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে একরূপ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইভাবে দেখিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়।

অন্যতম আধুনিক লেখক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসনের ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা চলে, কারণ রাজনৈতিক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভক্তীকরণ সম্ভব এবং এই বিশ্লেষিত ও শ্রেণীবিভক্ত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব।" জর্জ ক্যাটলিনও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়া উক্তি করিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানপর্যায়ভুক্ত, কারণ ইহা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত প্রমাণযোগ্য শৃংখলিত জ্ঞান লইয়া গঠিত।[১]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান: অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন নিয়মের (universal laws) সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, সর্বক্ষেত্রেই জলে নির্দিষ্ট পরিমাণের উত্তাপ প্রয়োগ করা হইলে জল ফুটিতে থাকিবে। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রকার সার্বিক সূত্রের আবিষ্কার অসম্ভব, কারণ মানুষের কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভংগি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দেশের বাতাবরণের (milieu) সহিত সম্পর্কিত।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া বলিয়া এই শাস্ত্রের বেলায় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কার্যক্ষেত্রে সকল সময় প্রয়োগ করা বিশেষ কঠিন। মানুষের বেলায় কোন বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।[২] ইহার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সকল সময় সতর্কভাবে চলিতে হয়; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অসম্ভব হইলে মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; সাধারণভাবে সরকারের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে মানুষকে লইয়া গবেষণাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না; সম্ভব হইলেও ইহা বিশেষ বিপজ্জনক পদ্ধতি। চরম দাসত্বের পীড়নে মানুষের অবস্থা কি হয় তাহা লইয়া পরীক্ষা করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়; সম্ভব হইলেও সমীচীন নয়। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনেক সময় অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলি বহুলাংশে অনুমানসিদ্ধ। বস্তুত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যেভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব, কোন সামাজিক বিজ্ঞানে তাহা সম্ভব নয়। এই সকল কারণে লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার (Meteorology) ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

১. "Political Science is a science in that it consists of a body of verifiable and systematic knowledge gathered by observation and experiment." Catlin: *The Science and Method of Politics*

২. Hans Morgenthau. *Scientific Man v. Power Politics*

প্রগতিশীল বিজ্ঞান : ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানসমূহের পর্যায়ভুক্ত করার পর বলিয়াছেন : "রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রগতিশীল বিজ্ঞান" (Political Science is a progressive science)। মানুষের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা প্রত্যহই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে তাঁহার পক্ষে মানুষের সমাজজীবন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা দিন দিন সহজতর হইতেছে।

ক্যাটলিন বলেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পদসঞ্চার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।[১]

আলোচনার সংক্ষিপ্তসার : উপরের আলোচনার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পার যায়, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই বিষয়ে এক মত যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য, কারণ বিজ্ঞানের অধিকাংশ গুণ বা লক্ষণ ইহাতে আছে—যথা, রাজনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গভীর শৃংখলা দৃষ্ট হয়, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ রাজনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করা যায় এবং এই সূত্রগুলি সাধারণভাবে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ সম্ভব। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয় অথবা অংকশাস্ত্রের মত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় মানুষকে লইয়া কারবার করে এবং মানুষের আচরণকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সূত্রের অনুরূপ সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।[২]

অধ্যাপক উইলসনের (F. G. Wilson) ভাষায় বলিতে পারা যায় : "রাজনৈতিক পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষিত ও শ্রেণীবিভক্ত করিয়া রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়; কিন্তু যাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ বলে—অর্থাৎ পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের যে-চেষ্টা তাহা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতিরও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই এবং বোধ হয় কোনদিনই পারিবে না।"

এক শতাব্দীরও পূর্বে টক্‌ভিল বলিয়াছিলেন : "নূতন জগতের জন্য এক নূতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রয়োজন।" জগৎ নূতন হইতে নূতনতর হইয়াছে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে রাষ্ট্রের বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানই রহিয়া গিয়াছে।

মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন : অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হইলেও কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন নয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় মূল্যায়নের প্রশ্ন আনিতেই হইবে। তাহা না করিলে

১. Catlin : *A Study of the Principles of Politics*

২. "Political science has not the axiomatic quality of mathematics. In its equations the variables are human beings whose uniqueness prevents their reduction to law in the scientific sense of that much-abused word." Laski

আলোচনা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে এবং অতীতের দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ ধ্যানধারণা বাদ পড়িয়া যাইবে।[১]

স্মর্তব্য – অধ্যায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্র, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের পর্যালোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

২. বিষয়বস্তু হইল (ক) রাজনৈতিক তত্ত্ব, (২) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, (৩) দল উপদল ও জনমত এবং (৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৩. উপাদানের পূর্ণ তালিকা : রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংঘ, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, ভোটদাতৃগণ, রাজনীতিকারিগণ, সামাজিক আচরণ, সমাজের রীতিনীতি শিক্ষা-প্রাকৃতিষ্টি ইত্যাদি, যোগাযোগ ও প্রচার-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক, কলাকৌশলগত ও রহিয়াছেনসংখ্যা-সংক্রান্ত অবস্থা।

laws) ৪. বিভিন্ন নূতন নূতন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির জন্য আলোচনাক্ষেত্র প্রয়োগ ক্রমপ্রসারিতই হইতেছে।

প্রক ৫ মার্ক্সীয় রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু শ্রেণীসংগ্রাম এবং লক্ষ্য কমিউনিস্ট সয সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৬. বিরোধিতা সত্ত্বেও অধিকাংশ আধুনিক লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী।

৭. রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই এক অংশ—নির্দেশমূলক অংশ।

৮. (ক) রাজনৈতিক চিন্তাসমষ্টিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায়, (খ) রাজনৈতিক ভাবাদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম উপাদান।

৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান হইলেও অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান, তবে প্রগতিশীল বিজ্ঞান।

১০. অতীতের ধ্যানধারণার মাপকাঠিতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়—রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ মূল্য-নিরপেক্ষ হইতে পারে না।

অনুশীলনী

1. Discuss the nature of Political Science as a science, and distinguish it from Political Philosophy.

[বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা কর এবং রাষ্ট্রদর্শন হইতে উহার পার্থক্য নির্দেশ কর।]

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত : রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা যায় কি না, সে-বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে। অধিকাংশ আধুনিক লেখকের মতে, বর্ণনামূলক ও নির্দেশমূলক—উভয় প্রকার রাজনৈতিক আলোচনার সমন্বয়ই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তবে সাধারণত বর্ণনামূলক আলোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নির্দেশমূলক আলোচনাকে রাষ্ট্রদর্শন বলিয়া অভিহিত করা হয়। ...২-৪ ৮-৯ এবং ১০-১১ পৃষ্ঠা। অতিরিক্ত আলোচনার জন্য পরবর্তী টীকাটিও প্রয়োজন।]

১. H. Victor Wiseman : *Politics—The Master Science*

2. Define 'Political Science'. Can Political Science be regarded as 'a science? Give reasons for your answer.

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা চলে ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (২-৪, ১২-১৩ পৃষ্ঠা)

3. Explain on what grounds Political Science may be regarded as a true science.

[কোন্ কোন্ যুক্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা যায় তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১২-১৩ পৃষ্ঠা)

4. Discuss in brief the Marxian view of Political Science.

[সংক্ষেপে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতের পর্যালোচনা কর।] (৭-৯ পৃষ্ঠা)

5. Should Political Science be value-free ? Give reasons for your answer.

[রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি মূল্য-নিরপেক্ষ হইবে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।] (১০-১১, ১৫-১৬ এবং ১৮-২০ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট*

রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন
(POLITICAL THEORY AND POLITICAL PHILOSOPHY)

> *"All political philosophers are also political theorists·· but not all political theorists are political philosophers in the full sense."* Dante Germino

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

২. থাকিলে পার্থক্য ঠিক কোথায় বা কোথায় কোথায় ?

৩. রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল কার্য কি কি, এবং উহার দুর্বলতাই বা কোথায় ?

৪ কি ভাবে রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় ?

৪ রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন কি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, না পরস্পরের পরিপূরক ?

সংক্ষেপে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের পার্থক্য : আধুনিক রাজনীতির আলোচনায় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন—এই দুইটি ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া গভীর বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের মধ্যে কোন মৌল পার্থক্যই নাই :—দুইটি বিষয়ই রাজনীতির মূল সমস্যা সম্পর্কিত এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য হইল সঠিক অনুসন্ধানের সাহায্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো। অন্যদিকে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণায় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন হইল রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দুইটি বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যা।

রাষ্ট্রতত্ত্ব বর্ণনামূলক (descriptive) আলোচনার মাধ্যমে রাজনীতির ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক, আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের বাস্তবধর্মী বর্ণনা পাওয়া যায় রাষ্ট্র-তত্ত্বের আলোচনায়। অপরদিকে রাষ্ট্রদর্শনে বর্ণনা অপেক্ষা নির্দেশ (prescriptions) ও মূল্যায়নের (value-judgement) প্রাধান্যই বেশী। রাষ্ট্র কি ভূমিকা পালন করিবে, রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কি কর্তব্য হওয়া উচিত—এ-সকল বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়াই রাষ্ট্রদর্শনের মূল লক্ষ্য।

অন্য দুইটি পার্থক্য : দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় শুধুমাত্র বর্ণনারই প্রাধান্য নাই—অনুসন্ধান, পরীক্ষানিরীক্ষারও যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। মানুষের রাজনৈতিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের জন্য রাষ্ট্রতাত্ত্বিকগণ পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভক্তীকরণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার

* পরিশিষ্টটি বিশেষ করিয়া উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রচিত।

করিবার পক্ষপাতী। উদ্দেশ্য হইল রাজনীতির কতকগুলি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এই সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করা। রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না, কতকগুলি সাধারণ অনুমান হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সিদ্ধান্তে পৌছিতে চাহেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রদার্শনিকগণ অবরোহণ পদ্ধতির (deductive method) মাধ্যমে কাম্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কল্পনা করেন। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনায়, হবসের স্বাভাবিক অবস্থার (বা প্রকৃতির রাজ্যের) (State of Nature) বিশ্লেষণে, হেগেলের স্বর্গীয় রাষ্ট্রের ধারণায় এই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রদার্শনিক রাষ্ট্রতাত্ত্বিকও হইতে পারেন—গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মূল্যবোধ তাঁহাকে সামগ্রিকভাবে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হইতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রদার্শনিকের মত রাষ্ট্রতাত্ত্বিক কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব ও সম্পর্কের সামগ্রিক বিশ্লেষণ বা নির্দেশে অগ্রসর হন না। সুতরাং সকল রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের পক্ষে রাষ্ট্রদার্শনিক না হওয়াই সম্ভব।[১]

ক। রাষ্ট্রতত্ত্বের স্বরূপ (Nature of Polititical Theory):

রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রকৃতি আলোচনায় বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় উহার বিভিন্নমুখী গতি।

প্রাথমিক পর্যায়ের দৃষ্টিভংগি : প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় উহার উপর ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভংগির প্রভাব। এই সময় প্রাচীন রাজনৈতিক ধারণা ও দৃষ্টিভংগিকে প্রতিষ্ঠিত করাই রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্লেটো অ্যারিষ্টটল হবস্ লক রুশো হেগেল বেন্থাম প্রভৃতি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ (মূলত রাষ্ট্রদার্শনিক) রাজনীতির গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক যুগে ডানিং (Dunning), স্যাবাইন (Sabine), ম্যাক্লয়েন (McIllwain), লিণ্ডসে (Lindsay) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রতত্ত্বের এই দিকটির প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন।

ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রাজনীতির পর্যালোচনা করা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গতি নির্ধারণ করা, বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করাই রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য বলিয়াই ইঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন এই সময় রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় অনুমান ও নীতির প্রাধান্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন: বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় এক নূতন গতি লক্ষ্য করা গেল—মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়সমূহের প্রয়োগ আলোচনায় বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তে মানুষের আচার-আচরণ, মানবীয় সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাত, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইহার প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পাইল। নীতিধর্মী

---

১. Dante Germino: *Two Conceptions of Political Philosophy*...পরিশিষ্টের সূচনায় লেখকের উদ্ধৃতিটি দেখ।

আলোচনার পরিবর্তে বিজ্ঞানধর্মী আলোচনার সূত্রপাত ঘটিল।[১] এককথায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হইল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মূল্য-নিরপেক্ষ (value-free) করার প্রবণতাও এই সময় হইতে লক্ষ্য করা গেল। অর্থাৎ, বলা হইল, রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ থাকিবে, কিন্তু কি হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে কোনরূপ নির্দেশ থাকিবে না।

আরও একদিকে গতি: রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় তৃতীয় একটি গতিও পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রতত্ত্বের কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন, রাষ্ট্রতত্ত্ব একাধারে তত্ত্ব ও তথ্যের, নীতিগত আলোচনা ও বিজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সামঞ্জস্য ঘটাইবে—অর্থাৎ রাষ্ট্রতত্ত্ব একাধারে নির্দেশমূলক ও বর্ণনামূলক হইবে। বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও পদ্ধতির আলোকে রাজনীতির ব্যাখ্যা করার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের দায়িত্বও রাষ্ট্রতাত্ত্বিক এড়াইতে পারেন না। সঠিক ব্যবস্থা কি হইতে পারে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা চালানো উচিত। মূল্য-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবাস্তব ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুসন্ধান পরাক্ষানিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির মূল্য যেমন রাষ্ট্রতত্ত্বে আছে, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বিশ্বাস মূল্যবোধ ভাবাদর্শ প্রভৃতির আলোকে রাজনীতি ব্যাখ্যার উপযোগিতা বড় কম নয়।

রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল কার্য: যাই হোক, সাধারণভাবে বলা যায় যে রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল কার্য হইল: (১) রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও সমস্যার বিচারবিশ্লেষণ; (২) বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োগে রাজনীতির চরিত্র নির্ধারণ, (৩) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসার ঘটানো; (৪) রাজনীতিকে মূল্য-নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত করা (আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগির পরিবর্তে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভংগির উপর মূল্য আরোপ করা); (৫) পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির আলোচনাকে গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রতত্ত্বের দুর্বলতা: ডেভিড ইস্টন প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, অধিক পরিমাণে অতীতের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা এবং রাজনৈতিক সামঞ্জস্যবোধের অভাব রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনাকে অধিকাংশে ব্যর্থতায় পরিণত করিয়াছে।[২]

দুর্বলতার অন্তর্নিহিত কারণ: আলফ্রেড কোব্যানের (Alfred Cobban) মতে, রাষ্ট্রতত্ত্বের ব্যর্থতার মূল কারণ অতীতের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এবং বর্তমান দিনের রাজনীতির ব্যাপ্তির মধ্যে সংযোগহীনতা। সক্রেটীস-প্লেটো হইতে সুরু করিয়া বিগত আড়াই হাজার বৎসরের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা ব্যবহারযোগ্য তাহা অবশ্যই বিতর্কের বিষয়। ইহার উপর বর্তমান রাজনীতির ব্যাপ্তি

---

১. "... twentieth century Political Science gradually came to focus research on actualities ... basing its findings on painstaking observation and measurement ..." Arnold Brecht: *Political Theory—The Foundations of Twentieth Century Political Thought*

২. David Easton.. *An Enquiry into the State of Political Science*

(রাষ্ট্রের বিপুল কার্যক্রম, আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ও বর্ধিত গুরুত্ব, সেনাবাহিনীর ভূমিকা) রাষ্ট্রতত্ত্বের দুর্বলতাকে প্রকট করিয়াছে।

কোব্যানের ধারণায় রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্নিহিত ত্রুটিও রাষ্ট্রতত্ত্বকে দুর্বল করিয়াছে। রাষ্ট্রচিন্তার ধারার বিভিন্নতা ও পরস্পরবিরোধী মতের প্রকাশ রাষ্ট্রতত্ত্বের দুর্বলতার মূলে কাজ করে। রাষ্ট্রতত্ত্বে বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব ও ইহার মূলে আঘাত করিয়াছে। রাষ্ট্রতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটায় হয়ত বুঝাপড়া ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আসিয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রতত্ত্বে সিদ্ধান্তগ্রহণ বা মতপ্রকাশের প্রশ্নটি অবহেলিত থাকিয়া যাইতেছে।[১]

আর একটি কারণ—মতাদর্শের আধিক্য : দান্তে জারমিনোর (Dante Germino) মতে, মতাদর্শের (ideologies) অনুপ্রবেশের আধিক্য রাষ্ট্রতত্ত্বকে দুর্বল ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। অবশ্য জারমিনো মনে করেন, বর্তমানে রাষ্ট্রতত্ত্ব আবার তাহার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।[২]

আরনল্ড ব্রেচ্‌টও (Arnold Brecht) 'বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রতত্ত্বের জয় ও বিষাদময় পরিণতি'র (Triumph and Tragedy of Twentieth Century Political Theory) কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও গতিশীলতাই ইহার জয় সূচিত করিয়াছে। অন্যদিকে মূল্যবিচার এবং অন্যান্য প্রশ্নে রাষ্ট্রতত্ত্ব ক্রমশই নিশ্চয়তা হারাইতেছে। বিজ্ঞানে যাহা সম্ভব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহা কতটা সম্ভব তাহাই বিচার্য। যাই হোক, রাষ্ট্রতত্ত্ব ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করিতেছে।

বিরুদ্ধ অভিমত—দুর্বলতা নহে, আধুনিকতা : অবশ্য কোন কোন লেখকের ধারণায় রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা রাষ্ট্রতত্ত্বের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে না, বরং উহা রাষ্ট্রতত্ত্বকে আধুনিকতার মর্যাদাই দান করিয়াছে। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহিত সহযোগিতার হাত ধরিয়া রাষ্ট্রতত্ত্বও আদর্শ ব্যবস্থা ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাইতেছে—একথা বলা যাইতে পারে।

৫। রাষ্ট্রদর্শনের স্বরূপ (Nature of Political Philosophy) : রাষ্ট্রদর্শন দর্শনশাস্ত্রেরই একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিচিত। সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মূলকথা হইল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনাই নহে, কতকগুলি সাধারণ অনুমানকে নির্দেশ করিয়া, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইহাদের ব্যাখ্যা করা সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্বের লক্ষ্য। যেমন, সমাজ বা রাষ্ট্রে গোষ্ঠীর ভূমিকা—এই ধরনের কোন একটি বিষয় নির্বাচন করিয়া কতকগুলি সাধারণ নিয়মে ও অনুমান অবলম্বনে বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে।

---

১. Alfred Cobban : *The Decline of Political Theory*—Artical published in Gould and Thursby eds. 'Ethics and the Decline of Political Theory'

২. Dante Germino : *Beyond Ideology*

৩. Arnold Brecht : *Political Theory—The Foundations of Twentieth Century Political Thought*

রাষ্ট্রদর্শন কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। দর্শনশাস্ত্রে বিজ্ঞান অপেক্ষা আদর্শের স্থান উচ্চে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হইল মোটামুটি বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ, দার্শনিক বিশ্লেষণে কিন্তু মতাদর্শ (ideology) প্রাধান্য পায়। আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দার্শনিক কতকগুলি আদর্শ (norms) বা সাধারণ মানকে (ideal standards) কল্পনা করিয়া অগ্রসর হন। দেখা যায়, পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা প্রধানত দুইটি লক্ষ্যাভিমুখী : (ক) ধারণার ব্যাখ্যা (clarification of concepts) এবং (খ) বিশ্বাস বা আদর্শের মূল্যায়ন (critical evaluation of beliefs)।

দ্বিতীয় লক্ষ্যটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া অধ্যাপক রাফায়েল বলেন, বিশ্বাস বা আদর্শের সঠিক মূল্যায়নই কোন বিশ্বাসকে গ্রহণ বা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয় (the attempt to give rational ground for accepting or refuting beliefs)। অর্থাৎ, দর্শনশাস্ত্র বিশেষ কোন বিশ্বাস বা মতের সমর্থক নয়, বিশ্বাস ও মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইহা নির্দেশ করে কোন্‌টি গ্রহণীয় ও কোন্‌টি বর্জনীয়।

পটভূমি ও লক্ষ্য : রাষ্ট্রদর্শনের উদ্দেশ্য অবশ্য অনুরূপ—বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও মূল্যায়ন এবং সমকালীন ক্ষেত্রে উহাদের প্রযোজ্যতার বিচার। প্রাচীন গ্রীসে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোফিস্ট (Sophists) চিন্তাবিদের ধ্যানধারণার বিচারের ফলেই রাষ্ট্রদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মনস্তাত্ত্বিক উপাদান : আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় মনস্তত্ত্বেরও অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে এবং স্বভাবতই মানুষের আচার-আচরণ, সমাজে মানুষের ভূমিকায় কোন্ কোন্ বিশ্বাস প্রতিফলিত ইত্যাদিও আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয়। আবার সনাতন বা ঐতিহ্যসম্মত রাষ্ট্রদর্শন সুসংহত চিন্তার (clear thinking) কতটা প্রকাশ ঘটায় তাহার বিবেচনাও করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন বিকল্পের অনুসন্ধান করিয়া, কোন আদর্শ বা নীতি বা বিশ্বাসের মূল্যায়ন করা এবং রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে সঠিক বিকল্পকে কার্যকর করাই আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের লক্ষ্য।

দৃষ্টিভংগিজনিত পার্থক্য : রাষ্ট্রদর্শন আদর্শের দৃষ্টিকোণ হইতে (normative approach) রাজনৈতিক বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটায়, রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি (empirical approach) অধিক প্রাধান্য পায়।

তবে রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় বিষয়বস্তুজনিত, দৃষ্টিভংগিজনিত বা পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামগ্রিক স্বার্থে উভয়েরই অবদান স্বীকৃত।

পরিপূরকতা : আধুনিক কালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রদর্শনের আলোকে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ আগ্রহী নহেন। বলা হয়, ইহা করা হইলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি ব্যাহত হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নীতিগত প্রশ্ন (উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন, ভালমন্দের বিচার) অবহেলিত হইবে—

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিচার-নিরপেক্ষ হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কখনই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা সম্ভব হইবে না—বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিকাশ ঘটিলেও, পদ্ধতিগত নূতনত্বের দাবি করিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করা কষ্টকর। রাষ্ট্রচিন্তার বৈচিত্র্য, রাজনীতির বিভিন্নতা, নিত্যনূতন রাজনৈতিক ধারণার উদ্ভব, রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার উপর পড়িতে বাধ্য। এই সমস্ত কারণে ইহার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও চিন্তাকে প্রকাশ করা কঠিন। সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দার্শনিক চিন্তা, নীতিবোধ ও ঐতিহাসিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে।

উপসংহার: রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের সম্মিলিত প্রয়াসই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলধন। উভয়ই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে উদ্দেশ্যমূলক (purposive) করিয়াছে এবং গতিশীলতা (dynamic) দান করিয়াছে—উভয়ের যুগ্ম প্রয়াসই রাজনীতিকে গভীরতা দান করিতে পারে। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য বিচারে নয়, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন উভয়ের পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। সঠিক ও প্রকৃত রাজনীতির গুরুত্ব এই প্রয়াস ও প্রচেষ্টাতেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

এককথায়, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় দুইটি পরস্পরবিরোধী মানসিকতা লইয়া অগ্রসর হইবে না; বরং বলা যাইতে পারে পরস্পরের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া একে অপরের সহযোগী হিসাবে চলিবে।[১]

স্মর্তব্য :—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যা।

২. পার্থক্য হইল তিন দিক দিয়া : (ক) রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রধানত বর্ণনামূলক, রাষ্ট্রদর্শন কিন্তু নির্দেশমূলক ; (খ) রাষ্ট্রতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিন্তু রাষ্ট্রদর্শন অবরোহণ পদ্ধতি অনুসরণ করে ; (গ) রাষ্ট্রদার্শনিক তাত্ত্বিক হইতে পারেন কিন্তু রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের পক্ষে দার্শনিক হওয়া কঠিন।

৩. রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল কার্য হইল (১) বিভিন্ন ধারণা, সমস্যা ও রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ, (২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ, (৩) রাজনীতিকে মূল্য নিরপেক্ষ করা, এবং (৪) পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৪. রাষ্ট্রদর্শনে মতাদর্শই প্রাধান্য পায়, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নহে। ইহাতে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানও আছে।

৫. রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শন পরস্পরের পরিপূরক—পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র নহে।

অনুশীলনী

1. Bring out clearly the points of distinction between Political Theory and Political Philosophy.

[রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্যগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ কর।] (১৮-১৯, ২০, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

---

১. **Political theory and Political Philosophy are complementary to each other, since "generally speaking, it is impossible to understand thought or action or work without evaluating it." Leo Strauss**

২

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি

(METHODS OF AND APPROACHES TO THE STUDY OF POLITICAL SCIENCE

> *"Political Science has not the axiomatic quality of mathematics. In its equations the variables are human beings whose uniqueness prevents their reduction to law in the scientific sense of that much abused word."* Laski

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতিতে সমস্যার হেতু কি ?

২. এই আলোচনা-পদ্ধতি মোটামুটি কয় শ্রেণীর ?

৩. পরম্পরাগত পদ্ধতির স্বরূপ ও উপাদান কি কি ?

৪. আধুনিক পদ্ধতি কি কি পদ্ধতির সমবায়ে গঠিত ?

৫. আচরণমূলক পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয় কি ?

৬. ব্যবস্থামূলক আলোচনার প্রথম প্রবক্তা কে ?

৭. সাংগঠনিক-কার্যগত পদ্ধতি বলিতে কি বুঝায় ?

৮. গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতিতে কোন্ আচরণের আলোচনা করা হয় ?

৯. নূতন রাজনৈতিক অর্থতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি ?

১০. মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগির ব্যাপকতা কোথায় ?

১১. বিষয়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতির তালিকা কিভাবে প্রণয়ন করা যায় ?

উপক্রমণিকা—আলোচনা-পদ্ধতির সমস্যা : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঐক্যমত পোষণ করেন না—বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতিতে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিদ্যা অর্থবিদ্যা মনোবিদ্যা নৃতত্ত্ব অংকশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান ও বিদ্যা হইতে বিভিন্ন পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির (Quantitative Method or Approach) ব্যাপক প্রয়োগও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এইভাবে পূর্বতন গতানুগতিক পদ্ধতির (traditional approaches) সহিত নূতন নূতন পদ্ধতির যোগ হওয়ায় কতকটা জটিলতা ও বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হইয়াছে। অভিযোগ হইল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষা ও শব্দাদি ক্রমশই দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে।[১] আরও অভিযোগ করা হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও মর্যাদাসম্পন্ন করিতে

১. "Not only the practical men but some political scientists themselves are finding the new language (which they often denigrate as jargon) difficult." Wiseman : *Politics—The Master Science*

গিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতির আসল সমস্যাগুলির বিচারবিবেচনা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।[১]

বলা যায়, অ্যারিষ্টটলের পর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও অতি অল্পসংখ্যক লেখকই বাস্তবধর্মী অনুসন্ধানের উপর দৃষ্টি দিয়াছেন।

অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার প্রচেষ্টা করেন।[২]

ইহার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হন। প্রাকৃতিক বিভাগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একই পর্যায়ের নয় বলিয়া উভয়ের আলোচনা-পদ্ধতিও এক হইতে পারে না, আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে মূল্য-নিরপেক্ষ (value-free) হইতে পারে না।

যাই হোক, মোটামুটিভাবে আলোচনা-পদ্ধতিগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

তিনশ্রেণীর আলোচনা-পদ্ধতি : ক। অনেকে সময়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে (১) পরম্পরাগত পদ্ধতি (traditioal approaches) এবং (২) আধুনিক পদ্ধতি (recent approaches)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

খ। রাজনৈতিক ধারার (process of politics) দিক দিয়া আলোচনা আবার (১) আচরণমূলক পদ্ধতি (the behavioural approach), (২) ব্যবস্থা-মূলক পদ্ধতি (the systemic approach) এবং (৩) সাংগঠনিক-কার্যগত পদ্ধতি (the structural-functional approach)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

মার্ক্সীয় পদ্ধতি : মার্ক্সীয় পদ্ধতিকে এই শ্রেণীর আলোচনা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এবং পদ্ধতিটিকে ব্যাপকতম বলিয়া মনে করা হয়। পদ্ধতিটি গতিশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজনীতির আলোচনা করে—বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার বিরোধী কারণ, সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত দিক পরস্পরের সহিত অংগাংগি সংপর্কে সম্পর্কিত।

---

১. Too many books by political scientists are now addressed neither to problems nor to the public—but only to prestige and preferment in a needlessly bureaucratic profession." Bernard Orick

২. *"Marx and Engels did indeed apply what we now call Scientific Method—empirical observation, description, hypothetical explanation and so forth—to a considerable extent n their common work:"* Arnold Brecht : *Political Theory*

গ। পরিশেষে বিশেষ বিষয়ের—যেমন, ভূবিজ্ঞান ইতিহাস অর্থবিদ্যা সমাজবিদ্যা মনোবিদ্যা দর্শন প্রভৃতি—দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করা যাইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টিভংগিকে বিষয়মূলক পদ্ধতি (disciplinary methods or approaches) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ইহা ছাড়া নূতন অর্থ নৈতিক পদ্ধতি, গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতি প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতি একপ্রকারের আচরণমূলক পদ্ধতি।

এখন এই সকল পদ্ধতির পর্যালোচনা করা হইতেছে।

ক। পরম্পরাগত পদ্ধতি (Traditional Approaches): পরম্পরাগত পদ্ধতিগুলির অন্তর্ভুক্ত হইল (১) দার্শনিক পদ্ধতি, (২) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং (৩) আইনগত পদ্ধতি। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিরাচরিত আলোচনায় দর্শন, ইতিহাস ও আইনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

১। **দার্শনিক পদ্ধতি** : আদর্শ রাষ্ট্র ও সুন্দর জীবনের অনুসন্ধান ছিল প্রাচীন কালের দার্শনিকদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইঁহারা বাস্তব তথ্যাদি বা ঘটনার উপর ততটা নির্ভর করেন নাই যতটা নির্ভর করিয়াছেন আত্মসমীক্ষার (introspection) উপর।[১] ইঁহারা অবরোহ পদ্ধতিতে (Deductive Method) বিভিন্ন অনুমান হইতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যেমন, মানব-প্রকৃতি এবং মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবৃত্তি (man's political and social instincts) সম্পর্কে ধারণা হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কিত দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আদর্শবাদের প্রাধান্য : প্লেটো হইতে সুরু করিয়া হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) পর্যন্ত অধিকাংশ রাষ্ট্রদার্শনিকেরই রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কে দৃষ্টিভংগি হইল আদর্শবাদী (বা ভাববাদী)—বাস্তবধর্মী নয়। তবে অ্যারিষ্টটল, মেকিয়াভেলি (Machiavelli) প্রভৃতি লেখককে ইহার ব্যতিক্রম হিসাবে নির্দেশ করা যায়। অ্যারিষ্টটল তাঁহার 'রাজনীতি' (Politics) গ্রন্থ রচনা করেন বহুসংখ্যক গ্রীক রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তিতে। মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স'ও (Prince) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার (empirical knowledge) উপর ভিত্তিশীল।

দার্শনিক পদ্ধতির মূল্য : প্রাচীন রাজনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, বর্তমানেও উহার আলোচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। কাম্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কি, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে কাম্য সম্পর্ক কি ?—প্রভৃতি প্রশ্নের গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত রুশো (Rousseau) প্রভৃতি রাষ্ট্রদার্শনিকের রচনা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব ঘটনাবলীকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ১৬৮৮ সালের ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব অনুধাবনে লকের (Locke) রচনাকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

১. "... the study of politics was largely carried on by political theorists using a process of philosophic introspection, only rarely aided by systematic observation or measurement of actual happenings." David Butler

বস্তুত, দার্শনিকদের তত্ত্ব এবং সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান থাকে।

২। **ঐতিহাসিক-বর্ণনামূলক পদ্ধতি**: পরম্পরাগত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত আর একটি পদ্ধতি হইল ঐতিহাসিক-বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Historical-Descriptive Method)। এই পদ্ধতিতে অতীতের ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও শৃংখলাবদ্ধ করিয়া বর্তমান রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিশেষ বিশেষ দিকের ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। এই ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক তাঁহার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও সাধারণ অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হন। রাষ্ট্রনেতাদের জীবন হইতে সুরু করিয়া সাংবাদিকদের প্রতিবেদন পর্যন্ত সকল তথ্যই ঐতিহাসিকের সাহায্যে আসে। এইভাবেই বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহাদের বিশ্লেষণভংগি বর্ণনামূলক এবং সিদ্ধান্ত হইল পরীক্ষা-সাপেক্ষ (tentative)।

৩। **আইনগত পদ্ধতি**: পরম্পরাগত পদ্ধতির আইনগত দিকও রহিয়াছে। এই বিশ শতকের প্রথম দিকেও কেহ বিধি-ব্যবস্থার (legal system) আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনার কথা চিন্তা করিতে পারিতেন না।[১] বর্তমানে অবশ্য ইয়োরোপ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে আইনগত পদ্ধতিতে আলোচনার উপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আইনগত পদ্ধতিতে শাসন-ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি কি, আইনগত সার্বভৌমের স্বরূপ (nature of the legal sovereign) কি, আইনের অনুশাসনের (The Rule of Law) প্রকৃতি কি, ইত্যাদি ধরনের প্রশ্নের বিশ্লেষণ করা হয়। বর্তমানে আইনগত পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ না করা হইলেও রাজনৈতিক আলোচনায় বিচার-ব্যবস্থার ভূমিকাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়।

পরম্পরাগত পদ্ধতির প্রভাব: পরম্পরাগত পদ্ধতিসমূহের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় উহাদের প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। এই প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাকে বলা হয় 'বর্ণনামূলক ও প্রতিষ্ঠানমূলক আলোচনা-পদ্ধতি'র (descriptive and institutional approaches) মধ্যে।[২] বর্তমান কালে নূতন নূতন আলোচনা-পদ্ধতি উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এখনও এই প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতিতেই আইনসভা, শাসন বিভাগ, বিচার-ব্যবস্থা, সরকারী

১. "In the generation before 1914 it would have been inconceivable that one should discuss political systems without also discussing legal systems." W. J. M. Mackenzie : *Politics and Social Science*

২. "The strongest legacy that philosophy, history and law have bequeathed to the study of politics is in the field of descriptive and institutional approaches." A. R. Ball : *Modern Politics and Government*

কর্মচারী, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও কার্যের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয় এবং ইহাদের সংস্কারের সুপারিশ করা হয়।

তুলনামূলক পদ্ধতি—পরম্পরাগত ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্র: পরম্পরাগত ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম যোগসূত্র হইল তুলনামূলক আলোচনা। তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়। রাজনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি তুলনীয় তাহা বাছিয়া লইয়া উহাদের আলোচনা করা হয় এবং সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। অ্যারিস্টটল, বোঁদা (Bodin), মন্টেস্কু (Montesquieu) প্রভৃতি লেখক তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন।

আধুনিক কালে ইস্টন (David Easton), অ্যালমন্ড (G. A. Almond), প্রভৃতি লেখক তুলনামূলক পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করিয়া উহার সূক্ষ্মতর ও কার্যকর রূপ দান করিয়াছেন।

খ। আধুনিক পদ্ধতি (Recent Approaches): বিশ শতকের প্রথম দিক হইতেই পরম্পরাগত পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি তুলেন যে পরম্পরাগত বা চিরাচরিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উহাদের কার্যাবলী ও কার্যপদ্ধতির আলোচনার দ্বারা রাজনীতির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

১। আচরণমূলক পদ্ধতি (Behavioural Approach): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার আসল বিষয়বস্তু হইল মানুষ। সুতরাং মানুষের আচরণের দিকে দৃষ্টি না দিলে রাজনৈতিক পদ্ধতি বা শাসন পদ্ধতি কিভাবে কার্য করে তাহার ইংগিত পাওয়া যায় না। কিভাবে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং কি কি বিষয়ের দ্বারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত হয়—তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইজন্য মাত্র রাষ্ট্রের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিচারবিবেচনা করাই যথেষ্ট নয়; রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে ভোটদাতৃদের আচরণ, বেসরকারী সংঘ ও স্বার্থগোষ্ঠীর আচরণ, রাজনৈতিক দলের আচরণ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিবে। ইহাকে আচরণমূলক পদ্ধতি বা দৃষ্টিভংগি (behavioural approach) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

ক্রমবিকাশ: গ্রাহাম ওয়ালাসের (Graham Wallas) 'হিউম্যান নেচার ইন্ পলিটিক্স' (Human Nature in Politics—1908) এবং (কিছুদিন পর প্রকাশিত) আর্থার বেন্টলির (Arther Bentley) 'দি প্রোসেস্ অফ্ গভর্ণমেন্ট' (The Process of Government) এই নূতন দৃষ্টিভংগির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

গ্রাহাম ওয়ালাস: গ্রাহাম ওয়ালাস দার্শনিকদের অবরোহ (deductive) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ অবাস্তব বলিয়া অভিযোগ করেন। দার্শনিকগণ ধরিয়া লইয়াছেন

যে মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, তাহা ঠিক নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ যুক্তি ও নিজস্ব স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।[১] সুতরাং রাজনৈতিক তত্ত্বকে ঐ ধারণার উপর যাঁহারা ভিত্তিশীল করিয়াছেন তাঁহারা বাস্তবের সহিত সংগতি রাখেন নাই। মানুষের প্রকৃতি জটিল সুতরাং প্রয়োজন হইল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ (facts and evidence) সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণের।

গ্রাহাম ওয়ালাস পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিকে বিশেষ সমর্থন জানাইয়াছেন।

পরবর্তী চিন্তাবিদগণ: আর্থার বেণ্টলিও রাজনৈতিক বিষয়াদির অনুসন্ধান তথ্যাদি ও পরিসংখ্যানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাজনৈতিক আচরণের বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন সংঘের (groups) কার্যাবলীর পর্যালোচনার উপর বিশেষ জোর দেন।[২] বলা যাইতে পারে, তিনিই রাজনৈতিক পদ্ধতিতে দল উপদল নির্বাচন ও জনমতের ভূমিকার আলোচনার পথিকৃৎ। পরবর্তী সময়ে মেরিয়াম (Charles E. Merriam), ল্যাসওয়েল (Harold D. Lasswell) ও অন্যান্য লেখক মনোবিদ্যা ও সামাজিক বিদ্যার পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করিয়া আচরণমূলক বিশ্লেষণকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে লইয়া যান।

আচরণমূলক পদ্ধতির মৌল বৈশিষ্ট্য: আচরণমূলক পদ্ধতির মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির নির্দেশ এইভাবে করা যাইতে পারে: (১) উদ্দেশ্য হইল মানুষ বা গোষ্ঠীর আচরণের আলোচনা করা। ইহা ঘটনাবলী, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা ভাবাদর্শের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। (২) ইহা রাজনৈতিক আলোচনাকে সমাজবিজ্ঞান মনোবিদ্যা নৃতত্ত্ব ও অর্থবিদ্যা প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত করিতে চাহে। ডেভিড ইস্টনের (David Easton) ভাষায়, "বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মালমসলাকে সুসংগঠিত করা ইহার লক্ষ্য" (Material from the various social sciences should be integrated)। (৩) ইহা তত্ত্ব (theory) এবং গবেষণার (research) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। (৪) রাজনৈতিক আচরণের সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে ইহা কড়াকড়িভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিবার দিকে জোর দেয়—সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির সংগ্রহ, শ্রেণীবিভক্তকরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান ইত্যাদি করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া যথাসম্ভব তথ্যাদির পরিমাপ করিতে ও পরিমাপ নির্ণয় করিতে হইবে (Measurement and quantification are necessary)। (৫) বাস্তব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকে নৈতিক মূল্যায়ন (ethical valuation) হইতে পৃথক রাখিতে হইবে।

১. "Political man is not nearly such a rational animal as he has been thought to be." Graham Wallas *Human Nature in Politics*

২. "When groups are adequately stated, everything is stated."

এইভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাজনীতির সাধারণ সূত্র (political laws) প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে।

সমালোচনা : এই আধুনিক আচরণমূলক বিশ্লেষণের (Behavioural Analysis) কতকগুলি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয় :

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণমূলক পর্যালোচনায় দল উপদল ভোটদাতৃ জনমত প্রভৃতির উপরই মাত্র গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে—যেমন, সরকার আইনসভা ও বিচার-ব্যবস্থাকে—উপেক্ষা করা হয়।

মোটকথা, আচরণমূলক অথবা প্রতিষ্ঠানমূলক (behavioural or institutional)—কোন পদ্ধতিই এককভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনায় যথেষ্ট হইতে পারে না। ফলে উভয় পদ্ধতিরই সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হয়।

(২) আচরণমূলক পদ্ধতির বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হয় যে ইহাতে মূল্যমানের (values) প্রশ্নকে অযৌক্তিকভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে। রাজনৈতিক জীবনে ভালমন্দের প্রশ্নকে কোনক্রমেই অপ্রাসংগিক বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত, বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ এবং নৈতিক মূল্যায়নের মধ্যে সংযোগ রাখিয়া রাজনৈতিক কাজকর্মের পর্যালোচনা করিতে হইবে।[১]

(৩) এই পদ্ধতি পরিমাপ ও সংখ্যায়নের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। ভোটারদের বা গোষ্ঠীর আচরণের ক্ষেত্রে ইহা সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইলেও রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা কঠিন, এমনকি নির্বাচকদের আচরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সঠিক তথ্যাদির অভাবে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিদগণের অনুসন্ধান ও মতামত ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞান অত্যধিক মাত্রায় সমাজবিদ্যা মনোবিদ্যা নৃতত্ত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ঐ বিদ্যা উহার স্বাতন্ত্র্য হারাইতে চলিয়াছে। অবশ্য আচরণবাদীরা ইহা অস্বীকার করিয়া থাকেন।

(৫) এই তত্ত্ব পদ্ধতিগত বিষয়াদির উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আসল উদ্দেশ্য ও সমাজের লক্ষ্য উপেক্ষিত হইয়াছে।

(৬) আচরণবাদীরা মূল্য-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে মার্কিনী লেখকগণ আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাম্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া আচরণমূলক তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও গবেষণা করিয়া থাকেন।

ইহাকে মূল্য-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যায় কি-না সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।[২]

---

১. 'The best method to follow…must be a combination of empirical analysis and of ethical evaluation." L. Lipson

২. Robert E. Dowse : *Political Behaviour*

স্থিতিশীল তত্ত্ব: সুতরাং এই তত্ত্ব স্থিতিশীল (static) তত্ত্ব, গতিশীল (dynamic) নয়—ইহা স্থিতাবস্থার ব্যাখ্যা করে এবং স্থিতাবস্থাকে সংরক্ষিত করিতে আগ্রহী। ফলে সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে ও কোন্ পথে আসে তাহার সন্ধান দিতে পারে না, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র যে প্রধানত অর্থ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এই সত্যকে এড়াইয়া যায়।

(৭) ইহা ইতিহাস, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রদর্শন প্রভৃতির গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখে।

উপসংহার: এই সকল সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে আধুনিক আচরণবাদিগণ পদ্ধতিটিকে সম্প্রসারিত করিতে এবং সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহারা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় আচরণ ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাজীকরণ (political socialisation), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সামাজিক পরিবেশ, তুলনামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিয়া থাকেন। তবুও কিন্তু আচরণমূলক পদ্ধতিকে সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণগুলির সন্ধান দিতে পারে না বা চাহে না।

২। ব্যবস্থামূলক আলোচনা (Systems Analysis): আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অনেকেই সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার (political system) কল্পনা করিয়া রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের (general theory) অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল লেখকের মধ্যে ডেভিড ইস্টনের (David Easton) নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়।

ইস্টনের সাধারণ তত্ত্ব: ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'দি পলিটিক্যাল সিস্টেম' (The Political System) নামক পুস্তকে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ইস্টন বলিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব সাধারণ এই অর্থে যে ইহার সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়েরই ব্যাখ্যা করা যায়।

রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হইল কিভাবে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অব্যাহত বা চালু থাকে তাহাই নির্ণয় করা। ইস্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে বিভিন্ন চাপ বা বিশৃংখলার সহিত মোকাবিলা করিবার—ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে ও পরিবর্তনের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে।

অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত (self-regulating) ও প্রতিবেদনশীল (responding)।

স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত বলিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ হইতে যে-সকল চাপ (stresses) আসে বা পরিবেশের (environments) যে-সকল পরিবর্তন ঘটে তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া কাঠামো ও পদ্ধতির পরিবর্তন সম্ভব হয়। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

এখন প্রশ্ন : রাজনৈতিক ব্যবস্থা (political system) এবং পরিবেশ (environments) বলিতে কি বুঝায় ?

রাজনৈতিক ব্যবস্থা : রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং ইহার মাধ্যমে সমাজে কর্তৃত্বসম্পন্ন বা বাধ্যতামূলক নীতিসমূহ বা সিদ্ধান্ত গৃহীত ও প্রযুক্ত হয়।[১]

এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য বিষয় বা ব্যবস্থা রহিয়াছে : অর্থনীতি, পরিবাস্তব্য (ecology), জীববিদ্যা (biology), কৃষ্টি (culture), সমাজবিদ্যা (sociology) ইত্যাদি। ইহা কোন সমাজের অংগীভূত বা বহির্ভূত— উভয়ই হইতে পারে।

পরিবেশ : এই বিষয়গুলিকেই পরিবেশ বা বাতাবরণ (environments) বলা হয়।

ইহাদের সহিতই রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত ঘটে।

ইস্টনের ব্যবস্থামূলক আলোচনার বিশ্লেষণ : ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থামূলক আলোচনাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

---
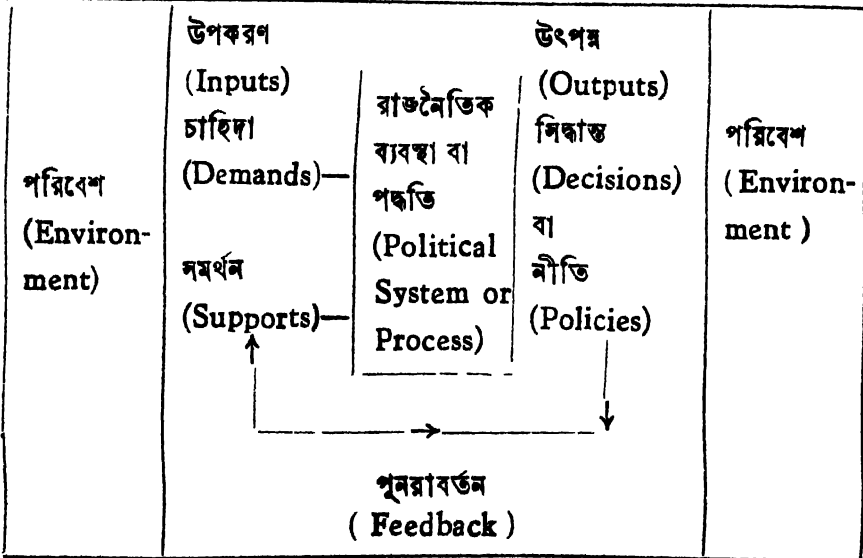
১. The Political System is "that system of interactions in any society through which binding or authoritative allocations are made and implemented." David Easton

(১) উপকরণ : প্রথমেই আছে উপকরণ (inputs)। সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশ হইতে দাবিদাওয়া (demands) ও সমর্থন (supports) প্রাপ্ত হয়। এই দাবিদাওয়া ও সমর্থনকেই উপকরণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উপকরণগুলি আন্তর্জাতিক পরিবেশ হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে, আবার সমাজের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইতেও আসিতে পারে। (যেমন, সরকারী আমলারা অধিক মজুরির দাবি জানাইতে পারে, সৈন্যবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য দাবি তুলিতে পারে, প্রভৃতি।)

(২) দাবিদাওয়া : দাবিদাওয়া বা চাহিদার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ঈপ্সিত বিষয়াদি (values) দাবিদারদের দাবি অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দিক। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাবিদারদের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।

(৩) সমর্থন : দাবিদাওয়াই উপকরণের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়—অন্যতর উপাদানটি হইল সমর্থন (supports) যাহা ব্যতীত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমর্থন বলিতে সেই সকল কার্য বা মনোভাবকে (orientations) বুঝায় যাহা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অথবা চাহিদা ও উহা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতিকে (process) মানিয়া লয়।

সমর্থন আবার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমস্যার সমর্থনকে বুঝাইতে পারে, অথবা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থনও বুঝাইতে পারে। এই দ্বিতীয় ধরনের সমর্থন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমর্থনের তিনটি উপাদান · ইস্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন প্রদানের উপাদান মূলত তিনটি : (ক) রাজনৈতিক সম্প্রদায় (the political community), (খ) শাসনসম্পর্কিত অবস্থাব্যবস্থা (the regime) এবং (গ) কর্তৃপক্ষ বা সরকার (the authorities)।

রাজনৈতিক সম্প্রদায় বলিতে বুঝায় যে, উহার সদস্যরা চাহিদাপূরণের জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিকে সমর্থন প্রদান করিবে এবং তাহাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ ও মতৈক্য (consensus) থাকিবে।

শাসনসম্পর্কিত অবস্থাব্যবস্থা দ্বারা শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মকানুন, রীতিনীতি, ধ্যানধারণা এবং আদর্শ ও নৈতিক মূল্যকে বুঝায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের এগুলিকে অবশ্য সমর্থন জানাইতে হইবে।

কর্তৃপক্ষ বা সরকারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। সরকারের পশ্চাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের সমর্থন থাকা প্রয়োজন এই কারণে যে ইহা ব্যতীত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না।

---

(৪) উপকরণ হইতে উৎপন্ন : উপরি-উক্ত উপকরণগুলি হইল সিদ্ধান্তগ্রহণের মালমসলা (raw materials)। রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপকরণগুলিকে বাধ্যতামূলক

রাজনৈতিক নীতি বা সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করে। এই সকল সিদ্ধান্তকে বলা হয় উৎপন্ন (outputs)।

প্রত্যাবর্তন ও স্থির অবস্থা : রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ বা উৎপন্ন আবার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রতিক্রিয়ার ফলাফল প্রত্যাবর্তনের পদ্ধতির (feedback mechanism) মাধ্যমে নূতন উপকরণ (চাহিদা ও সমর্থন) হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে চক্রাকারে উপকরণ উৎপন্নে পরিণত হয়, আর উৎপন্ন উপকরণে রূপান্তরিত হয়। যখন উপকরণ ও উৎপন্নের মধ্যে ভারসাম্য সাধিত হয় তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থা 'স্থির অবস্থায়' (steady state) পৌঁছায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপ : দাবিদাওয়ার পরিমাণ অত্যধিক হইলে অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন হ্রাস পাইলে অথবা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ চাপ পড়ে।

চাপহ্রাসের উপায় : অবশ্য চাপহ্রাসের কতকগুলি উপায়ও রহিয়াছে। প্রথমত, কৃষ্টিগত কারণে সমাজ সকল প্রকার দাবিদাওয়াকে অনুমোদন করে না। দ্বিতীয়ত, সংগঠনগত দিক দিয়া রাজনৈতিক দল (political parties), চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure groups) প্রভৃতি দাবিদাওয়া বাছাই ও নিয়ন্ত্রিত করে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে মানিয়া লইবার সময় ঐগুলিকে প্রশমিত (moderate) করে। চতুর্থত, যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে (communication channels) চাহিদার চাপ হ্রাস করা যায়।

সমর্থনহ্রাস, সংকট ও প্রতিকার : বলা হইয়াছে যে, সদস্যদের সমর্থন ব্যতীত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই চালু থাকিতে (persist) পারে না। সমর্থন দ্রুত হ্রাস পাইতে পাইতে এবং ন্যূনতম সীমার নিচে চলিয়া গেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিয়া বৈপ্লবিক অবস্থার (revolutionary situation) সৃষ্টি হইতে পারে। এখন প্রশ্ন, অব্যাহতভাবে সমর্থন পাইবার উপায় কি? প্রথমত, সিদ্ধান্তগুলি যদি সন্তোষজনকভাবে চাহিদা পূরণ করিতে পারে তাহা হইলে সমর্থন পাওয়ার কোন বিশেষ অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার-পরিবর্তনও সম্ভব হইতে পারে। তৃতীয়ত, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কে বিরোধিতা দেখা দিলে সংবিধান সংশোধন করিয়া নিয়মকানুন ও রীতিনীতিকে বদলানও সম্ভব হইতে পারে।

পরিশেষে, ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন সংগঠিত করিয়া তোলার উপায় হিসাবে রাজনৈতিক সমাজীকরণ (political socialisation) পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন।[১] এই সমাজীকরণের ফলে রাজনৈতিক জীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে

১. "Easton looks finally at *politicisation* as a mechanism of support." H. V. Wiseman : *Political Systems*

সদস্যরা শিক্ষিত হইয়া উঠে, তাহাদের দৃষ্টিভংগি ও মনোভাব (attitudes and orientations) নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত হয় এবং ভাবাদর্শ-দর্শন-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যায়নবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে।

মোট ফল: সমাজের সভ্যরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়া থাকে।

সমালোচনা: ইস্টনের সাধারণ তত্ত্ব পাশ্চাত্য রাজনৈতিক জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করিলেও ইহার কতকগুলি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়া থাকে।

(১) **অত্যধিক তত্ত্বভিত্তিকতা:** বলা হয়, সাধারণ তত্ত্ব (general systems theory) এত বেশীমাত্রায় বস্তু-নিরপেক্ষ ও তত্ত্বভিত্তিক (abstraction) যে ইহাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন।[১] ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের—গণবিক্ষোভ, নির্বাচকদের আচরণ, ধর্মঘট প্রভৃতি—ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বিশেষ আলোক-সম্পাত করিতে পারে না।

(২) **রক্ষণশীলতা:** দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব রক্ষণশীল—প্রচলিত ব্যবস্থা কিভাবে বজায় রাখা যায় তাহার দিকেই ইহার দৃষ্টি অধিক। ইস্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশের পরিবর্তন ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিক্রিয়ার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে পারে বলিয়া উহা নিজ সত্তাকে বজায় ও চালু রাখিতে সমর্থ হয় (maintains and persists)। অতএব, বজায় থাকার কারণানুসন্ধানই ইস্টনের তত্ত্বের বিষয়বস্তু, কিভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবনতি অবক্ষয় ও পতন ঘটে তাহার বিশ্লেষণ এই তত্ত্বে বিশেষ পাওয়া যায় না। এই কারণেই সমালোচকরা এ তত্ত্বকে রক্ষণমূলক ও পরিবর্তনবিরোধী—এবং বুর্জোয়াসুলভ মনোভাব দ্বারা প্রভাবিতও—বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

(৩) **রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকার অস্পষ্টতা:** তৃতীয়ত, অনেকের মতে, ইস্টন রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। ইস্টনের ধারণায় কাম্যবস্তু বা মূল্য বণ্টন (allocation of values) ব্যাপারে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরকরণই হইল রাজনীতির বিষয়বস্তু। সমালোচকরা মন্তব্য করেন যে অন্যান্য ব্যবস্থাও—যেমন, পরিবার, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure groups), বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি—বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ইপ্সিত বস্তু বণ্টন করিয়া দেয়। যেমন, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি যখন মূল্য স্থির করিয়া দেয় (sets the price) তখন বাধ্যতা-মূলক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়া থাকে; রাজনৈতিক দলও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সভ্য গ্রহণ ও সভ্য বিতাড়ণ করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা হয়, রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের ন্যায় অন্যান্য ব্যবস্থার বলপ্রয়োগের ক্ষমতা নাই।

---

১. "Easton's political system turns out to be an abstraction whose relation to empirical politics is virtually impossible to establish." Eugene J. Meehan: *Contemporary Political Thought: A Critical Study*

(৪) রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবের অনুল্লেখ : চতুর্থত, এই তত্ত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা (political power) বা প্রভাবের ধারণার যথেষ্ট উল্লেখ নাই।[১]

গ। সাংগঠনিক-কার্যগত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Structural-Functional Approach): রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সাধারণ তত্ত্বের একটি প্রকারভেদ হইল এই সাংগঠনিক-কার্যগত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি।

নৃতত্ত্ব হইতে রাজনীতি. এই আলোচনা-পদ্ধতির পথিকৃৎ হইলেন নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনোস্কী (Malinowsky) ও র‍্যাড্‌ক্লিফ-ব্রাউন (Radcliffe-Brown)। ইহারা নৃতত্ত্বের আলোচনায় এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময় ইহা পর্যায়ক্রমে সমাজবিদ্যা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়।

কার্যের সংজ্ঞা : নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ ধরনের ক্রিয়া-কলাপের দৃশ্য ফলাফলকে কার্য (functions) বলা হইয়া থাকে।[২]

এই কার্য পরিস্ফুট (patent) বা অপরিস্ফুট (latent)—উভয়ই হইতে পারে। যেমন, বিচার বিভাগের পরিস্ফুট কার্য হইল আইনের ব্যাখ্যা করা, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে আইনের ব্যাখ্যার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রসার হইল অপরিস্ফুট (বা অনুদ্দেশ্য-মূলক) কার্য।

সংগঠনের সংজ্ঞা : সংগঠন (structure) বলিতে বুঝায় সংশ্লিষ্ট কাঠামোর সেই সকল ব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

একই সংগঠন বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে পারে, অপরদিকে আবার একই কার্য বিভিন্ন প্রকার সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদিত হইতে পারে।

এই বিশ্লেষণের লক্ষ্য : সাংগঠনিক কার্যগত বিশ্লেষণের প্রাথমিক লক্ষ্য হইল কিভাবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চালু রাখা যায়, এবং সংকট দেখা দিলে কিভাবে তাহার মোকাবিলা করা যায় তাহার ইংগিত দেওয়া। বিশ্লেষণকারীরা চান যে পরিবর্তন ধাপে ধাপে আসুক—বিপ্লবের মধ্য দিয়া নয়। সুতরাং ইহারা খোঁজ করেন সমাজ-ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য কোন্ কোন্ কার্য অপরিহার্য বা প্রয়োজনীয় এবং কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান থাকিলে এই সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব, এই বিশ্লেষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে (traditional political systems) কিভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (modern political system) পরিণত করা যায়—তাহারই পথনির্দেশ করা।

১. "The approach has been variously criticised for failing to cater for such concepts such as political power … ." A. R Ball

২. *A Function* is "the objective consequence(s) of a pattern of action for the system (in this case social or political) in which it occurs." Oran Young

রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলী: সাংগঠনিক-কার্য তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে: প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের (structures) মাধ্যমে কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কার্যাবলীর মধ্যে আছে: (১) বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে সংগঠিত করা; (২) দাবি-দাওয়াকে সংগঠিত ও সংহত (co-ordinated) করিয়া বিকল্প কর্মপন্থায় পরিণত করা; (৩) নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা; (৪) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়মকানুন প্রয়োগ সম্পর্কে বিচারকার্য সম্পাদন করা; এবং (৫) এই কার্যাবলী সম্পর্কে সংবাদাদি পরিবেশন করা। ইহা ব্যতীত রাজনৈতিক সমাজীকরণ পদ্ধতির (process of political socialisation) মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেকে বাঁচাইয়া ও সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা।

অ্যালমণ্ডের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা: সম্প্রতি ডেভিড ইস্টনকে অনুসরণ করিয়া অ্যালমণ্ড (G. A. Almond) উপরি-উক্ত কার্যাবলীর পরিমার্জিত রূপ দান করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য হইল কিভাবে পরিবেশের চ্যালেঞ্জের (challenges) সহিত মোকাবিলা করিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

অ্যালমণ্ডের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার (উপরি-উক্ত কার্যাবলী ধরিয়া) তিন ধরনের বা তিন পর্যায়ের কার্য রহিয়াছে: (ক) রূপান্তরসংক্রান্ত কার্য বা পদ্ধতি (conversion functions), (খ) ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সংগতিসাধন সংক্রান্ত কার্য (system maintenance and adaptation functions) এবং (গ) সামর্থ্য (capabilities)।

(ক) **রূপান্তর কার্য**: রূপান্তরসংক্রান্ত কার্য বলিতে বুঝায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে বিভিন্ন উপকরণ বা চাহিদাগুলিকে রূপান্তরিত করে ও উহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরিবেশের পদ্ধতির (processes in its environment) প্রতি সাড়া দেয়। এই কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে (১) বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে সংগঠিত করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের গোচরে আনয়ন করা (interest articulation); (২) বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে সমন্বিত করিয়া বিকল্প কর্মপন্থায় বা সাধারণ নীতিতে পরিণত করা (interest aggregation); (৩) রাজনৈতিক সংবাদাদি পরিবেশন করা (communication function); (৪) নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগ (rules making and their application) এবং (৬) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সম্পর্কে বিচারকার্য সম্পাদন (rule adjudication)।

(খ) **সংরক্ষণ ও সংহতিসাধন কার্য**: রাজনৈতিক সমাজীকরণ ও রাজনৈতিক ভূমিকায় নিয়োগকরণের (political socialisation and recruitment) মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেকে বাঁচাইয়া ও নিজের সংহতি রক্ষা করিতে প্রচেষ্টা করে।

(গ) সামর্থ্য : সামর্থ সম্পর্কিত কার্যাদির বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিম্নলিখিত কার্যাদি করিতে সমর্থ কি না বা কতদূর সমর্থ তাহা দেখা। কারণ, মূলত এই সামর্থ্যের উপরই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

সামর্থ্যসংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে আছে : (১) সম্পদ সংগ্রহের সামর্থ্য (extractive capability); (২) ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য (regulative capability); (৩) সম্পদ (দ্রব্য ও সেবা) বন্টনের সামর্থ্য (distributive capability); (৪) প্রতীক সম্পর্কিত সামর্থ্য (symbolic capability)—ইহার সাহায্যে (যেমন, পতাকা, সামরিক অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রনেতাদের বিবৃতি ইত্যাদি) ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য আদায়ের প্রচেষ্টা হয়; এবং (৫) সাড়াপ্রদানের সামর্থ্য (responsive capability)—অর্থাৎ অভ্যন্তর এবং বাহির হইতে যে-সকল চাহিদা বা চাপ আসে তাহাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে সাড়া দেয়।

বিভিন্ন সংগঠনের দক্ষতা ও সামর্থ্যের উপর কাযগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন নির্ভর করে। সম্পাদন সুষ্ঠু না হইলে—চাহিদা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সংহতিসাধন সম্ভব না হইলে ভারসাম্যের অভাব এবং অবস্থিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

সমালোচনা : ইস্টনের ব্যবস্থামূলক আলোচনার সমালোচনার অনুরূপ সমালোচনা এই তত্ত্বেরও করা হয়।

(১) ভারসাম্য ও স্থায়িত্বের উপরই দৃষ্টি. বলা হয় সাংগঠনিক-কার্যগত পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য (equilibrium) বা সামঞ্জস্যবিধান (harmony) কিভাবে সাধিত হয় তাহার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।[১] ইহার উত্তরে অ্যালমণ্ড বলেন যে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতার কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, আলোচ্য বিষয় হইল যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন অংশের পরিবর্তন অন্যান্য অংশকে বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তাহা দেখা।

(২) গতিবিহীনতা ও রক্ষণশীলতা : দ্বিতীয়ত, মন্তব্য করা হয় যে ইহা গতিহীন (static) এবং রক্ষণশীল (conservative) তত্ত্ব, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু গতিশীল। ইহার উত্তরে অ্যালমণ্ড বলেন যে তাহার প্রথম দিকের লেখার বিরুদ্ধে এই সমালোচনা প্রযোজ্য হইলেও পরবর্তী লেখায় তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, আধুনিকীকরণ ও প্রগতির কথা বলিয়াছেন।

(৩) পাশ্চাত্য মডেল : তৃতীয়ত, অ্যালমণ্ড তাঁহার বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য মডেল অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির (Third World Countries) রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা কতদূর যুক্তিসংগত সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে

১. "This approach is inclined to emphasise the search for processes that maintain the stability of the system." Davies and Lewis : *Models of Political Systems*

সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কতকটা মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। এই মতৈক্যের ভিত্তিতে রচিত মডেল (consensual model) অনুন্নত দেশগুলিতে প্রয়োগ করা সমীচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন না।[১]

(৪) সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা: অনেক সমলোচক এই তত্ত্বকে সমাজতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া মনে করেন। ইহাদের ধারণায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রসারসাধন এই তত্ত্বের সমর্থকদের উদ্দেশ্য। এমনকি সমালোচকরা বলিয়াছেন যে, তত্ত্বটির মূল প্রেরণা হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো।[২]

উপসংহার—সাধারণ তত্ত্ব নহে: যাহা হউক, পাশ্চাত্য লেখকগণ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনায় এই তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহার সাহায্যে রাজনৈতিক জীবনের সকল দিকের ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। সুতরাং সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে এই তত্ত্বকে গ্রহণ করা যায় না।[৩]

ঘ। গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতি (The Group Approach): আধুনিক গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতির প্রেরণা যোগায় বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকগণের (যেমন, কোল মেইটল্যাণ্ড বার্কার ল্যাস্কি প্রভৃতি) বহুত্ববাদ। বহুত্ববাদের উদ্ভব হয় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

বহুত্ববাদ: বহুত্ববাদিগণের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল একত্ববাদ যে রাষ্ট্র ও সমাজ একরূপ অভিন্ন বলিয়া এবং সমাজকে 'অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন' (association of unassociated persons) বলিয়া মনে করে তাহা ভুল। অতএব, বহুত্ববাদিগণের মতে, সমাজ সংঘমূলক। এই সকল সংঘ ব্যক্তি-স্বার্থ সম্যকভাবে সংরক্ষিত করে। সুতরাং ইহাদের মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে না।

সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্য উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে—বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—এই গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া রাজনীতির আলোচনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশেষভাবে প্রচারকার্য চালানো হয়।

আলোচনাক্ষেত্র: গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতি আচরণমূলক পদ্ধতির প্রকারভেদ। ইহা গোষ্ঠীসমূহের আচরণ—বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার্যকলাপ, ঘাতপ্রতিঘাত ও স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির আলোচনা করিবার প্রচেষ্টা করে।[৪]

---

১. "... the functional theorists in politics, ... fail to provide empirically validated answers to what is happening in the Third World." C. P. Bhambri

২. "Some of its critics have even wanted to interpret it (functionalism) as a political ideology conditioned by the structure of American capitalism." W. G. Runciman

৩. Ball: *Modern Politics and Government*

৪. ইহাকে গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয় ও লক্ষ্য : সমাজ হইল গোষ্ঠীসমূহের সমষ্টি (a social system is a mosaic of groups)। এই গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের স্বার্থ বা লক্ষ্য চরিতার্থ করিবার জন্য এবং সরকার কর্তৃক ইহাদের মতামত গ্রহণের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং সরকারের উপর বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে।[১]

গোষ্ঠীর ধারণা : বেন্টলীর (Arthur F. Bently)[২] মতে, গোষ্ঠী হইল সমাজের ব্যক্তিসমূহের অংশবিশেষ—ইহাদের কাজকর্মই হইল গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ট্রুম্যানের (David Truman) ধারণায় গোষ্ঠী হইল সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিসমূহের সমষ্টি যাহা তাহার স্বার্থ বা মতামত কার্যকর করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গোষ্ঠীগুলির নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং তাহাদের দাবি পূরণের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের উপর চাপ দেয়।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব : সুতরাং গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতির বিষয়বস্তু হইল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

সরকার গোষ্ঠীগুলির দ্বন্দ্বের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে ও শৃংখলা রক্ষিত হয় এবং সমাজও অব্যাহতভাবে চলে।[৩] বলা হয়, যেহেতু রাষ্ট্র বা সরকার সকল প্রতিযোগিতাকারী গোষ্ঠীগুলির কার্যাবলীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেইহেতু কোন গোষ্ঠীর বক্তব্যই এবং কোন এক গোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রাধান্য পায় না।[৪] সুতরাং উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতা হইল বিক্ষিপ্ত (fragmented) ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রশক্তি যে বিশেষ স্বার্থের উদ্দেশ্যে কাজ করে তাহা মনে করা ভুল। অতএব, উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রকৃত গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

সমালোচনা : প্রথমত, গোষ্ঠীতত্ত্বের লেখকগণ 'গোষ্ঠী' বা 'স্বার্থ' বা 'ভারসাম্য' সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক সংজ্ঞা দিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে রাষ্ট্র বা সরকার বা সমাজের লক্ষ্য কি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য কি হইবে না-হইবে তাহার কোন নির্দেশ এই তত্ত্বে নাই সুতরাং সমাজ-পরিবর্তনের ধারা কি হইবে না-হইবে তাহাও এই তত্ত্ব হইতে অনুমান করা যায় না।

তৃতীয়ত, ইহা নির্দিষ্ট কৃষ্টির—অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সমাজের কৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং ইহা সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

১. বিশদ আলোচনার জন্য দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর অধ্যায় দেখ।

২. গ্রন্থের নাম The Process of Government (1908)

৩. "Government functions to establish and maintain a measure of order in the relationships among groups." David Truman · *The Governmental Process*

৪. "... all the active and legitimate groups in the population can make themselves heard at crucial stage in the process of decision." R A. Dahl : *A Preface to Democratic Theory*

চতুর্থত, রাষ্ট্র যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালীর স্বার্থসংরক্ষণের যন্ত্র তাহাকে দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চায় —অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি এবং উহা কি উদ্দেশ্য সাধন করে তাহা এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ প্রকাশ করিতে চাহেন না। এই কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রশক্তির আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে চাহেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় কিরূপে?[১] (বিস্তৃত সমালোচনা পুনরায় করা হইবে।)

৬। **নূতন রাজনৈতিক অর্থতত্ত্ব (The New Political Economy):** সাম্প্রতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থবিদ্যার আলোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতী। উদ্দেশ্য: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক রূপদান করা।

রাজনৈতিক বিনিময়-ব্যবস্থা: ইহাদের দৃষ্টিভংগি অনুসারে অর্থনৈতিক বিনিময়ের মতই রাজনৈতিক পদ্ধতি (political process) হইল এক প্রকারের বিনিময়-ব্যবস্থা। ধরিয়া লওয়া হয় যে এই বিনিময়কার্যে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বা সংগঠনই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (rational)। ভোট হইল এক বিশেষ ধরনের পদ্ধতি। নির্বাচনের মাধ্যমে ইহার দ্বারা বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, ভোটের বদলে কোন-না-কোন রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় আসীন হয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সরকারী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে এবং ঐ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভোট সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল উহার পক্ষে সমর্থনকে সর্বাধিক করিবার (maximise political support) জন্য সরকারী আয়ব্যয়ের কার্যাদি (Public Finance) এমনভাবে নির্বাহ করে যাহাতে ভোটের পরিমাণ সর্বাধিক হয়।

এইভাবে ভোট এবং সরকারী কার্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সরকার চাহে সমর্থন, সম্পদ ও আনুগত্য আর নাগরিকেরা চাহে তাহাদের সুযোগসুবিধাকে বৃদ্ধি করিতে।

আলোচ্য বিষয়: নূতন রাজনৈতিক অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইল সমষ্টিগতভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে অপ্রচুর সম্পদকে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে বণ্টন করে, কিভাবে সুযোগসুবিধা আয়-মর্যাদা ইত্যাদি বণ্টিত হয়, ব্যয়ভার কাহারা কিভাবে বহন করে ইত্যাদি প্রশ্ন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারী রাজস্ব, বাজেট, বিভিন্ন কর এবং রাজনৈতিক কাঠামোর উপর উপরি-উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের ফলাফল ইত্যাদি আলোচিত হয়।

পদ্ধতিটির সীমাবদ্ধতা: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থবিদ্যার পদ্ধতি প্রয়োগের অসুবিধা সম্পর্কে বলা হয় যে অর্থবিদ্যায় যেভাবে সহজে কতকগুলি অনুমান ধরিয়া লইয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহা করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যেরূপ পরিমাণগত পরিমাপ (quantitative

১. R. Miliband: *The State in Capitalist Society.*

measurement) সম্ভব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং, অর্থবিদ্যার পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না।[১]

চ। মার্ক্সীয় পদ্ধতি (The Marxist Approach): মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে ইহা প্রথমে মার্ক্স ও এঙ্গেলস অবতারণা করিলেও পরবর্তী লেখকগণ যেমন, লেনিন, স্তালিন, মাও সে-তুং এবং অন্যান্য লেখক বা চিন্তাবিদ্ ইহার প্রসারসাধন করিয়াছেন। অবশ্য বলা হয়, মার্ক্স ও এঙ্গেলস রাজনীতির বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। তবুও কিন্তু ইহাদের বিভিন্ন রচনা ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী লেখকের লেখা হইতে রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।[২]

প্রকৃতি: মার্ক্সীয় তত্ত্ব অতি ব্যাপক প্রকৃতির ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের গতিপ্রকৃতির আলোচনা করিয়া থাকে।

সমাজজীবনের আর্থিক ব্যবস্থা, রাজনীতি, রাষ্ট্র, আইনকানুন মতাদর্শ, কৃষ্টি প্রভৃতি সকলই পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত এবং পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সুতরাং বলা হয় যে রাজনীতিকে অন্যান্য বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না।[৩]

পরিপ্রেক্ষিত: মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানুষের স্থান ও ভূমিকা কি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি কি তাহার সামগ্রিক চিত্র অংকন করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছে। অন্যভাবে বলা যায়, মার্ক্সবাদীরা রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে, সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ও বাস্তব অবস্থার পটভূমিতে বিচার করিয়াছেন—আদর্শবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে নয়।

আবার মার্ক্স শুধু অবস্থিত পৃথিবী ও সমাজের ব্যাখ্যাই দেন নাই, তিনি কিভাবে উহাদের পরিবর্তন করা যায় তাহারও ইংগিত দিয়াছেন।

প্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব: আরও বলা যায়, মার্ক্সবাদ তত্ত্ব অপেক্ষা বাস্তবে ঐ তত্ত্বের প্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে।[৪]

---

১. "Much economic theory involves rigorous logic ··· the conclusions follow ··· with a mathematical necessity ··· . The problems which confront the political theorists cannot be reduced to such unequivocal terms." David Butler: *The Study of Political Behaviour*

২. তবে বর্তমান জগতের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহার আলোচনা ও প্রসারসাধনের আরও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয়। অন্যথায় মার্ক্সবাদ স্থিতিশীল তত্ত্বেই (static dogmas) পরিণত হইবে। See Miliband, *Marxism and Politics* and John Lewis: *Marxism and the Open Mind*

৩. "On the most general plane, Marxism begins with an insistence that the separation between the political, economic, social and cultural parts of the social whole is artificial and arbitrary ··· ." R. Miliband

৪. "··· although theory is essential in Marxism, Marx proclaimed the primacy of practice over theory." J. B. S. Haldane: *The Marxist Philosophy and the Sciences*

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ : মার্ক্সবাদের মূল তত্ত্ব হইল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। এই তত্ত্ব অনুসারে জগৎ বস্তুময় এবং আমাদের ধ্যানধারণা বা ভাবধারা এই বস্তুময় জগতের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন (reflexes)। সকল বস্তুই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা অসামঞ্জস্য।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ . সমাজজীবন ও সমাজজীবনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগই হইল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)।

সকল বস্তুই যখন পরিবর্তনশীল তখন সমাজ-ব্যবস্থা উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। পৃথিবীর সকল বস্তুই দ্বন্দ্ব বা অসংগতির মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হয়।

শ্রেণী সংঘর্ষ : অতএব, সমাজও তাহার আভ্যন্তরীণ অসংগতি বা দ্বন্দ্বের ফলে পরিবর্তিত হয়—শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে এই পরিবর্তন শ্রেণীবিরোধ বা শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্য দিয়া সংঘটিত হয়।

আবার বস্তুময় জগৎই যদি আমাদের ধ্যানধারণা ইত্যাদির উৎস হয় তাহা হইলে সামাজিক ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যবস্থা বা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রকারের ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠান।[১]

সমাজের ভিত্তি ও উপরিস্থ কাঠামো : অন্যভাবে বলা যায় সমাজের অর্থনীতি হইল ভিত্তি (base) এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া যে-ধ্যানধারণা, রাজনীতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (যেমন, রাষ্ট্র, দল, স্বার্থগোষ্ঠী প্রভৃতি) ও রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি গড়িয়া উঠে উহা হইল উপরিস্থ কাঠামো (superstructure)।

উপরিস্থ কাঠামোর প্রভাব : সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ধ্যানধারণা, রাজনীতি প্রভৃতিও আবার সমাজের বৈষয়িক পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে।

সুতরাং রাজনীতির মূলে রহিয়াছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।[২]

অবশ্য অর্থনৈতিক বিষয়ই সব নয়—রাজনীতির কোন প্রভাব নাই বা উহা একেবারেই স্বাতন্ত্র্যবিহীন একথাও মনে করা ভুল। বস্তুত, রাজনীতি, রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রভৃতির ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা যায় না।[৩]

---

১. "The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general." Marx : *Preface to A contribution to the Critique of Political Economy* (1859)

২. Politics is "a concentrated expression of economics." V. I. Lenin

৩. Miliband : *Marxism and Politics*

অতএব, সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরিস্থ কাঠামো—অর্থনীতি এবং রাজনীতি ও আইনকানুন, রাজনৈতিক সংগঠন ও আইনগত নিয়ন্ত্রণ, সমাজ ও ব্যক্তি ইত্যাদি—অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত।

উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক : সমাজ ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি—পূর্বসূত্র ধরিয়া বলা যায়, নির্ধারিত হয় উৎপাদন-পদ্ধতি (বা উৎপাদন-ব্যবস্থা) দ্বারা। এই উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক হইল (ক) উৎপাদন শক্তি (the forces of production) এবং (খ) উৎপাদন-সম্পর্ক (the relations of production)।

উৎপাদন-শক্তি বলিতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী শ্রমিক ও তাহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে বুঝায়, আর উৎপাদনের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষে মানুষে যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই হইল উৎপাদন-সম্পর্ক (the relations of production)। ইহা সহযোগিতা বা শোষণের সম্পর্ক হইতে পারে। শোষণমূলক সমাজে এই সম্পর্ক হইল প্রধানত শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে। অর্থাৎ, মালিকশ্রেণী ও উৎপাদনের উপকরণ (instruments of production) হইতে বিচ্যুত শ্রমজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক।

শোষণমূলক সমাজ ও উহার কারণ : ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (private property) উদ্ভবের ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভাঙিয়া যাওয়ার পরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিবর্তিত হওয়া পর্যন্ত সকল সমাজেই—যেমন, দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ—উৎপাদন-সম্পর্ক হইল শোষণমূলক।

শ্রেণী-সংঘর্ষ—কারণ : ইহার ফলেই শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। এই সংঘর্ষের মূলে রহিয়াছে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে অসংগতি বা বিরোধ। উৎপাদন-শক্তি অধিক গতিশীল কিন্তু শোষণ-মূলক শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে উৎপাদন-সম্পর্ক সহজে উৎপাদন-শক্তির ক্রমোন্নতির সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। কারণ, প্রচলিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে প্রতিপত্তিশালী মালিকশ্রেণী সুযোগসুবিধা ভোগদখল করে তাহারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্ককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ফলে গতিশীল উন্নততর উৎপাদন-শক্তির সহিত প্রগতি-বিরোধী প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের বাধে বিরোধ (conflict) এবং এই বিরোধ ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিতে থাকে। এবং শেষপর্যন্ত উহা শ্রেণীসংঘর্ষের রূপ ধারণ করে।

বিপ্লব : এই শ্রেণীসংঘর্ষের পরিণতি ঘটে বিপ্লবে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া নূতন উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানত মালিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ রহিয়াছে। বলা হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তিত হইয়া থাকে এবং উৎপাদনের

উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানার সহিত উৎপাদন-সম্পর্কের সংগে সংগতি সাধিত হয়।[১]

বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়: অতএব, মার্ক্সবাদী রাজনীতির গোড়ার কথাই হইল বিরোধ বা সংঘর্ষ (conflict)।[২] এবং এই বিরোধ বা সংঘর্ষের মূলে রহিয়াছে শ্রেণীশোষণ। সুতরাং বিপ্লব ছাড়া শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিরোধ ও শোষণের অবসান অকল্পনীয়। তাই বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল বলপ্রয়োগের যন্ত্র রাষ্ট্রশক্তিকে (State power) করায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রমজীবীগণ তাহাদের রাষ্ট্র ও আইন-কানুনের মাধ্যমে শোষণের অবসান ঘটাইবে এবং সাম্যবাদী সমাজ হইতে কমিউনিস্ট সমাজের দিকে অগ্রসর হইবে। অবশ্য কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে এবং সর্বহারাশ্রেণীর নায়কত্বে (dictatorship of the proletariat) শ্রমজীবীদের কার্যকলাপ পরিচালিত হইবে।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি: যখন পূর্ণাংগভাবে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন রাজনীতি, রাষ্ট্র ও দলের অবলুপ্তি ঘটিবে (will wither away)।

রাজনীতির আন্তর্জাতিক দিক: রাজনীতির আবার আন্তর্জাতিক দিকও আছে। এই আন্তর্জাতিক দিকটি হইল রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক। যতক্ষণ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে।

সামগ্রিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ: পরিশেষে স্মর্তব্য যে রাজনীতি সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভংগি অতি ব্যাপক। ইহা অর্থনীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, দল, গোষ্ঠী, ধর্মনৈতিক বোধ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির আলোচনা করিতে হইবে।

মূল্যায়ন (Evaluation): মার্ক্সবাদের প্রয়োগ ও প্রসার মানবজীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে। মানব-ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে মার্ক্সবাদের ভূমিকা অন্য যে-কোন তত্ত্ব বা ধারণাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।[৩]

পরম্পরাগত ধারণাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া, রক্ষণশীলতার শৃংখল ভাঙিয়া শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং রাজনীতির সাঠিক পরিস্ফুটনে অর্থনৈতিক

১. বিভিন্ন দেশে শ্রেণীবিন্যাস বিভিন্ন ধরনের বলিয়া বিপ্লবও বিভিন্ন রূপে আসিতে পারে। যেমন, আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনে বিপ্লব সংগঠিত হইয়াছিল কৃষকশ্রেণীর সহযোগিতায়।

২. "At the core of Marxist politics, there is the notion of conflict." R. Miliband

৩. "Marxism is an ideology whose acceptance and implementation has changed the whole course of human history as no other system of though, had ever done." Frank Thakurdas

ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান করিয়া মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক অভূতপূর্ব গতি সঞ্চার এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

কোন কোন দার্শনিক অবশ্য মনে করেন যে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি অর্থনৈতিক বিষয়-সমূহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া সামাজিক ধ্যানধারণা, মতবাদ, আদর্শ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছে, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখদুর্দশাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখিয়াছে। তবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে।

শ্রেণীদ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সম্প্রসারণেও মার্ক্সীয় তত্ত্বকে উপেক্ষা করা কঠিন।

মার্ক্সবাদী ও আচরণবাদী দৃষ্টিভংগির তুলনা: কোন কোন দিক হইতে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি ও আচরণবাদীদের (behaviourists) দৃষ্টিভংগির সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

সাদৃশ্য. (১) উভয় দৃষ্টিভংগিই প্রচলিত ধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উহার তত্ত্বসমূহকে আলোচনা করিতে অস্বীকার করে। মার্ক্সবাদ অর্থনৈতিক কাঠামোর (economic structure) উপর রাজনৈতিক ও আইনগত বিষয়সমূহের গাঁথুনি তুলিয়াছে (superstructure), অপরদিকে আচরণবিদগণ রাজনৈতিক আচরণের আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করিয়াছেন। (২) উভয়ের আলোচনাতেই সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে (যদিও মার্ক্সের যুগে এই বিষয়গুলি এতটা জনপ্রিয় ছিল না)। (৩) উভয় দৃষ্টিভংগি বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুগত অবস্থার আলোকে রাষ্ট্রকে বিচার করে।

বৈসাদৃশ্য: পার্থক্য হইল—(১) উভয়ই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজের বিচার করিলেও মার্ক্স সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর আলোচনা করিয়াছেন এবং দার্শনিক মনোভাব ও চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটাইয়াছেন। আচরণবিদগণ সমাজের কোন একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আলোচনা করিয়াছেন। (২) মার্ক্স রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাইতে সমর্থ হইলেও মূল্যমান-নিরপেক্ষ (value-free) ছিলেন না। তিনি বস্তুগত অবস্থার উৎকর্ষ নির্দেশ করিয়াছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে সমাজের বিচার করিয়াছেন। অপরদিকে আচরণবিদগণ সম্পূর্ণভাবে মূল্যমান-নিরপেক্ষ থাকিয়া রাজনৈতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে আগ্রহী। (৩) আচরণবিদগণের তত্ত্বে বিষয়বস্তু অপেক্ষা ধারণাই প্রাধান্য পাইয়াছে। মার্ক্সীয় তত্ত্বে কিন্তু ধারণা (concepts) বড় হইয়া উঠে নাই, ইতিহাসের প্রভাবই অধিক। তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহার তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়াছেন। আচরণবিদগণ কিন্তু রাজনীতির ব্যাখ্যায় ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

উপসংহার—নয়া বিজ্ঞান : সকল দিকের বিচার করিয়া মার্ক্সীয় চিন্তাধারাকে একটি সম্পূর্ণ নয়া বিজ্ঞান হিসাবেই উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত। অনেক সমালোচক অবশ্য ইহাকে বিজ্ঞান না বলিয়া 'ইতিহাস ও সমাজের ঘটনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যাখ্যা' আখ্যা দিয়া থাকেন।[১]

বিষয়মূলক পদ্ধতি (Disciplinary Methods or Approaches) : আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রসর হইতে পারা যায়।

বিভিন্ন পদ্ধতি : পদ্ধতিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : (ক) দার্শনিক পদ্ধতি, (খ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (গ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (ঘ) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, (ঙ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (চ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (ছ) মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি, (জ) আইনমূলক পদ্ধতি, (ঝ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং (ঞ) তুলনামূলক পদ্ধতি।

ক। **দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method)** : দার্শনিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হয়—অবরোহ পদ্ধতিতে (deductive method) দার্শনিকগণ কতকগুলি সাধারণ অনুমান হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যেমন মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতা সম্পর্কে অনুমান করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়। কাম্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের কাম্য সম্পর্ক কি হইবে তাহা দার্শনিকদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

বেন্থাম ও হবস্ : দার্শনিক পদ্ধতির লেখকদের মধ্যে বেন্থাম ও হবসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেন্থাম ধরিয়া লইয়াছেন যে মানুষ প্রকৃতিগত কারণেই সুখদুঃখের (pleasure and pain) অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং এই অনুমানের ভিত্তিতে তিনি রাজনীতি, অর্থতত্ত্ব ও নৈতিক সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার হবস্ অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) মানুষ কলহপ্রবণ। তিনি এই ধারণার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি কি হওয়া উচিত, ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন।

সমালোচনা : দার্শনিক পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে বাস্তব রাজনীতির সহিত ইহার যোগাযোগ নাই। ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে, রাজনৈতিক আলোচনায় নৈতিক প্রশ্নকে এবং অবরোহ পদ্ধতিকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।

---

১. "Marxism is an empirical study of the historical and social facts, but not a science. At the most it is a science of socialism, an analysis of the existing socialist movement and of the conditions in which it develops." Bottomore and Rubel : *Karl Marx : Selected Writing in Sociology and Social Philosophy*

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষের রাজনৈতিক আচরণের বিচার করিতে হইলে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতেই উহা করিতে হইবে।[১]

খ। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method): কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, রাজনৈতিক অনুসন্ধানে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিই বিশেষভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত। ব্রাইস বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন। পর্যবেক্ষণকারী অবশ্য সমালোচকের দৃষ্টি লইয়াই সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং বাহ্য সাদৃশ্য ও সামান্যীকরণ (generalisation) যথাসম্ভব পরিহার করিয়া যাইবেন। ব্রাইসের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া লাওয়েল (Lowell) বলিয়াছেন: "রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক নহে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর গবেষণাগার গ্রন্থাগার নহে, গবেষণাগার হইল বাহিরের রাজনৈতিক জীবন। অতএব, বাহিরের এই রাজনৈতিক জীবনেই রাজনৈতিক বিষয়সমূহের পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

গ। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method): স্যার জর্জ লিউ (Sir George Lewis) বলিয়াছেন, রসায়নবিদ রসায়নের ক্ষেত্রে যেভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেইভাবে পরীক্ষা করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে পূর্ণভাবে অনুসন্ধান করা সেখানেই সম্ভব যেখানে অনুসন্ধানের প্রতিকূল বিষয়গুলি বাদ দিয়া শুধু অনুকূল ঘটনাকে লইয়াই পরীক্ষা করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। ধরা যাউক, কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে চান। তাঁহার পক্ষে যে-কোন একটি রাষ্ট্র নির্বাচিত করিয়া, তাহাতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া এবং পরে প্রবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

আবার পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বারবার পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। আমরা আর্দ্রতাব পরিমাপ করিতে পারি, বায়ুর বেগের পরিমাপ করিতে পারি, উষ্ণতার পরিমাপ করিতে পারি কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতার ক্ষিপ্ততার পরিমাপ করিতে পারি না। এইজন্যই লর্ড ব্রাইস একস্থানে বলিয়াছেন যে, মানুষের রাজনৈতিক জীবনের শুধু বর্ণনাই করা যায়।

বিরতিবিহীন পরীক্ষা: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনে উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, মানুষের রাজনৈতিক জীবনে প্রতি-নিয়তই পরীক্ষা চলিতেছে। প্রত্যেক নূতন আইন, নূতন প্রতিষ্ঠান, নূতন রাজনীতি 'পরীক্ষা' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সকল পরীক্ষার ফল ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা

---

১. "Speculative thinking about politics can be very valuable but to understand and explain human conduct in political or any other contexts it is necessary to look closely at what people actually do." David Butler: *The Study of Political Behaviour*

হয় এবং পর্যবেক্ষণের ফলে পুনঃপরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে। এক দেশে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে অপরাপর দেশ তাহা অনুসরণ করে, অসন্তোষজনক হইলে তাহা পরিহার করিতে চেষ্টা করে।

উপসংহার: সুতরাং উপসংহার হিসাবে বলিতে পারা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করা না হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে।

ঘ। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method): রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিও অনুসরণ করে। প্রথমে পরিমেয় রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরে ইহা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (সরকারী নীতির নির্দেশক হিসাবে) সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ভোটদান-পদ্ধতি, জনমতের প্রাবল্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের পর্যালোচনায় পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর।

গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা: বর্তমানে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হওয়ায় পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির গুরুত্বও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। অনেক সময় পরিসংখ্যানের উপর অত্যধিক নজর দেওয়ার ফলে আসল বিবেচ্য বিষয়বস্তু চাপা পড়িয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাভুক্ত সকল বিষয় পরিমেয় নয়।[১]

ঙ। জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method): রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা দ্বারা রাষ্ট্রের গতি বিবর্তনবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাজনৈতিক জীবনের এই ব্যাখ্যা অনেক সময় প্রয়োজনীয় এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের (যেমন, জৈব মতবাদ—organismic theory) সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে এখন আর এই পদ্ধতির বিশেষ অনুসরণ করা হয় না।

চ। সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method): বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভংগি ও পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে সাধারণ সূত্রের অনুসন্ধান করা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং মানুষের রাজনৈতিক আচরণের বিশ্লেষণ করিতে হইলে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, দলীয় আনুগত্য অনেকখানি সমাজবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত, এবং

১. "A certain proportion of the raw material of political study is measurable. But most of our interest in politics is qualitative. It is not easy to measure or quantity qualities." Butler

সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞান হইতে গৃহীত হয়। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে শ্রেণী (class), বর্ণ (caste), ব্যক্তিত্ব (personality), মর্যাদা (status), ভূমিকা (role) প্রভৃতির ধারণা। যেমন, যে সমাজে বর্ণভেদ-ব্যবস্থা রহিয়াছে সেখানকার রাজনীতি এবং যেখানে বর্ণভেদ নাই সেখানকার রাজনীতি এক ধরনের নয়। জনতার আচরণ বিশ্লেষণ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য। ইহা সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

গুরুত্ব আরোপের বিপদ: তবে অনেকের মতে, সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকাংশে নিজস্ব সত্তা হারাইতে বসিয়াছে।[১]

ছ। মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি (Psychological Method): বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে—মানুষের রাজনৈতিক আচরণ কতদূর তাহার প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, দলে পড়িলে মানুষের রাজনৈতিক আচরণের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, কিভাবে জনমত গঠন করা যায়, ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণে মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যকলাপ, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা সহজতর হইয়া উঠিয়াছে।

গুরুত্ব: এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা থাকিলেও ইহা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে—বিশেষ করিয়া সর্বাত্মক রাষ্ট্রগুলিতে (Totalitarian States)—বিভিন্ন রাজনৈতিক ধ্যানধারণা (Political ideas) কিভাবে লোকের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয় তাহার বিশ্লেষণ মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সাহায্যে করা সহজ। আবার ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব (individual personality) এবং তাহার সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্কও বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সামাজিক মনোবিদ্যার (Social Psychology) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

জ। আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method): এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করা হয়—সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নহে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আইনের নীতিবিজ্ঞান বলিয়া ধরা হয়।[২]

এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্যের একটি সমষ্টিমাত্র—অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই আইন প্রণয়ন ও আইনকে কার্যকর করিবার জন্য।

১. 'One danger of the sociological approach is that 'politics has been seen as a subsidiary, a satellite of sociology ... ." Ball: *Modern Politics and Government*

২. "It regards the state primarily as a corporation or juridical person and views political science as a science of legal norms ... ," Garner

সুতরাং এই পদ্ধতি আইনের ভিত্তিতে গঠিত 'রাজনৈতিক জীবনে'র সকল সম্পর্কই বিশ্লেষণ করে, কিন্তু আইনের গণ্ডির বাহিরে কোনকিছু লইয়াই আলোচনা করে না। গার্ণারের মতে, এই ধরনের যে-কোন পদ্ধতিই (যাহা রাষ্ট্রকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখে না) সংকীর্ণ হইতে বাধ্য।

ঝ। ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method): বর্তমানে ইহা একরূপ স্বীকৃত অভিমত যে, ইতিহাসের পটভূমিকাতেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্যক আলোচনা সম্ভব। অতীতের অস্তিত্ব যে বর্তমানের এবং বর্তমান যে ভবিষ্যতের ইংগিত দেয়—এই সুপ্রচলিত উক্তি বিশেষভাবে সত্য। সুতরাং আমরা মাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই বর্তমান রাজনীতির পর্যালোচনা করিতে পারি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে দেখা হয় যে, বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পূর্বে তাহাদের রূপ কি ছিল।

পোলকের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, এই পদ্ধতি "রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের বর্তমান রূপ ও ভবিষ্যৎ গতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে।"

অতীতে তাহাদের কি রূপ ছিল এবং কিভাবে তাহারা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াই এই ব্যাখ্যা করা হয়, বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া নহে।

বিবর্তনবাদ: সুতরাং এই পদ্ধতি বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) সহিত সম্পর্কিত এবং নৃতত্ত্বমূলক পদ্ধতি (Anthropological Method) ইহারই অংগীভূত।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনুসন্ধানকালে বাহ্য সাদৃশ্যকে অভিন্নতা বলিয়া মনে করিয়া ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে লর্ড ব্রাইস আমাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। উপরন্তু, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ইতিহাসের গতির ভুল ব্যাখ্যাও করিতে পারেন। সুতরাং ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণকারীকে ব্যক্তিগত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠিয়া, বিজ্ঞানীর ন্যায় শান্ত ও ধীরভাবে যুক্তি দ্বারা রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান রাজনীতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্বন্ধে ইংগিত দিতে হইবে।

ঞ। তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method): ঐতিহাসিক পদ্ধতির ন্যায় তুলনামূলক পদ্ধতিতেও অতীতের রাষ্ট্রসমূহের শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা হয়, তবে শেষোক্ত পদ্ধতিতে বর্তমানেরও স্থান আছে।

অতীত ও বর্তমানের রাষ্ট্রসমূহের পর্যালোচনা হইতে লব্ধ বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয় এবং যে-বিষয়গুলি তুলনীয় নয়, সেগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে তুলনার দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ব্যবহার: অ্যারিষ্টটলই প্রথমে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।[১] কথিত আছে যে, তিনি ১৫৮টি রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা এবং তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া তাঁহার রাজনীতির (Politics) সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছিলেন। আধুনিক কালে মণ্টেস্কু, টক্‌ভিল (Tocqueville), লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহারে ঐতিহাসিক পদ্ধতির মতই সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। ঠিক তুলনীয় বিষয়গুলি বাছিয়া লইতে না পারিলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে।

আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary Approach): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতির উপসংহার হিসাবে সংক্ষেপে আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতির সপক্ষে আলোচনা করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার লক্ষ্য হইল রাজনৈতিক বিষয় ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সম্যক ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা, সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় সন্ধান করা এবং সুস্থ ও সবল সামাজিক জীবন কিভাবে সুনিশ্চিত করা যায় তাহার ইংগিত দেওয়া।

পদ্ধতি সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা: ইহা যদি লক্ষ্য হয় তাহা হইলে যাহাতে লক্ষ্যে পৌছাইতে পারি তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের আলোচনা-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। এবং প্রয়োজন হইলে একাধিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে (mix of approachs) আলোচনার পক্ষপাতী—ইহাতেই আলোচনা সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করেন।[২]

পৃথক পৃথক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা: পৃথক পৃথক পদ্ধতির উপযোগিতা থাকিলেও ইহাদের সীমাবদ্ধতাও স্মর্তব্য। যেমন, আচরণবাদীরা (দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আইনমূলক ইত্যাদি) পরম্পরাগত পদ্ধতিসমূহকে উপেক্ষা করিয়া তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা করিতে চান। স্বাভাবিকভাবেই নৈতিক মূল্যায়নকেও পরিহার করিতে চান। অথচ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করিলে বর্তমানকে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। আবার সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতির (decision making process) আলোচনা করা হয় বলিয়া দার্শনিক পদ্ধতিকেও উপেক্ষা করা যায় না—সিদ্ধান্ত দেশের পক্ষে মংগলজনক কিনা

---

১. অ্যারিষ্টটলের পূর্বে প্লেটোও কতকটা এই পদ্ধতি অনুসরণের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন ··· Bertrand Russell : *A History of Western Philosophy*, Ch. XIV

২. "··· we need to recognise that the study of almost any given subject in the field of politics can profit from the application of a mix of approaches." S. L. Washy : *Political Science—The Discipline and Its Dimensions*

তাহা বিচার করা দরকার। অতএব, মাত্র আচরণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সার্থক আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং আচরণমূলক পদ্ধতির সংগে পরম্পরাগত পদ্ধতিকে সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে।[১] অবশ্য আচরণমূলক পদ্ধতিও কতকটা আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতি, কারণ ইহা নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্য লইয়া থাকে।

আবার মার্ক্সবাদী তত্ত্বকেও উপেক্ষা করা যায় না। দ্বন্দ্ব রাজনীতির অন্যতম উপাদান। মার্ক্সবাদীরা এই দ্বন্দ্বের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মার্ক্সবাদ ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, মনোবিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সমাজ ও রাজনীতির গতিবিধির ব্যাখ্যা করিয়াছে। সুতরাং মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগিতে আলোচনাও ব্যাপক আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি।

সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় বা বিদ্যার (disciplines) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে—অর্থাৎ আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় আলোচনা পূর্ণাংগ বা সার্থক—কোনটাই হইবে না।

স্মর্তব্য—অধ্যায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর :

১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে ঐক্যমতের অভাবই সমস্যার হেতু।

২ আলোচনা-পদ্ধতি মোটামুটি তিন শ্রেণীর : সময়ভিত্তিক (পরম্পরাগত ও আধুনিক), (খ) রাজনৈতিক ধারাগত এবং (গ) বিষয়ভিত্তিক।

৩ পরম্পরাগত পদ্ধতিতে দর্শন, ইতিহাস ও আইনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এবং উপাদান হইল ঐ দর্শন, ইতিহাস ও আইন।

৪ আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে আছে (ক) আচরণমূলক পদ্ধতি, (খ ব্যবস্থামূলক পদ্ধতি বা আলোচনা, (গ) সাংগঠনিক-কার্যগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি, (ঘ) গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতি, (ঙ) নূতন রাজনৈতিক অর্থতত্ত্ব এবং (চ) মার্ক্সীয় পদ্ধতি।

৫ আচরণমূলক পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করিলে তবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বাস্তবধর্মী ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

৬. ব্যবস্থামূলক আলোচনার উল্লেখ্য প্রথম প্রবক্তা হইলেন ডেভিড ইস্টন।

৭. সাংগঠনিক-কার্যগত বিশ্লেষণ বলিতে বুঝায় বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা সম্পাদিত প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর বিশ্লেষণ। ইহা সাধারণ তত্ত্বেরই অন্যতর রূপ।

---

১. "It is of utmost importance that the dialogue between traditionalists and behaviouralists (and between the different groups in each school) be preserved … ." Roseman

৮. গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচরণের আলোচনা করা হয়।

৯. নূতন রাজনৈতিক অর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তু হইল যে রাজনৈতিক পদ্ধতি এক বিনিময়-ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

১০ মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগির ব্যাপকতা হইল ইহার সামগ্রিকতায় – রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গতিসঞ্চারে।

১১. বিষয়ের ভিত্তিতে অনুসৃত পদ্ধতির তালিকা এইভাবে প্রণয়ন করা যায়ঃ (ক) দার্শনিক পদ্ধতি, (খ পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (গ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (ঘ) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, (ঙ) জীববিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতি, (চ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (ছ) মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি, (জ) আইনমূলক পদ্ধতি, (ঝ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং (ঞ) তুলনামূলক পদ্ধতি।

সকল পদ্ধতির সংমিশ্রণের ভিত্তিতেই আলোচনা হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

1. Discuss the main points of difference between traditional approaches and recent approaches.

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরম্পরাগত পদ্ধতিসমূহ এবং আধুনিক পদ্ধতিসমূহের প্রধান পার্থক্যগুলির আলোচনা কর।] (২৬-২৭, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

2. Discuss in brief the main features of Behavioural Approach.

[আচরমূলক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা কর।] (২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

3. Write a short critical note on the New Political Economy.

[নূতন রাজনৈতিক অর্থতত্ত্বের উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা রচনা কর।] (৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

4. Discuss Structural-Functional Approach.

[সাংগঠনিক-কার্যগত পদ্ধতির আলোচনা কর।] (৩৬-৩৯ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the Group Approach.

[গোষ্ঠীমূলক পদ্ধতির আলোচনা কর।] (৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

6. In what sense is the Marxist Approach a pervasive one ?

[কোন্ অর্থে মার্ক্সীয় পদ্ধতি ব্যাপক ধরনের ?] (৪২-৪৬ পৃষ্ঠা)

7. What is the System's Approach ? What are its variations ?

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবস্থামূলক পদ্ধতি বলিতে কি বুঝায় ? ইহার প্রকারভেদ দেখাও।] (৩১-৩৫ পৃষ্ঠা)

8. Explain the different methods of study in Political Science. Which of them do you consider to be the most important and why ?

(C. U. 1966, '68, '71, '73, '76, '80)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে কর এবং কেন কর ?] (৪৭-৫৩ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট

আদর্শবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি
(THE NORMATIVE AND THE EMPIRICAL APPROACH)*

· *"How neutral or objective can the study of politics be? How neutral or objective ought it to be?*

Perhaps no other philosophical questions arouse deeper emotions among the students of politics." Robert Dahl

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার দুইটি মূল ধারা কি কি?

২ আদর্শবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির উৎস কোথায় কোথায়?

৩. উভয় দৃষ্টিভংগির মৌল পার্থক্য কি কি?

৪. উভয়ের মধ্যে ঐক্যমতের সন্ধানই বা কোন্ কোন্ ব্যাপারে পাওয়া যায়?

৫. উভয়ের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি?

৬. দৃষ্টিভংগি ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত?

দুইটি মৌল আলোচনা-ধারা : রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগিজনিত বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও বলা যায় যে আলোচনার ধাপ মূলত দুইটি : (ক) সনাতন বা পরম্পরাগত ধারা এবং (খ) আধুনিক বা আচরণবাদী ধারা (Traditional Approach and Modern or Behavioural Approach)।

ক। পরম্পরাগত ধারা : সনাতন বা পরম্পরাগত ধারা প্রধানত দর্শন, ইতিহাস ও আইনশাস্ত্রের আলোকে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পায়। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য (tradition), নীতিবোধ, আদর্শ, ভাবধারা ও কল্পনার প্রাধান্য থাকে বেশী। অনুমান বা অবরোহণ পদ্ধতি (deductive method), ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method), আইনমূলক পদ্ধতির (juridical method) অনুসরণ করিয়া ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করে। রাজনৈতিক আলোচনায় প্রশ্নে ব্যক্তিগত ধারণার প্রকাশ ঘটাইয়া এই দৃষ্টিভংগির বাস্তবতা ও যুক্তির পথকে অবরুদ্ধ করে।

খ। আচরণবাদী ধারা ও দৃষ্টিভংগি : অন্যদিকে আধুনিক বা আচরণবাদী ধারা মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের রাজনৈতিক আচার-আচরণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারণাকে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

* উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত বলিয়া অতিরিক্ত আলোচনা। কলিকাতা ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের জন্য প্রয়োজনীয় নহে।

আলোচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আচরণ অনুসন্ধান করা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা করা এই দৃষ্টিভংগির প্রধান লক্ষ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সনাতন বা পরম্পরাগত দৃষ্টিভংগি মূলত আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগির (Normative Approach) এবং আধুনিক দৃষ্টিভংগি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির (Empirical Approach) প্রসার ঘটায়।

প্লেটো অ্যারিস্টটল হবস রুশো হেগেল বেন্থাম মিল প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আলোচনায় আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে কার্ল মার্ক্স, ম্যাক্স ওয়েবার, গ্রাহাম ওয়ালাস, বেন্টলে, ল্যাসাওয়েল প্রমুখের আলোচনায় অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

উভয় দৃষ্টিভংগির মৌল পার্থক্য: আদর্শবাদী হইল সেই দৃষ্টিভংগি যাহা কতিপয় আদর্শ ও ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করে। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে কাজে লাগাইতে চায়। দ্বিতীয়ত, আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিরপেক্ষ (মূল্য নিরপেক্ষ) বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে আগ্রহী নহে। এই দৃষ্টিভংগি অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নীতিগত প্রশ্ন তুলিতে পারেন, এবং প্রয়োজনমত ভালমন্দের বিচারে সঠিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণে পথ দেখাইতে পারেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নীতিবিজ্ঞানীও বটেন—আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত পোষণ করার অধিকার তাঁহার আছে।

অপরপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মূল্যমান-নিরপেক্ষ (value-free) রাখিতে আগ্রহী

এই দৃষ্টিভংগি অনুসারে যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে কাজে লাগায় সেইহেতু ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচারের দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত নহে।

উপরন্তু, আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগি মূলত রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিভংগি এবং অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ। আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগিতে অবরোহণ পদ্ধতির প্রভাব এবং অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (পরীক্ষামূলক, পরিসংখ্যানমূলক, পর্যবেক্ষণমূলক) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগি অনুমান ও নীতির আলোকে রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশ্লেষণ করে। অপরদিকে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি রাজনৈতিক জীবনের সূত্র আবিষ্কার করে পরীক্ষানিরীক্ষা ও সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া। চতুর্থত, আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগি বিভিন্ন বিষয়ের আন্তর্বিষয়ক পর্যালোচনার (interdisciplinery study) উপর বিশেষ গুরুত্ব

দেয় না কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি সমাজবিজ্ঞানের তো বটেই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্য ও সহায়তার প্রশ্নকে গুরুত্বের সহিত বিচার করে।

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির দুর্বলতা: আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগির আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির কতিপয় দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

উভয় দৃষ্টিভংগির মধ্যে ঐক্যমত: উপরি-উক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও কতকগুলি ক্ষেত্রে আদর্শবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির মিল লক্ষ্য করা যায়:

(১) উভয় দৃষ্টিভংগি অনুসারেই অনুসন্ধানকারীর স্বার্থ ও কৌতূহল তাঁহাকে বিষয় নির্বাচনে প্রভাবিত করে এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন;

(২) মূল্য এবং অভিজ্ঞতা উভয়ের বিচারেই বিষয়ের নির্ণায়ক মান ও ইহার কার্যকারিতা উপলব্ধি করা উচিত;

(৩) রাজনীতির বাস্তব আলোচনা মূল্য-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়;

(৪) অনুসন্ধানকারীর ঝোঁক বা প্রবণতা পর্যবেক্ষণ বা প্রমাণের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিতে পারে;

(৫) অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তাঁহাদের ধারণা ব্যাখ্যা করেন একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই, তাঁহাদের ব্যাখ্যায় দার্শনিক উপলব্ধির প্রভাবও থাকিতে পারে;

(৬) বাস্তবের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নিরপেক্ষতা ও অনাসক্তি কতদূর প্রতিফলিত হইবে তাহা নির্ভর করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর, সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিভংগির উপর নহে।

সূক্ষ্ম পার্থক্য: অভিজ্ঞতাবাদিগণ মনে করেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে পৃথক করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা সম্ভব। অন্যদিকে আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগি বিশ্বাস করে ঘটনা ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কি হয় এবং কি হইতে পারে এ-সম্পর্কে ধারণার পার্থক্য থাকিতেই পারে। আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগি নিরপেক্ষতার দাবিকে শুধুমাত্র অযৌক্তিক মনে করে না, অকাম্যও মনে করে। তাঁহাদের মতে, রাজনীতির আলোচনা সঠিক কার্যের নির্দেশ করে—শুধুমাত্র কতকগুলি অনুভূতির প্রকাশ ঘটায় না। রাজনৈতিক মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যের সঠিক গতি নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কখনই মূল্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন নন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজনেই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

উভয় দৃষ্টিভংগির সমন্বয়: আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিষয়-নির্বাচন ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হইতেছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উভয় দৃষ্টিভংগির কার্যকারিতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বাস্তব ব্যাখ্যায় ও প্রকৃত রাজনৈতিক ধারণার প্রসারে উভয়ের অবদান আছে। কোন একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করিলে রাজনীতি পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে। সুষ্ঠু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ধারণা গড়িয়া তুলিতে উভয়েরই সহযোগিতার হাত বাড়াইবে—ইহা আশা করা যায়।

স্মর্তব্য—অধ্যায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর ঃ

১. দুইটি মূল ধারা হইল (ক) পরম্পরাগত ধারা, (খ) আধুনিক বা আচরণবাদী ধারা।

২ আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগির উৎস হইল যথাক্রমে নীতিবোধ, আদর্শ, ভাবধারা, কল্পনা; অপরদিকে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির উৎস হইল মানুষের রাজনৈতিক আচরণ।

৩. উভয় দৃষ্টিভংগির মধ্যে মৌল পার্থক্য হইল একদিকে আদর্শ ও ধ্যানধারণা এবং অপরদিকে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার পার্থক্য।

৪ ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায় অনুসন্ধানকারীর স্বার্থ ও কৌতূহল, আলোচনাকে মূল্য-নিরপেক্ষ করার প্রবণতায় এবং একে কিছুটা অন্যের পন্থা অনুসরণে।

৫. সূক্ষ্ম পার্থক্য হইল যে অভিজ্ঞতাবাদিগণ মূল্য-নিরপেক্ষতাকে আদর্শবাদিগণের মত গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন।

৬. উভয়ের সমন্বিত দৃষ্টিভংগিই কাম্য।

অনুশীলনী

1. Summarise the points of distinction as well as of affinity between Normative Approach and Empirical Approach to Political Science

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আদর্শবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভংগির মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (৫৬-৫৭, ৫৭ ৫৮ পৃষ্ঠা)

৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক
(RELATION OF POLITICAL SCIENCE TO OTHER SCIENCES)

> *"Although an autonomous science . . , it* (Political Science) *does not stand entirely unrelated to other sciences any more than the state stands isolated in the universe of phenomena."*
>
> Garner

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা :

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ধরনের এবং কোন্ কোন্ বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত ?

২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি সমাজবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে ?

৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস কি পরস্পরের অংগীভূত ?

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক কতটা গভীর ?

৫ বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি নীতি-শাস্ত্র হইতে সম্পর্কচ্যুত ?

সিজউইক বলিয়াছেন, কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা লাভ করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ঐ শাস্ত্রের সম্পর্ক অনুধাবন করা উচিত—অর্থাৎ দেখা উচিত যে, ঐ শাস্ত্র অপরাপর শাস্ত্র হইতে কি গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে কি-ই বা দান করিয়াছে।

সম্পর্কের কারণ : অপরাপর শাস্ত্রের উল্লেখ না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সিজউই-কের এই উক্তির যাথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

একমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই মানুষকে লইয়া আলোচনা করে না—সকল মানবীয় বিজ্ঞান (humanistic sciences) এবং কতিপয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও মানুষকে লইয়া আলোচনা করে। উপরন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কোনক্রমেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যায় না, কারণ সন্দেহাতীতভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে মালমসলা গ্রহণ করে এবং অন্যান্য কতিপয় বিজ্ঞানও যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে, তাহাও নিশ্চিত।

ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব (Political Science and Anthropology): অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই তাঁহাদের আলোচনায় নৃতত্ত্ব হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। নৃতত্ত্বে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন, তাহার কৃষ্টির প্রসার, তাহার পরিবেশ ও সামাজিক সম্পর্ক, তাহার বর্ণগত পার্থক্য, প্রভৃতি বিষয়াদির আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই সকল বিষয় তাঁহাদের আলোচনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। মানুষের উদ্ভব, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে গিয়া নৃতত্ত্বের সাহায্য লওয়া হয়।

মার্ক্স, এঙ্গেলস্ ও অন্যান্য লেখকের আলোচনায় নৃতত্ত্বের বিশেষ স্থান রহিয়াছে। আধুনিক লেখকগণ অনুন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলীর আলোচনায় এবং রাজনৈতিক আধুনিকিকরণে নৃতত্ত্বের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজনৈতিক নৃতত্ত্ব অপরপক্ষে, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা রাজনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক নৃতত্ত্ব (political anthropology) শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই রাজনৈতিক নৃতত্ত্বে আধুনিক সমাজ কিভাবে অনুন্নত সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, আইনের প্রকৃতি ও কার্য কি, সমাজের দ্বন্দ্ব ও কিভাবে উহার অবসান ঘটানো যায় তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হইয়া থাকে।

খ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা (Political Science and Zoology): প্রাণিবিদ্যার আলোকে রাজনীতির ব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণ করা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয় ডারউইনের সময় হইতে।

জৈব মতবাদ: ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমগ্র চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়ন তোলে[১]। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও ইহার প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখা করেন। ফলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে জৈব মতবাদের (Organic Theory) উদ্ভব হয়। এই মতবাদের দুইজন প্রধান প্রবক্তা হইলেন ইংরাজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) ও জার্মান চিন্তাবীর ব্লুন্টস্লি (Bluntschli)।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জৈব মতবাদে রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করা হয় বা প্রাণী বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহাতে প্রাণীর সমস্ত কিছু বৈশিষ্ট্য—জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় ও মৃত্যু আরোপ করা হয়। প্রাণী ও রাষ্ট্রের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, প্রাণিবিদ্যার সূত্রগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

মন্তব্য: মন্তব্য হিসাবে বলিতে পারা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি যে প্রাণিবিদ্যারই অনুরূপ তাহা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। তবুও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই চেষ্টা সমসাময়িক ও পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

গ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান (Political Science and Geography): মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক বিষয়সমূহের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভূখণ্ডের যে বিশেষ অংশে মানুষ বাস করে তাহার আয়তন ও অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য (natural resources) প্রভৃতি মানুষের প্রারম্ভ হইতেই মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে চিরকালই প্রভাবান্বিত করিয়া

১. তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ *Origin of the Species* ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

আসিতেছে। এই সূত্র ধরিয়া কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মানুষের রাজনৈতিক জীবন প্রধানত ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।[১]

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অ্যারিষ্টটল ভৌগোলিক বিষয়সমূহ ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ফরাসী চিন্তাবীর বোদাঁ (Bodin) ও রুশোর (Rousseau) লেখায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

রুশো প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে উষ্ণ জলবায়ুতে স্বেচ্ছাচারিতা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে কাম্য শাসন-ব্যবস্থা এবং শীতপ্রধান দেশে বর্বরতার উদ্ভব হয়।

তাঁহাদের পর মন্টেস্কু ও বাকল (Buckle) ভূবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বাকলের মতে, মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর যে-সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের মধ্যে ভৌগোলিক বিষয়সমূহই প্রধান।

অতি আধুনিককালে কয়েকজন জার্মান চিন্তাবীর এই আলোচনার পুনরুত্থাপন করিয়াছেন। এই লেখকগণের মধ্যে কয়েকজন বাকলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মূলত ভৌগোলিক বিষয়সমূহ যে রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপসংহার: রাজনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক বিষয়সমূহের প্রভাব অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ভৌগোলিক ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ঘ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science and Sociology): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, আদিমতম যুগ হইতেই সে সংঘবদ্ধভাবে বাস করিয়া আসিতেছে। সমাজজীবনে মানুষের কার্যকলাপ লইয়া যে-সকল শাস্ত্র আলোচনা করে তাহাদিগকে সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences) বলা হয়। সমাজজীবনে মানুষের কার্যকলাপের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবেও করা যাইতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞান: যাহাকে সমাজবিজ্ঞান (sociology or the science of society) বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা সমাজজীবনের আলোচনা সমগ্রভাবেই করে।[২] ইহা সমাজজীবনের সূত্রপাত, সংগঠন ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া সমাজ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব ও সূত্র নির্ধারণ করে। এই কারণে ইহাকে মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা হয়।

অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজজীবনের একটি দিক—মাত্র মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ—লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই আলোচ্য বিষয় সমাজবিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

---

১ N. J. Spykman; *The Geography of the Space*

২. R. M. MacIver in *Encyclopaedia of the Social Sciences*

বস্তুত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় 'রাষ্ট্র' প্রাথমিক অবস্থায় অন্যতম সামাজিক সংগঠন মাত্র ছিল। সমাজ-বিবর্তনের বিশেষ স্তরে রাজনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানের দ্বারস্থ না হইলে চলে না। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক গিডিংস্ (Giddings) বলিয়াছেন: "যাঁহারা সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি জ্ঞাত নহেন তাঁহাদিগকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিউটনের গতি সম্বন্ধে সূত্রের জ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ারই মত।"

সমাজবিজ্ঞান শুধু যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দান করে তাহা নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে গ্রহণও করে। সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন সমাজবিজ্ঞান হইতে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত, সমাজবন্ধনের সূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে তেমনি সমাজ-বিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে রাষ্ট্রের সংগঠন, কার্যাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে তত্ত্ব গ্রহণ করে।

উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সীমারেখা: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। গার্ণারের মতে, উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবুও কিন্তু বলা যায়, বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রকে পরস্পর হইতে পৃথক করা হইয়াছে।

গিডিংস্-এর অভিমত: অধ্যাপক গিডিংস্ এ-সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন: সাম্প্রতিক যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রের সহিত মিশিয়া যায় নাই—উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যাইতে পারে এবং ইহাই সাম্প্রতিক যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার: উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: (১) সমাজবিজ্ঞান ব্যাপকতম ও মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞান। (২) সমাজবিজ্ঞান সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র একপ্রকার সামাজিক কার্যকলাপ—রাজনৈতিক কার্যকলাপ—লইয়া আলোচনা করে। (৩) সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয় সমাজজীবনের সূত্রপাত হইতে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা সুরু করে প্রধানত রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে। (৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসাবে গ্রহণ করিয়া আলোচনা সুরু করে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞান মানুষ কেন এবং কি করিয়া সামাজিক জীবে পরিণত হইল তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে।

৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History): রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের পরই ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন স্যার জন সিলী (Seeley)।

সিলীর বিখ্যাত উক্তি : সিলীর মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল এবং ইতিহাস ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন।"[১] এই উক্তি যে কতকটা অতিরঞ্জিত সে-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। বর্তমানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। জেলিনেকের (Jellinek) মতে, শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নহে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও কার্যকলাপ অনুধাবনের জন্যও ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা : বস্তুত, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা অনেকাংশে উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা। উদ্দেশ্য হইল আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ইহা সাধন করিবার জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক পটভূমিকার। আজিকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, আজিকার দিনের শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি কোথায়—এই সকল প্রশ্নের বিচার আমরা করিতে পারি না যদি না ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সংগ্রহে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য আমাদিগকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহাই করেন। তিনি সংগৃহীত, শৃংখলাবদ্ধ তথ্যসমূহের তুলনা করিয়া রাজনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করেন। এই তথ্যের পরিমাণ অনুসারেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া উঠে মূল্যবান, গভীর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরত্ব : এই কারণে উইলোবি (Willoughby) বলিয়াছেন : "ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরত্ব যোগান দেয়" (History provides the third dimension of political science)।[২]

ইতিহাসের উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা : ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে মালমসলা সংগ্রহ করে। ইতিহাসের আলোচনাও কতকটা উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্য হইল ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইংগিত দিয়া মানুষকে কল্যাণময় পথে পরিচালিত করা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইতিহাসেরও উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। তাহা না হইলে ইতিহাস উদ্দেশ্যবিহীন অতীতের শুষ্ক ঘটনাবলীর সংকলন ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপূরকতা : সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পরের পরিপূরক।

১. "History without Political Science has no fruit
Political Science without History has no root."

২. *The Nature of the State*

এই কারণেই সিলী আর একস্থানে বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাস্তবিক রূপ ধারণ করে না এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলে ইতিহাস সাধারণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে।

বার্জেস (Burgess) বলেন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে একটি পংগু হইয়া পড়িবে—শবদেহেও পরিণত হইতে পারে এবং অপরটি আলেয়ার রূপ ধারণ করিবে।[১]

ইতিহাসের ব্যাপকতা: উপরের আলোচনা হইতে এ-ধারণা করা উচিত হইবে না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপরই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ-বিষয়ে সিলীর উক্তি যে কতকটা অতিরঞ্জিত তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা)। সিলী, ফ্রীম্যান (Freeman) প্রভৃতির উক্তির বিরোধিতা করিয়া গার্ণার স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে ইতিহাসের সমস্তটাই প্রাচীন রাজনীতি নহে। ইতিহাস একটি ব্যাপক শাস্ত্র। ইহা পর্যায়ক্রমে অতীত ঘটনাবলীর সংকলন করিয়া যায়। এই সংকলিত ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক কিছুরই—যেমন, চারুকলা ভাষা সংস্কৃতি—রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। সুতরাং এই সকল বিষয়ের ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রধানত সেই সকল হইতেই সংগ্রহ করেন যাহা রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

ইতিহাস-বহির্ভূত রাষ্ট্রবিজ্ঞান: অপরদিকে আবার সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই বর্তমান ইতিহাস নহে—অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমগ্রটার সন্ধান ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অংশই কল্পনাপ্রসূত—ঐতিহাসিক তথ্য হইতে তাহারা নির্ধারিত হয় নাই।

কল্পনা ও দার্শনিক তত্ত্বের সমবায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমন অনেক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের ভিত্তি আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই প্রসংগে বার্কার (Ernest Barker) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক সার্থক মতবাদ আছে যাহাদের ভিত্তি অতীত ইতিহাস নহে।[২] উদাহরণস্বরূপ প্লেটোর কমিউনিজম বা সমভোগবাদ, লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়।

আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ সমাজজীবন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংগিত দিবার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই সকল মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকল মতবাদের

---

১. "Separate them and the one becomes a cripple, if not a corpse, the other will-o-the-wisp"

২. "You have a political theory which is a good theory without being rooted in historical study".

অনুপ্রেরণায় অনেক সময় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও সংগঠিত হইয়াছে।

লর্ড এ্যাক্‌টনের মতে, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আদর্শকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দেখা গিয়াছে, ফল হিসাবে নহে।[১]

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ সময়ই আদর্শ নির্ধারণ করা হইয়াছিল ঐ বিশেষ যুগের পটভূমিকায়।

উপসংহার. উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পরের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইলেও উভয়ের আলোচনাক্ষেত্র পরস্পর হইতে অনেকাংশে পৃথক। লীককের (Leacock) উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়, "ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ" (Some history is part of political science)।

এই কিছুটা বা অংশকে সমগ্র বলিয়া ভুল করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস উভয়েরই স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে।

চ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা (Political Science and Economics): কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ বলিয়া মনে করা হইত। অর্থবিদ্যা (Economics) নামটিও আধুনিক। প্রাচীন গ্রীকরা ইহাকে রাজনৈতিক অর্থ-ব্যবস্থা (Political Economy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল কি করিয়া রাষ্ট্র প্রভূত রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। স্যার জেমস স্টুয়ার্ট বলিয়াছেন: "পারিবারিক অর্থ-ব্যবস্থার মত রাষ্ট্রেরও একটি অর্থ-ব্যবস্থা আছে।" অর্থাৎ, পরিবারের লক্ষ্য হইল যেমন আয় বৃদ্ধি করিয়া পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা তেমনি রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

বর্তমানে অবশ্য অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক মতানুসারে, অর্থবিদ্যা শুধু রাজস্ব সংগ্রহ লইয়া আলোচনা করে না; ইহা ছাড়া ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বণ্টন সংক্রান্ত মানুষের সকল কাজকর্ম লইয়াও আলোচনা করে।

অর্থবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত এই সকল বিষয়বস্তুর সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক থাকিলেও অনুধাবনের সুবিধার জন্য বর্তমানে অর্থবিদ্যাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে আলোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক: অর্থবিদ্যাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে আলোচনা করা হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থবিদ্যার মধ্যে যে-গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা

১. "Ideas ... are not the effect, but the cause of public events."

অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এই সম্পর্কের আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, উভয় শাস্ত্রই সমাজজীবনে মানুষের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে এবং উভয়েরই লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণ।

বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি একরূপ অভিন্ন বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা পরস্পরের সহিত অংগাংগি সম্পর্কে সম্পর্কিত বলা চলে।

(ক) পুলিসী রাষ্ট্রের যুগে: পূর্বে এই অংগাংগি সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ছিল না, কারণ রাষ্ট্র তখন ছিল পুলিসী রাষ্ট্র, যাহার কার্য ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। এই পুলিসী রাষ্ট্রের যুগেও রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা পরস্পরের উপর কতকটা পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল, কারণ রাষ্ট্রে শান্তিশৃংখলা বজায় না থাকিলে ধনোৎপাদন ব্যাহত হইত এবং ধনোৎপাদন ব্যাহত হইলে রাষ্ট্রে শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

(খ) বর্তমানের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে: বর্তমান দিনে রাষ্ট্র আর মূলত পুলিসী রাষ্ট্র নহে—সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র। বলা হয়, ইহা সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখে, কিভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে অধিক উৎপাদন, উপযুক্ত বিনিময়-ব্যবস্থা ও ন্যায্য বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ইহার জন্য রাষ্ট্র শুল্কনীতি নির্ধারণ করে, শ্রমিকের কল্যাণের ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজন হইলে ভোগের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে।

অপরদিকে আবার দেশের আর্থিক অবস্থাও শাসন-ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দেশে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিলে রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্যসমূহ ঠিকমত পালন করা সম্ভব হয় না। ফলে শাসনযন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ হইয়া আসে।

দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত রাষ্ট্রের অন্য একদিক দিয়াও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। পুঁজিবাদী সমাজে বণিক-সম্প্রদায় রাষ্ট্র পরিচালনায় যে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে ইহা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রামাণ্য মতবাদ।

উপরন্তু, এমন অনেক রাজনৈতিক মতবাদ আছে যাহা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের সমন্বয়ের ফল। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতন্ত্রবাদ সমভোগবাদ স্বাতন্ত্র্যবাদ (socialism, communism, individualism) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দিন দিন ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক: পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে দিন দিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতির ন্যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ঘনিষ্ঠতা বিশেষ প্রকট। ইংল্যাণ্ড ভারত প্রভৃতির ন্যায় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রেও ইহা অনুভব করিতে বিশেষ তত্ত্বগত আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান দিনে সম্পর্কের সংক্ষিপ্তসার : মোটকথা, অর্থবিদ্যা হইল অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান। জীবিকার্জনের তাগিদে মানুষ কিভাবে ধনোৎপাদন করে, কিভাবে উৎপন্ন ধন বণ্টিত হয়, উৎপাদনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কি প্রকারের সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, উৎপাদনশক্তি ও সামাজিক সম্বন্ধের ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে সমাজের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়, ইত্যাদি বিষয়কে অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সার্বভৌম শক্তি হিসাবে রাষ্ট্র আইনকানুনের সাহায্যে এই সকল সামাজিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করে।[১] সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কাহারও স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে না।

ছ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology): আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানপ্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বার্কার বলিয়াছেন: "রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানের সমাধানসমূহের ব্যবহার যেন বর্তমান দিনের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পূর্বসূরিগণ যদি জীববিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন, আমরা মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিতেছি।"[২] এবং যেদিন হইতে বেজট (Bagehot) তাঁহার 'পদার্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Physics and Politics) লিখিয়াছেন, সেদিন হইতে রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ মনোবিজ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছেন।" বেজট তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৪৮)। সেইদিন হইতে রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস আলোচনা করিলেই প্রকৃত মনোবিজ্ঞানমূলক প্রভূত রাজনৈতিক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।[৩]

গণতন্ত্রে রাজনীতি ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব : ইহা সত্য যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য মনোবিজ্ঞানের সূত্রসমূহের প্রয়োগ বিশেষভাবে কার্যকর। আধুনিক যুগে এই কার্যকারিতা আরও বাড়িয়াছে, কারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকার জনমত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়; জনমত সরকারকে প্রভাবান্বিত করে বলিয়া জনমতকে প্রভাবান্বিত করিবার পদ্ধতি-সমূহও আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের অনুধাবন অপরিহার্য। এ-সম্পর্কে গার্ণার বলিয়াছেন, জনসাধারণের মানসিক ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাস সরকারের মধ্যে প্রতিফলিত না হইলে সরকার স্থায়ী ও প্রকৃত জনপ্রিয় হইতে পারে না। স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং

---

১. Carl Becker: *Modern Democracy*

২. "The application of the psychological clue to the riddles of human activity has indeed become the fashion of the day. If our forefathers thought biologically, we think psychologically."

৩. এই সকল রাজনৈতিক সাহিত্য-স্রষ্টার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হইল ফ্রান্সের টার্ডে (Tarde) ও লে বঁ (Le Bon) এবং ইংল্যাণ্ডের ম্যাগডুগাল (McDougall), গ্রাহাম ওয়ালাস্ (Graham Wallas) ও হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)।

'জাতির মানসিক গঠনে'র (mental constitution of the race) মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের।

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ : শুধু যে শাসন-ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও জনপ্রিয় করিবার জন্য মনস্তত্ত্বের অনুধাবন প্রয়োজন, তাহা নহে। আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানের সূত্রও মনোবিজ্ঞানে মিলে, কারণ জাতীয়তাবাদ প্রধানত ভাবপ্রবণতা, মনোবৃত্তি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সমবায়েই সৃষ্ট। বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক দল প্রভৃতির গঠনেও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইহা ছাড়াও আধুনিক যুগে সরকারকে সৈন্যবাহিনী গঠনে, রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগে, বিচারালয়ে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

এই সকল পর্যবেক্ষণ করিয়া লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন : "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় আছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে" (Political science has its roots in psychology)।

মনোবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা : অবশ্য মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। মনোবিজ্ঞানের প্রধান সীমাবদ্ধতা হইল যে, ইহা অবস্থা লইয়া আলোচনা করে, আদর্শ লইয়া আলোচনা করে না। মনোবিজ্ঞানী কি ঘটে তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু কি ঘটা উচিত তাহার নির্দেশ দিতে পারেন না।*

এইভাবে মনোবিজ্ঞান নৈতিক মানদণ্ডের সহিত সম্পর্করহিত বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে পারে না।

ঝ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics) : প্রাচীন গ্রীকগণ নীতিশাস্ত্রকে মূলশাস্ত্র ও রাজনীতিকে ইহার অংশমাত্র বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের নিকট রাজনৈতিক আদর্শ ছিল প্রধানত নৈতিক আদর্শ।

নীতিশাস্ত্র হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বতন্ত্রীকরণ : ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীর চিন্তাবীর মেকিয়াভেলিই (Machiavelli) হইলেন প্রথম রাজনীতিবিদ যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেন। ইংরাজ দার্শনিক হবস্‌ মেকিয়াভেলিকেই অনুসরণ করেন। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল এবং উভয়ের বিষয়বস্তু ও পরিধি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িল।

স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ : উভয়ের বিষয়বস্তু যে পরস্পর হইতে কতকটা পৃথক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নীতিশাস্ত্র মনের চিন্তা ও বাহ্যিক আচরণ উভয় লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণ লইয়া আলোচনা করে, মনের চিন্তার সংগে এই শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। উপরন্তু, মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান কারবার করে না; ইহার

পরিধি মাত্র মানুষের রাজনৈতিক আচরণের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিশেষে বলিতে পারা যায় যে, ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ রচিত হয়; রাষ্ট্রের নির্দেশ বা আইন রচিত হয় সুবিধা-অসুবিধার কথাও চিন্তা করিয়া। যাহা বেআইনী তাহাই দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে।

সম্পর্কের বিবরণ: এইভাবে নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও উভয় শাস্ত্র পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত নহে—রাজনৈতিক আদর্শকে কখনই নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত করা যায় না। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইল এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি নির্ধারিত হয় এবং গণ্ডির নির্ধারণে রাষ্ট্র সকল সময়ই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশে পরিচালিত হয়। দুর্নীতিমূলক কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র নাগরিকগণেব সত্তার উপলব্ধিতে সহায়তা করিতে পারে না।

এইজন্য অন্যতম আধুনিক লেখক অধ্যাপক আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলিয়াছেন: নীতিশাস্ত্রের ধারণা প্রতিফলিত না হইলে রাজনৈতিক মতবাদ অর্থহীন এবং রাজনৈতিক মতবাদ ব্যতিরেকে নৈতিক মতবাদ অসম্পূর্ণ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক। আজ যাহা নীতিশাস্ত্রের সূত্র হিসাবে প্রচলিত আছে, কাল তাহা আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের রাজনৈতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রও আবার অনেক সময় আইন প্রণয়ন দ্বারা কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। ফলে নীতিশাস্ত্রের রূপও পরিবর্তিত হয়। লর্ড অ্যাকটনের (Lord Acton) মতে, ইহাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য।

সুতরাং অ্যাক্টনের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় হইল রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ঔচিত্য-অনৌচিত্য।[১]

অবশ্য রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে মতামত যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ধারণা দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হইতে বাধ্য, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উপসংহার: তবুও উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় বলা যায়: চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রের কার্যাবলী নির্ধারিত হইবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সমন্বয়সাধনের জন্য নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র কখনই পরস্পর হইতে সম্পর্কচ্যুত হইতে পারিবে না। বর্তমানে উভয়ের মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ না থাকিলেও, নিকট সম্পর্ক আছে—চিরকালই থাকিবে।

---

১. "The great question is not what government prescribe, but what they ought to prescribe."

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত মানবীয় বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত—যথা, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র।

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানে মিশিয়া যায় নাই।

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পরের পরিপূরক।

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ট এবং দিন দিন ঘনিষ্টতর হইতেছে।

৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও সম্পর্কচ্যুত নহে।

অনুশীলনী

1. Define Political Science. Indicate the relation of Political Science to (a) Sociology, (b) History and Sociology, and (c) History and Economics.

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত (ক) সমাজবিজ্ঞান, (খ) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান এবং (গ) ইতিহাস ও অর্থবিজ্ঞার সম্পর্ক নির্দেশ কর।]

(২-৪ এবং ৬১-৬২, ৬১-৬৫, ৬৩-৬৭ পৃষ্ঠা)

2. "History without Political Science has no fruit, and Political Science without History has no root," Discuss the statement.

["রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল এবং ইতিহাস ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ভিত্তিহীন।" উক্তিটি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

[উত্তরের কাঠামো : উক্তিটি স্যার জন সিলীর। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে তুলনামূলক বিচারবিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করেন। অপরপক্ষে ইতিহাসের আলোচনার অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে রাজনৈতিক ইতিহাস—অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন, তাহাদের প্রসার ইত্যাদির আলোচনা ইতিহাসের অংগীভূত। সুতরাং ইতিহাসকে সম্যকভাবে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের উহাকে রাজনৈতিক দিক দিয়া আলোচনা করিতে হইবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিহাসের সমস্তটাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান নহে। অনুরূপভাবে সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই বর্তমান ইতিহাস নহে—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অংশ আছে যাহা কল্পনাপ্রসূত।... এবং ৬২-৬৫ পৃষ্ঠা]

৪ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র
(INDIVIDUAL, SOCIETY AND STATE)

> "*Society exists only where social beings 'behave' towards one another in ways determined by their recognition of one another.*" MacIver and Page

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. সমাজের প্রকৃতি ও মানব-সমাজের ভিত্তি কি
২ মানব-সমাজের উদ্ভব কিভাবে ঘটিয়াছে ?
৩. জাতীয় সমাজ কাহাকে বলে ?
৪. ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি ?
৫. কি অর্থে মানুষ সামাজিক জীব ?

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক আচার-আচরণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা দিন দিন গুরুত্ব লাভ করিতেছে।[১] বলা যায়, আজিকার দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology) পরস্পরের অংগীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনায় সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানের কিছুটা ধারণা লইয়া চলা অপরিহার্য।

সমাজ—প্রকৃতি (Society—Its Nature) : বলা হয়, যত্র জীব তত্র সমাজ—অর্থাৎ জীবের সাক্ষাৎ পাইলেই সমাজের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

দলবদ্ধতা : উক্তিটির অর্থ হইল দলবদ্ধতাই সমাজবদ্ধতা। অর্থ ছাড়াও উক্তিটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে : দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধভাবে ছাড়া জীব বাঁচিতে পারে না। সুতরাং যে-সকল জীব পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে তাহাদের সকলেরই সমাজ আছে—সমাজ গঠন মানুষের কোন কিছু একচেটিয়া ব্যাপার নয়। বস্তুত, প্রাণিতত্ত্ব ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যা হইতে জানা যায় যে অতীতে যে-সকল জীব দল বাঁধার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত তাহারা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাদের কংকাল ও জীবাশ্ম (fossil) জাদুঘরে রাখা আছে।[১]

দলবদ্ধতার ভিত্তি : দলবদ্ধতা বা সমাজবদ্ধতা গড়িয়া উঠে সমতা (likeness) এবং বিভিন্নতা (difference)—উভয়েরই ভিত্তিতে ("Society depends on difference as well as likeness." MacIver and Page)।

১. দলবদ্ধতা ব্যতিরেকে জীব যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না তাহাই নহে, পৃথিবীতে আসিতেও পারে না। কারণ, জীবন হইতেই এবং অন্যান্য জীবনের মধ্যেই জীবনের আগমন সম্ভব ("Life can arise only out of and in presence of other life")। সুতরাং যত্র জীব তত্র সমাজ। কিন্তু বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে যে-সকল জীবের মধ্যে সমাজ-চেতনা (social awareness)—অর্থাৎ দলবদ্ধতার সুবিধা সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ ঘনীভূত হইতে পারে নাই সেই সকল জীবই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

একই ধরনের জীব পরস্পরের সহিত মিলিত হয়—বিভিন্ন ধরনের জীব নহে। ফলে দেখা যায় যে সমজাতীয় পশুপক্ষীই দল বাঁধিয়া বাস করিতেছে। টিয়া পাখীর ঝাঁকের মধ্যে শালিক দেখা যায় না, নেকড়ের পালের মধ্যে শিয়াল থাকে না। এই জন্যই বলা হয়: একই জাতের পাখী ঝাঁক বাঁধে (Birds of a feather flock together)।

মানুষের সামাজিক সম্পর্কের জটিলতার কারণ: সুতরাং সমতার ভিত্তিতে মিলন এবং বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা হইল দলবদ্ধতার বা সংঘবদ্ধতার প্রকৃতি। মানুষের দলবদ্ধতা বা সমাজবদ্ধতার মধ্যে ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তবে পার্থক্য হইল যে, মানুষের মধ্যে সমতার প্রভূত প্রকারভেদ (variation) রহিয়াছে বলিয়া মানুষের সামাজিক সম্পর্কও (social relationships) বিশেষ জটিল, ইতরেতর জীবের মত সহজ সরল ও সীমাবদ্ধ নয়।

সামাজিক সম্পর্কের ধারণা: এই প্রসংগে 'সামাজিক সম্পর্ক' সম্বন্ধে ধারণার কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

সামাজিক সম্পর্ক বলিতে বুঝায় পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত সম্পর্ককে। এই সম্পর্ক কায়িক বা বাহ্য সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে-সম্পর্ক, আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে যে-সম্পর্ক, কালি ও কালির দোয়াতের মধ্যে যে-সম্পর্ক, রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে যে-সম্পর্ক তাহাকেই কায়িক বা বাহ্য সম্পর্ক বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি অপরের অস্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। এই চেতনা ব্যতীত কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সুতরাং দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীব যখন পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পরস্পরের প্রতি বিশেষ ধরনের ব্যবহারে অগ্রসর হয় তখন যে-সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহাকেই বলা হয় সামাজিক সম্পর্ক।

মানুষের সামাজিক সম্পর্কের অনির্ণেয় পরিধি: ইতরেতর জীবের মধ্যে পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে-চেতনা তাহা অতি সংকীর্ণ—উহা যৌনবৃত্তি, আহার্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার ব্যাপারে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাতেই (interdependence) সীমাবদ্ধ। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু ইহা ছাড়াও আছে উন্নত জীবনের জন্য আকাংক্ষা। এই আকাংক্ষাই মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে বিস্তৃততর ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত, মানুষের দেওয়া-নেওয়া (give-and-take)—পারস্পরিকতা (reciprocity) সীমাহীন বলিয়া তাহার সামাজিক সম্পর্কের পরিধিও একপ্রকার অনির্ণেয়।

সমাজের মার্ক্সবাদী বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা: মার্ক্সবাদীরা সমাজের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে, ইতিহাসের নির্দিষ্ট স্তরে পরস্পরের উপর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টিই হইল সমাজ। অর্থাৎ, উৎপাদনকার্য বা উৎপাদনের

জন্য শ্রমকার্য সম্পাদন করিতে গিয়া মানুষে-মানুষে প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক সম্পর্ক। এবং এই সামাজিক সম্পর্কের সূত্রে গ্রথিত জনসমষ্টিই হইল সমাজ। সুতরাং ইতিহাসের নির্দিষ্ট পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যে-সকল সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটে (social interactions) তাহাই হইল সমাজের গোড়ার কথা।

উৎপাদন-পদ্ধতি: সামাজিক সম্পর্ক বা সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া নির্ভর করে উৎপাদন-পদ্ধতির উপর।

উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি প্রধান দিক হইল উৎপাদন-শক্তি (the forces of production) ও উৎপাদন-সম্পর্ক (production relations)। উৎপাদন-শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং কুশলী ও অভিজ্ঞ শ্রমজীবী। অপরপক্ষে, উৎপাদন করিতে গিয়া মানুষে-মানুষে এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই হইল উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনকার্য সম্পাদনে মানুষ যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহা শুধু মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কই নয়, মানুষ উৎপাদনের উপায়সমূহের (the means of production)[১] মধ্যে সম্পর্কও বটে। এই সম্পর্ক নির্দিষ্ট করিয়া দেয় সম্পত্তির সম্পর্ক (property relations) এবং ইহার দ্বারাই নির্ধারিত হয় কিভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় ও বণ্টন হইবে।

সমাজ সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি: এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সকল প্রকারের সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার গোড়ায় রহিয়াছে উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থা। অর্থাৎ, কিভাবে দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় এবং উহাদের বিনিময়বণ্টন কিভাবে সম্পাদিত হয় তাহার দ্বারাই নির্ধারিত হয় সামাজিক সংগঠন। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদন-পদ্ধতিই—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক কাঠামো (economic stucture) ও সম্পত্তির সম্পর্ক (property relations)—নির্দিষ্ট করিয়া দেয় সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মানুষদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে (social interaction)। এই সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া লইয়া সমাজ গঠিত।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি বিবর্তিত হইয়াছে এবং উহার ফলে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার ও সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটিয়াছে। যেমন, আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা ন্যস্ত ছিল সমগ্র সমাজের হস্তে। ফলে সকলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সমভাবে ভোগদখল করিত, এবং এই সমভোগের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক।

আবার উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতি, শ্রমবিভাগের প্রসার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে সমাজ যখন শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িল তখন দেখা দিল শোষণ-

১. উৎপাদনের উপায়সমূহ বলিতে মাত্র উৎপাদনের যন্ত্রপাতিকেই বুঝায় না। যন্ত্রপাতি ছাড়া জমি, কারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদি সকলই উৎপাদন উপায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মূলক অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্কের সকল দিকই—যেমন ভাবাদর্শ ধর্ম কৃষ্টি মতাদর্শ সকলই—ঐ অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিল ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইল। যেমন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বিশেষভাবে সামাজিক (social), কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগদখল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, সমবেত প্রচেষ্টা ও শ্রমের ফলে দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় কিন্তু মুনাফা ভোগ করে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী। এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে ঘিরিয়াই মানুষে-মানুষে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। মানুষের আশা-আকাংক্ষা, ভাবাবেগ, তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহ প্রভৃতি এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হয়।

সুতরাং মার্ক্সবাদীরা সমাজের সংজ্ঞা নির্দেশ এইভাবে করেন :

সংজ্ঞা : সমাজ হইল নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে সংগঠিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীসমূহের অপেক্ষাকৃতভাবে স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক যাহা আইন, রীতিনীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত ও বলবৎযোগ্য। এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক বিবর্তনের আপেক্ষিক এবং মানুষের অগ্রগতির পথে নির্দিষ্ট ধাপ।[১]

মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভংগির সারমর্ম : উপরি-উক্ত দৃষ্টিভংগির আলোচনার সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায় : ভাববাদীদের (Idealists) মত ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে মানুষের সহজাত সমাজবোধ (instinctive social consciousness) হইতেই সমাজের উদ্ভব হইয়াছে এবং সমপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও সহযোগিতা হইল স্বাভাবিক প্রকৃতি (natural instinct)। এই স্বাভাবিক বা সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। গ্রহণযোগ্য বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হইল : প্রয়োজনের তাগিদে—খাদ্য পরিচ্ছদ ও আশ্রয় অনুসন্ধানে এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে—অতি আদিম যুগ হইতেই সংঘবদ্ধভাবে প্রকৃতির সংগে লড়িয়াছে। ক্রমশ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, উৎপাদনের নিত্য নূতন উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছে, বুদ্ধিমত্তার বিকাশসাধন করিয়াছে এবং ভাষাবিদ্যা-কলা-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এ-সকল সম্ভব করিয়াছে সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা—সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই মানুষ সমাজ ও সভ্যতাকে ক্রমবিকশিত করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং সমাজের মধ্য দিয়াই মানুষের সামাজিক চেতনার উদ্ভব ঘটিয়াছে।[২] অন্তর্নিহিত সমাজচেতনার ফলে নহে।

---

১. "Society is a relatively stable system of social connections and relations of large groups of people, backed by force of law, custom, traditions, etc., formed in historical development, based on a certain mode of production and appearing as a stage in the progressive development of man." G. Osipov : *Sociology* (Progress Publishers, Moscow)

২. "Social existence does not depend on social consciousness but social consciousness follows from social existence." Marx

সম্পর্কের বিবর্তনশীলতা : অতএব, উৎপাদনব্যপদেশে মানুষে-মানুষে যে-সম্পর্কাদি গড়িয়া উঠে তাহাই হইল সামাজিক সম্পর্ক এবং এই সামাজিক সম্পর্ক লইয়াই গঠিত হয় সমাজ। সামাজিক সম্পর্ক কোন অপরিবর্তনশীল বিষয় নয়।

মানব-বিবর্তন এবং সমাজের উদ্ভব (Evolution of Man and Origin of Society) : মানুষ ও সমাজের বিবর্তন একদিকে চমকপ্রদ অপরদিকে তেমনি জটিল এবং দীর্ঘও বটে।

মানুষের আগমন সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা : মানুষের আগমন কিভাবে ঘটিল কিভাবে যে সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য কোথায়—এই সকল প্রশ্ন লইয়া দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা চলিয়া আসিতেছিল। যেমন, মানুষের আগমন সম্পর্কে এক সময় সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ বাইবেলের (Old Testament) উপাখ্যানে বিশ্বাস করিত। এই উপাখ্যান অনুসারে ঈশ্বর প্রথম পুরুষ আদম (Adam) এবং প্রথম নারী ঈভকে স্বর্গোদ্যানে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শয়তানের (Satan) প্রলোভনে আদম ও ঈভের পতন ঘটে। স্বর্গ হইতে পতনের পর তাহারা পৃথিবীতে বসবাস করিতে থাকে এবং তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া উদ্ভব ঘটে মানবজাতির।

ডারউইন : বাইবেলের এই উপাখ্যানের বিরোধিতা করিয়া ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) তাঁহার 'Origin of Species by Natural Selection' (1859) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে মানুষ আসিয়াছে বহুদিনের বিবর্তনের ধারা বাহিয়া—দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে। হঠাৎ একদিন খেয়ালের বশে ঈশ্বর মানবমানবী সৃষ্টি করেন নাই এবং আর একদিন শয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হওয়ার দরুন তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িতও করেন নাই।

মানব-বিবর্তনের ইতিহাস : সুতরাং মানুষের আগমনের ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে জীবজগতের বিবর্তনের মধ্যে, এবং এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে মানুষের সর্বশেষ পূর্বপুরুষ ছিল এক উন্নত ধরনের বানরজাতীয় জীব (anthropoid ape)।

বানরজাতীয় জীব হইতে মানুষে পরিণত হইয়া যখন সে গাছ হইতে নামিয়া আসিল তখন সে ছিল অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল। চারিদিকে তাহার ছিল প্রতিকূল পরিবেশ। এই প্রতিকূল পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখান যায় : (ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (the physical environment), এবং (খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ (the economic environment)। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক দিয়া যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত প্লাবন ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতির সংগে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের বাঁচিতে হইত, তেমনি আবার অধিকতর শক্তিশালী জীবজন্তুর হাত হইতেও নিজেকে রক্ষা করিতে হইত।

ক্রমশ মানুষ প্রকৃতির সংগে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে শিখিল[১], এবং তাহার পক্ষে খাদ্যাহরণ-পদ্ধতি কতকটা সহজতর হইল। যখন সে খাদ্যাহরণ ও আক্রমণ প্রতিরোধে হাত দুইটি ঠিকমত ব্যবহার করিতে শিখিল তখন সে 'যন্ত্রপাতি-ব্যবহারকারী (tool-using) জীবে' পরিণত হইল এবং তাহার শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইল।

কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ আগুনের ব্যবহার এবং আগুনের সাহায্যে উন্নত ধরনের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেও শিখিল। ফলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপকতর হইল। এইভাবে মানুষের সৃজন-ক্ষমতাই—তাহার সচেতনতা তাহাকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়া দিল। অন্যান্য জীবও আত্মরক্ষা করে—বাসা বাঁধে, কিন্তু সচেতনভাবে নয়—অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া।

সংঘবদ্ধতা : আদিম যুগ হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধ। ইহার মূলে আছে সমবেত প্রচেষ্টার (collective effort) প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি। সমবেত কাষ করিতে হইলে ভাবের আদানপ্রদান অপরিহার্য। ইহা হইতেই গড়িয়া উঠে ভাষা। ভাষা নিজেদের মধ্যে মাত্র ভাব-বিনিময়ের সুযোগই প্রদান করে না, ইহা পুরুষানুক্রমে অভিজ্ঞতা জ্ঞান-কৃষ্টি প্রভৃতি বহিয়া লইয়া যায়।[২] অতএব, ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন জীবন গঠনের প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ফলে সমাজ ও সভ্যতা হইয়াছে সমৃদ্ধ এবং গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাকে অভিহিত করা হয় সংস্কৃতি বলিয়া। এককথায় মানুষের ভাষা হইল তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারক ও বাহক, এবং ফলে সচেতন জীবনযাত্রার উপাদান।

ইতরেতর জীব হইতে মানুষের পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, পশু হইতে মানুষের পার্থক্য হইল চারিটি বিষয়ে : (১) উদ্দেশ্যমূলক শ্রমকার্য (purposive labour activity), (২) সামাজিক সংগঠন, (৩) সচেতনতা (consciousness) এবং (৪) ভাষা (language)।[৩]

১. অন্যান্য অনেক জীবও প্রকৃতির সংগে খাপ খাওয়াইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারে তাহাদের সহিত মানুষের পার্থক্য হইল দুই দিক দিয়া· মানুষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করে এবং মানুষ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের সহিত মোকাবিলা করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন এই মোকাবিলারই তাৎপর্য।

২. "Language is the vehicle for the transmission of the social heritage of experience , by its means experience—the results of trials of and errors, what may happen and what to do—is collected and transmitted." Gordon Childe : *What Happened in History*

৩. "Labour, social organisation, language, consciousness, are thus the distinctive characteristics of man, inseparably linked each with the others and naturally determining one another." E. Mendel : *Marxist Economic Theory*

সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ : জীবনধারণের তাগিদে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে শ্রমকার্যে লিপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং এই সমবেত শ্রমের ফলে মানুষের উপরি-উক্ত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদনের প্রয়োজনে সে প্রকৃতিকে (nature) যেমন পরিবর্তিত করে, তেমনি নিজ প্রকৃতিরও পরিবর্তন-সাধন করে।

সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদন করিয়া মানুষ একে অপরাপরের সংগে স্থাপন করে সামাজিক সম্পর্ক। বিশেষ ক্ষেত্রে এই সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টিই হইল সংশ্লিষ্ট মানব সমাজ।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারাই সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয় এবং গড়িয়া উঠে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন (socio-economic formations) যাহা নির্ধারণ করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক।

মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ (Evolution of Human Society) : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সঠিক অনুধাবন করিতে হইলে মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ, সমাজ ক্রমবিকাশমান বলিয়া এই সম্পর্কও বিবর্তনশীল।

বর্তমান অধ্যায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে, এবং পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করিয়া দেখা হইবে যে, উৎপাদন-শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদন-সম্পর্কের (production relations) ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ কিভাবে বিবর্তিত হয় এবং ঐ বিবর্তনে রাষ্ট্রেরই বা ভূমিকা কি।

ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : প্রথম পর্যায়ে মানব-সমাজ কি রূপ গ্রহণ করিয়াছিল—পরিবার না গোষ্ঠী—সে-সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।

প্রাচীন লেখকগণের মতে, প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল পরিবার (family) এবং পরে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া ও বিভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিল দল বা গোষ্ঠীর (clan)। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানিগণ কিন্তু বলেন, মানুষ প্রথম হইতে দল বা গোষ্ঠীতেই সংঘবদ্ধ ছিল এবং পরে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (private property) উদ্ভবের সংগে সৃষ্টি হইয়াছিল পারিবারিক সংগঠনের। আধুনিক লেখকগণের এই মত মানিয়া লইয়াই নিম্নে সমাজজীবনের ক্রমবিকাশের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

প্রথম স্তর—সমভোগী সমাজ : মানব-সমাজের প্রথম যুগকে পূর্বোক্ত (৭৬ পৃষ্ঠা) খাদ্যাহরণের যুগ (foodgathering stage) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই অবস্থায় জীবনসংগ্রাম (struggle for survival) যে অতি কঠোর ছিল তাহা

আমরা দেখিয়াছি (৭৫ পৃষ্ঠা)। তবে সমাজ ছিল সমভোগী (communistic), যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহা গোষ্ঠীভুক্ত সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত। কেহ নিজের জন্ম কিছুই সঞ্চয় করিত না।

আবার ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বলিয়া কিছু ছিল না—সকল দ্রব্যই ছিল গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পত্তি (collective wealth)।

পরিশেষে তখন পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই। ফলে শিশুর প্রতিপালন ছিল গোষ্ঠীভুক্ত সকলের দায়িত্ব।

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি ছিল গোষ্ঠীর অংগীভূত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) বা গোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া থাকিবার প্রশ্ন কিছু ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল পূর্ণ সাম্য এবং প্রকৃত গণতন্ত্র। সকলে সমান ভোগ করিত এবং গোষ্ঠী-জীবন পরিচালনায় অল্পবিস্তর সকলেরই মতামত গ্রহণ করা হইত।

দ্বিতীয় স্তর—পশুপালক সমাজ: পরবর্তী যুগের সূচনা হইল অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে, যে-পরিবর্তনকে অর্থনৈতিক বিপ্লব (economic revolution) বলিয়াও অভিহিত করা যায়। ইহা সংঘটিত হয় প্রধানত দুইটি আবিষ্কারের ফলে: (ক) পশুপালন এবং (গ) উদ্ভিদপালন বা কৃষিকার্য। পশুপালনের ফলে গড়িয়া উঠিল পশুপালক সমাজ।

অনেকের মতে, এই পশুপালক সমাজের মধ্যেই প্রথম ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয়—পালিত পশুর সম্পর্কেই মানুষ প্রথম বলিতে শিখে: "এগুলি আমার, বাকিগুলি অপরের।"

তৃতীয় স্তর—খাদ্যোৎপাদন জীবন: এই আমার ও অপরের মধ্যে পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে উদ্ভিদপালন বা কৃষিকার্য সুরু হইলে। কৃষিকার্য আবিষ্কারের ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিয়া খাদ্যের জন্ম অদৃষ্ট-নির্ভরশীলতা হইতে নিজেকে অনেকাংশে মুক্ত করিল। তখন খাদ্যাহরণ-জীবন (food-gathering life) মূলত খাদ্যোৎপাদন-জীবনে (food-producing life) রূপান্তরিত হইল। মানুষ তখন ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করিল, এবং ক্রমে গড়িয়া উঠিল গ্রাম-ব্যবস্থা।

গ্রামীণ সমাজে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিল, এবং স্বাভাবিকভাবেই হইল দ্রব্য-বিনিময় (barter)। ক্রমে বিনিময়কে কেন্দ্র করিয়া বাজার এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল নগর (city)।

ধনবৈষম্য বৃদ্ধি ও আইন: শ্রমবিভাগ ও দ্রব্য-বিনিময়ের উদ্ভবের ফলে ধনবৈষম্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তখন সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হইল চুরিজুয়াচুরির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়মকানুন প্রণয়নের। পরবর্তী যুগে এই নিয়মকানুনই 'আইনে' (Law) পরিণত হয়।

চতুর্থ স্তর—উপজাতি : এইভাবে শ্রমবিভাগ, বিনিময়, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সমাজ কতকটা সুসংগঠিত গোষ্ঠীকে উপজাতি (tribe) আখ্যা দেওয়া হয়। উপজাতিকে পশুপালক যাযাবর জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে উপজাতি আক্রমণ করিতেও শিখিল, যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইল উপজাতীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার যুদ্ধের ফলে বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির লোকদের দাসে পরিণত করিল এবং মাঠেঘাটে খাটাইয়া শোষণ করিতে লাগিল। এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজে ধনীদরিদ্রের সংঘাতকে সীমাবদ্ধ এবং শোষণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল বলপ্রয়োগের বিশেষ প্রতিষ্ঠানের। এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানই হইল রাষ্ট্র।

বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে :

যুদ্ধনায়ক. উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন উদ্ভব হইল যুদ্ধনায়কদের। পরবর্তীকালে তাঁহারা রাজপদ অধিকার করিয়া বসিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে বলা হয় যে, রাজার জন্ম হইল যুদ্ধের ফলে (War begot the King)।

সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব : যুদ্ধের ফলে রাজার জন্ম হইলেও রাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের সাহায্যও লওয়া হইয়াছিল। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের (Divine Origin Theory) সাহায্যে—অর্থাৎ রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজার আদেশ ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ, এইরূপ ধারণা প্রচার করিয়া সমাজে সংহতি আনয়ন করা হইয়াছিল। এইভাবে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

আজিকার দিনের সমাজ ও রাষ্ট্র : তারপর বহু ও বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—যে-অবস্থায় সমাজকে বলা হয় জাতীয় সমাজ (National Society) এবং রাষ্ট্রকে বলা হয় জাতীয় রাষ্ট্র (National State)। এই জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় সমাজ সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে আরও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই বিবর্তনকে অবশ্য রাষ্ট্রেরই বিবর্তন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কারণ উদ্ভবের পর বিবর্তনশীল রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া সমাজও ক্রমবিকশিত হইয়া জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে।

রাষ্ট্রের বিবর্তন (The Evolution of the State):

মার্ক্সবাদীদের মতে, প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যে রাষ্ট্র বলিয়া কোন কিছু ছিল না। পরে সমাজে শ্রমবিভাগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসত্ব প্রথার উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রেরও উদ্ভব ঘটিল।

ক। উপজাতীয় রাষ্ট্র: প্রথম রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হইল দাস-রাষ্ট্র (slave-State)। এই দাস-রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকারভেদ ছিল। যাহা হউক, দাসত্বপ্রথা এবং সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের ফলে উপজাতীয় স্তরেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। অন্যভাবে বলা যায় উপজাতীয় ইউনিয়নগুলি (tribal unions) ছিল প্রাচীনতম রাষ্ট্র।[১]

খ। নদী-উপত্যকা সাম্রাজ্য: উপজাতীয় রাষ্ট্রের পরবর্তী স্তর হইল সাম্রাজ্য। প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয় প্রাচ্য দেশে এবং নীল ইউফ্রেটিস হোয়াংহো ইয়াসিং প্রভৃতি নদী-উপত্যকায়। এইজন্য এই সকল সাম্রাজ্যকে নদী-উপত্যকা সাম্রাজ্যও (river-valley empires) বলা হয়। সাম্রাজ্যের বিপুল জনসংখ্যা এবং প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দাসশ্রেণীর (servile class) সৃষ্টি হয় এবং ইহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতে থাকে সামাজিক বৈষম্য, বর্ণভেদ প্রথা ও স্বৈরাচারিতা। ধর্ম (Religion) তখন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ফলে উদ্ভব হয় পুরোহিতশ্রেণীর।

অপরদিকে আবার যুদ্ধনায়কদের মধ্যে পর্যায়ের সূচনা হয় এবং শেষে একজন যুদ্ধনায়ক বা রাজা 'সম্রাট' বা 'রাজচক্রবর্তী' বলিয়া গণ্য হন। মধ্যে মধ্যে অবশ্য রাজা বা সম্রাটের স্বৈরাচারিতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিধিশাস্ত্র-প্রণেতৃবর্গ রাজধর্মের[২] নীতি ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। মনুসংহিতা যাজ্ঞবাল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি অনেকাংশে এই রাজধর্মেরই ব্যাখ্যা।

গ। নগর-রাষ্ট্র: একদিকে প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন নদী-উপত্যকায় যেমন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে তেমনি ইয়োরোপের সমুদ্রোপকূলে নগর-রাষ্ট্রেরও (city-states) পত্তন হইতেছিল। নগর-রাষ্ট্র ব্যবস্থা (polity)[৩] চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় গ্রীসে।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্র—বৈশিষ্ট্য: স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল পরস্পরের অংগীভূত। এইজন্য গ্রীক নগর-রাষ্ট্রকে অনেকে সমাজ-রাষ্ট্র (society-state) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গ্রীক সমাজ-রাষ্ট্রেই প্রথমে নাগরিকতার ধারণা পরিস্ফুট হয়, তবে এই নাগরিকতা ছিল বিশেষ সীমাবদ্ধ—উহাতে ক্রীতদাস ও বিদেশীয়দের কোন অধিকার ছিল না এবং ক্রীতদাসও ছিল অসংখ্য। সুতরাং স্বাতন্ত্র্যবাদী, স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল অনেকাংশে ক্রীতদাসভিত্তিক।

১. "The tribal unions were the earliest form of the state, and most slave states went through this stage." *An Outline of Social Development* (Progress Publishers, Moscow)

২. রাজধর্ম—রাজার ধর্ম—Duties of Kings

৩. এই polity হইতেও politics বা রাজনীতি (বা রাষ্ট্রনীতি) শব্দটি উদ্ভূত হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, দাস সমাজ ও স্বাধীন সমাজের সংমিশ্রণই গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের সমাজ-ব্যবস্থার মৌল প্রকৃতি।

ঘ। **রোমক সাম্রাজ্য**: খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার (খ্রী: পূ: ৩৩৬-৩২৩) প্রাচ্য দেশসমূহের অনুসরণে ইয়োরোপে প্রথমে সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য অবশ্য প্রাচ্য দেশেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আলেকজেণ্ডারের সাম্রাজ্য স্থায়ী না হইলেও ইহার উত্তরাধিকার গিয়া বর্তায় রোমে। একটি নগর-রাষ্ট্র হিসাবে উদ্ভূত হইলেও রোম ক্রমশ বিভিন্ন মহাদেশে পরিব্যপ্ত এক দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এইজন্য ইহাকে বিশ্ব-সাম্রাজ্যও (world empire) বলা হয়।

সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটিলে রোম নগর-রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (constitution) ভাঙিয়া পড়ে। রোমক গণতন্ত্র তখন রাজধানী রোমে নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যিক নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক: রাজধানী রোম হইতে অবশ্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সামাজিক জীবনে বিশেষ হাত দেওয়া হইত না।[1] তবে শাসনক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীভূত (centralised); ফলে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রোমের দান: গ্রীসের সহিত তুলনা করিয়া হেগেল বলিয়াছেন: "গ্রীস ঐক্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করিয়াছিল; রোম গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়াই ঐক্য-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল" (Greece had developed democracy without unity; Rome secured unity without democrcy)।

রোমক সাম্রাজ্য সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে পারে নাই, কিন্তু সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিকের সম্প্রসারণ করিয়াছিল। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রোমের অন্যান্য দান ছিল ব্যাপক ভূখণ্ডের মধ্যে ঐক্য, একীভূত বিধি-ব্যবস্থা (uniform legal system)।

ঙ। **সামন্ততান্ত্রিক যুগ**: রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর পশ্চিম ইয়োরোপে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে, এবং উহার স্থলে ফিরিয়া আসে আদিম সমাজ-ব্যবস্থা (primitive social system)। ইহার পরের যুগকে বলা হয় মধ্য যুগ (Middle Ages), যে-যুগে ছিল রাষ্ট্রের পরিবর্তে খ্রীষ্টধর্ম-প্রতিষ্ঠানের (Church) প্রাধান্য। ইহার পর নবজাগরণ (Renaissance) এবং জার্মান

১. রোমক শাসক পন্টিয়াস পাইলেটের আদেশে যীশু খ্রীষ্টকে যে-ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় তাহা স্থানীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের দাবিতেই করা হয়, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ (blasphemy)।

ধর্মসংস্কারের[১] ফলে যে-নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ইতিহাসে তাহাই 'ফিউডাল' (Feudal) বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অভিহিত।

ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য: সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হইল জমির মালিকানা—জমির মালিকানার পরিমাণ অনুসারেই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ভূম্যধিকারী এবং তাহার অধীন সামন্তবর্গের (vassals) ব্যক্তিগত আনুগত্যই হইল ফিউডাল-ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য।

ইহার ফলে সাধারণ লোক ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের (political authority) মধ্যে সম্পর্ক হইয়া দাঁড়ায় পরোক্ষ। রাষ্ট্রের পরিবর্তে কর্তৃত্ব (authority) বর্তায় গিয়া ভূম্যধিকারীতে। নিজ নিজ এলাকায় ভূম্যধিকারীদের ইচ্ছা ও আদেশই হইয়া দাঁড়ায় আইন।

এরূপ অবস্থায় সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিলুপ্ত না হইয়া পারে না।

চ। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব: মধ্য যুগের শেষের দিকে ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে নবোদ্ভূত বণিক সম্প্রদায়ের সংগে ভূম্যধিকারীদের বাধে সংঘর্ষ, এবং ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে আজিকার দিনের জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State)।

জাতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য: জাতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল জাতীয় ভাব (national spirit), ইহা কোন বহিঃকর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং ফলে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়া সকল রাষ্ট্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন।

এইরূপ জাতীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্গত স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সকল সংঘের এবং প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিকে জাতীয় সমাজ বলা হয়। রাষ্ট্র ও জাতীয় সমাজের মধ্যে সম্পর্ক অংগাংগি না হইলেও বিশেষ ঘনিষ্ঠ।

জাতীয় সমাজের গঠন (Structure of National Society): সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় সমাজ (ক) বিভিন্ন সংঘ (associations) এবং (খ) প্রতিষ্ঠানের (institutions) সমন্বয়ে গঠিত। সম্প্রদায়ের ধারণাও ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ক। সংঘ (Association): সংঘ বলিতে বুঝায় পরস্পরের সমবায়ে এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত গঠিত সংস্থাকে ('a group organised for the pursuit of *an interest or a group of interests* in common')—যথা, ধর্ম সংঘ, শ্রমিক সংঘ (trade union), বণিক সংঘ (merchants association or chamber of commerce), সাহিত্য সংসদ, জ্ঞানবিজ্ঞান পরিষদ,

---

১. ইতিহাসে ইহা 'Teutonic Renaissance' নামে অভিহিত, এবং মূল নবজাগরণকে বলা হয় Italian Renaissance। জার্মান ধর্মসংস্কার বা Teutonic Renaissance-এর প্রধান ঋত্বিক ছিলেন মার্টিন লুথার।

ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, সংঘ ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—বিভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে। ইহা ছাড়াও আছে রাষ্ট্র (State) বা রাজনৈতিক সংগঠন।

রাষ্ট্র ও সংঘ: মানুষ স্বেচ্ছায় সংঘ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বেচ্ছায় উহাদের সদস্য হয়। রাষ্ট্র কিন্তু মানুষের আবশ্যিক সংগঠন (compulsory association)—মানুষ রাষ্ট্রের সভ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দিক দিয়া রাষ্ট্রকে সংঘ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

উপরন্তু, সীমাবদ্ধ সাধারণ স্বার্থ (limited common interest) লইয়া সংঘের কাজকারবার, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কখনই সীমাবদ্ধ নহে।

তবুও কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘের চরিত্র (associational character) যে একবারে নাই তাহা বলা যায় না। রাষ্ট্র ব্যাপক স্বার্থসাধনের এজেন্সি' হইলেও, এজেন্সি মাত্র। বলা যায়, রাষ্ট্র সমগ্র সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ-এজেন্সি।

খ। প্রতিষ্ঠান (Institutions): প্রতিষ্ঠান বলিতে বুঝায় বিধিনিয়মের উপর স্থাপিত সামাজিক ব্যবস্থাসমূহকে—যথা, বিবাহ, ধর্মাচরণ, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটিই বিধিনিয়মের উপর স্থাপিত। যেমন, কে বা কাহারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, অথবা কাহাকে বিবাহ করা যাইবে বা যাইবে না সে-সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেরই বিধিনিয়ম থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, সংঘজীবনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে যে-সকল সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহার-পদ্ধতি বর্তমান থাকে ('established conditions of procedure of group activity') তাহাদিগকেই প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য: এই প্রসংগে সংঘ (associations) ও প্রতিষ্ঠানের (institutions) মধ্যে পার্থক্যের আরও কিছুটা আলোচনা করা যাইতে পারে। মানুষ যেমন সংঘ স্থাপন করে তেমনি সাধারণ স্বার্থসাধনের জন্য এবং সমাজ বা সংঘভুক্ত বিভিন্ন সভ্যের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী বা পদ্ধতিও গড়িয়া তুলে। এই নিয়মাবলী ও পদ্ধতিগুলিকেই বলা হয় প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং প্রত্যেক সংঘই প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, কারণ প্রত্যেক সংঘেরই স্বার্থ হইল স্বতন্ত্র।

অতএব, যখন আমরা কোন সংগঠিত দলীয় সংস্থার (an organised group) কল্পনা করি তখন উহা হইল সংঘ; আর যখন কোন কার্যপদ্ধতির (form of procedure) উল্লেখ করি তখন উহা হইল প্রতিষ্ঠান। এই দিক দিয়া পরিবার অন্যতম সংঘ এবং বিবাহ হইল অন্যতম প্রতিষ্ঠান; খ্রীষ্টধর্ম সংঘ (Church) অন্যতম সংঘ এবং উহার উপাসনা-পদ্ধতি ইত্যাদি হইল প্রতিষ্ঠান।

গ। সম্প্রদায় (Community): যখন ক্ষুদ্রবৃহৎ কোন গোষ্ঠী সাধারণ জীবন-পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করিয়া একসংগে বসবাস করে তখন ঐ গোষ্ঠী বা সংস্থাকে বলা হয় সম্প্রদায়। সংঘ হইতে সম্প্রদায়ের পার্থক্য হইল যে সংঘের বেলায় বিশেষ

স্বার্থ (particular interest) সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমগ্র জীবনই ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তির সামগ্রিক সামাজিক সম্বন্ধ লইয়াই সম্প্রদায়ের পরিধি রচিত, এবং উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির পূর্ণ জীবনযাপন সম্ভব করা।

দ্বিবিধ ভিত্তি: সম্প্রদায়ের ভিত্তি দ্বিবিধ : একই ভূখণ্ডে বসবাস (locality) এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা (community interest)।

ইহার পর প্রয়োজন সুসম্বদ্ধতা—সামাজিক সুসম্বদ্ধতা (social coherence)। অর্থাৎ, একই ভূখণ্ডবাসী জনগোষ্ঠী যখন পরস্পরের সংগে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক সভ্য যখন সাধারণ জীবনপদ্ধতির অংশীদার হয় এবং জীবনের মূল্য ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনই জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অতএব, সংক্ষেপে যৌথ বসবাসের ক্ষেত্রকেই (area of common living) সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতিই সম্প্রদায়ের মূর্ত রূপ: বর্তমান দিনে জাতিই (Nation) সম্প্রদায়ের মূর্ত রূপ। তবে জাতির মধ্যে সম্প্রদায়-চেতনা (community-consciousness) ভালভাবে দানা নাও বাঁধিতে পারে। তখন প্রয়োজন হয় অনুশীলন দ্বারা এই চেতনা বৃদ্ধি করিবার।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Individul and Society):

সমাজের পর্যালোচনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক। এই সম্পর্কের বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে : ব্যক্তি (individual) বলিতে কি বুঝায় ? প্রশ্নটির তাৎপর্য অনুধাবন করিবার জন্য আর একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে : আমি কে ? ভারতের বাহিরে কোন দেশে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব, আমি একজন ভারতীয় এবং ভারতের অন্য কোন অঞ্চল হইলে বলিব আমি একজন বাঙালী। পেশার দিক হইতে আমি একজন শিক্ষক বা ডাক্তার বা অফিস-কর্মচারী বা কারখানার শ্রমিক। বর্ণের দিক হইতে আমি একজন ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ বা বৈদ্য অথবা অন্য কোন বর্ণ। আমার এই যে পরিচয় ইহার প্রত্যেকটিই আমার সামাজিক পরিচয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে আমার পরিচয় নহে।

বস্তুত, সমাজভুক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় কিছু নাই বলিলেই চলে। মাত্র রবিন্‌সন ক্রুশোর ন্যায় সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র পরিচয় আছে—সে রবিন্‌সন ক্রুশো ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক: শুধু যে সমাজের পরিচয়েই ব্যক্তির পরিচয় তাহা নহে, ব্যক্তিজীবনও সমাজজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আমি ভারতীয়, বাঙালী, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। সুতরাং আমার জীবন, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ ভারতীয় হিসাবে, বাঙালী হিসাবে, মধ্যবিত্ত হিসাবে কিছু-না-কিছু পরিমাণে গড়িয়া উঠিবেই। বাঙালী হিসাবেই আমার কথা ধরা যাউক। আমার খাদ্য বেশভূষা শিক্ষাদীক্ষা আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি মোটামুটি বাঙালীরই জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে গৃহীত। অপরদিকে আবার আমার আচার-আচরণ দ্বারা আমার প্রতিবেশী প্রভাবান্বিত হয় এবং ফলে পরোক্ষভাবে বাঙালী সমাজও কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়। আমি যদি বাঙালীর খাদ্য ছাড়িয়া অন্য খাদ্যের দিকে ঝুঁকি তবে আমার দেখাদেখি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ঐ খাদ্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে।

মোটকথা, ব্যক্তির প্রত্যেকটি কার্যের ফলাফল কোন-না-কোনভাবে সমাজকে স্পর্শ করে বলিয়া এবং সমাজের পরিচয়েই ব্যক্তির পরিচয় বলিয়া ব্যক্তির সংগে সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকৃতি: এখন প্রশ্ন: এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঠিক কি প্রকৃতির? এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এইগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) আংগিক মতবাদ (Organic Theory) এবং (খ) যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory)।

ক। আংগিক মতবাদ (Organic Theory): ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আংগিক মতবাদের বক্তব্য হইল যে এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ অংগাংগি সম্পর্ক—অর্থাৎ সমাজের প্রকৃতি জীবদেহের ন্যায় এবং ব্যক্তি সমাজের অংগস্বরূপ। বলা হয় হস্তের সহিত সমগ্র দেহের যেরূপ সম্পর্ক, বৃক্ষপত্রের সহিত বৃক্ষের যেরূপ সম্পর্ক—ব্যক্তির সহিত সমাজেরও সেইরূপ সম্পর্ক।

আংগিক মতবাদের সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের মতে, মানুষ সামাজিক জীব (man is a social animal) এবং এই কারণে মাত্র সমাজের মধ্য দিয়াই সে তাহার জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। এই ধারণা অবশ্য এবরূপ অখণ্ডনীয়, কিন্তু ইহা হইতে পরবর্তী যুগে যে-আংগিক মতবাদের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে।

সমালোচনা: দেখা যায়, সমাজভুক্ত ব্যক্তি ও জীবের অংগপ্রত্যংগের মধ্যে তুলনায় বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্যুত করিলে ব্যক্তি বাঁচিতে পারে, কিন্তু হাত পা বা অন্য-কোন অংগকে দেহ হইতে ছিন্ন করিলে ঐ অংগ সংগে সংগেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, কোন অংগের পক্ষে একাধিক জীবদেহের সহিত যুক্ত থাকা অসম্ভব, মানুষ কিন্তু একাধিক সংঘের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে—এক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অপর আর এক সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

তৃতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির স্বার্থকে সমাজের স্বার্থের বিরোধী হইতে দেখা যায়, কিন্তু জীবের কোন অংগের স্বার্থ সমগ্র জীবদেহের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে না।

যেমন, খাদ্যসংকটের সময় খাদ্য মজুত রাখিয়া কালোবাজারে বেচিলে সমাজের ক্ষতি হইবে সত্য, কিন্তু ব্যবসায়ীদের যে লাভ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরদিকে কিন্তু কথামালার উপকথায় ন্যায় অংগপ্রত্যংগ যদি উদরের সহিত অসহযোগ করে তবে উদরের সংগে সকল অংগপ্রত্যংগই দুর্বল হইয়া পড়িবে।

উপসংহার: মোটকথা, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক অংগপ্রত্যংগ ও জীবদেহের মধ্যে সম্পর্কের সহিত কোনমতেই তুলনীয় নহে। সুতরাং আংগিক মতবাদকে ভ্রান্ত মতবাদ বলিয়া স্বচ্ছন্দেই অভিহিত করা চলে। তবে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করে বলিয়া সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়া এই মতবাদের যে কিছুটা মূল্য আছে তাহাও অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের প্রসংগে আংগিক মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

খ। যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic Theory): যান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে মানুষ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সমাজ স্থাপন করিয়াছে।

সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ কৃত্রিম—উহা মাত্র কয়েকটি উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত।

এই সকল উদ্দেশ্যের বাহিরে ব্যক্তির উপর সমাজের কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নাই, ব্যক্তিরও সমাজের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ: এই যান্ত্রিক মতবাদের বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সামাজিক চুক্তি মতবাদে (Social Contract Theory)। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, আদিম যুগে মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলেই সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। কেন আদিম মানুষ চুক্তি করিতে অগ্রসর হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে এই মতবাদের ব্যাখ্যাকারগণ একমত নহেন। কাহারও মতে, অরাজক জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিশৃংখলার মধ্যে বাস করিবার উদ্দেশ্যেই আদিম মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠন করিয়াছিল। কাহারও মতে আবার মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়া শুধু জীবনকেই নিরাপদ করিতে চাহে নাই, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনসম্পত্তির অধিকারও সংরক্ষিত করিতে চাহিয়াছিল।

সমালোচনা: মতবাদটির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে, ইহা ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় আইনানুমোদিত বুঝাপড়া বা পারস্পরিক অংগীকার। সুতরাং চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল আইনের। এই আইন অবশ্য সামাজিক বিধিনিয়মও হইতে পারে, আবার বিধিবদ্ধ (codified) রাষ্ট্রের আইনও হইতে পারে। মোটকথা, চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল কোন-না-কোন প্রকার আইনের। সামাজিক চুক্তি মতবাদে কিন্তু ইহা অস্বীকার করা হইয়াছে, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে সামাজিক বিধিনিয়ম গ্রহণ করিবার পূর্বেই মানুষ চুক্তি সম্পাদন

করিয়াছিল। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা অনুমান করা যায় না। সামাজিক বিধিনিয়ম গড়িয়া উঠিবার পূর্বে তাহাদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা জন্মিল কি করিয়া? আর যদি ধারণাই না জন্মিয়া থাকে তবে তাহাদের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের কথাই বা ভাবিল কি করিয়া? সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ যে ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা অনস্বীকার্য।

মানুষের প্রকৃতি ও বিবর্তন বিরোধী মতবাদ: সামাজিক চুক্তি মতবাদ মানুষের প্রকৃতি, বিবর্তনবাদ প্রকৃতিরও বিরোধী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে চুক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠনের পূর্বে মানুষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। ইহা কোনমতে সম্ভব নয়, কারণ দল বাঁধিয়া বাস করাই মানুষের স্বভাব—একা একা নয়।

বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ ধীরে ধীরে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সংঘবদ্ধভাবে বাস করিতে করিতে মানুষ নিজেকে পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়াছে; অপরদিকে আবার পরিবেশকেও নিজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এই বিবর্তনের এক অধ্যায়ে সে নিজেকে ব্যক্তি (individual) হিসাবে অনুভব করিয়াছে; তখনই সে সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে এবং সমাজকে তাহার ধ্যানধারণা অনুসারে গড়িয়া তুলিবার কথা ভাবিয়াছে বা প্রচেষ্টা করিয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের কিন্তু বক্তব্য হইল যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিবার পূর্বেই মানুষ ব্যক্তি হিসাবে সচেতন ছিল; এই ব্যক্তিজীবনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কৃত্রিম সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করিয়াছিল। সুতরাং মানুষ পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ সুরু করিল এবং ঐ পরামর্শের ফলস্বরূপ একদিন সমাজ গঠিত হইল।

এইরূপ ধারণা কোনমতেই গ্রহণীয় নয়। সংঘবদ্ধতা মানুষের স্বভাবগত—ব্যক্তি বা সমাজ কেহই কাহারও পূর্ববর্তী নহে। মানুষের এই সংঘবদ্ধতার ফলেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রেই আবার মানুষ সচেতনভাবে সমাজের রূপদানের প্রচেষ্টা করিয়াছে। এই দুই প্রকার শক্তির (forces) কার্যের ফলেই এবং দীর্ঘ বিবর্তনের ধারা বাহিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে আজিকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা—যে সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সম্প্রদায় বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক (True Relation between Individual and Society): দেখা গেল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের সন্ধান আংগিক মতবাদ বা যান্ত্রিক মতবাদ কোনটিতেই পাওয়া যায় না, কিন্তু আবার প্রকৃত সম্পর্কের সন্ধান এই দুই মতবাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই দুই মতবাদের মধ্যে এমন কয়েকটি বক্তব্য আছে যেগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিলেই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথার্থ ব্যাখ্যাটি সংক্ষেপে হইল এইরূপ:

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আংগিক সম্পর্কও নয়, আবার যান্ত্রিক সম্পর্কও নয়। ব্যক্তি সমাজের অংগীভূত বটে, কিন্তু কোন অংগ বা প্রত্যংগ নয়। স্বভাবজাত কারণে সংঘবদ্ধ হইয়াছে এবং সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদনের কলাকৌশল ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারসাধন করিয়াছে।

যখন হইতে সে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিল তখন হইতে মানুষ সচেতনভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করিল। এবং নিজের চিন্তাবিশ্বাস অনুসারে সমাজকে গড়িয়া তুলিতে প্রচেষ্টা করিতে লাগিল এবং সেই প্রচেষ্টা এখনও করিয়া চলিয়াছে। মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং এই প্রচেষ্টা করিয়া চলিবেই।

উপসংহার—ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক : বস্তুত, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সমাজ আগে কি ব্যক্তি আগে এ-বিতর্কের কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না। উভয়ই একসংগে জীবন সুরু করিয়াছে এবং উভয়ই ক্রমোন্নতির পথে একসংগে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না, উহারা পরস্পরের পরিপূরক। সমাজ ব্যতীত যেমন ব্যক্তির চিন্তা করা যায় না তেমনি আবার ব্যক্তি ছাড়াও সমাজের কথা চিন্তা করা যায় না।[১] মানুষ সমাজের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে এবং গোড়া হইতেই সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়াই সে গড়িয়া উঠে। সংক্ষেপে জন্ম হইতে ব্যক্তি সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী (A man is born to social heritage) হয়। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন তাহাকে ভাষা শিক্ষা দেন, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির সহিত পরিচয় করাইয়াও দেন। এখন ভাষা বা রীতিনীতি হইল সমাজের উপাদান। সুতরাং প্রথম হইতেই মানুষ সমাজ কর্তৃক প্রভাবিত হইতে থাকে।[২] অপরদিকে আবার সে সমাজকে সচেতনভাবে গড়িয়া তুলিবারও প্রচেষ্টা করে।

কি অর্থে মানুষ সামাজিক জীব (In What Sense Man is a Social Animal) : এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন যে, কি অর্থে মানুষ সামাজিক জীব। নচেৎ, মানুষ অবশ্যই কেন তাহার চিন্তাবিশ্বাস ধ্যানধারণা অনুসারে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করিবে—তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে না।

'মানুষ সামাজিক জীব'—উক্তিটি গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের। এ্যারিষ্টটল আরও বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি সমাজে বাস করে না হয় সে পশু, না-হয় দেবতা।[৩]

১. "Society and the individual are inseparable ; they are necessary and complementary to each other, not opposites." E. H. Carr : *What is History ?*

২. "Every human being at every stage ··· is born into a society and ··· is moulded by that society. Both language and environment help to determine the character of his thought...". E. H. Carr

৩. Man perfected by society is the best of animals. If he finds himself an individual who cannot live in society...he is a savage beast or a god." Aristotle

এ্যারিষ্টটলের এই উক্তিটির তাৎপর্য হইল যে মানুষ জন্ম হইতেই সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসে। অন্যভাবে বলা যায়, সে সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী (social heritage) হইয়াই জন্মায় এবং তাহার ব্যক্তিত্ব এই সামাজিক পরিবেশ দ্বারাই প্রভাবিত হয়। সে প্রথমে পরিবারের মাধ্যমে সামাজিক ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির সহিত পরিচিত হয়। পরে সে বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে আসে এবং নিজের জীবন গড়িয়া তুলিতে থাকে। অর্থাৎ, মানুষ শিক্ষাদীক্ষা, জীবনধারণ, সুযোগসুবিধা প্রভৃতি সকলের জন্যই সমাজের উপর নির্ভরশীল।

মোটকথা, সমাজ ব্যতীত, সামাজিক ঐতিহ্য ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে না—গড়িয়া উঠিতে পারে না।[১]

'মানুষ সমাজিক জীব'—ইহার প্রথম তাৎপর্য হইল ইহাই। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে সামাজিক পরিবেশ একদিকে যেমন মানুষকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ করিয়া দিতে পারে, অপরদিকে আবার তেমনি তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করিতেও পারে। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, 'মানুষ সামাজিক জীব' বলিতে বুঝানো হয় যে সংঘবদ্ধতাই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[২] প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সংঘবদ্ধতার ব্যাপারে মানুষে মানুষে প্রভূত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে কেহ বা তাহার গ্রাম বা নগরকেই সম্প্রদায় (community) বলিয়া গণ্য করিতে থাকে, কাহারও কাছে আবার তাহার সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তি সার্থক হইয়া উঠে সারা বিশ্বের মধ্যে।

বিশ্বমানব: যাঁহারা বিশ্বকে সম্প্রদায় এবং সমগ্র মানবজাতিকে তাঁহার সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগকে বিশ্বমানব (Universal Man) আখ্যা দেওয়া হয়।

এইরূপ বিশ্বমানবের সংখ্যা কিন্তু অত্যল্প। তাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ আখ্যাও দিয়া থাকি। যুগে যুগে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের গণ্ডি পরিবার গ্রাম বা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না, এই গণ্ডি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।

অসামাজিক সামাজিকতা: মানুষের প্রকৃতিকে জার্মান দার্শনিক কান্ট (Immanuel Kant) 'অসামাজিক সামাজিকতা' (unsocial sociableness) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝায় যে সামাজিকতা (sociableness)

১. "... without society, without the support of the social heritage, the individual personality does not and cannot come into being." MacIver and Page : *Society*

২. "Sociality is the defining characteristics of human nature." John Lewis *The Marxism of Marx.*

এবং দ্বন্দ্বপ্রীতি (pugnacity)—উভয়ই মানুষের প্রকৃতিগত। মানুষ যেমন একদিকে অপরের সহিত মিলিত হইতে চাহে, অপরদিকে তেমনি আবার অপরের সহিত কলহেও লিপ্ত হইতে চাহে। এই মিলনের আকাংক্ষা প্রকাশ পায় সহযোগিতার (co-operation) মধ্যে, আর কলহপ্রীতি প্রকাশ পায় অসহযোগ ও সংঘর্ষের (conflict) মধ্যে।[১]

সহযোগিতা ও সংঘর্ষ যে সকল সময় প্রত্যক্ষ তাহা নয়, উহারা পরোক্ষ রূপও ধারণ করে। যেমন, আমরা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া খেলাধূলা করি, বারোয়ারী পূজা করি, চোরডাকাতের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য পাড়ায় রক্ষিবাহিনী (defence party) গঠন করি তখন ঐ সহযোগিতা হইল প্রত্যক্ষ। কিন্তু যখন কলকারখানায় শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে দ্রব্য উৎপাদন করি, স্কুলকলেজে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করি তখন ঐ সহযোগিতা হইল পরোক্ষ। অনুরূপভাবে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে আমরা পরস্পরকে দোষারোপ করি, প্রতিবেশীর সংগে মামলামকদ্দমায় লিপ্ত হই, অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ করি তখন ঐ সংঘর্ষ হইল প্রত্যক্ষ। অপরদিকে আবার যখন অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই, একজনকে সমর্থন করিয়া অপর একজনের ক্ষতি করিবার প্রচেষ্টা করি তখন ঐ সংঘর্ষ সম্পূর্ণ পরোক্ষ।

সামাজিক উত্তরাধিকার: যাহা হউক, বলা হয় যে সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে মানব-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার এই সহযোগিতা ও

---

১. **মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ**: জন লিউস (John Lewis) প্রমুখ মার্ক্সবাদী ও অন্যান্য লেখক আছেন যাহারা মানুষ প্রকৃতিগতভাবে কলহপ্রবণ ও দ্বন্দ্বশীল এই তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। ইঁহারা মনে করেন যে তত্ত্বটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকদের অপপ্রচার।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকগণ প্রচার করেন যে মানুষের পূর্বপুরুষগণ ছিল আগ্রাসী ও হিংস্র পশু। সুতরাং মানুষ বংশপরম্পরায় এই প্রকৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং বলা হয় এই প্রকৃতি শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া মার্ক্সবাদিগণ বলেন যে মানুষ যখন পশুজীবন হইতে মানবজীবনে পদার্পণ করে তখন হইতেই সে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। মানুষের আসল প্রকৃতি সামাজিকতা (sociality)। এই সামাজিকতার দরুনই সে বিভিন্ন সভ্যতা বা কৃষ্টি গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল (malleable)। এই পরিবর্তনশীলতার প্রধান কারণ হইল তাহার পরিবেশ। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের প্রকৃতির প্রকারভেদ হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষকে প্রতিযোগিতামূলক, আগ্রাসী ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। এই ব্যবস্থার সমর্থকরাই প্রচার করিয়া চলিয়াছেন যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আত্মস্বার্থান্বেষী জীব, এই প্রবৃত্তি শাশ্বত ও চিরন্তন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে এই প্রবৃত্তি যদি শাশ্বতই হয় তাহা হইলে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ গড়িয়া উঠে কি করিয়া? ("If human nature is invariable, how then can it serve to explain the course of intellectual or social development of mankind"—Plekhanov)।

মোটকথা সামাজিকতাই হইল মানুষের প্রকৃত রূপ: মানুষের চরিত্র যদি ইহার ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সামাজিক পরিবেশই হইল এই ব্যতিক্রমের মূল কারণ। See John Lewis: *The Marxism of Marx*; John Lewis: *Man and Evolution*; and J.A.C. Brown: *The Evolution of Society*

সংঘবদ্ধতার সমন্বয়ে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে বলা হয় সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage)। সামাজিক উত্তরাধিকার ভাবভাষা জ্ঞানবিজ্ঞান আচার-আচরণ প্রভৃতি মানুষের যাহা কিছু গর্বের বস্তু সকলই লইয়া গঠিত। মানুষ এই উত্তরাধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করে এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়াই তাহার জীবন গড়িয়া উঠে। যে-সমাজের উত্তরাধিকার যত ঐশ্বর্যবান (rich) সে-সমাজে ব্যক্তির জীবনের বিকাশের সম্ভাবনাও তত বেশী।

'মানুষ সামাজিক জীব'—এই উক্তির দ্বারা মূলত এই সামাজিক উত্তরাধিকারেরই নির্দেশ করা হয়।

বলা হয়, সামাজিক উত্তরাধিকার ব্যতীত ব্যক্তি (individual) মানুষ হিসাবে তাহার জীবনকে বিকশিত করিতে সমর্থ হয় না। আরও বলা হয় যে, সমাজে—অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে—বাস না করিলে সে বাঁচিতেই পারে না। মানুষ যদি সংঘবদ্ধ না হইত তবে অতীতের অনেক জীবের মত বিলুপ্তই হইয়া যাইত—পৃথিবীতে 'মানুষ' বলিয়া কোন জীবের আগমন কোনদিনই ঘটিত না। 'মানুষ সামাজিক জীব'—উক্তিটির দ্বিতীয় তাৎপর্য হইল ইহাই।

দুইটি তাৎপর্য - পুনরাবৃত্তি : অতএব, মানুষ সামাজিক জীব বলিতে দুইটি জিনিস বুঝায় : (ক) সংঘবদ্ধতা মানুষের বাঁচার পক্ষে অপরিহার্য, এবং (খ) সামাজিক উত্তরাধিকার ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানুষের সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইতে পারে না।

স্মর্তব্য—অধ্যায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. সমাজের প্রকৃতির মূল কথা দলবদ্ধতা এবং মানব-সমাজের ভিত্তি হইল সমতা ও বিভিন্নতা উভয়ই।

২. মানব-সমাজের উদ্ভব ঘটিয়াছে দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে।

৩. জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠান লইয়াই হইল জাতীয় সমাজ।

৪. ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক হইল পরিপূরকতা। অর্থাৎ, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক।

৫. মানুষ সামাজিক জীব বলিতে নির্দেশ করা হয় সামাজিক উত্তরাধিকারকে।

অনুশীলনী

1. **How did man and society evolve ?**

[মানুষ ও সমাজ কিভাবে বিবর্তিত হইয়াছে ?] (৭৫-৭৯ পৃষ্ঠা)

2. **What is meant by the term 'Society' ? Explain the nature of human society.**

['সমাজ' বলিতে কি বুঝায় ? মানব-সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।] (৭১-৭২, ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা)

3. **Trace the evolution of human society.**

[মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের বিবরণ দাও।] (৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা)

4. Describe briefly the evolution of the State indicating its relationship with society of each stage.

[প্রত্যেক স্তরে সমাজের সংগে সম্পর্কের ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

(৭৯-৮২পৃষ্ঠা)

5. Define the term 'association' and distinguish it form (a) community and (b) social institution.

[সংঘের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সংঘের সহিত (ক) সম্প্রদায় এবং (খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য দেখাও।] (৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

6. Explain the significance of the statement, "Man is by nature a social animal." Indicate in this context the true relation between individual and society.

["প্রকৃতিগত কারণে মানুষ সামাজিক জীব"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এই প্রসংগে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি তাহা দেখাও। (৮৮-৯১, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)

৫

রাষ্ট্র—প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা
(STATE—ITS NATURE AND PURPOSE)

> "*More than ever before men now live in the shadow of the state.*"
> Ralph Miliband

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কিরূপ হইতে পারে ?
২. রাষ্ট্রের উপাদান কি কি ?
৩. রাষ্ট্র ও সরকারের মৌল পার্থক্য কি ?
৪. সংক্ষেপে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য কি ?
৫. রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে মতামত : রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিভেদ রহিয়াছে। অনেক আধুনিক—বিশেষ করিয়া মার্কিনী লেখকগণের মতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা অপ্রয়োজনীয় ও অচল।[১] অপরদিকে কার্যক্ষেত্রে যে মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষ সম্প্রসারিত হইয়াছে তাহাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে—তাহার সুখদুঃখ ও আশা-আকাংক্ষা রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা অনস্বীকার্য যে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।[২] সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ রাষ্ট্রের আলোচনা ব্যতীত উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না।

রাষ্ট্র-উদ্ভবের পশ্চাতে প্রেরণা : পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, কিভাবে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে। এখন প্রশ্ন, রাষ্ট্রের এই উদ্ভবের পশ্চাতে মানুষের কোন্ আকাংক্ষা বা প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে ? অনেকের মতে, ইহা হইল নিরাপত্তা (security), আবার অনেকের মতে ইহা হইল ন্যায় (justice)। অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণীর লেখকগণের মত হইল যে নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিয়মশৃংখলার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র উদ্ভুত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণের মতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

আধুনিক মত : আধুনিক লেখকগণের অনেকে বলেন, এই দুই মতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধিতা নাই। নিয়মশৃংখলা মানুষের প্রাথমিক আকাংক্ষা হইলেও মানুষ চাহিয়াছে ঐ নিয়মশৃংখলা যেন ন্যায়ের (justice) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

১. "The concept of the State, which once identified the study of politics is now generally considered obsolete." Wasby : *Political Science—The Discipline and Its Dimensions*

২. ...the sovereign state is...a reality of power, both abroad and at home. ...We must recognise the sovereign state as the prime fact of political life." J. D. B. Miller : *The Nature of Politics*

হয়।[১] অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার মূলে রহিয়াছে ন্যায়ভিত্তিক নিয়মশৃংখলার আকাংক্ষা। রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে এই প্রয়োজনীয়তা অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রকে সমাজ-সংগঠনের চরম রূপ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই প্রসংগে অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখক রাষ্ট্রকে সমাজ-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া মনে করেন না। জনসংখ্যার মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক যে রাষ্ট্রের ভিত্তি ইহাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না।

এই সকল লেখকের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্র মূলত শক্তিপ্রয়োগের বাস্তব প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মিলে তখনই যখন মনুষ্য-সমাজে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকে, কারণ এই বিরোধ বা দ্বন্দ্বকে সংযত রাখিবার জন্যই হয় শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন।[২] সমাজ-বিবর্তনের যে-স্তরে উৎপাদনের উন্নতি এবং শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, ধনবৈষম্য এবং মানুষে মানুষে বিবাদবিসংবাদ দেখা দিল সেই সময়ই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের। প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে-শ্রেণী আর্থিক বলে বলীয়ান—অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর মালিকানা যাহাদের, সেই শ্রেণী রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং যে-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা সুবিধা ভোগ করে সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করে। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সমাজের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সমাজ আবার পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের চরিত্র এবং উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়। দাস-রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, দাস-সমাজে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হইল দাসপ্রভুরা দাস খাটাইয়া যাহাতে উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করিতে পারে তাহা দেখা এবং পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল পুঁজিবাদী মালিকের মুনাফাকে বজায় রাখা।

রাষ্ট্র চিরন্তন নয়: এই শ্রেণীর লেখকেরা আরও বলেন, রাষ্ট্র কোন চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। শ্রেণীবিরোধের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যখন পৃথিবীর বুক হইতে শ্রেণীবিরোধ দূরীভূত হইবে তখন সংগে সংগে রাষ্ট্রও লোপ পাইবে।

বর্তমানে আমরা এই শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতবাদ আলোচনাক্ষেত্রের বাহিরে রাখিয়া কতকটা গতানুগতিকভাবেই আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও সংজ্ঞা (Necessity and Definition the State): রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। প্রত্যেক সংগঠনেরই অন্তত একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে—যথা, শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা করা, বণিক সংঘের উদ্দেশ্য হইল ব্যবসায়ী বা বণিকদের স্বার্থসাধন করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল বিশেষ ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচার করা, ইত্যাদি।

---

১. "Something more than order is required for the fully developed state." Leslie Lipson

২. "State's emergence shows that society is in conflict ... and that force is necessary to moderate the conflict, if not to resolve it." D. N. Sen : *From Raj to Swaraj*

রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত।

এই কারণে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনানুগ অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: রাষ্ট্র হইল "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির শাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের তাৎপর্য: এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য' কাহাকে বলে? এককথায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলিতে বুঝায় সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। সুষ্ঠু, সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে হয় নাই। ক্রমবিকাশের ধারা বাহিয়া মানুষ যখন গোষ্ঠীজীবন অতিক্রম করিয়া উপজাতীয় স্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিল তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে সুশৃংখল, সুন্দর সমাজজীবনের সম্ভাবনা দেখা দিল। এই জীবনের প্রতি স্বভাবজাত আকাংক্ষাই মানুষকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র-গঠনে প্রণোদিত করিয়াছে।

অতএব, স্যার হেনরী মেইনের (Henry Maine) ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃতি" (The State is based upon the habit of mankind)।

রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থাকে: ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বণিক সমিতি ইত্যাদি। রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বহু পরিবারও থাকে। ইহাদের সমবায়ে অবশ্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই। বস্তুত, রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ ব্যাপকতর।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য: রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইলেও বলা যায় যে, সমাজজীবনের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য হইল শৃংখলা (order) রক্ষা। এবং শৃংখলা রক্ষা বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায়: (ক) বিধি-ব্যবস্থা (system of law) প্রবর্তিত রাখা, (খ) সমাজে বিভিন্ন দ্বন্দ্বশীল স্বার্থের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।[১] উপরন্তু, বর্তমানে সকল রাষ্ট্রই নাগরিকদের জন্য কল্যাণমূলক কার্য ও সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।[২] এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে (শৃংখলা রক্ষা ও সমাজকল্যাণ) রাষ্ট্রকে এক বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাকে বলা হয় 'সার্বভৌম ক্ষমতা' বা 'সার্বভৌমিকতা' (sovereignty)।

১. "... the sovereign state is the means of order. This has two aspects, that of preserving the law, and that of adjudicating amongst interests for scarce commodities, services and opportunities," J. D. B. Miller

২. "Welfare state provision, in its widest sense, strengthens the state as a necessary in its people's lives." J. D. B. Miller

সার্বভৌমিকতা : অধ্যাপক ম্যাকআইভার (MacIver) সার্বভৌম ক্ষমতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' (united power of the community) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা। আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে, আইন মান্য করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষে বাধ্যতামূলক—অমান্য করিলে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে।

উইলসন-প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন (President Wilson) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন : "রাষ্ট্র হইল আইনকানুনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি" (A state is a people organised for law within a definite territory)।

রাষ্ট্রের অন্যান্য কয়েকটি সংজ্ঞা (Some Other Definitions of the State) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য। একজন জার্মান লেখক বলিয়াছেন যে, প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং যে-কোন দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে সংগতির অভাব দেখা যায়

এই অসংগতির মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া মনে করেন, অনেকে আবার ইহাকে বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেন। যাহা হউক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারের মত (৮৪-৮৭ পৃষ্ঠা) এক্ষেত্রেও চিন্তাবিদগণকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (১) যাঁহারা জৈব মতবাদে বিশ্বাসী এবং (২) যাঁহারা যান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক। জৈব মতবাদীরা রাষ্ট্রকে জীবদেহ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন ; অপরপক্ষে যান্ত্রিক মতবাদিগণের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র হইল যন্ত্রস্বরূপ। যান্ত্রিক মতাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে সম্মতিকে (consent) রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, অনেকের মতে আবার রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল শক্তি বা বল (force)। এখন বিভিন্ন মতাবলম্বী লেখকগণ রাষ্ট্রের যে-বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। তবুও কিন্তু প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্য হইতে সাধারণ উপাদানগুলি (elements common to all theories) লইয়া রাষ্ট্রের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পূর্বে আরও দু একটি আধুনিক সংজ্ঞার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ওয়াজবীর সংজ্ঞা : অধ্যাপক ওয়াজবী (Professor S. L. Wasby) প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হইল : "রাষ্ট্র হইল কোন ভূখণ্ডে বসবাসকারী এমন জনসমষ্টি যাহার সুসংগঠিত সরকার রহিয়াছে এবং যাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত" (The

State is "a collection of people having organised government and possessing autonomy with respect to other such units.")।

র‍্যাফায়েল: অধ্যাপক র‍্যাফায়েলের মতে, "রাষ্ট্র হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা শক্তি দ্বারা বলবৎযোগ্য আইনের সাহায্যে শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে, যাহার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সর্বজনীন এক্তিয়ার রহিয়াছে এবং যাহার সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকৃত।"[১]

গার্ণারের সংজ্ঞা: সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে। গার্ণারের সংজ্ঞা মৌলিক সংজ্ঞা নয়; ইহা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র। গার্ণারের মতে, "রাষ্ট্র হইল বহু সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বভাবগত আনুগত্য স্বীকার করে।"[২]

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of the State): রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অসংখ্য হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ-বিষয়ে মতৈক্য রহিয়াছে যে রাষ্ট্রের কতকগুলি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য থাকিবে—যথা, (ক) জনসমাজ বা ঐক্যবদ্ধ মনুষ্য-সম্প্রদায়, (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (গ) সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন প্রণীত ও কার্যকর হয় এবং (ঘ) সার্বভৌমিকতা বা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের উপর চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা।[৩]

এই চারিটি উপাদানের সমবায়েই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়—ইহাদের মধ্যে কোন একটির অভাব হইলে সংগঠন রাষ্ট্র পদবাচ্য হয় না।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞার মধ্যে সংগঠনের ধারণা: রাষ্ট্রের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জনসমষ্টির (a collection of people)। কিন্তু সংগঠন ব্যতীত জনসমষ্টি অনিয়ন্ত্রিত জনতা (an unregulated multitude)। সুতরাং রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে সংগঠনের ধারণা রহিয়াছে। সংগঠিত জনসমষ্টিই রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।

এখন যখনই কোন জনসমষ্টি সংগঠিত হয় তখনই উহা সমাজ বা সম্প্রদায় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান (society or community or association) আখ্যা

১. "We may define the State as an association designed primarily to maintain order and security, exercising universal jurisdiction within territorial boundaries, by means of law backed by force and recognised as having sovereign authority." J. D. B. Raphael: *Problems of Political Philosophy*

২. "The state ··· is a community of persons permanently occupying a definite portion of territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.

৩. *Encyclopaedia Britannica*

পাইয়া থাকে।[১] নিয়মকানুন দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ সমাজ বা সম্প্রদায় এক বিশেষ ধরনের সংগঠনের নির্দেশ করে—যাহা অন্যান্য সংগঠনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত কিন্তু নিজ শক্তির সকল সদস্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হইল জনসমষ্টির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাস।[২]

এখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত চারিটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

ক। রাষ্ট্রের জনসমষ্টি (Population of the State): রাষ্ট্রের জনসমষ্টির দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে: (ক) শাসক (rulers) ও শাসিত (ruled), (খ) নাগরিক (citizens) এবং বিদেশীয় (aliens)। শাসকবর্গ স্থায়ী হইতে পারেন, আবার অস্থায়ীও হইতে পারেন। অপরদিকে যাহারা আইন কর্তৃক রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহারাই নাগরিক; আর যাহারা কোন বহিঃরাষ্ট্রের সভ্য এবং যাহাদের আনুগত্য কোন বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি অথচ অস্থায়ীভাবে এই রাষ্ট্রে বাস করিতেছে তাহাদের বিদেশীয় বলা হয়।

আয়তন: রাষ্ট্রের জনসমষ্টির আয়তন সম্বন্ধে কোন প্রচলিত বিধি নাই। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, স্বল্প সংখ্যাই সুশাসনের পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু আধুনিক যুগে পরোক্ষ শাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতি, পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি প্রভৃতির ফলে দেখা গিয়াছে যে বৃহৎ জনসংখ্যা সুশাসনের কোন অন্তরায় নহে। পূর্বে সুশাসনের দিক দিয়া অনেক সময় হাজার জনসংখ্যাকে কাম্য বলিয়া মনে করা হইত; বর্তমানে ঐ একই দিক দিয়া দশ কোটিও অকাম্য নহে। তবে কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণে একমাত্র সুশাসনকেই মানদণ্ড করিলে চলিবে না—দেশের আর্থিক সম্পদ কি সংখ্যক জনসংখ্যার উপযোগী তাহাও দেখিতে হইবে।

খ। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড (Territory of the State): জনসমাজ যতক্ষণ-পর্যন্ত না নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠিত হয় না। প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদীরা সংঘবদ্ধ ছিল, কিন্তু পৃথিবীময় ছড়াইয়া থাকায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কোন কিছুর কল্পনাও করা যায় না। সভ্যতার যে-পর্যায়ে মানুষ শুধু পশুচারণ করিত, সেই পর্যায়ে ঠিক রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হয় নাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সমাজ যখন কৃষিকর্মকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল, তখনই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ ও দ্বন্দ্ব-মীমাংসার প্রয়োজনীয়তার ফলে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।[৩]

---

১. "An organised body of people is a community." T. D. Weldon

২. "... society or the community has complete control over its own members and as a consequence of this, it has to possess clearly recognised geographical boundaries." T. D. Weldon

৩. ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

ইংরাজী শব্দগত অর্থ ধরিলে রাষ্ট্রের সংগে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। অধ্যাপক গেটেলের ভাষায়, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতাও ভূমিগত।[১]

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিতে মাত্র (নদনদী ইত্যাদি সহ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকেই বুঝায় না, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমুদ্রকূলবর্তী হইলে ঐ সমুদ্রের কিছু অংশ (territorial waters) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভূখণ্ডভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য সমুদ্রের কতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে সে-সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই—এ-ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার দাবি করিয়া থাকে। যেমন, ভারতে রাষ্ট্রপতির ১৯৫৬ সালের এক ঘোষণা অনুসারে সমুদ্রের প্রায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত ভারতরাষ্ট্রের এলাকাধীন ভূখণ্ডের অন্তর্গত। অনেক সময় আবার সর্ববিষয়ে সার্বভৌম অধিকার দাবি না করিয়া পাঁচ কিলোমিটারের অধিক অঞ্চলের উপর বিশেষ অধিকার দাবি করা হয়।

সংলগ্ন অঞ্চল: সমুদ্রের যে-অংশের উপর এইরূপ বিশেষ অধিকার দাবি করা হয় তাহাকে সংলগ্ন অঞ্চল ('contiguous zone') বলিয়া অভিহিত করা হয়। কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে—যেমন, রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুনাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য—সংলগ্ন অঞ্চলের নীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলের দূরত্ব কতটা হইবে সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও বর্তমানের ধারণা হইল যে, দূরত্ব উপকূল সীমারেখা হইতে ১২ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।[২]

বিমান চলাচল ও বেতারের প্রসারের ফলে সম্প্রতি বায়ুমণ্ডলের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিলেও ইহা একপ্রকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকাধীন ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের উপর ঐ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তৃত। তবে মাত্র চুক্তির মাধ্যমে ঐ বায়ুমণ্ডলের ব্যবহার করিতে পারে।

গ। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র (Government of the State): জনসমষ্টি ও ভূখণ্ডের পর রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরবর্তী অপরিহার্য উপাদান হইল শাসনযন্ত্র বা সরকার। সরকারই রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

১. "...the idea of territorial sovereignty and jurisdiction is firmly embedded in present political thought."

২. সংলগ্ন অঞ্চলের সীমা এখনও মতবিরোধ-সাপেক্ষ। সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া সমুদ্রোপকূল হইতে ৩২০ কি.মি. (২০০) পর্যন্ত অনন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive economic zone) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অবশ্য এ-পর্যন্ত অনেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইলেও 'সমুদ্র আইন' (Law of the Sea) এখনও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

এককথায়, সরকারকে 'শাসকগোষ্ঠী' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যসাধন করে। রাষ্ট্র শুধু একটি তত্ত্বগত ধারণা কি না—এই লইয়া মতবিরোধ থাকিলেও, বাস্তব দৃষ্টিতে সরকারই যে রাষ্ট্র ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্যই সাধারণ লোকে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে না। হবসের মত অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও ইহা করেন নাই।

সরকারের স্বরূপ : ব্যাপক অর্থে যে-সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে সাধারণ নির্বাচকগণও সরকারের এক অংশ। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলিতে বুঝায় মাত্র শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা বিভাগ ও বিচার বিভাগকে। এই সমস্ত বিভাগের কর্মকর্তাগণ কিভাবে সার্বভৌম শক্তি ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ধারণ করেন, সাধারণ কর্মচারিগণ তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে কার্য করে।

আবার অনেক সময় শুধু শাসন বিভাগকে বুঝাইবার জন্যও সরকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

দুই প্রকার কার্য : রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শৃংখলা বজায় রাখা। আভ্যন্তরীণ এই ব্যবস্থা ছাড়াও আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সকল কার্যই সাধিত হয় সরকার বা শাসনযন্ত্র দ্বারা।

খ। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty of the State). সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। 'সার্বভৌম ক্ষমতা' কথাটি 'আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা' এবং 'বহিঃশক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত অবস্থা' বুঝাইবার জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয়। আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা হইল, ম্যাকআইভারের ভাষায়, 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা'।[১] এই ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের নিয়মাবলী বা আইন মান্য করিতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও সংগঠনই বাধ্য। চরম আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে রাষ্ট্রকে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

দুইটি দিক : সুতরাং আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতার সহিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বর্তমান দৃষ্টিকোণ—তত্ত্বগত ধারণা : রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার আলোচনা প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে সার্বভৌমিকতাকে আইনগত বা তত্ত্বগত বলিয়াই ধরা হয়। কারণ, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত নয়। নানা ধরনের

১. ৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সংগঠিত ও অসংগঠিত সংস্থা এবং স্বার্থ দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ। ইহা ব্যতীত সমাজজীবনে যে-সকল প্রথাগত রীতিনীতি, ধ্যানধারণা ও আইনকানুনের মূলনীতি প্রচলিত থাকে তাহা উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্র আইন প্রবর্তন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না।[১]

শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র (The State in Constitutional and International Law): রাষ্ট্রকে যে সর্বতোভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে, ইহা শাসনতান্ত্রিক আইনের লেখকরা সকল সময় দাবি করেন না। তাঁহাদের মতে, সংগঠন যদি আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হয় তবেই রাষ্ট্র আখ্যা পাইতে পারে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক আইনের লেখকগণের মতে, রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য প্রয়োজন বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনতা। এই আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ হইতেই অধ্যাপক হল রাষ্ট্রকে "...বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।[২]

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সংগঠনের স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব, সন্ধি-সর্তাদি পালনের ক্ষমতা থাকা চাই। বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলে এই ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন দেশসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নয়। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক আইন জাতিগোষ্ঠীর (Comity of Nations) সভ্য হিসাবে কোন দেশকে আসন দান করে না, যদি-না ঐ দেশের এক বিশেষ ধরনের ও উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা থাকে।

রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি: প্রকৃতপক্ষে অনেক চিন্তাবিদের মতে কোন দেশ রাষ্ট্র কি না, তাহা বিচারের মাপকাঠি হইল অপরাপর রাষ্ট্রের (বা আন্তর্জাতিক সংস্থার) স্বীকৃতি।[৩]

অন্যতম আন্তর্জাতিক আইনবিদ ওপেনহিম (Oppenheim) উক্তি করিয়াছেন যে, একমাত্র স্বীকৃতির ফলেই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সত্তা পাইতে পারে এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হইতে পারে।[৪] আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে তুরস্ক উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই; চীন ও জাপান আরও

১. "Although the State largely makes the law there are often basic principles of law, or nationally accepted customs, or even prejudices of opinion, which set restrictions upon the free exercise of the State's coercive authority." Greaves: *The Foundations of Political Theory*

২. ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

৩. "...diplomatic recognition is often considered another property of the State." *Encyclopaedia Britannica*

৪. "... through recognition only and exclusively a state becomes an international person and a subject of international law." Oppenheim: *International Law*

পরে জাতিগোষ্ঠীর সভ্যপদে আসীন হয়। বর্তমানেও অনেক সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UN) নূতন সভ্যগ্রহণের সময় আপত্তি উঠে যে, ঐ দেশ পররাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নহে। অতএব, আপত্তিকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতিপুঞ্জের সভ্যপদপ্রার্থী রাষ্ট্রকে 'রাষ্ট্র' হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বাংলাদেশের স্বীকৃতি ব্যাপারে এইরূপ বিভ্রান্তিই দেখা দিয়াছিল। আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনীতির ব্যাখ্যাকারদের মত হইল যে, আনুষ্ঠানিকভাবে হউক বা না-হউক, কয়েকটি বড় রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভই যথেষ্ট।[১] ক্রমে অন্য রাষ্ট্রও উহা মানিয়া লইবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনুরূপই ঘটিয়াছিল।

উপসংহার—সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা উপসংহারে গেটেল প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়: আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত অবস্থা—এই দুইটি অবস্থাকে সার্বভৌমিকতার (sovereignty) দুইটি দিক বলিয়া মনে না করিয়া প্রথমটিকে বুঝাইতে 'সার্বভৌমিকতা' শব্দটি এবং দ্বিতীয়টিকে বুঝাইতে 'স্বাধীনতা' (independence) শব্দটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government): সাধারণত রাষ্ট্রকে একটি তত্ত্বগত ধারণা বলিয়া মনে করা হয়। ইহা পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিতে সরকারকেই জানে—তাহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করে না। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও অনেক সময় এই পার্থক্য নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন না। হবস্ 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি অভিন্ন অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন: 'আমিই রাষ্ট্র'। আমাদের কৌটিল্য এবং ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের দুই-একজনও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।[২] এইভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও এই দুইটি ধারণা অভিন্নবোধক নহে।

পার্থক্য: রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত সংগঠিত জনসমাজ। ইহার শাসনতন্ত্র আছে, নিয়মকানুন আছে, সরকার গঠনের পদ্ধতি আছে এবং আছে নাগরিকবৃন্দ। যখন আমরা রাষ্ট্রের কথা বলি বা চিন্তা করি তখন সামগ্রিকভাবে আমরা এইগুলির কথাই বলি বা ইংগিত করি। অপরপক্ষে যখন সরকারের কথা বলি তখন বুঝি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার সংস্থাকে (administrative organ)।[৩] এই শাসনকার্য পরিচালনার সংস্থা কতিপয় লোক লইয়া গঠিত

---

১. J. L. Brierly: *The Law of Nations*

২. 'রাজা রাজ্যমিতি প্রকৃতি সংক্ষেপঃ।' কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ৮।২

৩. "When we speak of the State we mean the organisation of which Government is the administrative organ.... A State has a constitution, a code of laws, a way of setting up its government, a body of citizens. When we think of this whole structure we think of the State." MacIver

হয় যাঁহারা রাষ্ট্রের নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি ব্যবহার করেন। অতএব, শাসকযন্ত্র বা সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা অংশ মাত্র।

অধ্যাপক গার্ণার রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার জন্য রাষ্ট্রকে জীবদেহ এবং যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র যদি জীবদেহের তুল্য হয়, তবে সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। আবার রাষ্ট্রকে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হইলে সরকারকে ইহার পরিচালকমণ্ডলী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। পরিচালকমণ্ডলী যেমন যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সব নয় তেমনি সরকারও রাষ্ট্রের সব নয়।[১]

আরও বলা হয় যে স্থায়িত্ব (permanence) রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সরকার কিন্তু চিরপরিবর্তনশীল। বিপ্লব, বিহিত পদ্ধতি (legal procedure), বংশের বিলুপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সরকার অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে; সরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ও অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইতেছে।

অতএব, বলা হয় যে অবিনশ্বরতা বা স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২]

পরিশেষে, রাষ্ট্রকে এক বিমূর্ত ভাব (an abstract) এবং সরকারকে উহার বাস্তব রূপ (concrete embodiment) বলিয়াও ধরা হয়। যেহেতু বিমূর্ত ভাব সেইহেতু রাষ্ট্র হইল প্রকারভেদবিহীন (without variation); অপরদিকে বাস্তবরূপে সরকার বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে।

রাষ্ট্র চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয় নহে : অবশ্য রাষ্ট্র এক আদর্শ চিরস্থায়ী ও বিমূর্ত 'সংস্থা'—এই মতবাদ সকল চিন্তাবিদ স্বীকার করিয়া লন নাই। ইঁহাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকারের উপরি-উক্ত পার্থক্য এক আদর্শবাদী (বা ভাববাদী) বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা (an explanation inspired by idealistic hallucination) মাত্র। ইঁহারা বলেন, সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস হইতেই দেখা যাইবে যে রাষ্ট্র চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয় নহে। সুদূর অতীতে এমন একসময় ছিল যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। যে-সময় হইতে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িল তখনই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।[৩] শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র হইল আর্থিক প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর যন্ত্রস্বরূপ। যখন সমাজের শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তিত হয়—একশ্রেণীর স্থলে অন্য আর একশ্রেণী প্রতিপত্তিশীল হইয়া দাঁড়ায় তখন রাষ্ট্রও পরিবর্তিত হয়। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-সম্পর্ক প্রবর্তিত হওয়ায় রাষ্ট্রের রূপও পরিবর্তিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সংগে সংগে আবার সরকারেরও পরিবর্তন হয়। অপরদিকে রাষ্ট্র অপরিবর্তিত

১. "The government is an essential element or mark of the state, but it is no more the state itself than the brain of an animal is itself the animal, or the board of directors of a corporation is itself the corporation." Garner

২. "States possess the quality of permanence. Governments, on the contrary, are not immortal." Garner

৩. "There was a time when there was no state. It appears wherever and whenever a division of society into classes appears, whenever exploiters and exploited appear." Lenin : *The State*

থাকিয়া সরকারের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। যেমন, ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল দলের সরকারের পরিবর্তে শ্রমিক দলের সরকার গঠিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না, কারণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্কে (economic or social relations) পরিবর্তন ঘটে না।[১]

রাষ্ট্র অবিনশ্বরও নহে : রাষ্ট্র চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় কি না, তাহা লইয়া উপরি-বর্ণিত মতবিরোধ থাকিলেও রাষ্ট্র যে সম্পূর্ণ অবিনশ্বর নয় তাহা মোটামুটি সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে যতদিন রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার অধিকারী থাকে। সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত হইলে রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society) : ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, এই সম্পর্ক কখনও ছিল অংগাংগি, কখনও নিবিড় আবার কখনও বা দূর। এখন দেখা যাউক, বর্তমানে এই সম্পর্ক ঠিক কি এবং কি হওয়া উচিত। এই আলোচনার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাসের সামান্য কিছুটা পুনরাবতারণা করা প্রয়োজন।

সমাজ রাষ্ট্রের ধারণা বার্ক (Edmund Burke) তাঁহার বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবসংক্রান্ত গ্রন্থে (*Reflections on the Revolution in France*) লিখিয়াছেন, "সমাজ একটি চুক্তিগত প্রতিষ্ঠান···কিন্তু রাষ্ট্রকেও সম্প্রদায়ের সমগ্র ব্যবসাবাণিজ্য, সমগ্র বিজ্ঞান, সমগ্র ললিতকলা, সমগ্র সংগঠন এবং সমগ্র পরিপূর্ণতায় অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোনরূপে গণ্য করা যায় না।"[২] বার্কের এই উক্তিতে দুইটি রাজনৈতিক ধারণা প্রতিফলিত হইয়াছে (ক) রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন এবং (খ) এই এক ও অভিন্ন ব্যবস্থা মানুষের সমাজ সংগঠনের সকল উদ্দেশ্য সাধন করে।

এইরূপ সংগঠনকে সমাজ-রাষ্ট্র (society-state) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

ইহা যে শুধু আইন প্রণয়ন ও আইন প্রবর্তন করিয়া সমাজজীবনকে শৃংখলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে তাহা নহে, ইহা শৃংখলিত সমাজজীবনের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সকল দিকই নিয়ন্ত্রিত করে।

বার্কের বহু পূর্বে প্রাচীন গ্রীকরাও এইভাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। বার্কার বলেন, গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ছিল রাষ্ট্র ছাড়া আরও অনেক কিছু, ইহা ছিল নৈতিক সমাজ, উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সুন্দর ও সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত সাংস্কৃতিক সংগঠন।

---

১. Laski , *The State in Theory and Practice*

২. "Society is indeed contract ··· but the state ought not to be considered nothing better than a partnership agreement in a trade ... it is a partnership in all science , a partnership in all art , a partnership in every virtue, and in all perfection."

সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য : কিন্তু নগর-রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। যেমন, ভারতে সমাজ ছিল 'অন্তঃশাসনে শাসিত' এবং রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র। ফলে যখন "ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত, তখন কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য অবাধে সম্পাদিত হইতে থাকিত।[১] রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাচীন ভারতে ধর্মভিত্তিক সমাজ রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী ছিল না; পানীয় জল সরবরাহ হইতে বিদ্যা বিতরণ পর্যন্ত সকল ব্যবস্থা সমাজই করিত। রাজশক্তির উপর শুধু প্রতিরক্ষা ও দণ্ডবিধানের ভার ছিল।[২]

পরবর্তী যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরস্পরের অংগীভূত বলিয়া কল্পনা করিয়াছে, কোনটি বা উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছে। এই তর্কবিতর্কের ফলে একটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়। এই চিন্তাধারার শেষ স্তর বা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান ধারণা—জাতীয় সমাজ আমরা দেখিয়াছি যে বর্তমানে 'সমাজ' ও 'রাষ্ট্র' উভয় শব্দই জাতি (Nation) বা সম্প্রদায়ের ধারণার সহিত সম্পর্কিত (৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)।

বর্তমানের সমাজ হইল জাতীয় সমাজ (National Society)। এই 'জাতীয়' অর্থে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা 'মানুষের যে কোন সংগঠন'কে বুঝায় না—বুঝায় কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘের সমষ্টিকে।[৩]

সুতরাং ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি সমষ্টিগতভাবে হইল জাতীয় সমাজ। জাতীয় সমাজের প্রত্যেক উপাদান বা ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘই এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এবং স্বেচ্ছাধীনভাবে মানুষ এই সকল সংঘের সদস্যভুক্ত হয়—আবশ্যিকভাবে নয়। অপরদিকে রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় জাতির অন্তর্গত বিশেষ সংগঠনকে, যাহার উদ্দেশ্য হইল আবশ্যিকভাবে কতকগুলি বিধিনিয়ম বা আইন প্রতিষ্ঠিত রাখা। আবশ্যিকভাবে বর্তমানে মানুষ কোন-না কোন রাষ্ট্রের সভ্য, স্বেচ্ছাধীনভাবে নয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য : সমাজকে এইভাবে 'মানুষের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সমষ্টি' এবং রাষ্ট্রকে "একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবশ্যিক সংগঠন' বলিয়া বর্ণনা করিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। বস্তুত, সমাজ এবং রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়।

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সামাজিক প্রবন্ধ
২. রবীন্দ্রনাথ : স্বদেশী সমাজ

৩. "By 'Society' we mean the whole sum of voluntary bodies or associations contained in the nation" Barker

এ-সম্পর্কে ম্যাকআইভার : ম্যাকআইভারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল হইবে। ইহার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনটিরই সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হইবে না। ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন, ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই, রাষ্ট্র হইতে ইহারা কোন অনুপ্রেরণাও লাভ করে না। উপরন্তু, সমাজ-ব্যবস্থা এমন কতকগুলি সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা কখনও শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতে পারে না।

বার্কার : বার্কার বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে গ্রথিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা একই কার্য সম্মিলিত ভাবে ও একই পদ্ধতিতে সম্পাদন করে না।

উদ্দেশ্য (purpose), গঠন (organisation) ও পদ্ধতিতে (method) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

(ক) উদ্দেশ্যের দিক হইতে রাষ্ট্র হইল আইনশৃংখলা প্রবর্তন করার জন্ম আইনগত প্রতিষ্ঠান, অপরদিকে ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম হইল সমাজ। (খ) গঠনের দিক হইতে রাষ্ট্র আইনগত উদ্দেশ্যসাধনের জন্ম সংগঠিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং জাতির সকলেই উহার সদস্য, অপরপক্ষে সমাজ হইল বহু প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি—বিভিন্ন সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্ম ব্যক্তি একই সংগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়। (গ) পদ্ধতির দিক হইতে দেখা যায় যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা হইল বলপ্রয়োগ (coercion or compulsion), কিন্তু সমাজ তাহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্ম স্বেচ্ছামূলক ও প্রবর্তনমূলক পদ্ধতি (process of persuasion) অবলম্বন করে।[১]

অতএব, রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নহে।

ল্যাস্কি : ল্যাস্কির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় : 'রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূলসূত্র নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন অভিন্ন নহে" (The State may set the keynote of social order, but it is not identical with it)।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের সংগে সংগে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কের সন্ধানও

১. "The State exists for one great, but single purpose, Society exists for a number of purposes. As organised legally the members of the nation belong to one organisation only. As organised socially, the members of the nation belong to many organisations .... The State employs the method of coercion or compulsion, Society uses the method of voluntary action and the process of persuasion." Barker

পাওয়া যায়। ল্যাস্কি রাষ্ট্রকে 'মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মানুষের ব্যবহার' বলিতে সংঘবদ্ধ জীবনের সমগ্র ব্যবহারকে বুঝায়। ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুপ্রেরণা লাভ না করিলেও তাহাদের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর। পরিবার সম্বন্ধেও এই উক্তি অনেকাংশে প্রযোজ্য। সমাজ-জীবনে মানুষের ব্যবহার রাষ্ট্রের নীতির পরিপন্থী হইতে পারে না। রাষ্ট্রের নীতি হইল সার্বভৌম শক্তির প্রকাশ—ইহার সহিত সংঘাত বাধিলে ব্যক্তি বা সংগঠনকে তাহার নীতি বা কার্য পরিবর্তিত করিতে হইবে।

ন্যায়বোধ এবং সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন: অপরদিকে আবার রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের মূলনীতিগুলিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে। তত্ত্বের দিক দিয়া বলা হয়, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য—ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করিবার জন্য। যে-সমাজে সুশৃংখল জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে কতকগুলি নীতি গৃহীত হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র এইগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। অবশ্য গৃহীত নীতিগুলি যদি ন্যায়বোধের (idea of justice) উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে সেইগুলির পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টা করা।[১]

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and Other Associations): রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা প্রসংগে সমাজ ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংগঠিত যৌথ জীবনকেই সমাজ (society) বলা হয় এবং উহা সুসংগঠিত হইলে প্রতিষ্ঠান (association) বলিয়া অভিহিত হয়।[২]

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য: এই সকল প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র উভয়ই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট। রাষ্ট্রের সভ্যপদ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সভ্যপদ কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। আবশ্যিকভাবে মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য, অন্যান্য সংগঠনের সভ্য না হইলেও মানুষের চলে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হইল যে, কোন ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না, কিন্তু একাধিক সংগঠনের সভ্য হইতে পারে এবং হয়।

১. মার্কসবাদীরা অবশ্য বলেন যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে যখন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থসাধন করা, সার্বজনিক কল্যাণসাধন নয়। এই শ্রেণীস্বার্থ সাধন করিতে গিয়া প্রয়োজনবোধে সমাজের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

২. *"Society* is used to stand for something less organised than an *association."* Weldon : *The Vocabulary of Politics*

উদ্ভবগত পার্থক্য : রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে বিবর্তনের ফলে, কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা দ্বারা।

প্রক্রিয়াগত পার্থক্য ও স্থায়িত্ব : প্রত্যেক রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে, যাহার বাহিরে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের কার্যক্ষেত্র কিন্তু এইরূপ গণ্ডি দিয়া নির্দিষ্ট নহে।

সাধারণত রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী, অন্যান্য সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী নাও হইতে পারে। বস্তুত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে কত প্রতিষ্ঠানই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং কত নূতন প্রতিষ্ঠানই সংগঠিত হইতেছে। এই চিরপরিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় অপরিবর্তিতই থাকে।

কার্যপরিধি. অন্যান্য সংগঠনের সাধারণত দুই-একটি উদ্দেশ্য থাকে। ফলে ইহাদের কার্যাবলীও সংখ্যায় পরিমিত। রাষ্ট্রের কার্যপরিধি কিন্তু সীমাহীন। কারণ, ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করা—সুন্দর জীবন সম্ভব করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সুন্দর জীবনের অনুপন্থী বিবেচিত হয় তাহাই রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রভুক্ত।

ক্ষমতাগত পার্থক্য. সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র তাহার নিয়মাবলী বা আইন মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুনয়বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে মাত্র—কিন্তু বাধ্য করিতে পারে না।[১]

পরিশেষে, স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। বস্তুত অন্যান্য সংগঠনের অস্তিত্বই নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর। রাষ্ট্র কিন্তু কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন নহে, ইহার অস্তিত্বও অপর কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না

স্মর্তব্য—অধ্যায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর

১ সার্বভৌম ক্ষমতা বা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে।

২ রাষ্ট্রের উপাদান সংখ্যায় চারিটি (ক জনসমাজ, খ) ভূখণ্ড, (গ) শাসন-ব্যবস্থা এবং (ঘ) সার্বভৌমিকতা।

৩ সরকার রাষ্ট্রের অংশ বা এজেন্সী মাত্র।

৪ সমাজকে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সংঘের সমষ্টি এবং রাষ্ট্রকে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবশ্যিক সংগঠন বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

৫ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য হইল উদ্ভব, কার্যপরিধি ও ক্ষমতার দিক দিয়া।

---

১. "The state . . has the legal power to impose any penalty it chooses ... but with other association ... the ultimate sanction is only expulsion from the society ..." A. C. Ewing : *The Individual, the State and World Government*

অনুশীলনী

1. Distinguish between State and Society and indicate the relation between them.

[রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।]

(৭৭, ৯৪-৯৫, ১০৬-০৭ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the *significance* and *meaning* of 'territory' as a constituent element of the State. What are the exceptions to the principle of exclusive jurisdiction of a State over its own territory ?

[রাষ্ট্রের আংগিক উপাদান হিসাবে ভূখণ্ডের তাৎপর্য ও অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা কর। নিজ ভূখণ্ডের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের নীতির কি কি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় ?] (৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)

৬ সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় ও রাষ্ট্র
(STAGES OF SOCIAL DEVELOPMENT AND THE STATE)

"*Whatever is the mode of production of a society, such in the main is the society itself, its ideas and theories, its political views and institutions.*" Stalin

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১ ইতিহাসে কয় প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ?

২. ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি এবং বর্তমান রূপই বা কি ?

৩ কমিউনিস্ট সমাজের পূর্ববর্তী সমাজ-ব্যবস্থা কি ?

৫ কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে কেন ?

সমাজ পরিবর্তনশীল—ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই পরিবর্তনশীলতার কারণ হিসাবে কেহ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ, কেহ বা ভগবানের ইচ্ছা, কেহ বা আকস্মিক ঘটনাবলী, অনুরূপ কোন কিছুকে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে সমাজ-বিকাশের নির্দিষ্ট ধারা বা সূত্র রহিয়াছে। কোন সমাজের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় উহার অর্থনৈতিক কাঠামো বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা, এবং মানুষের ধ্যানধারণা, আদর্শ, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে এই অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন-পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া।

উৎপাদন-পদ্ধতি—সমাজের গতিপ্রকৃতির নির্ধারক : জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণসংগ্রহই মানুষের প্রাথমিক সমস্যা, যে সমস্যার সমাধানে তাহাকে উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হইতে হয়। এবং উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারাই সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক : উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক রহিয়াছে : (ক) উৎপাদন-শক্তি (the forces of production)। উৎপাদন-শক্তি বলিতে বুঝায় উৎপাদনের উপকরণ (যন্ত্রপাতিসহ) (instruments of production), ঐ উপকরণ ব্যবহারকারী শ্রম এবং তাহার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। অপরদিকে প্রচলিত ধনসম্পত্তির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই হইল উৎপাদন-সম্পর্ক।

নিত্যনূতন উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদন-শক্তি পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইহার সহিত সংগতি রাখিয়া উৎপাদন-সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। সহজে পরিবর্তিত না

হইলে সূচনা হয় সংকটের এবং দেখা দেয় সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা। মোটকথা, উৎপাদনপদ্ধতি পরিবর্তনশীল বলিয়া সমাজ-ব্যবস্থাও গতিশীল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে পাঁচ প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থা: সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করিলে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাঁচ প্রকারের সমাজ ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়: (১) আদিম সমভোগী সমাজ-ব্যবস্থা, (২) দাস সমাজ-ব্যবস্থা, (৩) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, (৪) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কিছুটা বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক। আদিম সমভোগী ব্যবস্থা (Primitive Communistic System): গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া—অর্থাৎ বানর জীবন হইতে মানব-জীবনে পদসঞ্চার করিয়া মানুষ বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হইল। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে ক্রমে সে উহাকে অনুকূল করিয়া লইতে শিখিল। সুরু হইল বাসস্থান নির্মাণ। তাহার পর একদিন আবিষ্কৃত হইল অগ্নির ব্যবহার। ইহা এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

সমভোগী সমাজ বা কমিউন: অগ্নি ব্যবহারের পূর্বে এবং পরেও—জীবন-সংগ্রাম যে অতি কঠোর ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। খাদ্য সংগ্রহে কোন নিশ্চয়তা ছিল না, এবং অধিকাংশ দিনই—সংগৃহীত খাদ্য পর্যাপ্ত হইত না। তখন লোকে সঞ্চয় করিতে শিখে নাই—সঞ্চয় করিবার কোন সুযোগসুবিধাও ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহা দল বা গোষ্ঠীভুক্ত সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত। কেহ নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত না। ফলে যেদিন ভাল খাদ্য সংগৃহীত হইত সেদিন ভোজ বসিত, আর কিছু পাওয়া না গেলে ঘটিত পাইকারী অনাহার বা অর্ধাহার। আদিম মনুষ্য-সম্প্রদায় বা কমিউন (commune) শুধু যে আহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত তাহাই নয়, সকল দ্রব্যই ছিল গোষ্ঠী বা কমিউনের সম্পত্তি। কোন ব্যক্তি একটি হাতিয়ার তৈয়ার করিলে তাহা দলের সকলে প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে পারিত। কেহই বলিতে পারিত না, 'এই জিনিসটি আমার, তুমি ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।'

শোষণহীনতা: সুতরাং আদিম সমাজ ছিল সমভোগী সমাজ (primitive communism)—শোষণের কোন প্রশ্ন, কোন সুযোগ ছিল না।

অতএব, উৎপাদন-সম্পর্ক (production relations) বা সামাজিক সম্পর্ক ছিল সাম্যভিত্তিক। ঐ সমাজে শোষণের স্থান ছিল না বলিয়া বলপ্রয়োগের বিশেষ ব্যবস্থার (special apparatus of coercion) প্রয়োজনও দেখা দেয় নাই।

সম্প্রদায়ের কাজকর্ম সম্পাদন করিত সমগ্র কমিউন এবং পরিচালন-ভার ছিল উহার প্রবীনদের উপর।

শ্রমবিভাগ ও নারীর স্থান: আদিম সমভোগী সমাজে শ্রমবিভাগ ছিল মূলত নারী-পুরুষের মধ্যে। সবল বলিয়া পুরুষরা শিকারাদি কার্যে ব্যাপৃত

থাকিত আর দুর্বল বলিয়া নারীরা ফলমূল আহরণ করিত, খাদ্যাদি প্রস্তুত ও অন্যান্য গৃহকার্য সম্পাদন করিত। তবুও সমাজে নারীর স্থান উচ্চে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) ছিল বলিয়া পুত্রকন্যারা পরিচিত হইত মায়ের নামে।

এই অবস্থায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে গোষ্ঠী (clan) এবং কয়েকটি গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত বৃহত্তর সম্প্রদায়কে উপজাতি (tribe) আখ্যা দেওয়া হয়।

পরবর্তী অধ্যায় : এই অধ্যায়ের পরবর্তী সময়ে যখন কৃষিকার্য ও পশুপালন দেখা দিল তখন পুরুষের আধিপত্য বাড়িয়া গেল এবং নারীর স্থান গৌণ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা ব্যতীত গোষ্ঠী বা উপজাতি ভাঙিয়া উদ্ভব ঘটিল পারিবারিক সংগঠনের (families)।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন : এইবার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিক দৃষ্টিপাত করা যাউক। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণ ছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন। মানুষ একদিন ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার শিখিল, এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইল পূর্বের দুইটি আবিষ্কার : (ক) পশুপালন ও (খ) কৃষিকার্য। পশুপালন আবিষ্কৃত হইলে খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পালিত পশুর পশম হইতে পোশাকপরিচ্ছদ ও চর্ম হইতে তাঁবু ইত্যাদি নির্মিত হইতে লাগিল। পালিত পশু ভারও বহন করিতে সুরু করিল। কৃষিকার্যের আবিষ্কারের ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিল এবং অপরিহার্যভাবে ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিল। ক্রমে গড়িয়া উঠিল হস্তশিল্প।

পরবর্তী স্তর হইল দ্রব্য-বিনিময় (barter)। প্রথমে গোষ্ঠীর মধ্যে সকল দ্রব্য সমানভাবে বণ্টিত হইত। পরে উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির সংগে সংগে যে যত বেশী উৎপাদন করিত সে তত বেশী ভাগ পাইতে লাগিল। ফলে লোকে নূতন নূতন উদ্ভাবনের সাহায্যে নূতন নূতন ক্ষেত্রে অধিক উৎপন্ন করিতে উৎসাহিত হইতে লাগিল।

উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের অসংগতি : বলা হয়, উন্নয়নের ফলে উৎপাদনশক্তি উৎপাদন-সম্পর্কের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলে। কারণ, এখন দলবদ্ধভাবে সনাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের অর্থ দাঁড়ায় উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ও উৎপাদনশক্তিকে উপেক্ষা করা।[১] ফলে অংকুরিত হইল নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক।

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও ধনবৈষম্য : এদিকে শ্রমবিভাগ ও বিশেষিকরণ (specialisation) এবং বিনিময়-ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটিল।

---

১. "The obsolete production relations based on collective labour and a common ownership of the means of production, began to hinder the further development of the productive forces. The establishment of new production relations was inevitable." *An Outline of Social Development* (Progress Publisher Moscow)

জমি ও পশুর মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে দেখা দিল ধনবৈষম্য। শোষণের পথও উন্মুক্ত হইয়া উঠিল।

দাসত্বপ্রথা ও শোষণের সূত্রপাত: পূর্বে যুদ্ধবন্দীদের হয় মারিয়া ফেলা হইত, না-হয় গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া লওয়া হইত। এখন উন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থায় কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে দাসে পরিণত করা হইল। দাসরা নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা উৎপাদন (surplus product) করিত তাহা ভোগ করিত দাসপ্রভুরা। দাসপ্রভুরা মাত্র দাসদেরই শোষণ করিত না, ছোটখাটো স্বাধীন দরিদ্র মালিকরা দুরবস্থায় পতিত হইলে তাহারাও এই শোষণের কবলে পড়িত।

আর এক শ্রেণীর শোষকেরও উদ্ভব ঘটিয়াছিল—মহাজন ও কুসীদজীবীদের। সুদের ব্যবসায় বা প্রয়োজনের সময় ঋণপ্রদান করিয়া তাহারাও ক্রমে বিত্তশালী হইয়া উঠিল। এইভাবে একদা যে সমাজ সমভোগী ছিল তাহা এখন শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রাথমিক (basic) শ্রেণী দুইটি হইল বিত্তহীন দাসশ্রেণী এবং তাহাদের মালিক বা দাসপ্রভু। ইহা ছাড়া ছিল স্বল্পবিত্ত স্বাধীন মালিকশ্রেণী।

সুতরাং একাধারে শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজের গোড়াপত্তন ঘটিল।

খ। দাস-ব্যবস্থা (The Slave System): দেখা গেল, আদিম সমভোগী ব্যবস্থা হইতেই দাস-ব্যবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে। দাস-ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তি হইল দ্বৈত: (ক) উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা, (খ) শ্রমজীবী দাসদের উপরও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। দাস-মালিকরা শুধু শোষণ করিবার অধিকারই পায় নাই, দাসদের জীবনমরণ ও ক্রয়বিক্রয়ের অধিকারও প্রভুদের ছিল।

শোষণ ও দ্বন্দ্ব: কঠোর পরিশ্রম ও অকথ্য অত্যাচারে দাসরা প্রভুদের জন্য অতিরিক্ত (surplus) উৎপাদন করিতে বাধ্য হইত, এবং নিজেরা মাত্র জীবনধারণের জন্য দ্রব্যাদি পাইত। এইভাবে সমাজ দুই প্রধান দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীতে (antagonistic classes) বিভক্ত হইয়া পড়িল।

ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীবিভক্ত দ্বন্দ্বশীল সমাজ হইল এই দাস-সমাজ।

সমাজের অগ্রগতি: দাস-ব্যবস্থার উদ্ভবের সংগে শ্রমবিভাগ উন্নততর হইতে থাকিল। একদিকে কৃষিকার্য ও নগরাঞ্চলের শিল্প এবং অপরদিকে বিভিন্ন হস্তশিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ সমাজের অগ্রগতিকে এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দেয়। যন্ত্রপাতির উন্নতি হইতে থাকে, বিশেষিকরণ প্রসারলাভ করে এবং শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার এবং বিনিময়-ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে নগরাঞ্চল গড়িয়া উঠে এবং নগরাঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প, কলা, সাহিত্য ও কৃষ্টিও প্রসারলাভ করে। বিভিন্ন সংলগ্ন দেশের মধ্যে ব্যবসার প্রসার ও কৃষ্টি-বিনিময় ঘটিতে থাকে।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রের উদ্ভব : কিন্তু এই সকল উন্নয়ন সম্ভবপর হয় দাস-শ্রমের মাধ্যমে। ইহাদের শোষণ ও অত্যাচার করিয়াই দাসপ্রভুরা বিত্তশালী হইয়া উঠিতে থাকে এবং বিলাসব্যসনে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ধনী ও দরিদ্র, দাসপ্রভু ও দাসদের মধ্যে সুরু হয় সংঘাত। তখন দাসদের দমন করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় বলপ্রয়োগের বিশেষ এক প্রতিষ্ঠানের। এই প্রতিষ্ঠানই হইল রাষ্ট্র।

অতএব, শ্রেণীবিন্যস্ত দাস-সমাজ হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

বিপ্লব ও পতন : দাস-সমাজে ধনী-দরিদ্র এবং প্রভু দাসদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির অগ্রগতি ব্যাহত হইতে থাকে। কারণ, উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদন-শক্তির মধ্যে বিরোধ বা অসংগতি দেখা দেয়। সম্পদ উৎপাদন করিত দাস-শ্রমিকরা আর উহার ভোগদখল করিত দাসপ্রভুরা। এই অবস্থা চরমে পৌঁছিলে দাস-সমাজে ঘটে বিপ্লব, যে-বিপ্লবের শেষে শ্রমজীবী দাসরা মাথাচাড়া দিয়া উঠে।

ইহা এবং বহিরাক্রমণের দরুন ভাঙিয়া পড়ে দাস-সমাজ ও রাষ্ট্র। পরবর্তী সময়ে ইহার স্থান অধিকার করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (feudal society)।

ইতিহাস : প্রথম দাস-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ইউফ্রেটিস ও নীল নদের উপত্যকায়। এই সকল স্থানে অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর জমির দরুন উচ্চস্তরের এক অভূতপূর্ব আগ্রাসী (aggressive) সভ্যতা গড়িয়া উঠে। আগ্রাসী নগরের কাযকলাপের ফলে ইজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। ইহাদের সমাজও ছিল শ্রেণী বিভক্ত।

ভারত : যুদ্ধজয়ের ফলে বহু দাসের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য দেশের মত বিস্তারলাভ না করিলেও[১] ভারতে যে দাসপ্রথা ছিল তাহার প্রমাণ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে, কোন 'আর্য'কে দাসে পরিণত করা যাইবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অনার্যদের দাস করায় কোন বাধা ছিল না।[২]

চীনদেশেও ব্যাপক দাসত্বপ্রথা বর্তমান ছিল। অবশ্য দাসভিত্তিক সভ্যতা ও নগর-সমাজের সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীস ও রোমক সাম্রাজ্যে। গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টা নগর-রাষ্ট্রের বিস্ময়কর রাষ্ট্রের উৎকর্ষের মূলে ছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অধিকার-বঞ্চিত অসংখ্য দাস ও অন্যান্য সাধারণ লোকের কঠোর পরিশ্রম ও শোষণ।

স্পার্টা ও এথেন্সে শ্রেণীবিন্যাস : নগর-রাষ্ট্র স্পার্টার সমাজ তিন শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত ছিল। সর্বনিম্নস্তরে ছিল হেলটস (Helots) বা দাসশ্রেণী। সংখ্যায় অধিক হইলেও এবং কৃষিকার্যের মাধ্যমে সকলকে খাদ্য যোগাইলেও ইহাদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সর্বোচ্চ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিল স্পার্টানগণ। ইহারা জমির মালিকানা ভোগ করিত। মধ্যবর্তী স্তরে ছিল আর এক শ্রেণীর লোক (Perioikoi) যাহাদের সামাজিক অধিকার থাকিলেও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। ইহাদের বৃত্তি ছিল ব্যবসাবাণিজ্য।

এথেন্সবাসীদের মধ্যে প্রধান (basic) শ্রেণীবিভাগ ছিল দাস ও স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে। দাসদের কোনপ্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

---

১. "No other ancient civilization had fewer slaves than India." Basam : *Wonder that was India*

২. "The *Arthashastra* also lays stress on the old doctrine that never shall an *Arya* be subjected to slavery.' Apparently there were some kinds of slaves, brought from outside the country or belonging to the country ..." Nehru : *Glimpses of World History*

এইভাবে দাসত্বপ্রথার উপর নির্ভরশীলতাই ছিল গ্রীক নগর-সভ্যতার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

রোমক সমাজ : রোমক সাম্রাজ্যেরও ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। প্রথম হইতেই রোমক সমাজ প্যাট্রিসিয়ান (Patricians) বা অভিজাত জমিদারশ্রেণী এবং প্লেবিয়ান (Plebeians) বা সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত সাধারণ নাগরিকগণ—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এবং সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল দাসশ্রেণীভুক্ত অসংখ্য লোক।

আধিপত্য বিস্তারের সংগে সংগে রোম সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী ও সমর-নায়কগণের শোষণের সুযোগসুবিধাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আহৃত সম্পদ ও ক্রীতদাস ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হয়।

পতন : ক্রমশ রোমক সমাজের অসংগতি প্রকট হইয়া উঠে। একদিকে ধনীদের মধ্যে বিলাসব্যসনের স্রোত বহিতে থাকে অপরদিকে দরিদ্র শ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়ন বাড়িয়া যায়। দাস-ব্যবসায় পুরাদমে চলিতে থাকে। শোষণ ও অত্যাচারের ফলে দাসদের মধ্যে প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। বস্তুত, জার্মানী ও ফরাসী অঞ্চলের বর্বর উপজাতিদের আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার বহু পূর্বেই অন্তঃসারশূন্য প্রাচীন রোমক সভ্যতার অবসান ঘটে।[১]

এইভাবে দাসত্বপ্রথার অবসান ঘটিলে তাহার স্থানাধিকার করে সামন্তপ্রথা (the feudal system)।

গ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা (The Feudal System) : সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। তবে মূল শ্রেণী সংখ্যায় ছিল দুই : (ক) জমিদার, (খ) ভূমিদাস (serfs)। জমির মালিকানা ছিল জমিদারদের।

ভূমিদাসশ্রেণী : ভূমিদাসরা দাস ও স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিত। সংক্ষেপে তাহাদের অবস্থা ছিল আবদ্ধ শ্রমিকদের (bonded labour) মত এবং জমিদারদের সংগে তাহাদের সম্পর্ক ছিল শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক।

পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছুটা জমি ভূমিদাসদের দেওয়া হইলেও অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে জমিদারের জমিতেই খাটিতে হইত। জমি হস্তান্তরিত হইলে তাহার সহিত ভূমিদাসও হস্তান্তরিত হইত। কৃষিকার্যের পাশাপাশি হস্তশিল্প হইতেও অনেক ভূমিদাস অন্নসংস্থান করিত।

খাজনার উদ্ভব : সামন্তপ্রথার প্রথম দিকে ভূমিদাসরা জমিদারদের জমিতে বেগার খাটিতে বাধ্য হইলেও পরবর্তী সময়ে ইহাদিগকে জমির ফসল ও হস্তশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশও খাজনা হিসাবে জমিদারদের দিতে হইত। ইহারও পরে—পণ্য উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নয়নের সংগে সংগে—ভূমিদাসদের নগদ টাকায় খাজনা মিটাইতে হইত।

এখানে উল্লেখ্য যে সামন্তপ্রভুদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন স্তর ছিল। ছোটখাট ভূস্বামীকে অধিক ক্ষমতাশালী সামন্তপ্রভুর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইত। স্বয়ং রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ সামন্তপ্রভু।

---

১. Refer : Gordon Childe : *What happend in History.*

শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা : সামন্তপ্রভুরা নিজ নিজ এলাকায় প্রভুত্ব করিত। তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে কর শুল্ক জরিমানা প্রভৃতি আদায় করিত। ভূস্বামীদের সমর্থনে কাজ করিত পুরোহিতশ্রেণী যাহারা নিজেরাও জমির মালিকানা ভোগ করিত। ইহা ছাড়া ছিল পণ্যব্যবসায়িগণ (merchants)। রাষ্ট্রশক্তিও জমিদারদের স্বার্থে কার্য করিত। প্রায়শই সশস্ত্রবাহিনীর সাহায্যে ভূমিদাসদের দমন ও শোষণ করা হইত।

দাসদের তুলনায় ভূমিদাস : দাসদের (slaves) তুলনায় ভূমিদাসদের (serfs) যে কিছুটা বেশী অধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাহার কারণও ছিল। শোষণের ফলে দাসদের কাজে কোন উৎসাহ ছিল না। জমিদারশ্রেণী ইহা বুঝিয়াই ভূমিদাসদের কিছুটা সুযোগসুবিধা প্রদান করিয়াছিল।[১]

প্রথমত, ভূমিদাসরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য জমি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ক্রয়, পশুপালন, হস্তশিল্প পরিচালন প্রভৃতির অধিকারও ভূমিদাসদের দেওয়া হইয়াছিল। পরিশেষে, ভূমিদাসদের জীবনের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি : ইহার ফলে উৎপাদনশক্তির প্রসারলাভ ঘটিতে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধিত হয়, এবং জমির উর্বরতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলে। কারিগরি শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হইতে থাকে এবং উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতির যোগান সুরু হয়। সামন্তপ্রভু এবং বণিকদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং অস্ত্রশস্ত্রও উৎপাদিত হইতে থাকে। এই সময় লৌহ শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে এবং গোলাবারুদ কাগজ মুদ্রণ প্রভৃতির আবিষ্কার হয়। সহরাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়া ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও কৃষ্টির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।

অপরদিকে কিন্তু আবার শোষণের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্রমাবনতি : ত্তের শতকের পর হইতে বিভিন্ন দিক হইতে আঘাতের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে।

তত্ত্বের দিক দিয়া কারণ ছিল উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদন-শক্তির মধ্যে ক্রমশ প্রকট অসংগতি।

প্রথমত, জমিদারশ্রেণী ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তী এক শ্রেণীর লোক ব্যবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া আর্থিক দিক দিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। অপরদিকে জমিদারদের করায়ত্ত খেতখামারে আর্থিক দুর্দশা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে—শোষণ ও অত্যাচারে প্রপীড়িত ভূমিদাসগণের পক্ষে ভূস্বামীর সংগে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। দ্বিতীয়ত, নগরাঞ্চলে উদীয়মান ব্যবসায়ীশ্রেণীর (the rising bourgeoisie) আর্থিক ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ইহারা হইয়া

---

১. *Stalin : Leninism*

দাঁড়ায় সামন্তপ্রভুদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সমৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন ছিল তিনটি জিনিস : (ক) 'স্বাধীন' শ্রমিক, (খ) সামন্তপ্রভু প্রবর্তিত শুল্ক ও করের অবসান এবং (গ) বাজারের সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় বাজারের সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবসায়ীশ্রেণী বা বুর্জোয়ারা সমাজের অন্যান্য শোষিত ও অত্যাচরিত গোষ্ঠীর সহিত জোট বাঁধিয়া সামন্তপ্রথার উপর আঘাত হানে।

বুর্জোয়া-বিপ্লব : ইহার ফলেই ঘটে বুর্জোয়া-বিপ্লব (bourgeois revolution) এবং সূচিত হয় ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন।

ঘ। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা (The Capitalist System) : ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনা দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) ইহার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, (২) বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান রূপ।

১। **উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :** সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিশৃংখলা ও অন্তর্বিরোধের মধ্য হইতে চরম রাজতন্ত্রের (absolute monarchy) অধীনে একই সংগে জাতীয় রাষ্ট্র ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়।

মধ্যযুগের অধিকাংশটাই ছিল রোমের পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধ দ্বারা সূচিত। প্রথমে ধারণা ছিল যে পোপের স্থান সম্রাটের উপর এবং সম্রাটের ক্ষমতা পোপের নিকট হইতে প্রাপ্ত। পরবর্তী সময়ে পোপের গুরুত্ব ও আধিপত্য হ্রাস পায়। নৃপতিবর্গ (রোমের) পোপকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে ঝুঁকেন। নানা অভিযোগের ফলে ধর্মসংস্থার (Church) আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের দাবি উঠে এবং উহার ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই সুযোগে রাজতন্ত্র তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে এবং জমিজমা দখল করিয়া লয়।

জাতীয় ভাবের উদ্ভব : এই (চরম) রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে শক্তিশালী সার্বভৌম রাষ্ট্র (the Sovereign State) এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সম্প্রসারিত হইতে থাকে জাতীয় ভাব বা স্বাদেশিকতা (national spirit or patriotism)।

জাতীয় ভাবের (বা স্বাদেশিকতার) তাৎপর্য হইল ঐক্যবোধ। একই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারিগণ অনুভব করিতে থাকে যে তাহারা একই জনগোষ্ঠীর অংগীভূত এবং ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক। ক্রমে তাহারা অভিন্ন কৃষ্টিরও অংগীভূত হইয়া দাঁড়ায়।

উদ্ভবের মৌল কারণ : চরম রাজতন্ত্রের অধীনে সার্বভৌম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং কয়েকটি আনুষংগিক বিষয় (যেমন, খ্রীষ্টধর্মসংস্কার, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি) সহায়ক উপাদান হিসাবে কার্য করিলেও, জাতীয় ভাবের উদ্ভবের মূল কারণ

ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থ-ব্যবস্থার অসংগতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিলুপ্তি এবং উদীয়মান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।[১]

কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী শাসন-কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায় ছিল সংখ্যাহীন সামন্তপ্রভুগণ। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব খাটাইত। সুতরাং শিল্পবাণিজ্যের স্বার্থে ইহাদের দমন করা, শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন হইল। এই কার্যে অনেক ক্ষেত্রেই নৃপতিগণ সাধারণ জনগণের সমর্থন পাইতে সমর্থ হন। কারণ, ভূমিদাসদের উপর সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা সহ্যসীমাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তদুপরি ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অরাজকতার মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ শান্তিশৃংখলার আশায় শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। জনসাধারণের সমর্থনে নৃপতিগণের পক্ষে সামন্তপ্রভুদের দমন সহজ হয়। উদীয়মান ব্যবসায়ীশ্রেণীর মদত ও গোলাবারুদের আবিষ্কার সহায়ক বিষয় হিসাবে কার্য করে।

সংগে সংগে রোমক আইনের পুনর্চর্চার ফলে এই তত্ত্ব সুপ্রচারিত হয় যে 'আইন হইল নৃপতির ইচ্ছা' (law is the will of the king)। ফলে রাজতন্ত্র চরম রূপ ধারণ করে।

রাজতন্ত্র বনাম ব্যবসায়ীশ্রেণী : এইভাবে চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংঘাত সুরু হয় নৃপতির সহিত জনসাধারণ ও উদীয়মান ব্যবসায়ীশ্রেণীর। এই দ্বন্দ্বে নৃপতিগণ আগেকার সামন্তপ্রভুদের সামিল করিয়া লন। এদিকে জাতীয় চেতনা প্রসারলাভ করিতে ও জনসাধারণ অধিকমাত্রায় অধিকার-সচেতন হইতে থাকে। শিল্পবাণিজ্য প্রসারলাভ করায় শিল্প শ্রমিকদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীরও সৃষ্টি হয়। তাহারাও তাহাদের দাবিদাওয়া লইয়া আন্দোলন করিতে থাকে। নৃপতিগণ কর্তৃক ব্যবসায়ের উপর নানাপ্রকার বাধানিষেধ এবং উত্তরোত্তর করস্থাপন ও অর্থের দাবি ছিল ব্যবসায়ীদের বিদ্বেষ ও আন্দোলনের কারণ। আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিলে তাহারা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টাও করিতে থাকে। শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতির সংগে সংগে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংগ্রহ নিশ্চিত করিবার জন্য তাহারা আবদ্ধ ভূমিদাসদের মুক্তি-আন্দোলনেও মদত যোগাইতে থাকে।

অপরদিকে চরম রাজতন্ত্রও সহজে উহার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। ফলে বিভিন্ন স্থানে ঘটে সংঘর্ষ এবং কোন কোন স্থানে দেখা দেয় বিপ্লব। ইংল্যাণ্ডে এই বিপ্লব সংগঠিত হয় সতের ও ফ্রান্সে আঠার শতকে। অন্যান্য দেশের বিপ্লবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এই দুই বিপ্লবের মধ্য হইতেও পাওয়া যায়।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিপ্লবের মধ্য দিয়াই বর্তমান ধনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বুনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে।

---

১. "Nationalism was the expression of the inspiration of the rising middle class for economic unity and cultural freedom as against the separatism and obscurantism of the feudal society." Paul Sweezy

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও উহার অবদান: স্মর্তব্য যে উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল ব্যবসায়িগণ বা বুর্জোয়াশ্রেণী। তাহারা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী (Equality, Liberty and Fraternity)—রাজনৈতিক আদর্শের এই ধ্বনি তুলিয়া জনসাধারণের সহযোগিতায় বিপ্লব সংগঠিত করে এবং চরম রাজতন্ত্রের চরম ক্ষমতার অবসান ঘটায়। কিন্তু পার্লামেন্ট বা আইনসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে বহুদিন কাটিয়া যায়। সার্বিক ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিমূলক আইনসভা ক্রমশ প্রবর্তিত করা হইলেও স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ইত্যাদি আদর্শ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা ও সাম্যকে সীমাবদ্ধ করা হয় আইনের কাঠামোর মধ্যে[১]—অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নকে এড়াইয়া যাওয়া হয়। বস্তুত, উদারনৈতিক বা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে প্রকৃত স্বাধীনতা বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে সামাজিক সম্পর্ক (social relations) ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তিশীল এবং সমাজ ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দরিদ্রশ্রেণীর পক্ষে অধিকমাত্রায় সুযোগসুবিধা আদায় করিবার পথ সুগম হয়।

২। **বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান রূপ:** বলা হইয়াছে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমপরিণতি লাভ করিতে থাকে।

উৎপাদন-সম্পর্ক: এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমাজের এক প্রান্তে থাকে উৎপাদন-উপায়সমূহের মালিকশ্রেণী আর অপরদিকে থাকে উৎপাদন-উপায়সমূহ হইতে বিচ্যুত শ্রমজীবীশ্রেণী।[২]

অবশ্য প্রথমদিকে ধনতান্ত্রিক মালিকশ্রেণীর পাশাপাশি ছিল ছোটখাট মালিকদের কৃষিখামার ও হস্তশিল্প। পরে তাহারা শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত হয়। তবে বড় কৃষি-খামারগুলিতে মূলধন-নিবিড় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি (capital-intensive capital st method) অবলম্বিত হইতে থাকে। মোটকথা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সহায়সম্বলহীন শ্রমজীবীদের শ্রমশক্তি (labour power) বিক্রয় করা ছাড়া জীবিকার্জনের কোন উপায় থাকে না। আর মূলধন-মালিক এই শ্রমজীবীদের মজুরির পরিবর্তে খাটাইয়া

---

১. "Having attained their end, political power, the French Bourgeoisie dropped off 'fraternity' and made 'liberty' and 'equality' stand for abstract equality before the law and the liberty of men with money to engage in industry and commerce...". Howard Selsam: *What is Philosophy?*

২. "The basis of relations of production under the capitalist system is that the capitalist owns the means of production, but not the workers in production ... who are deprived of the means of production, and, in order not to die of hunger, are obliged to sell their labour power ··· and to bear the yoke of exploitation." Stalin

এবং বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করিতে থাকে। এইভাবে শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়।

উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব এখন প্রশ্ন, মালিকশ্রেণীর এই মুনাফার উৎস কি—ইহা কিভাবে অর্জিত হয়? সংক্ষিপ্ত উত্তর: ইহা আসে শ্রম উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus-value) হইতে। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বরূপ কি? শ্রমিক কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিস (যেমন, জ্বালানি তৈল, ইত্যাদি) এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং মালিক দ্রব্যকে বাজারে বিক্রয় করিয়া দাম পায়। এই দাম (১) কাঁচামাল ইত্যাদির দাম, (২) ঘরবাড়ি, কারখানা যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দাম বা যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের (depreciation) ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয়, এবং শ্রমিকের শ্রম দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত নূতন মূল্য লইয়া দ্রব্যটির বাজার-দাম স্থির হয়। ইহাদের মধ্যে শ্রমিকের শ্রম দ্বারা যে নূতন মূল্য সৃষ্ট হয় তাহা শ্রমশক্তির দাম হইতে অনেক বেশী অন্যভাবে বলা যায়, শ্রমিককে যে-মজুরি দেওয়া হয় তাহা তাহার ভরণ-পোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই, কিন্তু শ্রমিক-সৃষ্ট মূল্য বাজারে বিক্রয় করিয়া যে-দাম পাওয়া যায় তাহা তাহার মজুরির মূল্য হইতে অনেক বেশী। এই পার্থক্যই হইল উদ্বৃত্ত-মূল্য।[১] মালিকরা ইহা মুনাফা (profit) হিসাবে ভোগ করে।

উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির পদ্ধতি. মূলধন-মালিকরা উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বা মুনাফা বাড়াইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রথমত, মজুরি না বাড়াইয়া দৈনিক শ্রমের সময় বাড়াইতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, শ্রমের সময় বা উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া মজুরি কমাইতে চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, শ্রমিককে কঠোর শ্রম করিতে বাধ্য করিয়া অথবা উৎপাদন-কৌশলের উন্নতিসাধন করিয়া ঘণ্টাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্রমপ্রসার ও শ্রেণীসংঘর্ষ. মালিকশ্রেণী এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের কতকাংশ নিজের প্রয়োজন মিটাইতে ব্যয় করে আর বাকিটা মূলধনে পরিণত করে এবং এই মূলধনের সাহায্যে অধিক শ্রম নিয়োগ করিয়া আরও অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি ও ভোগ করে। এইভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণকার্য চলিতে থাকে এবং ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে বাধে সংঘর্ষ।

ধনতন্ত্র প্রসারের তিনটি সর্ত উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারের তিনটি সর্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে: (১) বিক্রয়বাজারের বিস্তৃতি, (২) সঞ্চয় হইতে গঠিত মূলধন এবং (৩) সহায়সম্বলহীন শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি। ধনতান্ত্রিক সমাজের সূত্রপাতে মালিকশ্রেণী এই মূলধন নানা উপায়ে সংগ্রহ করে। ব্যবসাবাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, দস্যু বা লুণ্ঠনবৃত্তি প্রতারণা প্রভৃতির

১ '... surplus value ... is the value of the product which a worker produces without compensation since his wage is always smaller than the value of the commodity he has created." *Fundamentals of Political Science* (Progress Publishers, Moscow)

আশ্রয় লইয়া উদীয়মান ব্যবসায়শ্রেণী এই মূলধন সংগ্রহ করে। পনের ও ষোল শতকে আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভারত ও চীনে ব্যবসায়ের পথ সুগম হওয়ার পর বাণিজ্য ও মূলধন সঞ্চয়ের পথ সুগম হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের সংগে পুরাদমে চলে লুণ্ঠনকার্য। অপরদিকে খাজনাবৃদ্ধি, জমি হইতে কৃষক বিতাড়ণ, গির্জার জমি দখল ইত্যাদির মাধ্যমে বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে সৃষ্ট মূলধন ও শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকার্য ষোল হইতে আঠার শতক পর্যন্ত চলিতে থাকে।

শিল্প-বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের প্রসার: আঠার-উনিশ শতকে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে এবং পরে অন্যান্য দেশেও শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। কায়িক পরিশ্রমের স্থলে বহুলাংশে যান্ত্রিক কলাকৌশল অবলম্বিত হয়।[১] ফলে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন (capitalist industrialisation) পূর্ণাংগ রূপ ধারণ করে। শিল্প-বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে সমাজের বিভিন্ন দিকে রূপান্তর ঘটিতে থাকে। দ্রুতগতিতে উৎপাদনবৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। একই তালে মালিকশ্রেণীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি উত্তরোত্তর শ্রমিক-শোষণ চলিতে থাকে। কৃষকশ্রেণীর সংখ্যা হয় ক্রমহ্রাসমান। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রসারলাভ করে।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও ধনতন্ত্রের সংকট: ইহার মধ্যেই কিন্তু লুক্কায়িত থাকে পতনের বীজ—ধনতন্ত্র ক্রমশ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকটের সম্মুখীন হয়। ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে মূলধন ক্রমান্বয়ে মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জীভূত (centralisation and concentration) হইতে থাকে। তখন শ্রমিক ও দরিদ্রশ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু না করিয়া পারে না। ইহা ছাড়া ধনতন্ত্রের নিজের মধ্যেই রহিয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। পরিবর্তনশীল মূলধনের (variable capital) অনুপাতে স্থিতিশীল মূলধন (constant capital) (অর্থাৎ মজুরির তুলনায় যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতির উপর ব্যয়)[২] অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হইতে থাকায় মুনাফা বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার (rate of profit) হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ লোকের হাতে যথেষ্ট ক্রয়শক্তি থাকা। কিন্তু অধিকমাত্রায় শোষণের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ লোকের পক্ষে ক্রয়শক্তির অভাবে উৎপন্ন দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় করা সম্ভব হয় না।[৩] অপরদিকে মালিকশ্রেণী মুনাফার তাগিদে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলে। তৃতীয়ত, উৎপাদনক্ষেত্রে

১. "The change from manufactory stage of capitalism with its manual technology to the machine industry is called the Industrial Revolution." *An Outline of Social Development, Part II* (Progress Publishers, Moscow)

২. মার্ক্সীয় অর্থে মজুরির জন্য মূলধন-মালিক যে-অর্থ ব্যয় করে তাহাকে পরিবর্তনশীল মূলধন বলা হয়। মজুরি ছাড়া যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতির উপর যে অর্থ মূলধন মালিক বিনিয়োগ করে তাহা হইল স্থিতিশীল মূলধন।

৩. "The last cause of all real crisis always remains the poverty and restricted consumption of the masses … ." Marx: *Capital,* Vol III

বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনও বিশৃংখলভাবে হয়।

সংকট ও ঔপনিবেশিকতা: ইহার দরুন উৎপাদন-ব্যবস্থার দেখা দেয় অত্যুৎপাদন ও সাধারণ সংকট।

বস্তুত, সামাজিক উৎপাদন (social production) এবং ব্যক্তিগত মুনাফা-শিকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তির প্রসার ও ব্যবহার ব্যাহত হইতে থাকে।

ইহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীশ্রেণী উপনিবেশ ও বিদেশী বাজার খুঁজিতে থাকে। সেখানেও লক্ষ্য হইল শোষণ। ইহার দরুন উপনিবেশগুলির নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হয় এবং শোষিত জনসাধারণ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতে থাকে। বর্তমানে বহুসংখ্যক উপনিবেশ স্বাধীন হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী দেশের বৃহদাকারের বহুজাতীয় একচেটিয়া কারবারগুলি (giant multinationals) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শোষণ ও প্রভাব বিস্তার করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

রাষ্ট্রের ভূমিকা: এই প্রসংগে রাষ্ট্রের ভূমিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রাথমিক কার্য হইল প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত করা। আইনশৃংখলার নামে ইহারা শ্রমিকশ্রেণীকে সংযত রাখিতে ও দমন করিতে চেষ্টা করে এবং প্রয়োজনমত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা বাড়িয়া গেলে ও ধনতন্ত্রের সংকট অধিক হইলে রাষ্ট্রকে অধিক সক্রিয় হইতে দেখা যায়। বর্তমানে ইহাই ঘটিতেছে।

অর্থনীতি ও রাজনীতির অংগাংগি সম্পর্ক: তাহা হইলে দেখা গেল যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সহিত রাজনৈতিক ক্ষমতা অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া সামন্ত-তান্ত্রিক বাধানিষেধ ও সুযোগসুবিধার অবসান ঘটায় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের পথ সুগম করে (১১৮ পৃষ্ঠা)। শিল্প-বিপ্লবের পর যখন ধনতন্ত্র দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছিল তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতকটা সীমাবদ্ধ করিবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।[১] বলা হয়, ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যত কম হস্তক্ষেপ করিবে দেশের ও দশের ততই মংগল। এই তত্ত্ব প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই প্রতিফলন।

স্বাচ্ছন্দ্য-নীতি: সংক্ষেপে এই নীতির বক্তব্য হইল, মালিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা অবাধ ও অপ্রতিহত হইবে—অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র

১. "In the Marxist perspective, the intervention of the State is always and necessarily partisan : as a class state, it always intervenes for the purpose of maintaining the existing system of domination ⋯." Ralph Miliband : *Marxism and Politics*

কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, মাত্র আইনশৃংখলা, সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধেই নিয়োজিত থাকিবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কার্য হইবে ন্যূনতম। ইহাকে স্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্যনীতি (Laissez-faire) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অ্যাডাম স্মিথ, লক প্রভৃতি হইলেন ইহার তাত্ত্বিক প্রবক্তা।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপান্তর: সময় অতিবাহিত হওয়ার সংগে সংগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিতে থাকে, স্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্যনীতি বিদায় গ্রহণ করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হইয়া উঠে সক্রিয়। কারণ হইল সম্পত্তি-সম্পর্ক (property relations) সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন।

বস্তুত, রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যপরিধি প্রবর্তিত সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়—অর্থ-ব্যবস্থায় প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অবস্থিত সামাজিক বা সম্পত্তির সম্পর্ককে বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

ফিনান্স-মূলধন ও উপনিবেশিক সংঘর্ষ: আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয় ততই উহা একচেটিয়া ও ঔপনিবেশিক আকার ধারণ করিতে থাকে। উৎপাদন-সংস্থা বৃহদাকার হইয়া ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে এবং মূলধনও মুষ্টিমেয়ের হাতে দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়। ব্যাংক-মূলধনের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুঞ্জীভূত মূলধন ফিন্যান্স-মূলধনে (Finance Capital) পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই অবস্থায় পৌঁছাইলে উহার অসংগতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব অধিকমাত্রায় প্রকট হইয়া পড়ে। বহুলোকের সহযোগিতায় উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হইলেও উৎপন্নের ভোগ-দখল থাকে ব্যক্তিগত।[১] ইহাতে শ্রমিক ও সাধারণ লোকের সহিত মালিক শ্রেণীর বাধে সংঘর্ষ। ইহা ছাড়া উপনিবেশগুলিতে শোষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন ঐ সকল দেশের জনগণ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ জানায় ও পরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশ বহির্বাজারের অংশ লইয়া এবং বিদেশে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন লইয়া নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা: এই অবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা কি হইবে তাহা অনুমান করা মোটেই কঠিন নহে। রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তোষণ ও নিপীড়ন (reform and repression) নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণ লোকের অনতিক্রম্য আন্দোলনের চাপে সংস্কারমূলক কল্যাণকর কার্যাদি গ্রহণ করিতে হয়। অপরদিকে গণ-আন্দোলনের ফলে যখন আইনশৃংখলার প্রশ্ন দেখা দেয় তখন স্বভাবতই রাষ্ট্রকে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য দমনমূলক নিয়মকানুন

১. বহুলোকের সহযোগিতায় উৎপাদনকে 'সামাজিক চরিত্রের উৎপাদন ('social character of production'.—Stalin) বলা হয়।

প্রবর্তন ও বলপ্রয়োগ করিতে হয়। আবার একচেটিয়া কারবারের বিশৃংখলাকে সামাল দেওয়ার জন্ত রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক কাজকর্মেও লিপ্ত হইতে হয়।

ক্ষয়ক্ষতির জাতীয়করণ: ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে প্রসার আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতি ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে দেখা দেয়। যে-ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি দেখা দেয় সে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অগ্রসর হইয়া জাতীয়করণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে হয়। ইহাকে অনেকে ক্ষয়ক্ষতির জাতীয়করণ (nationalisation of losses) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপে সজ্জায় রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র Social Welfare State) বলিয়া অভিহিত হয়।

সমাজকল্যাণ-ব্যবস্থার একটি অসংগতি: বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট ও জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রকে অধিকমাত্রায় জাতীয়করণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও জনকল্যাণকর কার্যের মাধ্যমে বেকারত্ব দারিদ্র্য বুভুক্ষা ইত্যাদি সমস্তার সমাধানের দিকে ঝুঁকিতে হইতেছে। ইহার দ্বারা মূল সমস্তার কোন সমাধান সম্ভবপর কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়া গিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত কার্যাবলী সামাজিক উৎপাদন (social production) এবং ব্যক্তিগত মুনাফা ভোগের (appropriation of profit) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে পারে না। উৎপাদন-শক্তির ক্রম-বিকাশ ঘটিতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, উন্নত কলাকৌশলের প্রয়োগ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতির ফলে বর্তমানে সম্পদ উৎপাদনের বৃদ্ধি, শ্রমের সময়হ্রাস ও মানুষের সৃজনশীল শক্তির উন্মেষ প্রভৃতির সম্ভাবনা ও সুযোগ বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসংগতিও (contradiction) ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আহ্বান: পূর্বতন পরাধীন উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা পাওয়ার পর বহুজাতিক একচেটিয়া কারবারগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বাজার ও প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লাগিয়াই গিয়াছে। এ-অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় নাই বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, মাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই বুভুক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভব—ধনতান্ত্রিক মীমাংসায় কিছুই হইবে না।

৬। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (The Socialist System):

দেখা গিয়াছে, ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন সামাজিক কিন্তু মালিকানা ও মুনাফার ভোগদখল ব্যক্তিগত হয় বলিয়া উহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হয়। এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে—শোষক মালিকশ্রেণী ও শোষিত শ্রমজীবীদের মধ্যে।

বিপ্লবের মধ্য দিয়া উদ্ভব : শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্রতর আকার ধারণ করিলে শোষণের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। ইহার উদ্দেশ্য, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন ও ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান এবং সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা করিয়া শোষণের অবসান ঘটানো।

বলা হয়, এই বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে নেতৃত্বপ্রদানের উপযুক্তশ্রেণী হইল বিপ্লবী সর্বহারা শ্রমজীবীশ্রেণী।[১]

সর্বহারাশ্রেণীর নায়কত্ব : ইহারা ধনতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্য দিয়া সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হয়, রাজনৈতিক দিয়া দিয়া সচেতন থাকে এবং নিজেদের সংগ্রামী দল (communist party) গঠন করে। সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সর্বহারাশ্রেণীর প্রাথমিক কার্য হইল রাষ্ট্রশক্তিকে (State power) করায়ত্ত করা ও শ্রমজীবীদের হস্তে হস্তান্তরিত করা এবং বিপ্লবের পর সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব (dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠা করা।[২] এই হস্তান্তরিত করার অর্থ এই নয় বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্রকে হস্তগত করা—অর্থ, শ্রমজীবীদের নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করা। কারণ, শ্রমজীবীদের প্রতি আনুগত্যশীল নির্ভরযোগ্য সরকার—বিশেষ করিয়া নির্ভরযোগ্য সরকারী কর্মচারী ও সশস্ত্রবাহিনী না থাকিলে সর্বহারাশ্রেণী উহার উদ্দেশ্য পূরণ করিতে পারিবে না—অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ সাধিত হইবে না। শ্রমজীবীদের এই নায়কত্ব প্রয়োজন হয় এই কারণে যে বিপ্লবের পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি—যেমন, জমিদারশ্রেণী, বৃহৎ প্রতিক্রিয়াশীল মালিকশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি—মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারে এবং পূর্বতন অবস্থা ফিরাইয়া না আনিতে পারে। ইহা ছাড়া সর্বহারাশ্রেণীর নায়কত্ব এবং শ্রমজীবীদের দল বা দলগুলি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যে নেতৃত্ব প্রদান করিতে থাকে।

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র : অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, হিংসাত্মক বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা? মার্ক্সীয় মহলে এই প্রশ্নটি প্রথমে তুলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মান সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের (German Social Democracy) প্রতিনিধি এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইন (Edward Bernstein)।

১. "Of all the classes that stand face to face with bourgeoisie, the proletariat alone is a truly revolutionary class." Marx and Engels, *Communist Manifesto*

২. সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব দেশ, কাল ও অবস্থার ভেদাভেদে শ্রেণীগুলির অবস্থা অনুযায়ী রূপ গ্রহণ করে। সোবিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের পর ইহা ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্ব। আবার চীনে ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক নায়কত্ব (People's Democratic Dictatorship) ইহা গঠিত ছিল শ্রমিক, কৃষক, পাতি বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়াদের লইয়া। বর্তমানে এই নায়কত্ব হইল শ্রমজীবীদের—ইহা কৃষক ও শ্রমিকদের সহযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও অনুরূপপ্রকারের সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব রহিয়াছে।

তিনি একদিকে এঙ্গেলসের বন্ধু ছিলেন এবং অপরদিকে তেমনি তিনি ফেবিয়ান তত্ত্বের (Fabianism) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি হিংসাত্মক বিপ্লবকে অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে, ক্রমবর্ধমান সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। তিনি সমাজতন্ত্রের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেন। সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইবে জনসাধারণকে উন্নততর বস্তু-নিরপেক্ষ নৈতিক মানের (ethical and moral standards) দিকে লইয়া যাওয়া। শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার দ্বারা জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। সমাজতান্ত্রিক দলগুলি নির্বাচকদের ও শ্রমিকসংঘগুলির সমর্থন পাইয়া শক্তিশালী হইবে এবং রাষ্ট্রকে অধিক মাত্রায় সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত করিবে। সংকটের মধ্যে পড়িয়া ধনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িবে বার্ণস্টাইন মার্ক্সের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। কারণ দেখা গিয়াছে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সংকটের ফলে ভাঙিয়া তো পড়েই নাই, বরং উহাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ক্রমশ উন্নতির দিকে গিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব করিবার কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের দোষত্রুটিগুলি অপসারণ করিয়া সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়া যুক্তিযুক্ত। ইহার ফলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা হইবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের (democratic socialism) বক্তব্যও একই ধরনের। এ-বিষয়ে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' বক্তব্য কি তাহা পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অনেক 'মার্ক্সবাদী সংস্কারপন্থী' (Marxist 'Reformists') আছেন যাঁহাদের মতে বিশেষ অবস্থায় পার্লামেন্টীয় পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছান সম্ভব। সম্পূর্ণভাবে ধনতন্ত্রকে বিলুপ্ত করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইহাদের লক্ষ্য। সংস্কারমূলক কার্যাদি হইল আংশিক উপায় ও লক্ষ্য হইল ধনতন্ত্রের মূল উচ্ছেদন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে ইহার পথে বহু বাধাবিপত্তি আছে। সমাজতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বাধা দুরতিক্রম হইয়া দাঁড়ায় এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীকে রূপায়িত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অবশ্য 'মার্ক্সিস্ট সংস্কারবাদীরা' এ-বিষয়ে মার্ক্সের সতর্কবাণী সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আছেন। ("Reformist leadership knows perfectly well that Marx was right when he said that universal suffrage may give one the right to govern but does not give one the power to govern" Ralph Miliband : *Marxism and Politics*)।

বলা হয়, শাসনতান্ত্রিক পার্লামেন্টীয় (বা সংসদীয়) পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে এবং সামাজিক জীবনে সর্বক্ষেত্রে ইহাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সংগঠন (a network of organs of popular participation) গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং

রাষ্ট্রযন্ত্রের সংগঠন, কার্যপদ্ধতি ও আমলাদের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তিত করিতে হইবে।

বিপ্লবের চরম লক্ষ্য—কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন : অবশ্য সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের চরম লক্ষ্য হইল শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট সমাজ প্রবর্তিত করা। এইরূপ সমাজের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য হইল : (ক) সকল প্রকার শ্রেণীর অবসান, (খ) মানুষের মনুষত্ব পংগুকারী শ্রেণীবিভাগের বিলুপ্তিসাধন (crippling forms of division of labour); (গ) সহরাঞ্চল ও গ্রাম এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে প্রভেদের অবসান; (ঘ) বণ্টন-ব্যবস্থা এমন হইবে যে, যাহার যাহ প্রয়োজন, সে তাহা পাইবে (each will get according to his needs), (ঙ) বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তির মালিকানার অবসান করিয়া সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা; (চ) বলপ্রয়োগের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি (withering away of the State)।

অবশ্য এই ধরনের কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই গঠন করা সম্ভব হয় না। প্রথমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্র হইল কমিউনিস্ট সমাজের নিম্নতর স্তর এবং অন্তর্বর্তীকালীন সমাজ-ব্যবস্থা।[১]

সমাজতন্ত্র (বা নিম্নস্তরের কমিউনিস্ট সমাজ) ধনতন্ত্রের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে ধনতন্ত্রের ছাপ ও দুর্বলতা থাকিয়া যায়। এইগুলি দূরীকরণ করিয়াই প্রকৃত কমিউনিস্ট সমাজের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের আরও কিছুটা আলোচনা করা যাইতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ থাকিলেও বলা যায় যে, ইহা উৎপাদনের উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানা ও ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তিশীল সমাজ-ব্যবস্থা। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের মূলে রহিয়াছে সামাজিক মালিকানা। সমাজতন্ত্রের প্রথম কার্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো। একবারেই কিন্তু সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব হয় না। প্রথমে বৃহৎ ও মূল শিল্পগুলির সমাজীকরণ করা হয় এবং ধীরে ধীরে ছোটখাট কৃষিখামার ও শিল্পগুলিকে সমবায়ের ভিত্তিতে যৌথ মালিকানায় লইয়া যাওয়া হয়।[২] এখন উৎপাদন-সম্পর্ক সামাজিক মালিকানার উপর ভিত্তিশীল হয় বলিয়া শোষণের অবসান ঘটে এবং উৎপাদন-শক্তির উন্নতি ও উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে।

১. "What is usually called socialism was termed by Marx the *first* or *lower phase* of communist society." Lenin

২. "Our task will first of all consist in transforming the individual production into cooperative production and cooperative ownership ... ." Engels

বৈশিষ্ট্য: সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল উৎপাদনের উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানা।

দ্বিতীয়ত, উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানাই যথেষ্ট নয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করিবার জন্য উৎপাদনকে উন্নততর স্তরে লইয়া যাইতে হইলে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া মূলধন-দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে হইবে।

তৃতীয়ত, বলা হয় যে কমিউনিস্ট সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এমন প্রাচুর্যের সৃষ্টি হয় যাহাতে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকে তাহা দেওয়া সম্ভব হয়—অর্থাৎ লোকে তখন সাধ্যানুযায়ী কার্য করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদ ভোগ করিতে সমর্থ হয় ("From each according to his ability, to each according to need".)। কিন্তু সমাজতন্ত্রের স্তরে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে এমন প্রাচুর্য আসে না যাহাতে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা মিটানো সম্ভব হয়।

সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টনের নীতি হয় যে, লোকে ক্ষমতা অনুযায়ী কার্য করিবে এবং কার্যের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করিবে ("From each according to ability, to each according to work.")।

ধন-বৈষম্য: কার্যের বৈষম্যের অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্য বৈষম্যমূলকভাবে বণ্টিত হয় বলিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজে আয়-বৈষম্য থাকিয়াই যায়।[১] মাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে—প্রয়োজনের ভিত্তিতে উৎপন্ন বণ্টিত হয় বলিয়া প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকে তাহার আত্মবিকাশের সমান সুযোগ ভোগ করে।

ব্যক্তিরও সমাজের প্রতি কর্তব্য রহিয়াছে। তাহাকে সাধ্যানুযায়ী সামাজিক সম্পদ উৎপাদনে অংশগ্রহণ করিতে হয়। অপরপক্ষে নীতিটি হইল: "যে কাজ করিবে না সে খাইতেও পাইবে না" ("He that does not work, neither shall he eat".)।

চতুর্থত, ধনতান্ত্রিক সমাজে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ মানুষকে পংগু করিয়া ফেলে। ক্রমে সে হইয়া পড়ে যন্ত্রেরই অংশ। সমাজ শোষণমূলক এবং ধনতান্ত্রিক মালিকানা প্রবর্তিত বলিয়া যন্ত্রপাতিই শ্রমিকের উপর প্রভুত্ব করে—শ্রমিক উৎপাদনের উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে না। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় সুন্দর, পূর্ণাংগ মানবজীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

পূর্ণাংগ মানুষ গড়ার প্রথম ধাপ: সমাজতান্ত্রিক সমাজেও প্রথমে মানুষকে শ্রমবিভাগের মধ্যে কাজ করিতে হয়। এখন কিন্তু উৎপাদকশ্রেণী বা শ্রমিকরা উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা ভোগ করে বলিয়া আর যন্ত্রদাস নয়। ক্রমশ শিক্ষার প্রসার ও শ্রমিকদের কলাকৌশলগত প্রশিক্ষণের ফলে তাহারা সমগ্র উৎপাদন-

১. মার্ক্সের ভাষায় ইহাকে বলা হয় সমান কার্যের জন্য সমান বেতনের বুর্জোয়ানীতি।

পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। ফলে শ্রমের গতিশীলতা বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ প্রয়োজনমত শ্রমিকরা বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত হইতে পারে। তাহাদের মানসিক, কায়িক ও কৃষ্টিগত দিকের উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। তাই বলিয়া বিশেষীকরণ থাকিবে না তাহা নয়। তবে পংগুকারী শ্রমবিভাজন ক্রমশ অপসারিত হইতে ও কমিউনিস্ট সমাজের জন্য পূর্ণাংগ মানুষ গড়া হইতে থাকিবে।

কমিউনিস্ট সমাজ ও পূর্ণাংগ মানুষ: ক্রমশ সমাজ যখন কমিউনিস্ট সমাজের পর্যায়ে প্রবেশ করিবে তখন পূর্ণাংগ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগসুবিধা আসিয়া যাইবে। জ্ঞানবিজ্ঞান, কলাকৌশল, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, শিক্ষাদীক্ষা, কল্যাণমূলক কার্যাদি প্রভৃতির প্রসারের ফলে উৎপাদন সহজ-সরল হইবে মানুষ তখন বিজ্ঞানের কলাকৌশলের সাধারণ নীতিগুলি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবে, উপাদানের প্রাচুর্য আসায় সকলের প্রয়োজন মিটানো যাইবে, কার্যের সময় কমিয়া যাইবে এবং কৃষ্টিগত কার্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে। এই সকলের ফলে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হইবে—শ্রমবিভাগ বা শ্রেণীশোষণ তাহাকে আর পংগু করিয়া রাখিতে পারিবে না। বলা হয়, কমিউনিস্ট সমাজে শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে—কাজ তাহার কাছে আনন্দেরই দ্যোতক (a pleasure)।[১]

মার্ক্সের মতে, কমিউনিস্ট সমাজে শ্রম হইয়া দাঁড়ায় 'জীবনের প্রধানতম প্রয়োজন' (Life's prime want)।[২] আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও অভ্যাসের দরুন লোকে পছন্দমত কার্য করিয়া যায়। তাহারা ইহাতে আনন্দই পায়।

পঞ্চমত, ধনতান্ত্রিক সমাজে নগরাঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, গ্রামাঞ্চল শোষিত ও অবহেলিত হওয়ায় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধিজীবীরা কায়িক শ্রমকে শোষণ করে।

দ্বন্দ্বমূলক অসংগতি: সুতরাং গ্রাম ও নগরাঞ্চল এবং কায়িক শ্রম ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক অসংগতি (antagonism) থাকে।

সমাজতন্ত্রে এই দ্বন্দ্ব দূরীভূত হইতে থাকে। কারণ, সমাজতন্ত্রে শোষণের কোন অবকাশ থাকে না। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সমাজতন্ত্রে নগর ও গ্রাম এবং বুদ্ধিজীবী ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য (distinction) থাকিয়া যায়। ক্রমশ অবশ্য গ্রামগুলির উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের প্রয়োগ, শিক্ষাদীক্ষার প্রসার, যৌথ খামারের সৃষ্টি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার বিস্তার প্রভৃতির ফলে কৃষকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হইয়া দাঁড়ায় বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্থক্যও

১. "Productive labour becomes a pleasure instead of a burden." Engels: *Anti-Duhring*

২. *Critique of the Gotha Programme.*

ক্রমশ দূরীভূত হইতে থাকে। শ্রমজীবীরাও 'জাতে উঠিয়া' ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ কুশলী ও বিজ্ঞানী প্রভৃতিতে পরিণত' হয়। তবুও কিন্তু সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী—এই দুই শ্রেণী থাকিয়া যায়। পণ্য-উৎপাদন (commodity production)—অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থাও চালু রাখিতে হয়।

কমিউনিস্ট সমাজে অসংগতির অপসারণ : কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রাম ও সহর এবং কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের মূল পার্থক্য (essential distinction) সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া যায়। শ্রেণীবিন্যাস এবং সম্পত্তির পার্থক্যও অনুরূপভাবে বিলুপ্ত হয়। সমাজ হইয়া দাঁড়ায় সুসম্বদ্ধ শ্রেণীহীন সমাজ এবং উৎপাদনের মালিকানা বর্তায় সমাজের হস্তে। স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ ও জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য অপসৃত হয়। অর্থের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। 'যাহার যাহা প্রয়োজন' (to each according to his need)—এই নীতি অনুসৃত হইতে থাকে। সমগ্র উৎপাদন সমাজের হাতে চলিয়া যায় ও সমাজই উহাকে পারকল্পিতভাবে সংগঠিত করে ও উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখে।

ষষ্ঠত, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অন্যান্য প্রকারের দ্বন্দ্বও থাকে। প্রথমাদকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজাবরোধী শক্তিগুলি কার্য করিতে থাকে। ইহাদিগকে দমন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের জন্য প্রয়োজন হয়—রাষ্ট্র, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব ও শ্রমজীবী দলের। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রমজীবীদের রাষ্ট্র—ইহার সহিত জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় ইহা বহুগুণে অধিকমাত্রায় গণতান্ত্রিক। কারণ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু জনসাধারণকে ক্রমবর্ধমান-মাত্রায় রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি : আবার যখন কমিউনিস্ট সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমস্ত শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে বলিয়া রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়।[১] স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র বিলুপ্তির পথে চলে ("The State is not abolished, it withers away." Engels)।

চ। কমিউনিস্ট সমাজ (Communist Society):

কমিউনিস্ট সমাজের চূড়ান্ত রূপের পূর্ণাংগ চিত্র অংকন করা কঠিন হইলেও মোটামুটি উহার একটি রূপরেখা দেওয়া যাইতে পারে।

রূপরেখা : প্রথমত, কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে জনগণকে আর শ্রমবিভাগের দাস থাকিতে হইবে না এবং কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে পার্থক্য দূর হইয়া যাইবে। মানুষ তখন মাত্র জীবিকার্জনের জন্য কাজ করিবে না, করিবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের প্রধানতম অনুপ্রেরণা বলে (prime necessity of life)। উৎপাদনের এত প্রাচুর্য হইবে যে সকলের পক্ষে সর্বাংগীণ পূর্ণাংগ বিকাশের সুযোগ সম্ভবপর হইবে এবং সমাজের সম্পদও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। ফলে প্রত্যেকে

১. "The interference of the state power in social relations becomes superfluous."

তাহার সাধ্যানুযায়ী কার্য করিবে এবং প্রয়োজনমাফিক সম্পদ ভোগ করিতে পাইবে (From each according to his ability, to each according to his needs)।

রূপরেখার বিশ্লেষণ: প্রদত্ত রূপরেখার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কমিউনিস্ট সমাজে (১) উৎপাদনের সমস্ত উপাদান সমাজের হাতে চলিয়া যাইবে। (২) সকল প্রকারের শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য, গ্রাম ও সহরের মধ্যে বিভেদ, নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ইত্যাদি অপসারিত হইবে। (৩) জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, মানুষের মধ্যে নৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের শক্তির সর্বাংগীণ বিকাশ প্রভৃতির ফলে উৎপাদিকা-শক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইবে যাহার দরুন সকলেই প্রয়োজনানুযায়ী ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। (৪) পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা অপসারিত হইবে। জীবিকার্জনের জন্য মানুষকে এখন আর কার্য করিতে হইবে না, সে কাজ করিবে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে। (৫) সকল ভেদাভেদ ও শ্রেণীশোষণ অপসারিত হওয়ায় কমিউনিস্ট সমাজে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্য বিরাজ করিবে। মানুষ তখন বাতাবরণের নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিতই করিয়া চলিবে। ইহা তাহার সুন্দর জীবনের সহায়ক না হইয়া পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ বাহ্য প্রকৃতি ও সামাজিক নিয়মাবলীর হাতে ক্রীড়নক হওয়ার পরিবর্তে উহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সমাজের অগ্রগতি নির্ধারণ এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিবে।

প্রয়োজনীয়তার রাজ্য হইতে স্বাধীনতার রাজ্যে: এঙ্গেলসের ভাষায় বলা যায়, মানুষ প্রয়োজনীয়তার রাজ্য হইতে স্বাধীনতার রাজ্যে পদক্ষেপ করিবে।[১]

---

(৬) সকল প্রকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্য ফুরাইয়া যাইবে। কারণ রাষ্ট্র হইল বলপ্রয়োগের যন্ত্র এবং দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ না থাকায় ইহা নিজ হইতেই অবলুপ্ত হইবে। মার্ক্সবাদীদের মতে, কমিউনিস্ট সমাজের মানুষ নৈতিক ও জ্ঞানের দিক দিয়া এত উন্নত যে তাহার পক্ষে রাষ্ট্রবিহীন সমাজের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইবে। তবে বলা হয়, যে-পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিবে সে-পর্যন্ত কমিউনিস্ট সমাজেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যাইতে পারে।[২]

১. "The objective, external forces which have hitherto dominated history, will pass under the control of men themselves...It is humanity's leap from the realm of necessity into the realm of freedom." Engels : *Socialism, Utopian and Scientific*

২. এখানে অবশ্যই উল্লেখ যে, সমাজবিকাশের যে বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা যে একের পর এক পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবে এমন কোন কথা নাই। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে যে পরিণত ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব না ঘটিয়াও অনুন্নত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাশিয়া ও চীনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (See David Horowitz : *Imperialism and Revolution*, p. 32)

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. ইতিহাসে পাঁচ প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

২. ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস। সংকোচনশীলতা এবং অস্তিত্ব রাখিবার প্রচেষ্টাই বর্তমান রূপের মধ্যে প্রতিফলিত।

৩. কমিউনিস্ট সমাজের পূর্ববর্তী হইল সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা।

৪. কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে উহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায় বলিয়া।

অনুশীলনী

1. **What are the main driving forces for the development of society ?**

[সমাজবিকাশের পশ্চাতে মূল শক্তিগুলি কি কি ?] (১১০-১১ পৃষ্ঠা)

2. **Give in brief the main characteristics of the Primitive Communal Society. Was there private property in such a society ?**

[আদিম সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এরূপ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল কি ?] (১১১-১৩ পৃষ্ঠা)

3. **Describe the nature and characteristics of the Slave Society. In what sense was the slave the property of his master ?**

[দাস-সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। কোন্ অর্থে দাস তাহার প্রভুর সম্পত্তি ছিল ?] (১১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

4. **Explain the characteristics of the Feudal Society.**

[সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।] (১১৫-১৭ পৃষ্ঠা)

5. **What are the characteristics of the Capitalist Society ? How did the Capitalist System develop ?**

[ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কিভাবে বিবর্তিত হইয়াছে ?] (১১৯-২৪, ১১৫-১৭ পৃষ্ঠা)

6. **What is Surplus Value ? How does it arise ?**

[উদ্বৃত্ত-মূল্য কাহাকে বলে ? ইহা কিভাবে সৃষ্ট হয় ?] (১১৯-২০ পৃষ্ঠা)

7. **What is a Socialist System ? What are its characteristics ?**

[সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?] (১২৪-৩০ পৃষ্ঠা)

8. **What is the difference between a Socialist Society and a Communist Society ? Are there any classes in a Socialist Society ?**

[সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত কমিউনিষ্ট সমাজের পার্থক্য কি ? সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে কি কোন শ্রেণী থাকে ?] (১৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

9. **In what sense is there a leap from the realm of necessity to the realm of freedom in the Communistic Society ?**

[কমিউনিষ্ট সমাজে মানুষ প্রয়োজনীয়তার রাজ্য হইতে স্বাধীনতার রাজ্যে প্রবেশ করে—এ উক্তির তাৎপর্য কি ?] (১৩১-৩১ পৃষ্ঠা)

৬ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ
(THEORIES OF THE NATURE OF THE STATE)

" ...... *from the days of Greece onwards States have tended to be personified.*" T. D. Weldon

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. জৈব মতবাদ কি রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা, বা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র ?
২. আদর্শবাদের (ভাববাদের) কল্যাণকর ও বিপজ্জনক দিকগুলি কি কি ?
৩. রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? এই ধারণার সারবস্তু কতটুকু ?

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ফলে সৃষ্ট হইয়াছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ। এই মতবাদগুলির কয়েকটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। বলা যায়, এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ মোটামুটি তিনটি : (ক) জৈব মতবাদ, (খ) আদর্শবাদ (বা ভাববাদ), এবং (গ) মার্ক্সীয় মতবাদ।

ক। জৈব মতবাদ (The Organic or Organismic Theory of the State) : জৈব মতবাদের সমর্থকগণ জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাণিপ্রকৃতির অনুরূপ রাষ্ট্রপ্রকৃতি : এই মতবাদে দেখানো হয় যে জীবদেহের বিভিন্ন অংশের সহিত জীবের যেরূপ সম্পর্ক, রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সেইরূপ সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেরূপ পরস্পরের এবং সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের যেরূপ কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই—তেমনি রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের এবং রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরও পৃথক সত্তা বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণীর প্রকৃতির অনুরূপ এবং রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা কোষ বলিয়া গণ্য করা চলে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জীবদেহ যেরূপ কোষের সমবায়ে সৃষ্ট হয় রাষ্ট্রও সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়। এবং জীবের কোন অংগ ও সমগ্র জীবদেহের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক, বৃক্ষপত্রের সহিত বৃক্ষের যেরূপ সম্পর্ক—ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেইরূপ সম্পর্ক।[১]

১. "... as is the relation of the hand to the body, or the leaf to the tree, so is the relation of man to society." . Leacock

রাষ্ট্র জীবন্ত সামাজিক প্রাণী : অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রাণী ও রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনাকে আরও চরম রূপ দান করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি শুধু প্রাণিদেহের অনুরূপ নহে, রাষ্ট্র একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী—প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র নহে। রাষ্ট্রের মধ্যে জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের—যথা, জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় মৃত্যু প্রভৃতির সন্ধান মিলে। রাষ্ট্র সামাজিক প্রাণী বলিয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও জৈবিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে একজাতীয়। জৈব মতবাদ এইরূপ চরম রূপ গ্রহণ করে ব্লুন্টসলি (Bluntschli) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হস্তে।

জৈব মতবাদের দুইজন ব্যাখ্যাকর্তা : জৈব মতবাদের পরিস্ফুটনে ব্লুন্টস্‌লি ছাড়া যে দার্শনিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হইলেন ইংরাজ চিন্তাবীর হার্বার্ট স্পেন্‌সার। তবুও বলা যায়, ব্লুন্টস্‌লির হস্তেই জৈব মতবাদ পূর্ণ ও চরম রূপ গ্রহণ করে।

ক। ব্লুন্টস্‌লি ব্লুন্টস্‌লির মতে, রাষ্ট্র ব্যক্তি-মানবের প্রতিমূর্তি। তিনি বলেন, কোন তৈলচিত্র যেমন শুধু কয়েক ফোঁটা তৈলের সমষ্টি অপেক্ষা আরও কিছু, মর্মর মূর্তি যেমন কয়েকটি মর্মর প্রস্তরের টুকরার সমষ্টি অপেক্ষাও অধিক তেমনি রাষ্ট্র কয়েকটি 'নিয়মকানুনের সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু।

অর্থাৎ, রাষ্ট্র অন্যতম প্রাণবন্ত জীব, নিয়মশৃংখলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে।

খ। হার্বার্ট স্পেন্‌সার : হার্বার্ট স্পেন্‌সারই রাষ্ট্রের জৈব মতবাদের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কথার অবশ্য এই অর্থ নয় যে, তিনি বিজ্ঞানের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরং ঘটনাটি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বার্কারের মতে, স্পেন্‌সারের কয়েকটি রাজনৈতিক পূর্বধারণা (political preconceptions) ছিল এবং তিনি এই সকল পূর্বধারণাকে মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সম্ভাব্য উপমা ও সাদৃশ্য আহরণ করিয়াছিলেন। এইভাবে স্পেন্‌সার রাষ্ট্র সম্বন্ধে জীববৈজ্ঞানিক ও বিবর্তনমূলক ধারণায় উপস্থিত হন।

সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধেই স্পেন্‌সারের ধারণা ছিল বিবর্তনমূলক। তাঁহার মতে, জীবদেহ ও সমাজদেহ—উভয়েই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে জীবন সুরু করে। তাহার পর একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উভয়েই বিবর্তিত হয়। বিবর্তনের বিশেষ এক স্তরে আসিলে তাহাদের গঠন জটিল হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের সরলতা থাকে না বটে, কিন্তু সাদৃশ্য নির্দেশ করা কঠিন হয় না। বিবর্তনের সূত্রপাত হইতে আজ পর্যন্ত যে-কোন স্তরে জীবদেহ ও সমাজদেহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সমতার সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নতম জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন উদরবৃত্তি, আদিম মানুষেরও তেমনি বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধবৃত্তি। সমাজ-বিবর্তনের সংগে সংগে অংগপ্রত্যংগের মধ্যে কর্মবিভাগও লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

প্রবৃত্তিগত সাদৃশ্য : জীবদেহ ও সমাজদেহ—উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিবর্তনের সকল স্তরেই বর্তমান রহিয়াছে। "হস্ত যেরূপ বাহুর উপর নির্ভরশীল এবং বাহু যেরূপ শরীর ও মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল, সমাজদেহের বিভিন্ন অংশও সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।"[১]

গঠনগত সাদৃশ্য : স্পেন্সার সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যও বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহা প্রাণীর নিয়মিতকরণ-পদ্ধতির (regulating system) অনুরূপ।

স্পেন্সারের মতবাদের ত্রুটি : এইভাবে রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনার দ্বারা রাষ্ট্র যে একটি জীবন্ত প্রাণী—স্পেন্সার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য, রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে যে-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা সম্পূর্ণভাবে স্পেন্সারের লক্ষ্য এড়াইয়া যায় নাই।

বস্তুত, এই বৈসাদৃশ্যের উপরই তিনি তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে (individualism) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জৈব মতবাদের অন্যতম অস্বীকার মাত্র।

সমালোচনা : জৈব মতবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক গার্ণার বলিয়াছেন, যদি এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয় যে সমাজের সভ্যরা ব্যক্তিগতভাবে সমগ্র সংস্থা বা সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজও ইহার অংশ বা ব্যক্তিসমূহের উপর নির্ভরশীল তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার অবতারণা করা যায় না।

মতবাদের অযৌক্তিকতা কিন্তু প্রাণীদের গঠন ও কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যাবলীর মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা অযৌক্তিক। জৈব মতবাদ এইরূপ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে যাহা সম্পূর্ণ উপরিতলগত—মূলগত নহে (superficial not fundamental), এবং সকল ক্ষেত্রে ইহা সাদৃশ্যের নির্দেশও করিতে পারে না—পারা সম্ভবও নহে।

(১) ব্যক্তি জীবদেহের কোষের সদৃশ নহে : ব্যাখ্যা করিয়া ইহা সহজেই দেখাইতে পারা যায় যে রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তি জীবদেহের কোষের সদৃশ নহে। ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছা আছে এবং এইরূপ অনেক কার্য ও স্বার্থ আছে যাহা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অপরদিকে জীবদেহের কোষের কোন স্বতন্ত্র জীবন নাই, ইচ্ছা নাই এবং সমগ্র জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখা ছাড়া ইহার আর কোন উদ্দেশ্য বা কার্য নাই।

১. "... Just as the hand depends on the arm and the arm upon the body and the head, so do the parts of the social organism depend on each other."

ব্যক্তিকে সমাজ বা রাষ্ট্র হইতে বিচ্যুত করিলেও সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কোষকে জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সংগে সংগেই তাহা বিনষ্ট হয়।

(২) রাষ্ট্র ও প্রাণিদেহের মধ্যে প্রকৃতিগত সুস্পষ্ট পার্থক্য: কোন কোষের পক্ষে একসংগে দুইটি জীবদেহের অংগীভূত হওয়া অসম্ভব, ব্যক্তি কিন্তু একই সময়ে একাধিক সংগঠনের সভ্য হইতে পারে। প্রত্যেক জীবদেহ প্রাণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লাভ করে পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে। রাষ্ট্রের বেলায় কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় আপনা হইতেই। জীবের জন্মপদ্ধতির সহিত রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্তের কোন সংগতি নাই। জেলিনেক প্রমাণ করিয়াছেন যে অনেক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে শুধু তরবারির দ্বারা, জীবের জন্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নহে। উপরন্তু, বৃদ্ধি ক্ষয় ও মৃত্যু যেরূপ প্রাণিজীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, রাষ্ট্রজীবনের সহিত সেইরূপ নহে। রাষ্ট্রের ক্ষয় ও মৃত্যু নাও হইতে পারে।

(৩) রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আলোকসম্পাতের অভাব: পরিশেষে বলা যায়, জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করে না—ইহা হইতে আমরা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি নির্ধারণ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জৈব মতবাদকে তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে ব্যবহার করিয়াছেন; অপরদিকে ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ দার্শনিক রাষ্ট্রকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে কোনরূপে গণ্ডি দিয়া সংকুচিত করা চলিবে না। ইহার ফলে রাষ্ট্র সর্বক্ষম ও সর্বাত্মক বলিয়া গণ্য হইতে থাকে এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে আদর্শবাদ জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে জৈব মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইতে চরম সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপসংহার: উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য অধ্যাপক গেটেল বলেন, যদিও রাষ্ট্রজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবুও জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ নহে।[১]

অধ্যাপক হবহাউসের (L. T. Hobhouse) মতে, রাষ্ট্রকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করা অর্থহীন।

তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক মূল্য: জৈব মতবাদের এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, ইহার কিছু তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তত্ত্বের দিক দিয়া বলা যায়, ইহা রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের মূলগত ঐক্যের উপরও

১. "... the organismic theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the State nor a trustworthy guide to state activity."

যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। ইতিহাসের দিক দিয়া এই মতবাদ রাষ্ট্র বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ইহা প্রচার করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মতবাদ যে, রাষ্ট্র কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান বা মানুষের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রবিশেষ (mechanism) তাহার বিরোধিতা করিয়াছে। ইহার ফলে তৎকালীন প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল, সমাজে ভাঙনের পথ রুদ্ধ হইয়া সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধের নির্দেশই জৈব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান।

জৈব মতবাদের প্রধান দুর্বলতা—ভ্রান্ত বা উপরিতলগত সাদৃশ্যের উপর ইহার নির্ভরশীলতা—ইহার গুরুত্বকে অবশ্য অনেকাংশে লঘু করিয়াছে। এই কারণে জেলিনেক বলেন, আমাদের পক্ষে মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করা উচিত।

পরিত্যক্ত মতবাদ : বস্তুত, এই মতবাদ বর্তমানে পরিত্যক্তই হইয়াছে। কোকার বলেন, বর্তমানে ইহার অস্তিত্বের সন্ধান একমাত্র হেগেলীয় দর্শনেই (Hegelian Philosophy) পাওয়া যাইবে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিজের জন্যই, ইহার বিবর্তন ইহার নিজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং সকল অংশই জাতীয় সমষ্টিগত জীবনের উপর নির্ভরশীল।

খ। আদর্শবাদ (বা ভাববাদ) (Idealistic Theory of the State) :

আদর্শবাদ (বা ভাববাদ[১]) হইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদ। ইহাকে চরম মতবাদ (Absolute Theory) এবং আধিবিদ্যক তত্ত্ব (Metaphysical Theory) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। জোডের (C. E. M. Joad) মতে, এই মতবাদের উদ্ভবের সন্ধান পাওয়া যায় রাষ্ট্র ও মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকদের বিশেষ করিয়া প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের ধারণার মধ্যে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই।[২] মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই দুই দার্শনিকের ধারণা ছিল যে, মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব বলিয়া একমাত্র রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে সে তাহার জীবনকে সুন্দর করিয়া, সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

গার্ণার বলেন, উপরি-উক্ত অখণ্ডনীয় মতবাদ হইতে নূতন এক রাজনৈতিক দর্শনের উদ্ভব হইল যাহা রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিল এবং ইহাতে প্রায় দেবত্ব আরোপ করিয়া ইহার স্তবস্তুতি সুরু করিল। এই স্তবস্তুতিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় :

১. Idealistic শব্দটি idea বা 'ভাব' হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেক সময় তত্ত্বটিকে 'ভাববাদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরটিকে idea বা 'ভাব' বলিতে বিশেষ আদর্শও বুঝায় বলিয়া তত্ত্বটিকে 'আদর্শবাদ' আখ্যা দেওয়াও অযৌক্তিক নহে।

২. ১০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার : রাষ্ট্রের সার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত, ইহা মানুষের স্বাভাবিক অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন। পরিণতিতে ইহা চরম ও সর্বাত্মক। ইহা কোন অন্যায় করিতে পারে না; ইহা ভালমন্দ—যাহাই হউক না কেন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ বা ইহার আজ্ঞাপালনে অস্বীকার করা অযৌক্তিক ও অন্যায়।

এইভাবে রাষ্ট্রকে উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল এবং রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া হইল বেদীমূলে প্রণাম করিতে এবং বেদীতে অধিষ্ঠিত দেবতাকে পূজা করিতে।

হেগেলীয় রাষ্ট্র : দেবত্ব আরোপের ফলে হেগেলের ভাষায় রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল, 'অন্যতম আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মচেতনাসম্পন্ন আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি'। (a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualising individual)। এই অতি-মানবীয় ব্যক্তি বা বস্তুর স্থান নির্দিষ্ট হইল সংগঠিত জনসমাজের উপর। প্রচার করা হইতে লাগিল যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের নিজস্ব ইচ্ছা আছে, অধিকার আছে, স্বার্থ আছে, এমনকি নির্দিষ্ট নৈতিক মানও আছে। এই ইচ্ছা, অধিকার, স্বার্থ ও নৈতিক মানের সহিত ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রভৃতির সংগতি নাও থাকিতে পারে। যদি না থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি তাহার অপ্রকৃত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, কারণ রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়।

রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ : এইভাবে ব্যক্তির প্রকৃত ও অপ্রকৃত ইচ্ছার (real and unreal will) মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইল, রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করা হইল—গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের অনুসরণে রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অধিকার প্রদান করা হইল।[১]

আদর্শবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র-দেবতাই সভ্যতা ও প্রগতির মূলসূত্র, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ নহে।

আদর্শবাদের ক্রমবিকাশ : আদর্শবাদের উৎসের সন্ধান গ্রীক রাজনৈতিক দর্শনে পাওয়া গেলেও ইহা রূপগ্রহণ করে জার্মান দার্শনিকগণের হস্তে এবং অনেকের মতে, এই জার্মান দার্শনিকগণের মধ্যে কান্তকেই (Immanuel Kant) আদর্শবাদের জনক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

কান্ত : কান্ত রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ঐশ্বরিক অবদান বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্র কোন ভুল করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ঐশ্বরিক অবদান বলিয়া ইহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অন্যতম পবিত্র কর্তব্য।

হেগেল : কান্তের পর হেগেলের (Hegel) হস্তে আসিয়া আদর্শবাদ চরম পরিণতি লাভ করে। হেগেলের মতে, সমাজে বাস করিয়া মানুষ যে-স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাই প্রকৃত

১. "Every beast is driven to the pasture with blows" ... similarly "only force will compel mankind to act for their own good..." Heraclitus

স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের অধীনে বাস করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মানুষ এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধিতে রাষ্ট্রই এই অদ্বিতীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া ইহা প্রকৃত ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

রাষ্ট্র সাধারণের ইচ্ছার ভাণ্ডার : রাষ্ট্রের এই ইচ্ছা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। ইহাকে সাধারণের ইচ্ছা (General Will) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী এই সাধারণের ইচ্ছারই প্রকাশ বলিয়া ইহা সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সাধারণের ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধিলে ব্যক্তির ইচ্ছাকে পরিবর্তিত করিতে হইবে, কারণ সাধারণের ইচ্ছা সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়।

'বিশ্বে ঈশ্বরের পদক্ষেপ' : রাষ্ট্রকে এইভাবে সাধারণের ইচ্ছার ভাণ্ডার বলিয়া কল্পনা করিলে সহজেই ধারণা করা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্থকতা তাহার আপনার মধ্যেই নিহিত এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্ব রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির জীবনের উপর পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত। ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে চরম মতবাদ। রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দেওয়াই এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, হেগেলীয় দর্শনে ইহা এইরূপই গ্রহণ করিয়াছে। হেগেলীয় রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঐশ্বরিক অবদান—'বিশ্বে ঈশ্বরের পদক্ষেপ' (March of God on earth)। সুতরাং ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্রকে আমাদের পূজা করিতে হইবে।[১]

পরবর্তী জার্মান আদর্শবাদিগণ : হেগেলের পর জার্মান দার্শনিকগণ আদর্শবাদকে আরও চরম করিয়া তুলিয়া ইহাকে যুদ্ধবাদে (Militarism) পরিণত করেন। ট্রিটস্‌কে (Treitschke) মেকিয়াভেলির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে, রাষ্ট্র শক্তিরই প্রতীক এবং সকলকে নির্দেশ দিলেন এই শক্তির পূজা করিতে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ট্রিটস্‌কে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব তাহার পাপেরই প্রতীক। সুতরাং রাষ্ট্রকে বৃহৎ হইতে হইবে; বৃহৎ হওয়ার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের। অতএব, যুদ্ধ অন্যায় নয় বরং ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে মহান্ ও আবশ্যিক কর্তব্য। অনেকের মতে, ট্রিটস্‌কে ও তাঁহার অনুবর্তিগণের এইরূপ প্রচারের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

ইংরাজ আদর্শবাদিগণ : ব্রাড্‌লি, বোসান্‌কোয়েত, গ্রীণ প্রভৃতি ইংরাজ দার্শনিকদের হস্তে আদর্শবাদ বেশ কিছুটা পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। গ্রীণ প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিক রাষ্ট্রকে চরম বলিয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানির্দেশ করিয়াছিলেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তোলাই রাষ্ট্রের কর্তব্য।

সমালোচনা : আদর্শবাদের প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে, ইহা অবস্থা লইয়া আলোচনা করে না—আদর্শ বা ভাব লইয়া আলোচনা করে। আদর্শবাদ যে-রাষ্ট্রের কল্পনা করে—অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় ও নৈতিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র—তাহা মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কোনদিন হইতেও পারে না। ইহা কল্পিত স্বর্গরাজ্যের কল্পিত রাষ্ট্র।[২]

---

১. ধারণাটিকে এইভাবেও প্রকাশ করা হয় : "The State is the Divine Idea as it exists on earth.... We must therefore worship the state as the manifestation on the Divine on earth."

২. "The State of which it conceives ... may be laid up in heaven, but it is not established on earth." Barker

আদর্শবাদীর ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ: রাষ্ট্র মানুষের আবশ্যিক প্রতিষ্ঠান; আবশ্যিকভাবেই মানুষ ইহার সভ্য হয়। ইহার ভিত্তি হিসাবে ব্যক্তিসমূহের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় ও নৈতিক সহযোগিতার কল্পনা করার অর্থ হইল রাষ্ট্রকে মাত্র আদর্শের দৃষ্টিতে দেখা, বাস্তব দৃষ্টিতে নহে।

এই আদর্শের দৃষ্টিতে দেখা হয় বলিয়া রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। সমালোচকগণ বলেন, ইহা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। রাষ্ট্র ও সমাজ এক এবং অভিন্ন নহে।

সমাজের মধ্যে আবশ্যিক সংগঠন রাষ্ট্র ছাড়াও স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত নানারূপ সংগঠন—যথা, আর্থিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি থাকে। আধুনিক কালে মানুষ ইহাদের সহিত উত্তরোত্তর নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

বর্তমানে ব্যক্তিকে যখন কর প্রদান করিতে হয়, নির্বাচনে ভোট দিতে হয়, কিংবা বিচারকার্যে জুরির আসনে বসিতে হয়—মাত্র তখনই সে রাষ্ট্রের সংস্রবে আসে। এই সকল ব্যাপার ব্যক্তির জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে না। অপরদিকে তাহার ব্যক্তিগত জীবনে শ্রমিক সংঘ অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। প্রতিনিয়তই তাহাকে ইহাদের দৈনন্দিন কর্মপরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সাধারণ নাগরিকের নিকট রাষ্ট্র অপেক্ষা তাহার সংঘই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্য স্বীকার করে না বলিয়া আদর্শবাদ বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন না হইয়া পারে না। ইহা রাজনৈতিক দর্শন হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ইহাকে রাজনৈতিক মতবাদ বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না।

প্রবৃত্তির উপেক্ষা: দ্বিতীয়ত, আদর্শবাদে ব্যক্তির আত্মচেতনা ও বিচারশক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ব্যক্তি যেমন তাহার চেতনা ও বিচারশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি সে প্রবৃত্তির দ্বারাও পরিচালিত হয়। আদর্শবাদ মানুষের প্রবৃত্তির দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। সুতরাং ইহা আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

প্রকৃত ও অপ্রকৃত ইচ্ছা: তৃতীয়ত, আদর্শবাদে ব্যক্তির প্রকৃত ও অপ্রকৃত ইচ্ছার (real and unreal will) মধ্যে যে-পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা যদি রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় তবে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তি তাহার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বলপ্রয়োগের দ্বারা ইহা তাহাকে বুঝাইতেও হইবে। সুতরাং চোরকে যখন পুলিস ধরিয়া লইয়া যায় তখন সে চোরের প্রকৃত ইচ্ছার উপলব্ধিতে সহায়তা করে মাত্র। এই প্রকৃত ইচ্ছার উপলব্ধিই প্রকৃত স্বাধীনতা।

প্রকৃত স্বাধীনতা : সুতরাং আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে আইন ও স্বাধীনতা এক এবং অভিন্ন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, এই দৃষ্টিভংগি অনুসারে আইন মান্য করার মধ্যেই রহিয়াছে স্বাধীনতার উপলব্ধি।[১]

এইভাবে আইনকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া কল্পনা করিয়া আদর্শবাদে ন্যায় ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারিতার সমর্থন করা হইয়াছে, ব্যক্তিসত্তার বিনাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হবহাউসের মতে, আদর্শবাদে যাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র।

হেগেলীয় দর্শন সম্পর্কে হবহাউস বলেন যে, রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর সংগঠন। ইহার কল্যাণের স্থান যে-কোন ব্যক্তির কল্যাণের উর্ধ্বে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার সার্থকতা ইহারই মধ্যে নিহিত এরূপ মনে করিয়া ইহাকে পূজা করিলে মিথ্যা দেবতার কল্পনা করিতে হয়।

হবহাউসের ন্যায় বহু দার্শনিক এইরূপ মিথ্যা দেবতার কল্পনা করিয়া ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে, ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ইহাতেই রাষ্ট্রের সার্থকতা।

পরিশেষে, সমাজ-সংস্কারকগণ বলেন যে আদর্শবাদ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না, সমাজের অপূর্ণ অবস্থাকেই আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতে চায়। অ্যারিস্টটল ক্রীতদাস প্রথাকে আদর্শের রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন; গ্রীণ ধনতন্ত্রবাদকে আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন; হেগেল প্রাসিয়ান স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

রক্ষণশীলতার অন্যতম কলাকৌশল : সুতরাং সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে আদর্শবাদ রক্ষণশীলতার কলাকৌশলের অন্যতম মাত্র।[২]

ইহা সংস্কারকের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিতে চায়।

উপসংহার : এইভাবে আদর্শবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, রাষ্ট্রের আদর্শগত ধারণা হিসাবে এই মতবাদের কিছু মূল্য আছে। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির অন্ধ আনুগত্য যে কতকটা প্রয়োজনীয়, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তিকে যে কখনও কখনও আত্মোৎসর্গ করিতে হয়—তাহা সমালোচনার উর্ধ্বে। তত্ত্বের দিক দিয়াও বলা যায়, আদর্শবাদের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় যে,

১. For the idealist "... whenever there is law there is freedom. Thus 'freedom' for him means little more than the right to obey the law." Bertrand Russell

২. "Idealism is a part of the tactics of capitalism." Hobson

রাষ্ট্রই আইনের উৎস এবং বলপ্রয়োগের দ্বারাই শেষ পর্যন্ত আইনকে বলবৎ করা হয়—তাহাও অখণ্ডনীয়। তবে আদর্শবাদ বলপ্রয়োগকে যে নীতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা যুক্তিসংগত নহে।

আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কারণ: বলা যায়, আদর্শবাদের বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে তাহা আদর্শবাদের বিকৃত ব্যাখ্যারই ফল। আদর্শবাদ যদি ট্রিটস্‌কে প্রভৃতির হস্তে যুদ্ধবাদে পরিণত না হইত তাহা হইলে আদর্শবাদকে এত হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বোধ হয় হইত না।

গ। মার্ক্সীয় মতবাদ (The Marxian Theory): মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি ও ভূমিকার সন্ধান পাইয়া যাইবে শ্রেণী ও শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যে। উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন-সম্পর্ক বা সম্পত্তি-সম্পর্ক (property relations) গড়িয়া উঠে।

সম্পত্তি-সম্পর্ক: এই সম্পত্তি-সম্পর্কই সমাজের শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। শোষণমূলক সমাজে সম্পত্তি-সম্পর্কের ভিত্তিতে এক শ্রেণী মালিকানাবলে আর্থিক সুযোগসুবিধা লাভ করে; অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণী বৈষয়িক সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকে। অর্থাৎ, মালিকশ্রেণী সম্পত্তির মালিকানার জোরে অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করে।

আদিম সমভোগী সমাজ ভাঙিয়া যাওয়ার পর হইতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের গোড়াপত্তন পর্যন্ত সকল সমাজই এইরূপ শোষণমূলক।

শ্রেণীশোষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা: এখন প্রশ্ন, মুষ্টিমেয় শোষণকারী মালিকশ্রেণী অপরাপরকে তাহাদের শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা উহা ভোগদখল করিতে সমর্থ হয় কি করিয়া? কি করিয়া তাহারা বর্ধিষ্ণু প্রতিদ্বন্দ্বী শোষণকারী অপর শ্রেণীসমূহের (other rising exploiting classes) হাত হইতে নিজেদের শোষণ-পদ্ধতি সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়? ইহার উত্তরে বলা হয়, মালিকশ্রেণী বলপ্রয়োগের বিশেষ সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের অপর সকলের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত সময় বা মূল্য আদায় ও ভোগদখল করে। অর্থাৎ, আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী বলপ্রয়োগের বিশেষ সংগঠনের সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের শোষণকার্য চালায়। এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানই হইল রাষ্ট্র। অন্যভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজে যে-শ্রেণী আর্থিক বলে সর্বাপেক্ষা বলীয়ান—উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা যাহাদের, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে করতলগত করে এবং যে-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থাকিয়া তাহারা সুযোগসুবিধা লাভ করে সেই সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে।

সুতরাং রাষ্ট্র হইল বলপ্রয়োগের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। ইহার সাহায্যেই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে দমন ও শোষণ করে। রাষ্ট্রের প্রকারভেদ যাহাই হউক না কেন, উহার প্রকৃতি ঐ একই—সকল ক্ষেত্রেই উহা শ্রেণীশাসনের যন্ত্র।[১] জেল পুলিস সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র আইন-আদালত প্রভৃতির মাধ্যমে এই শ্রেণীশাসন এবং বলপ্রয়োগ করা হয়।

বলপ্রয়োগ মাত্র শারীরিকই নয়, মানসিক দিক হইতেও করা হয়। উপযুক্ত ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের ব্যাপক প্রসারের সাহায্যেও মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করা হয়।

রাষ্ট্র শাশ্বত প্রতিষ্ঠান নয়. অতএব, রাষ্ট্র কোন শাশ্বত বা চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়—ইহাকে বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়াও হয় নাই। ইহা সমাজের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে—সমাজ-বিবর্তনের বিশেষ অধ্যায়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সুদূর অতীতে এমন একসময় ছিল যখন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় নাই এবং ফলে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ও দ্বন্দ্বশীল হয় নাই। সমাজ-বিবর্তনের যে-স্তরে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধনগত বৈষম্য এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে মীমাংসাতীত সংঘর্ষ (irreconcilable antagonisms) দেখা দিল সেই সময় রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।[২] মালিকশ্রেণীই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে সংঘর্ষকে সংযত রাখিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করে। রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হইবে তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্র কি ধরনের মালিকশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে তাহার উপর। অর্থাৎ, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর (economic structure) উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। খাদ্যাচরণকারী আদিম-সম্ভোগী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণ বা শোষণের কোন সুযোগই ছিল না। ফলে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয় নাই এবং রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। পরবর্তী স্তরে উৎপাদনের কলাকৌশল এবং শ্রমবিভাগের উন্নতির ফলে মানুষের পক্ষে যখন জীবনরক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদন সম্ভব হইল তখনই উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের অন্যের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তাংশ (surplus) ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল। ফলে প্রবর্তিত হইল শোষণমূলক দাস-সমাজ। এই দাস-সমাজে দাস-প্রভুরা রাষ্ট্রকে দাসদের শাসন

> "... the state is an organ of class *rule*, an organ for the *oppression* of one class by another." Lenin : *State and Revolution*

১. "The state has not existed from all eternity. . . At a definite stage of economic development which involved the cleavage of society into classes, the state became a necessity because of this cleavage." Engels : *Origin of the Family, Private Property and the State*

> "The state is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonisms." Lenin : *State and Revolution*

ও শোষণ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে লাগিল। যখন আবার অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হইয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (feudal society) প্রবর্তিত হইল তখন সামন্তপ্রভুরা রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকারী হইল এবং উহার সাহায্যে ভূমি-দাসদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদের শোষণ করিতে লাগিল। এই সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বণিক ব্যবসায়ীশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া প্রবর্তিত হইল ধনতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজ—মূলধন-মালিক ও শ্রমজীবী এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইল এবং ইহাদের মধ্যে সুরু হইল শ্রেণীদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে রাষ্ট্র মালিকদেরই সহায়ক হইল, কারণ রাষ্ট্র এখন মুখ্যত তাহাদেরই। বলা হয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপ গণতান্ত্রিক হইতে পারে, কিন্তু কার্যত মালিকশ্রেণীর স্বার্থ সাধনের—শ্রেণীশোষণের যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ আনুষ্ঠানিক মাত্র।[১] ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বহিরাবরণ তখনই খুলিয়া পড়ে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করার ফলে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্জন এবং স্বাধীনতা হরণ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব: ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা মূলধন-মালিক বা বুর্জোয়াদের হাত হইতে শ্রমজীবীদের নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং কোন নূতন শোষকশ্রেণীর উদ্ভব না হইয়া মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। উৎপাদন-যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক মালিকানা।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই সমস্ত শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হয় না। পরাভূত ধনিকশ্রেণী প্রমুখ সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপ্লবকে বানচাল করিয়া দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সর্বহারার দল (proletariat) ঐ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে দমন ও বিলুপ্ত করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র. যখন সম্পূর্ণরূপে মালিকশ্রেণীর বিলোপসাধন করা হয় এবং উৎপাদনের উপায়সমূহ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয়, তখন শ্রমজীবীদের আর সর্বহারা বলা চলে না। রাষ্ট্র তখন হইয়া দাঁড়ায় শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি মার্ক্সবাদীরা রাষ্ট্রের অবলুপ্তির (withering away of the state) কথা বলেন। রাষ্ট্র কোন চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়—অতীতে একসময় ছিল যখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও অস্তিত্ব ছিল না, আবার ভবিষ্যতে এমন একসময় আসিবে যখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যেই রাষ্ট্রের জন্ম। সুতরাং সমাজের বুক হইতে যতই শোষণ এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হইবে, যতই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসার ও অগ্রগতি লাভ করিবে, ততই রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তিপ্রয়োগ এবং সামাজিক সম্পর্কে হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। অবশেষে শ্রেণীবিহীন কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রকে বর্জন করা হয় না, নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নিজে হইতেই রাষ্ট্র নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়।[২] রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পর সমাজের কাজকর্ম জনসাধারণ নিজেদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করিতে সুরু করে।

১. "The democratic institutions introduced by the bourgeoisie are of a formal nature ..." *Fundamentals of Marxism-Leninism* (Foreign Language Publishing House, Moscow)

২. *"The state is not 'abolished' It withers away."* Engels

(১) মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of the Marxian Theory of the State): বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি : প্রথমত, বলা হয় যে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি অলীক কল্পনা মাত্র। কারণ, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকারের প্রয়োজনীয়তা কোন সময়েই অস্বীকার করা যায় না। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমাজের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সংস্থার প্রয়োজন হইবে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলে এ-প্রয়োজনীয়তা মিটানো যাইবে কিরূপে? অতএব, রাষ্ট্রের বিলুপ্তির ধারণা প্রচার করা হয় সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য।[১]

এ-সম্পর্কে মার্ক্সবাদীরা মন্তব্য করেন, শ্রেণীবিহীন পূর্ণাংগ সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি হইতে থাকে এই কারণে যে শ্রেণীশোষণ না থাকায় রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে যে-পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশাপাশি বর্তমান থাকিবে সে-পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যাইবে। সমগ্র পৃথিবীতে যখন সমভোগবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। কারণ, তখন স্বেচ্ছামূলক সংঘগুলি নিজেরাই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিচালনা করিবে।[২]

(২) শ্রেণীবিলুপ্তি : দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের পর সমাজে শ্রেণীবিন্যাস যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, মার্ক্সবাদীদের এই ধারণারও সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে বিপ্লবের নায়কদের এক নূতন শাসকশ্রেণীতে পরিণত হইবার এক বিশেষ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। প্যারেটো (Pareto), ওয়েবার (Weber) প্রভৃতি লেখক সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রবর্তন অসম্ভব—সকল সময়েই ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠী থাকিয়া যাইবে।

মার্ক্সবাদীদের ধারণায় কিন্তু সমাজতন্ত্রের শাসকগোষ্ঠী এবং ধনতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে। ধনতান্ত্রিক দেশে শাসকগোষ্ঠী মূলধন মালিকদের কার্যকরী শাসন-সংস্থা (executive organ of the capitalist class) হিসাবেই কার্য করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সমগ্র জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে এবং ফলে সকলেরই কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকে। বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক সমাজে কার্য-পরিচালনার সংস্থাকে ঠিক শাসকগোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা যায় না। কারণ, ইহাদের উপর কার্যপরিকল্পনা ও সমন্বয়-সাধনের দায়িত্ব ন্যস্ত—শাসনের নহে।

(৩) ধনতন্ত্রের অবসান : তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, ধনতন্ত্রের অবসান সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা ও পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে সহায়ক হইবে। সমালোচকদের মতে,

১. "Marxian conception of the withering away of the state is a myth ··· The theory ··· has been adopted by Marx and Engles mainly in order to take *the wind out of their rivals.*" *Karl Popper*

২. V. *Chkhikvadze : The State, Democracy and Legality in the USSR*

মার্ক্সবাদীদের এ-ধারণা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনারই প্রকাশ। মার্ক্সের মৃত্যুর পর এক শতাব্দী হইতে চলিল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হইতেছে, একথা বলা যায় কি? মার্ক্স ও লেনিন সাম্রাজ্যবাদের পারপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত্রের অবসানের ইংগিত দিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকট কাটাইতে সমর্থ হইতে পারে—এ সম্ভাবনার বিচার তাঁহারা করেন নাই। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রমিক-কল্যাণ ও শ্রমিক-স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। এই কারণে দেখা যায়, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবণতা হইল সংস্কারের দিকে, বিপ্লবের দিকে নয়। শ্রমিক সংঘ, যৌথ দরাদরি (collective bargaining) এবং সমাজকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কার্যাদির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, এ-ধারণা মার্ক্সের ছিল কি না সন্দেহ।

বিরোধিতা করিয়া মার্ক্সবাদীরা বলেন, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আপাতদৃষ্টিতে সংকটমুক্ত মনে হইলেও উহাদের সংকট বাড়িয়াই চলিয়াছে। কারণ, উহারা ব্যক্তিগত মুনাফা-শিকার (private profitability) ও সামাজিক উৎপাদনের (social production) মধ্যে সংগতিসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই উহারা বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, অপচয়, সংস্কৃতির বিকৃতি প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে অপারগ। এমনকি রাষ্ট্রগুলি বর্তমান নিয়োগাবস্থা বজায় রাখিবার জন্যই মারণাস্ত্র-শিল্পের প্রসার করিয়া চলিয়াছে এবং নয়া-ঔপনিবেশিক পন্থায় বৈদেশিক বাজার ও প্রভাব বিস্তারে উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছে।[১]

(৪) তত্ত্ব ও প্রয়োগ. চতুর্থত, তত্ত্বের দিক দিয়া মার্ক্সবাদ জনপ্রিয় হইলেও ইহার সত্যকার প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেই ঘটিয়াছে কিনা, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে। নীতি ও পদ্ধতির প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বও যে দ্বিধাবিভক্ত তাহা বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

উত্তরে মার্ক্সবাদীরা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর একটা বিরাট অংশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।[২] নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও সকল সমাজতান্ত্রিক দেশই শ্রেণীহীন সমভোগী সমাজ গঠন করিতে উৎসুক ও প্রয়াসী।

(৫) অর্থনৈতিক গুরুত্বের আধিক্য: পঞ্চমত, অনেকেই বলেন, মার্ক্সীয় ধারণা অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির পক্ষপাতমূলক ব্যাখ্যা করিয়াছে। ইহা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ (economic determinism) ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক এলাকা-বহির্ভূত বিষয়গুলিও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

১. John Lewis: *Marxism and the Open Mind*

২. *Fundamentals of Political Science* (Progress Publishers, Moscow)

এই অভিযোগের খণ্ডনে মার্ক্সবাদীরা এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করেন। এঙ্গেলস বলিয়াছেন, রাজনৈতিক আইনগত দার্শনিক ইত্যাদি বিষয়সমূহের ক্রমপ্রসার অর্থনৈতিক প্রসারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সকল বিষয়ের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত ঘটে যাহা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অতএব, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই একমাত্র সক্রিয় আর অন্যান্য বিষয়াদির কোন ভূমিকা নাই একথা সত্য নয়।[১] কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হয় যে মার্ক্সীয় তত্ত্বে অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।[২]

(৬) বিপ্লবের অপরিহার্যতার প্রশ্ন: ষষ্ঠত, সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য বিপ্লবের অপরিহার্যতার কথা সকলে স্বীকার করেন না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সার্বিক ভোটাধিকারভিত্তিক গণতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন সংবাদপত্র, শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি জাগ্রত জনমত 'আদর্শ পৃথিবী' গড়িতে অবশ্যই সাহায্য করে। মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তায় কিন্তু এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অবহেলিত হইয়াছে। মানুষের সামাজিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাও আদর্শ সমাজগঠনে কম সহায়ক নয়।

অপরদিকে অধিকাংশ মার্ক্সবাদী বিশ্বাস করেন না যে সার্বিক ভোটাধিকারভিত্তিক গণতন্ত্র মৌল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়া সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করিতে সমর্থ। ইহা ছাড়া গণতন্ত্রে যে-সকল সমাজকল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদিত হয় তাহার উদ্দেশ্য হইল সাধারণের—বিশেষ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর—আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা।[৩] ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় (representative government) কিছু কিছু সংস্কারমূলক কার্যাদি সম্ভব হইলেও কখনও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলিয়া আশা করা যায় কি ?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন: রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় ধারণার বিভিন্ন দিক দিয়া সমালোচিত হইলেও এই মতবাদের অভিনবত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বলা যায়, মার্ক্সীয় রাষ্ট্রদর্শনের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দর্শন সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হইতে উদ্ভূত এবং স্বভাবতই অতিরঞ্জিত।

রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, ইহার সংকটের ব্যাখ্যা, এই ব্যবস্থার অবসানে বিপ্লবের

১. "It is not that economic situation is cause, solely active, while everything else is only passive effect." Marx and Engels : *Selected Correspondence*

২. "But one must not protest too much. There remains in Marxism an insistence on the primacy of the economic base which must not be understated." Miliband : *Marxism and Politics*

৩. P. M. Sweezy : *The Theory of Capitalist Development*

অনিবার্যতা ঘোষণা এবং সর্বোপরি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও শোষণের অবসান-কল্পে সাম্যবাদের জয় ঘোষণা করার মধ্যেই রহিয়াছে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রচিন্তার স্বার্থকতা।

অবশ্য একথা ঠিক যে মার্ক্স উনিশ শতক ও পরবর্তী কালে শ্রমিক আন্দোলনের স্বরূপ, শ্রেণী-সম্পর্কের প্রকৃতি, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উদ্ভব, মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োগ, গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহের উত্তরোত্তর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি—এই সকল বিষয় ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত না হইয়াই ভবিষ্যৎ সমাজের ইংগিত দিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রকৃত অর্থ : কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে মার্ক্স রাষ্ট্রের অবলুপ্তির অর্থে রাষ্ট্রীয় সংস্থার কল্যাণমূলক কার্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নাই, রাষ্ট্রের শোষণমূলক ভূমিকার অবসানের কথাই বলিয়াছেন।

পরিশেষে, মার্ক্স শ্রেণী-সহযোগিতার (collaboration of classes) প্রশ্নকে অস্বীকার করিয়াছেন—এই অভিযোগও ভিত্তিহীন। মার্ক্স ও এঙ্গেলস 'শ্রেণীগত ঐক্যের' ধারণাটির বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেন। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবিতে, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে এবং সর্বোপরি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে শ্রেণী-সহযোগিতা বা ঐক্যের প্রশ্নটি মার্ক্সবাদীদের নিকট কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

উপসংহার : রাষ্ট্র সম্পর্কে সনাতন ও চরম ধারণাকে অস্বীকার করিয়া, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণাকে মূলধন করিয়া, শোষণমুক্ত সমাজ-গঠনের আদর্শকে লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করিয়া মার্ক্সীয় চিন্তা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। এই চিন্তা হইতে বিশ্বের মেহনতী মানুষের আন্দোলন শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছে—অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। ফলে সূচিত হইয়াছে এক নবদিগন্ত।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ—কোনটাই নহে।

২. আদর্শবাদের কল্যাণকর দিক হইল ব্যক্তির আনুগত্যের ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মোৎসর্গের উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং অকল্যাণকর দিক হইল আইনকে নীতি ও আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

৩. মার্ক্সীয় মতবাদের মৌল প্রতিবাদ্য বিষয় হইল যে বলপ্রয়োগের বাস্তব প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্র শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণের যন্ত্র। অন্য-পক্ষে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটনেই রহিয়াছে এই মতবাদের সারবস্তু।

অনুশীলনী

1. "The Organismic Theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the State nor a trustworthy guide to state activity." Elucidate.

["জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নহে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সূত্রও নহে।" ব্যাখ্যা কর।] (১৩৩-৩৪, ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

2. Make a critical assessment of the Organic Theory regarding the nature of the State.

[রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কর।] (১৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss critically Idealist Theory regarding the nature of the State. Analyse its virtues and dangers.

[রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আদর্শবাদের (ভাববাদের) পর্যালোচনা কর। তত্ত্বটির কল্যাণকর ও বিপজ্জনক দিকগুলি বিশ্লেষণ কর।] (১৩৭-৩৮, ১৩৯-৪২ পৃষ্ঠা)

4. Analyse the Marxist conception of the State.

[রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার বিশ্লেষণ কর।] (১৪২-৪৩, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

5. State and examine the Marxist conception of the State.

[রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার বিবরণ দিয়া উহার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর।]

(১৪২-৪৩, ১৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা)

6. Examine the validity of the Marxist conception of the State.

[রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার সারবত্তা বিশ্লেষণ কর।] (১৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা)

৮ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা
(SOVEREIGNTY OF THE STATE)

> *"The notion of absolute sovereignty as applied to a state seems ··· plainly false in either an ethical or actual sense, and rather futile in a legal sense."* A. C. Ewing

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা :

১. রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে ঠিক কি বুঝায় ?
২. সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি ?
৩. অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মৌল প্রতিবাদ্য বিষয় কি ?
৪. বহুত্ববাদ বলিতে কি বুঝায় ? এবং উদ্ভবের কারণ কি ?
৫. সার্বভৌমিকতার ধারণা কিভাবে দুই দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়াছে ?
৬. জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতা বলিতে ঠিক কি বুঝায় ?
৭. সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্ব বলিতে কি বুঝায় ?
৮. সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিভংগি ঠিক কি ?

বর্তমান দিনে রাজনৈতিক জীবনে সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভূমিকা সকলেই স্বীকার করিয়া লন ("We must recognise the sovereign state as the prime fact of political life." Miller)। নিয়ম-শৃংখলা ও নিরাপত্তা (order and security) রক্ষা করা এবং কল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা হইল আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন (final authority) রাষ্ট্র আইনকানুন প্রবর্তন করিয়া থাকে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকে কার্যকর করার জন্য শক্তি বা বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে।

মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের এই চরম বা চূড়ান্ত কর্তৃত্বকে (supreme or final authority)। রাষ্ট্রের আইনকানুন অন্যান্য সংঘের নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে।[১]

সার্বভৌমিকতার স্বরূপ (Nature of Sovereignty):

অনেকে বিরোধী মত পোষণ করিলে মূলত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা হইল আইনগত। রাষ্ট্রও আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ। বার্কার বলেন : "এই আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ বা রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে উদ্ভূত সমগ্র আইনসংগত

১. "To say that the state is sovereign is to say that the state has supreme or final authority in a community that its rules override the rules of other association." D. D. Raphael

মীমাংসার জন্ত একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা অবশ্যই থাকিবে” (There *must* exist in the State, as a *legal association*, a power of final *legal adjustment* of all *legal issues* which arise in its ambit.)। এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলা হয়। এখানে পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে, ইহা হইল আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। স্ট্রং (C. F. Strong) বলেন: “শব্দগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলিতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইলেও, রাষ্ট্রের প্রসংগে এই শব্দের ব্যবহারে বিশেষ এক শ্রেষ্ঠত্ব—অর্থাৎ আইন বলবৎকরণের ক্ষমতা বুঝায়।”[১] আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। ইহা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংঘের উপর প্রযোজ্য। এককথায় রাষ্ট্রের মধ্যে আইন সর্বব্যাপী। রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংঘ আইন কি হইবে বা আইনসংগত অধিকার কি এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতে পারে। তাই প্রয়োজন হয় একটি শক্তির যাহা এই সকল ধারণার সামঞ্জস্যবিধান বা সমন্বয়সাধন করিবে। এই সমন্বয়সাধনে ক্ষমতাকেই বলা হয় সার্বভৌমিকতা। ইহা চূড়ান্ত চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। ইহার সহিত সংঘর্ষ বাধিলে ব্যক্তি বা সংঘকে তাহার ইচ্ছা পরিবর্তিত করিতে হইবে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক: অপ্রতিহতভাবে বিভিন্ন আইনসংগত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্ত রাষ্ট্রকে শুধু আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেই চলিবে না, সর্বতোভাবে বাহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। নচেৎ, উহার আইন প্রণয়ন এবং বলবৎ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে না। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে—রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে—জনসমাজকে চূড়ান্ত চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে এবং এই অধিকারী হইবার জন্ত সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক রহিয়াছে—আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ও চরম ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা।

সমগ্র আধুনিক রাষ্ট্রই এইরূপ সার্বভৌম রাষ্ট্র।

ক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা: রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতাকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে. “রাষ্ট্র ইহার এলাকাধীন সমগ্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আদেশ জারি করে, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করে না।”[২] কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও রাষ্ট্র সকল

১. "Etymologically the word sovereignty means... superiority, but when applied to the state it means superiority of a special kind...the law-issuing power."

২. "The State is internally supreme over the area that it controls. It issues orders to all men and associations within that area; it receives orders from none of them."

ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার—অর্থাৎ আদেশ জারি—করে না এবং রাষ্ট্রের এলাকাধীন ব্যক্তি ও সংঘসমূহ অনেক সময় রাষ্ট্রের আদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া নিজেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থির করিয়া লয়। ইহাও দেখা যায়, অনেক সময় বিভিন্ন সংঘ নিজেদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্র ইহাতে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করে না।

ব্যবহারিক জীবনের এইরূপ উদাহরণ হইতে কিন্তু রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিলে ভুল করা হইবে। রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংঘের সম্বন্ধ নির্ণয় বা কার্যক্ষেত্র নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু করিতে পারে। রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তি ও সংঘের অনেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আছে রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে মাত্র। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় এই সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সার্বভৌমিকতা চরম ক্ষমতা হইলেও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই চরমতা পরিব্যাপ্ত নহে; ইহা চূড়ান্ত ক্ষেত্রে—শেষ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় মাত্র। রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনের কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে চায় এবং সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তাহাতে বাধা দেয় তবেই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশিত হইবে—তখনই মাত্র রাষ্ট্র প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইবে যে, সকল সময়ই সকল ব্যক্তি ও সংঘের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়।

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা: রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়।

খ। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা: আন্তর্জাতিক আইনের লেখকরা অনেক সময় বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে রাষ্ট্রের সহিত অপরাপর রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার ক্ষমতা হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত বুঝেন। অন্যান্য লেখকের মতে অবশ্য সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই ধারণা আপত্তিজনক, কারণ ইহার দ্বারা বুঝায় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপরাপর রাষ্ট্রের এলাকাতেও প্রযোজ্য যাহা সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ধারণার সহিত অসংগতিপূর্ণ। সুতরাং ইহারা বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে শুধু 'স্বাধীনতা বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা'[১] বুঝেন।

বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে যখন স্বাধীনতাকেই বুঝায় তখন গেটেল প্রভৃতি লেখকের মতে, 'বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা' (external sovereignty) কথাটি ব্যবহার না করিয়া 'স্বাধীনতা' (independence) শব্দটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতাকে 'স্বাধীনতা' বলিয়া অভিহিত করিলে সার্বভৌমিকতা বলিতে শুধু আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বুঝায়। এই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতার জন্যই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বা স্বাধীনতা প্রয়োজন।[১] রাষ্ট্রের

---

১. "A sovereign is not subject to the will of another. It exists as an independent entity... with exclusive jurisdiction over its territory." Schuman: *The Rights of Sovereignties*

যে শেষ কথাটি বলিবার, চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার শক্তি আছে অপরাপর রাষ্ট্রকে ইহা জ্ঞাত করানোই—আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই সম্বন্ধে মতবিরোধ দূরীকরণই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা। ইহাকেই আমরা স্বাধীনতা বা সর্বতোভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বলি। ইহা আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত।

সার্বভৌমিকতার ধারণা কি মাত্র তত্ত্বগত? বলা হইয়াছে, আধুনিক রাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্র—অর্থাৎ প্রত্যেক আধুনিক রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ও সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। অনেকের মতে, বর্তমান দিনে এই ধারণা সম্পূর্ণ তত্ত্বগত, ব্যবহারিক জীবনের সহিত ইহার কোন সংগতি নাই। ইঁহারা বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অন্যবিধের বহিঃশক্তি বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন।[১] রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। সুতরাং ইহাদের সার্বভৌমিকতা পূর্ণ নহে, সীমাবদ্ধ মাত্র।[২]

ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই তত্ত্বগত বা আইনগত। আইনের দৃষ্টিতে সকল রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাধীন—যদি তাহারা অপর কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত কার্য। এই নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিলে আইনত নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রের কোনকিছু করিবার নাই। আন্তর্জাতিক সন্ধি সর্ত আইন প্রভৃতি পালন যেমন সার্বভৌমিকতাকে বিনষ্ট করে না, তেমনি স্বেচ্ছাস্বীকৃত নিয়ন্ত্রণও সার্বভৌমিকতার বিলুপ্তি ঘটায় না।[৩] যতক্ষণ আইনসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করিবার কোন কর্তৃত্ব না থাকিবে, ততক্ষণ রাষ্ট্রসমূহ কার্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হইলেও তাহাদের সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty): সার্বভৌমিকতার উপরি-বর্ণিত প্রকৃতি হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সন্ধান সহজেই পাওয়া যায়:

(১) পূর্ণতা বা চরমতা (Absoluteness): সার্বভৌম ক্ষমতা বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বা চরম ক্ষমতা। ইহা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে।

সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সার্বভৌমিকতা আইনগতভাবে সীমাবদ্ধ না হইলেও নৈতিক সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্যর হেনরী মেইনের মতে, নৈতিক প্রভাব প্রতিনিয়তই সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ব্লুন্টস্‌লি ঘোষণা করিয়াছেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বাহ্যিক দিক দিয়া অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকার এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া ইহার নিজস্ব প্রকৃতি ও

---

১. "...a state's sphere of independent action is limited by the existence of other states." E. O. Ewing: *The Individual, the State and World Government*

২. "...the only political reality is ... limited, not absolute, sovereignty." Shotwell: *The Problem of Government*

৩. "A nation's sovereignty may be defined as its *legal power* to make and enforce whatever internal laws *it sees fit* and to be subjected only to those external limitations it has *voluntarily agreed*." Austin Ranney

ব্যক্তিসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চিরন্তন বিধান এবং ইতিহাসের ঘটনার নিকট রাষ্ট্র চিরদিনই দায়িত্বশীল থাকিবে।

ঈশ্বরের বিধান ও নৈতিক সূত্র দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ কি না তাহা আমাদের বিচার্য বিষয় নহে, কারণ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত, নীতিগত নহে। এই আইনের দৃষ্টিতে দেখিলে সার্বভৌমিকতা যে সীমাবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুইটি সীমাবদ্ধতা: বার্কারের মতে, এই সীমাবদ্ধতা হইল সার্বভৌমিকতার নিজস্ব প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতির জন্য।[১]

প্রথমে প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সার্বভৌমিকতা হইল চূড়ান্ত কর্তৃত্ব; শেষ কথাটি বলিবার, চূড়ান্ত বিচার করিবার ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এই শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, বহু দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যায়। সুতরাং সার্বভৌমিকতার সীমাবদ্ধতা হইল যে, ইহা সকল বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, সকল বিষয়ের মীমাংসা করে না—মাত্র চূড়ান্ত ব্যাপারেই নিজেকে প্রকাশিত করে।

দ্বিতীয়ত, কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিলে সার্বভৌমিকতা আইনমূলক বলিয়া ইহা যাহা আইনের এলাকাধীন নহে তাহার সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহে। বার্কারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, সার্বভৌমিকতা হইল 'আইনসংগতভাবে আইনসংগত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার আইনানুমোদিত ক্ষমতা' (. a legal power settling finally legal questions in a legal way)। সুতরাং ইহা আইনের গণ্ডি দ্বারা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। সমাজের মধ্যে অনেক বিষয় উদ্ভূত হয় যাহা আইনের এলাকায় পড়ে না। ফলে তাহাদের উপর সার্বভৌম শক্তির এক্তিয়ারও নাই।

আবার অনেকের মতে, সার্বভৌমিকতা ব্যবহারিক জীবনেও সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

(২) সর্বজনীনতা (Universality): সার্বভৌমিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল সর্বজনীনতা। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে এমন কোন ব্যক্তি বা সংঘ থাকিতে পারে না, যাহা সার্বভৌম শক্তির অধীন নহে। অবশ্য, পররাষ্ট্রদূতেরা রাষ্ট্রের অধীন নন। তবে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে যে-কোন সময় অপসারিত করিতে পারে।[২]

সর্বজনীনতা সার্বভৌমিকতার সীমাহীনতার আর একটি লক্ষণ। এই সীমাহীনতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, সকল ব্যক্তি বা সংঘের উপর সার্বভৌমিকতার এক্তিয়ার

---

১. Sovereignty is 'limited ... by its own *nature* and its own *mode of action*." Ernest Barker

২. এইভাবে যাঁহাদিগকে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁহাদিগকে বলা হয় persona non grata বা অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

থাকিলেও এই প্রক্রিয়ায় আইনের গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনানুমোদিতভাবে ছাড়া অন্যভাবে সার্বভৌম শক্তি কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নিজস্ব অবাধ ইচ্ছা চাপাইয়া দিতে পারে না।

(৩) স্থায়িত্ব (Permanence) : স্থায়িত্ব সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে সার্বভৌমিকতা ততদিনই স্থায়ী থাকে। রাষ্ট্রের কার্যপরিচালকগণের বা সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারিগণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সার্বভৌমিকতা বিলুপ্ত হয় না। যদি অবশ্য রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সংঘটিত হয় তবে সার্বভৌমিকতারও অবসান ঘটে।

(৪) অবিভাজ্যতা (Indivisibility) : সার্বভৌমিকতাকে বিভক্ত করা যায় না। আইনানুসারে ঐক্যবদ্ধ জনসমাজই রাষ্ট্র। এই ঐক্যবদ্ধতার জন্য প্রয়োজন হয় সার্বভৌমিকতার ঐক্যের। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিচারের জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে। বহু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমতা কাহারও হস্তে থাকিতে পারে না। ফলে সার্বভৌমিকতাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য দেখা যায় যে, সরকারের বিভিন্ন অংশ সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু ইহাকে বিভক্তীকরণ বলা চলে না। ইহা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রয়োগক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার বণ্টন মাত্র।[১]

অবিভাজ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনা. সার্বভৌম শক্তির অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে যে-মতবাদ আছে সাম্প্রতিক যুগে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সমালোচনা করা হইয়াছে প্রধানত আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ এবং রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংঘের স্বার্থের দিক হইতে। এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়েই পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

(৫) হস্তান্তরযোগ্যতাহীনতা (Inalienability) : সার্বভৌমিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হস্তান্তরযোগ্য নহে। অধিকাংশ আইনানুগের মতে, মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিলে বাঁচিতে পারে না, বৃক্ষ যেমন বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিলে বাঁচিতে পারে না তেমনি সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করিলে রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না।

সার্বভৌমিকতার হস্তান্তর রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল।

'সার্বভৌমিকতাকে হস্তান্তরিত করা' বলিতে অবশ্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের কোন অংশ হস্তান্তরিত করা বা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর পরিবর্তন বুঝায় না। রাষ্ট্র অনেক সময় ভূখণ্ডের অংশ হস্তান্তরিত করে বা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারী অনেক সময় অপরের হস্তে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে রাষ্ট্র লোপ পায় না।

---

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা কিন্তু সার্বভৌমিকতা বিভাজ্য এই ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ-সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় প্রসংগে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করা যায় কি না, ইহা লইয়া তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। হবসের ন্যায় রাজতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, সার্বভৌমিকতা আদিতে জনগণের হস্তে থাকিলেও রাজার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজার নিকট হইতে জনগণের নিকট ইহার পুনর্হস্তান্তর কোনমতেই সম্ভবপর নহে। অপরদিকে জনগণের প্রাধান্যের সমর্থকগণের মতে, সার্বভৌমিকতা কোন পর্যায়েই হস্তান্তরযোগ্য নহে। সুতরাং জনগণ রাজাকে ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী-ভাবে সার্বভৌমিকতা সমর্পণ করিয়াছে মাত্র, রাজার নিকট হস্তান্তরিত করে নাই। গার্ণার বলেন: "এই বিতর্কের মূল্য যাহাই হউক না কেন, বর্তমানে আইনজ্ঞগণ ইহাই প্রচার করেন যে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নহে।"

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের উদ্ভব ও পরিস্ফুটন

(Origin and Development of the Theory of Sovereignty): সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে হইলেও ইহার স্বরূপ প্রাচীন লেখকগণের নিকটেও অজ্ঞাত ছিল না। সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিবার কারণ হইল, মধ্যযুগ পর্যন্ত বর্তমান দিনের সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই।

মধ্যযুগ: মধ্যযুগ ছিল সামন্তপ্রথার যুগ। এই যুগে আনুগত্য রাজা, সামন্তপ্রধান ঊর্ধ্বতন সামন্ত প্রভৃতির মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ সুগম হইয়া উঠিতে পারে নাই। সামন্তপ্রথার সংগে আবার ছড়াইয়া ছিল সাম্রাজ্য ও খ্রীষ্টধর্ম-প্রতিষ্ঠানের (Church) পরস্পরবিরোধী শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। এই দাবির মীমাংসাও সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া হয় নাই[১] ফলে রাষ্ট্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় রাষ্ট্রও সার্বভৌম বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই। উপরন্তু, সাধারণের ছিল স্বাভাবিক আইনের (Natural Law) উপর বিশ্বাস। মানুষের প্রণীত আইনকে যে সকল সময় স্বাভাবিক আইনের অনুবর্তী হইতে হইবে এ-ধারণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথে ছিল এক বিরাট বাধাস্বরূপ। এইভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট না হওয়ায় ভূমিগত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, ভূমিগত সার্বভৌম রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হয় নাই।

ভূমিগত সার্বভৌমিকতার উদ্ভব. মধ্যযুগের শেষদিকে নানা কারণে সামন্ত-প্রধানরা দুর্বল হইয়া পড়ায় রাজা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন এবং অবশেষে তিনি রাষ্ট্রমধ্যে সর্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সামন্তপ্রথা একরূপ ভূমিপ্রথা। রাষ্ট্রমধ্যে রাজার সর্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভূমিগত প্রাধান্য বা ভূমিগত সার্বভৌমিকতার সূত্রপাত হইল।

অপরদিকে পোপের সহিত রাজার প্রাধান্য লইয়া যে সংঘর্ষ বাধে তাহা লুথারের (Martin Luther) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে নূতন রূপ গ্রহণ করিল। লুথার ইয়োরোপীয় নৃপতিগণের সহায়তায় পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রের উপর পোপের কর্তৃত্ব কমিল, কিন্তু নৃপতিগণের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইল। লুথার প্রচার করিয়াছিলেন, রাজা সার্বভৌম এবং রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য অবিভাজ্য।

---

১. "In the Middle Ages political authority was dispersed and divided... Ties of varying strength, and none clearly political attached a man to his guild, city, abbey, manor, baron, king and pope." Mabbott: *The State and the Citizen*

জাতীয় রাষ্ট্র ও সার্বভৌমিকতা : পরে যখন পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন নৃপতিগণ লুথারের প্রচারিত নীতির শরণ লইলেন। নৃপতিগণের এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে তাঁহাদের সপক্ষে যে-কয়েকজন রাষ্ট্রচিন্তানী ও আইনবিদ যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক বোদাঁ-ই (Bodin) প্রধান। ইঁহাদের প্রচারের ফলে পোপের কর্তৃত্ব হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) উদ্ভব হইল। এই জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা এবং সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্দেশ করা হইল নৃপতির মধ্যে।

বোদাঁ : বোদাঁ সার্বভৌমিকতার অবস্থান নৃপতির মধ্যে নির্দেশ করিলেও সার্বভৌমিকতা যে রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—রাজার নহে, এ-সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার রিপাব্লিকেই (*Republic*) সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়। সার্বভৌমিকতাকে তিনি প্রজা ও নাগরিকগণের উপর 'রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষমতা কোনরূপ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ নহে।[১] এই অর্থে সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য এবং চিরন্তন ক্ষমতা। ইহার এলাকা রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ড ব্যাপিয়া।

গ্রোটিয়াস : এইভাবে বোদাঁ আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বর্ণনা করিলেও যাহাকে 'বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা' বলে তাহার রূপদান করিতে পারেন নাই। এই দ্বিতীয় কার্যটি সমাপ্ত করেন ডাচ্ আন্তর্জাতিক আইনবিদ গ্রোটিয়াস (Grotius)। তিনি বলিলেন, সকল রাষ্ট্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বপ্রকারে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। গ্রোটিয়াসের এই মতবাদের ফলে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় পুরাপুরি সার্বভৌম হইয়া উঠিল।

হবস্ : বোদাঁ ও গ্রোটিয়াসের পর হবসের হস্তে আসিয়া সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ আরও পরিস্ফুট হইল। হবস্ এক সামাজিক চুক্তির কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাকে সমর্থন করিয়া সার্বভৌমিকতার পথ প্রশস্ততর করেন। তাঁহার মতে, আদিম মনুষ্যগণ নিরাপদ জীবন-যাপন করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির সৃষ্টি করিয়া উহার বা তাঁহার হস্তে সর্বময় ক্ষমতা সমর্পণ করে।[২]

জনগণের সার্বভৌমিকতা—লক ও রুশো : হবসের পর লক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থনে ঘোষণা করিলেন যে সকলের ইচ্ছানুসারে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে তবেই উহা কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে অর্থাৎ, সার্বভৌমিকতা সকলের দ্বারাই ব্যক্ত হইবে। এইভাবে 'জনগণের সার্বভৌমিকতা'র (popular sovereignty) সূত্রপাত হইল এবং ইহা পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল রুশোর হস্তে। রুশোর মতে, সার্বভৌমিকতা চিরকালই জনগণের, ইহা কখনও রাজার নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই।

বেন্থাম : রুশোর পর বেন্থাম ঘোষণা করেন যে সার্বভৌম শক্তি আইনের দিক দিয়া অসীম হইলেও নৈতিক দিক দিয়া নহে—যাহাতে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ ('greatest good of the greatest number' , সাধিত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্রকে আইনকানুন প্রণয়ন করিতে হইবে।

আইনগত ধারণা—অস্টিন : অবশ্য ইংরাজ আইনবিদ অস্টিনের (John Austin) হস্তেই সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগতভাবে বিশ্লেষিত ও পূর্ণ মতবাদে পরিণত

১. "... the supreme power of the State over citizens and subjects unrestrained by law."

২. "Security is the purchase in our social contract. The price is absolutism." Mabbott : *The State and the Citizen*

হয়। ইহাকেই বলা হয় 'অস্টিনের মতবাদ' (Modern or Austinian Theory) বা পরম্পরাগত তত্ত্ব (Classical or Traditional Theory)।

পরম্পরাগত মতবাদ ও সাম্প্রতিক সমালোচনা: এই পরম্পরাগত তত্ত্ব বা মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল দুইটি: (১) রাষ্ট্র বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং (২) নিজ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চরম ও অনিয়ন্ত্রিত।

সাম্প্রতিক সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই পরম্পরাগত মতবাদের বিশেষ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনা করিয়াছেন প্রধানত আন্তর্জাতিক মতবাদীরা এবং বহুত্ববাদী নামে অভিহিত একদল মতবাদী। আন্তর্জাতিক মতবাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বিশ্বশান্তির ও বিশ্বসমাজ গঠনের পরিপন্থী। বহুত্ববাদিগণের বক্তব্য হইল, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা সমাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং সেইজন্য ইহা সুন্দর সমাজজীবন গঠনের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

এ-সম্পর্কে পরে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে।

সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্ব (The Power Theory of Sovereignty): একশ্রেণীর লেখকের মতে, রাজনীতিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে নিছক বলপ্রয়োগের চরম ক্ষমতাই (supremacy of coercive power) বুঝায়, রাষ্ট্রের আইনগত কর্তৃত্ব (supremacy of legal authority) নয়।[১] ইহাদের বক্তব্য হইল: অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও নিজ নিজ এলাকায় চরম কর্তৃত্ব দাবি করিয়া থাকে, এমনকি ব্যক্তিবিশেষও নৈতিক দিক দিয়া চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার জানাইয়া থাকে। যেমন, রাষ্ট্রের কোন আইন সম্পর্কে তাহার নৈতিক আপত্তি থাকিলে সে তাহার নৈতিক ধ্যানধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঐ আইনকে অমান্য করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন বলপ্রয়োগের।

সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার আসল রূপ হইল বলপ্রয়োগ—অর্থাৎ চূড়ান্ত বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই হইল সার্বভৌমিকতা।

বলপ্রয়োগতত্ত্বের ত্রুটি: বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য হইল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয় ও অচল। কারণ, এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহও ক্ষমতার ভারসাম্যের (balance of power) দ্বারা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যথেষ্ট বা আবশ্যিক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকে বলপ্রয়োগ ব্যতীতই আইন মান্য করিয়া থাকে। অবশ্য একথা ঠিক যে কিছু কিছু লোক থাকে যাহাদের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অপরিহার্য। তবুও কিন্তু নিছক বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না—লোকের সম্মতি (consent) বা স্বীকৃতি (acknowledgement) ব্যতীত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলিতে পারে না।[২]

---

১. "... sovereignty should be defined, for the purposes of politics, as supremacy of coercive power rather than of legal authority." Raphael

২. "Obedience secured solely by the threat of sanctions is unstable." Alan Ball
Also "will, not force is the basis of the State." T. H. Green

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Sovereignty) : সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা, ইহার অবস্থান নির্দেশ সম্বন্ধে মতবিরোধ প্রভৃতির ফলে 'সার্বভৌমিকতা' শব্দটি বর্তমানে নিয়ে আলোচিত বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলা চলে।

ক। নামসর্বস্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমিকতা (Titular and Actual Sovereignty) : রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃত চরম ক্ষমতার অধিকারীকে প্রকৃত সার্বভৌম এবং যাঁহার নামে সার্বভৌম শক্তি ব্যবহৃত হয় অথচ যিনি আসলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহেন, তাঁহাকে বলা হয় নামসর্বস্ব সার্বভৌম।

দৃষ্টান্ত : ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব সার্বভৌমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাঁহাকে সার্বভৌম (Sovereign) বলিয়াই অভিহিত করা হয়। তিনি নামে মাত্র সার্বভৌম, কারণ তিনি 'রাজত্ব করেন মাত্র, শাসন করেন না' (The King or Queen rules but does not govern)। শাসন করে কমন্স সভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী। মন্ত্রিমণ্ডলীই সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারী, যদিও আইনের চক্ষে পার্লামেণ্টই সার্বভৌম—রাজা বা রাণী নহেন, মন্ত্রিমণ্ডলীও নহে।

খ। আইনসংগত সার্বভৌমিকতা (Legal Sovereignty) : এককথায় আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতাই আইনসংগত সার্বভৌমিকতা। ইহা সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনের ধারণা মাত্র। এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের মধ্যে যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘ আইনত চরম আদেশ জারি করিবার বা চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের অধিকারী তাহাকেই সার্বভৌম আখ্যা দেওয়া হয়। আইনসংগত সার্বভৌমের আদেশ কেহই অমান্য করিতে পারে না ; ইহা কোনমতে নৈতিক সূত্র, ধর্মীয় বাধানিষেধ বা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।

বিচারালয় একমাত্র আইনসংগত সার্বভৌমের আইন মানিয়া লইতে বাধ্য। অন্য যে-কোন সূত্র হইতে প্রণীত আইনকে আদালত স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারে।

আইনাজ্ঞগের মতে, আইনসংগত সার্বভৌমিকতাই প্রকৃত সার্বভৌমিকতা। বস্তুত, আইনাজ্ঞগের দৃষ্টিতে আইন ছাড়া আর কোন কিছুরই গুরুত্ব নাই। সুতরাং যে-সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত নহে, তাহা আইনাজ্ঞগের নিকট গুরুত্বহীন।

আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অস্টিন। ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, রাজা-সহ পার্লামেণ্টের (King-in-Parliament) মধ্যে সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। বলা হয়, ইহা নারীকে পুরুষে এবং পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর সব কিছুই করিতে পারে।[১] সুতরাং আইনাজ্ঞগের দৃষ্টিতে পার্লামেণ্ট সার্বভৌম।

১. "Parliament can do everything but cannot make a woman a man, and a man a woman." De Lolme

গ। রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Political Sovereignty): আইনসংগত সার্বভৌমের চরম, অপ্রতিহত এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা আইনের কল্পনা মাত্র। বাস্তবজগতে ইহার সন্ধান কোথাও মিলে না। চরম স্বেচ্ছাচারী শাসককেও বিভিন্ন প্রভাবের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রাণী-সহ-পার্লামেণ্ট যে-কোন আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলেও, ইহা কি এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে যাহা নাগরিকগণকে পরস্পরের সর্বস্ব অপহরণের ক্ষমতা প্রদান করিবে? সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে আর একপ্রকার সার্বভৌমিকতার অনুসন্ধান করিতে হয় যাহা বাস্তব জগতে কার্যকর।

সংজ্ঞা: ডাইসির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "আইনবিদ্ যাহাকে সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করেন তাহার পশ্চাতে আরও একটি সার্বভৌম আছে যাহাকে আইনসংগত সার্বভৌম প্রণতি না জানাইয়া পারে না" (Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow)। ইহাকে 'রাজনৈতিক সার্বভৌম' বলা হয়।

অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, ইহা হইল আইনের পশ্চাতে যে-সকল প্রভাব কার্য করে তাহাদের সমষ্টি।

ধারণায় অনিশ্চয়তা: ঠিক রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বুঝায়, সে-সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নহেন। অনেক সময় ইহাকে জনমত, অনেক সময় ইহাকে নির্বাচকগণের মত এবং অনেক সময় আবার ইহাকে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনের প্রভাব বলিয়া ধরা হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, জনমত-গঠনকারী বিভিন্ন প্রভাব এবং নির্বাচকগণকে সংযুক্তভাবে রাজনৈতিক সার্বভৌম বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা আইনানুমোদিত পদ্ধতিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না, তবুও কিন্তু ইহার ইচ্ছা দ্বারাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তির নিকট আইনসংগত সার্বভৌমিকতা অল্পবিস্তর অবনত থাকে।

অধ্যাপক রিচি (Ritchi), গেটেল প্রভৃতির মতে, আইনসংগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণই সুশাসনের প্রধান সমস্যা।[১] আইনের দৃষ্টিতে অবশ্য সার্বভৌমিকতার এই দুই রূপের মধ্যে সংঘাত বাধিলে আইনসংগত সার্বভৌমের ইচ্ছাই বলবৎ থাকিবে, কারণ আদালতগুলি কেবল আইনসংগত সার্বভৌমের আইনকেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু আইনের অনুশাসন দ্বারা বাস্তব জীবন সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, মানুষ প্রাণ দিয়াও আইনের বিরোধিতা করিয়াছে[২] এবং সংঘটিত হইয়াছে গৃহবিপ্লব। তাই আইনসংগত

---

১. "The problem of good government is largely one of the proper relation between the legal and ultimate political sovereignty." Gettell

২. "There are goods, such as freedom of thought or conscience, for which lives have been risked." Mabbott · *The State and The Citizen*

সার্বভৌমকে সর্বদাই রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়।

রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার আখ্যার সমীচীনতা: উপসংহারে বলা যাইতে পারে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ আইনগত। যাহাকে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা হয় তাহাকে আইন স্বীকার করে না। সুতরাং তাহাকে 'সার্বভৌমিকতা' আখ্যা না দেওয়াই সমীচীন। আধুনিক লেখকগণের মতে, একমাত্র আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে 'সার্বভৌমিকতা' এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে 'জনমত' বা 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করা উচিত

ঘ। আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা (*De Jure* and *De Facto* Sovereignty): অনেক সময় আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা হইল আইনসংগত সার্বভৌমিকতা। আইনই ইহার ভিত্তি এবং অপরদিকে ইহাই আইনের উৎস। কিন্তু আইনানুমোদিত সার্বভৌম-প্রণীত আইন কার্যকর নাও হইতে পারে—বাস্তবে কোন কোন সময় সাধারণে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার নাও করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাঁহার আইন কার্যকর হয় এবং যাঁহার প্রতি জনসাধারণ আনুগত্য স্বীকার করে তাঁহাকেই বাস্তব সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করিয়া আইনসংগত সার্বভৌমিকতা হইতে পৃথক করা হয়।

সংজ্ঞা: লর্ড ব্রাইস বলেন, যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ আইনসংগতভাবেই হউক আর আইনবিরুদ্ধভাবেই হউক নিজের বা নিজেদের চূড়ান্ত ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারা হইলেন বাস্তব সার্বভৌম।

পার্থক্যের প্রতীতি: সাধারণ সময়ে আইনানুমোদিত বা বাস্তব সার্বভৌমিকতা একই হস্তে এবং ফলে অভিন্ন রূপে থাকিলেও বিপ্লব, বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। বিপ্লবের ফলে নূতন শক্তি কর্তৃত্ব অধিকার করিলে উহা বাস্তব সার্বভৌমে পরিণত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকে, যদিও আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা থাকে সেই পুরাতন কর্তৃত্বের হস্তে। বাস্তব সার্বভৌমিকতা কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আবার আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতায় পরিণত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিলুপ্ত হয়। বিদ্রোহের ফলে স্বল্প সময়ের জন্য আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা বাস্তব সার্বভৌমিকতা হইতে পৃথক হইতে পারে। পরে বিদ্রোহ দমিত হইলে এই পার্থক্য আবার বিলুপ্ত হয়। বহিঃশত্রু দেশ আক্রমণ করিয়া চিরকাল বা স্বল্পকালের জন্য বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে পারে। চিরকালের জন্য অধিকারী হইলে ইহা কিছুদিন পরে আইনানুমোদিত সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায় এবং স্বল্পকালের জন্য হইলে বাস্তব সার্বভৌমিকতা আবার পূর্বের আইনানুমোদিত সার্বভৌমের নিকট ফিরিয়া আসে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে প্রতীয়মান পার্থক্য স্বল্পকাল স্থায়ী। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হইলে উভয়ে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, চীনে অন্তর্বিপ্লব, মিশরে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিপ্লব, বাংলাদেশের পাকিস্তান হইতে বিচ্যুতি ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পার্থক্যের সমীচীনতার প্রশ্ন: আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য আলোচনার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা আইনানুমোদিত নহে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাহাকে সার্বভৌমিকতা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। এই দিক দিয়া বাস্তব সার্বভৌমিকতা সার্বভৌমিকতাই নহে, এবং আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নির্দেশ করা অযৌক্তিক।

গেটেল বলেন, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ না করিয়া আইনানুমোদিত ও বাস্তব সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

৬। জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty): সার্বভৌমিকতাকে অনেক সময় জনগণের বলিয়া বর্ণনা করা হয়। জনগণই যে প্রকৃত চরম ক্ষমতার অধিকারী এ-ধারণা প্রাচীন রোমে বর্তমান ছিল। পরে অবশ্য ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা ষোল ও সতের শতকে সৃষ্ট। ইহার উদ্ভব হয় চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের ফলে। স্বাভাবিক আইন ও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে এই দুই শতাব্দীতে অনেক লেখক জনগণের চরম ক্ষমতা সমর্থন করিয়াছিলেন। এই লেখকগণের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, আদিতে সার্বভৌমিকতা জনগণেরই ছিল এবং তাহা হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া কোনরূপে হস্তান্তরিত হয় নাই। যেমন লকের মতে, কাম্য শাসন-ব্যবস্থায় সার্বভৌম জনসাধারণের সম্মতিক্রমে (with the consent of the governed) ব্যবহৃত হইবে, আইন জনসাধারণের ইচ্ছাতেই প্রণীত হইবে।

ইহার পর আঠার শতকে আসিয়া জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই ধারণা আরও চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। রুশো এবং আমেরিকার জননেতা জেফারসন (Jefferson) জনগণই যে চরম ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকারী—ইহা বিজয়ীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং এই শতকেই অনুষ্ঠিত দুইটি বিপ্লবের—ফরাসী ও আমেরিকান—ভিত্তি হিসাবে ইহা গৃহীত হয়।

গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র: ব্রাইস বলেন, এই সময় হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১] ইহা এই ধারণার

১. Since the American Declaration of Independence and the French Revolution „popular sovereignty has become basis and watchword of democracy."

প্রেরণা যোগাইয়াছে যে, সার্বভৌম শক্তি বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—অর্থাৎ জনসাধারণ দ্বারা ব্যবহৃত না হইলে উহা স্বায়ত্ত সার্বভৌম বা রাষ্ট্রশক্তি বলিয়া পরিগণিতই হইতে পারে না।[১] আইনের প্রসংগে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হইতেছে।[২]

সমালোচনা: জনগণের সার্বভৌমিকতা যে গণতন্ত্রের ভিত্তি ইহা অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ। ইহার প্রতি শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না। কিন্তু 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে ধারণার একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত অর্থ করিয়া ইহাকে মতবাদের রূপ দেওয়া কঠিন।

অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট ধারণা: গার্ণার বলেন, বিভিন্ন লেখক 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বিভিন্নভাবে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করায় ধারণাটিতে বিশেষ অস্পষ্টতা—এমন কি অনির্দিষ্টতাবও সৃষ্টি হইয়াছে। "যাঁহারা সার্বভৌমিকতাকে জনগণের বলিয়া অভিহিত করেন ··· তাঁহারা 'জনগণ' বলিতে কি বুঝেন, তাহা অধিকাংশ সময় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন না।" এক অর্থে জনগণ বলিতে রাষ্ট্রাধীন সমগ্র অনির্দিষ্ট জনসাধারণ বা জনতাকে বুঝায়। কিন্তু এই অনির্দিষ্ট জনতা কখনও সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করিতে পারে না। জনগণের মতামত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সুসংগঠিত নহে বলিয়া ইহাকে ঠিক জনমত (Public Opinion) বলা যায় না। জনতার মত যদি জনমতে পরিণত হয় তবে ইহাকে 'রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা' (political sovereignty) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে মাত্র 'আইনসংগত সার্বভৌমিকতা' (legal sovereignty) বলিয়া নহে। উপরন্তু, জনমতকে সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইলেও উহার প্রয়োগের জন্য স্থায়ী গণ উদ্যোগের ব্যবস্থা (a permanent system of referendum) থাকা প্রয়োজন।[৩] বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিতে জনতার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং বিপ্লব দ্বারা আইনানুমোদিত সরকারের পরিবর্তনের সম্ভাবনাও বুঝাইতে পারে। এই অর্থের বিরুদ্ধে বক্তব্য হইল যে, বিপ্লব কখনই আইনসংগত নহে, কিন্তু সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই আইনগত। সুতরাং জনগণের বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে 'সার্বভৌমিকতা' আখ্যা কোনমতেই দেওয়া যাইতে পারে না।

সংকীর্ণ অর্থ: 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে অনেক সময় সংকীর্ণ ধারণা করিয়া মাত্র ভোটাধিকারীগণকে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা হয়। ভোটাধিকারিগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে তাহাদের ইচ্ছাকে আইনের রূপদান করিয়া চূড়ান্ত

১. "Sovereignty is state power when it is being exercised democratically." Andrew Hacker: *Political Theory*

২. পরবর্তী অধ্যায়ে 'আইন কি সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ?' দেখ।

৩. Laski: *A Grammer of Politics*

ক্ষমতার ব্যবহার করে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রে নির্বাচক বা ভোটাধিকারীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। আবার দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকায় সকল নির্বাচকের নির্বাচিত প্রতিনিধিই আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন না, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিগণই করেন। সুতরাং কার্যত এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের নির্বাচকগণই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ব্যবহার করে। এইরূপ ক্ষমতাকে 'জনগণের' বলিয়া অভিহিত করা যায় কি?

মূল্য: 'জনগণের সার্বভৌমিকতা'র ধারণা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ও আইনসংগত না হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ধারণাটির কিছু মূল্য আছে। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে শাসনকার্য জনমতের অনুকূলেই পরিচালনা করা হয় এবং জনমত যাহাতে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার মধ্যে লিখিত শাসনতন্ত্র, ব্যাপক ভোটাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রভৃতিই প্রধান। অনেক সময় আবার গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও থাকে।

ব্যবহারিক রূপ: বস্তুত, এই সকল ব্যবস্থাই বর্তমানে জনগণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারিক রূপ। ইহাদের দ্বারা জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকেই নিয়ন্ত্রিত করে। গিলক্রিস্টের মতে, জনগণের সার্বভৌমকতা বলিতে এই নিয়ন্ত্রণই বুঝায়।[১]

সাধারণের ইচ্ছা ও সার্বভৌমিকতা (General Will and Sovereignty): হবসের ন্যায় রুশোর মতে (সামাজিক) চুক্তি হইয়াছিল মাত্র একটি। তবে রুশো-কল্পিত চুক্তির ফলে কোন রাজার সৃষ্টি হয় নাই। অর্থাৎ, আদিম মনুষ্যগণ চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সকল ক্ষমতা সমর্পণ করে নাই। ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজকে যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রুশোর সাধারণের ইচ্ছার স্বরূপ: এই চুক্তি প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি। ইহাতে কোন দ্বিতীয় পক্ষ নাই। ইহা দ্বারা আদিম ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে, 'তাহার নিজস্ব সত্তা ও সকল ক্ষমতা সাধারণের ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিয়াছিল'। এবং প্রত্যেকেই সাধারণের ইচ্ছা বা নবগঠিত সমাজের অংশ বলিয়া, ব্যক্তিসমূহ যৌথভাবে যাহা সমর্পণ করিয়াছিল তাহাই ফিরিয়া পাইল। সুতরাং সকল কিছু সমর্পণ করিয়াও কেহ নিঃস্ব হইল না। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল, কারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী ও অংগীভূত।

---

১. "The phrase 'popular control' better indicates the idea underlying 'popular sovereignty'."

হবস ও রুশোর মধ্যে পার্থক্য : এইভাবে সৃষ্ট সাধারণের ইচ্ছা হইল সার্বভৌম। রুশোর এই সার্বভৌম হবসের সার্বভৌমের মত সর্বাত্মক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য হইল যে হবসের সার্বভৌম হইল ব্যক্তিবিশেষ বা রাজা আর রুশোর সার্বভৌম হইল জনসমষ্টি (community of persons)।

হারনশের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, হবসের 'লেভায়াথানে'র মস্তক ছেদন করিলেই রুশোর 'সাধারণের ইচ্ছা' পাওয়া যায়। তবে রুশোর এই ছিন্নমস্তক লেভায়াথান হবসের মস্তকসমন্বিত লেভায়াথানের মতই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী।"[১]

সাধারণের ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য : রুশোর সার্বভৌম 'সাধারণের ইচ্ছা'র বৈশিষ্ট্য-গুলি উপলব্ধি করা কঠিন নয়। প্রথমত, সার্বভৌম বলিয়া ইহাকে বিভক্ত বা হস্তান্তরিত করা যায় না। হস্তান্তরিত করা যায় না বলিয়াই রুশো-কল্পিত চুক্তিতে রাজার স্থান থাকিতে পারে না। সরকার যে-ক্ষমতার ব্যবহার করে তাহা রুশোর মতে চুক্তি দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা নহে, অর্পিত ক্ষমতা (delegated powers) মাত্র। এই ক্ষমতার মধ্যে মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই, কারণ মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কখনও প্রতিভূর হস্তে অর্পণ করা যায় না।[২]

দ্বিতীয়ত, ইহা চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। চূড়ান্ত বলিয়া ইহাকে সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তির ইচ্ছার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে সাধারণের ইচ্ছাই বজায় থাকিবে, ব্যক্তির ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে। ব্যক্তির ইচ্ছাকে দমন করা কি যুক্তিযুক্ত? ইহার উত্তরে রুশোর প্রতি প্রশ্ন হইবে, কেন নয়? সাধারণের ইচ্ছা যে অভ্রান্ত, ইহা যে সাধারণের কল্যাণকামী, ইহা যে সকল ব্যক্তির 'প্রকৃত ইচ্ছা'র (real will) সমন্বয় মাত্র। যদি ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধে তবে বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি 'অপ্রকৃত ইচ্ছা'র (unreal will) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে সুতরাং বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহার প্রকৃত ইচ্ছা ও সাধারণের ইচ্ছার মধ্যে কোন অসংগতি নাই—থাকিতে পারে না।

সমালোচনা : বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাহা প্রকৃত ইচ্ছা বা সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া পরিগণিত তাহা হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা এবং যাহা অপ্রকৃত ইচ্ছা—অর্থাৎ যাহা সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইল সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা। সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ সাধারণের ইচ্ছা বা ইহার প্রকাশ আইনের বিরুদ্ধাচরণ

১. "The 'general will' of Rousseau is Hobbes's Leviathan with his head chopped off .... The headless Leviathan of Rousseau is as formidable as the complete monster of Hobbes." Hearnshaw : *The Development of Political Ideas*

২. "Rousseau asserted that the function of legislation—fundamental legislation ... could never be legitimately delegated ... ." Cole : *Rousseau's Political Theory*

করিলে তাহাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে—তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহারা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে। সুতরাং আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা চলিবে না।

বলপ্রয়োগ ও স্বৈরাচারিতার ক্ষেত্র : অতএব, রুশোর সাধারণের ইচ্ছাতেও বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র রহিয়াছে, দমন করার প্রশ্ন রহিয়াছে, স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে হবসের সহিত ইহার পার্থক্য এইখানে যে, হবস্ করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন আর রুশো করিয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন। রুশোর মতবাদে অবশ্য আছে গণতন্ত্রের সমর্থন; কিন্তু আইনের বিরুদ্ধাচরণ যখন অবৈধ তখন কার্যত এই তত্ত্বসর্বাত্মক রাষ্ট্রেরই (Totalitarian State) পরিপোষক।[১] সুতরাং রুশোর সমস্যা যে সাধারণের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন—তাহা সম্ভব হয় নাই। ফলে রুশোকে সমভাবেই মানবাধিকারের ঘোষক এবং সর্বাত্মক রাষ্ট্রের জনক বলিয়া অভিহিত করা যায়।[২]

মূল্য—রুশোর অবদান সার্বভৌমিকতা ও সাধারণের স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে অসমর্থ হইলেও রাজনৈতিক মতবাদ সৃষ্টিতে রুশোর যে বিশেষ দান রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস হইল জনসাধারণ এবং সাধারণের মংগলসাধনই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা হইতে তিনি চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্র জনসাধারণের সক্রিয় ইচ্ছার (active will) উপরই প্রতিষ্ঠিত, নিষ্ক্রিয় পরোক্ষ সম্মতির (passive consent) উপর নহে। তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রকে প্রাণিদেহের সহিত তুলনা করা যায় এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। পরিশেষে, রুশো জানাইতে চাহিয়াছেন, একদিন-না-একদিন একভাবে বা অন্যভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সাধারণের স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্পূর্ণ সম্ভব হইবে এবং তখন আবার ফিরিয়া আসিবে সেই অতীতের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক জীবন (free and democratic community life)। অতীতে যাহা সত্য ছিল, ভবিষ্যতে আবার তাহা সম্ভব হইবে না কেন।[৩] তাঁহার এই নীতি ও বিশ্বাসগুলি রাজনৈতিক আদর্শের জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, চিরকালই থাকিবে।

---

১. Rousseau's doctrine, though it pays "lip-service to democracy, tends to the justification of totalitarian State." Bertrand Russell। কোলের (G. D. H. Cole) মতে অবশ্য এইরূপ সর্বাত্মক রাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা সীমাহীন বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহাতে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের (people) ক্ষমতাই সীমাহীন, ব্যক্তিগতভাবে কোন নাগরিকের বা নাগরিকদের প্রতিভূস্বরূপ সংস্থা সরকারের ক্ষমতা নহে।

২. 'Rousseau is equally the father of the Declaration of Rights and of the Authoritarian State." Lloyd: *Democracy and Its Rivals*

৩. Rousseau reminds us that "the goal he set for the future once existed in the past." Andrew Hacker; *Political Theory*

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ: সুতরাং একদিক দিয়া রুশোকে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র (democratic revolution) পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ (Austinian Theory of Sovereignty): আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রধান ব্যাখ্যা-কর্তা হইলেন ইংরাজ আইনানুগ দার্শনিক অষ্টিন (John Austin)। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'আইনশাস্ত্রের উপর বক্তৃতা' (*Lectures on Jurisprudence*) নামক পুস্তকে এই মতবাদ প্রথম প্রচারিত হয়।

উৎস: সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিস্ফুটনে অষ্টিন চুক্তিবাদী (contractualist) হবস্ ও হিতবাদী (utilitarian) বেন্থাম (Jeremy Bentham) দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রধানত বেন্থামকে অনুসরণ করিয়াই তিনি আইন এবং প্রথার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। অষ্টিনের মতে, আইন হইল অধস্তনের প্রতি উর্ধ্বতনের আজ্ঞাবিশেষ; ইহার সহিত নৈতিক সূত্র বা প্রচলিত প্রথার কোন সংস্রব নাই। রাষ্ট্র মধ্যে সার্বভৌম শক্তিই চরম চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইহার আদেশই একমাত্র আইন। এইভাবে অষ্টিন সমাজে সংহতি আনয়ন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আইনের একটিমাত্র উৎসের নির্দেশ দিয়াছেন।

সংজ্ঞা: আইন সম্বন্ধে এই ধারণা হইতে অস্টিন সার্বভৌমকতা সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট করিলেন এবং সার্বভৌমিকতার এইরূপ সংজ্ঞা দিলেন: যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ অপর কোন উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে কিন্তু সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য পাইয়া আসিতে থাকে, তবে সেই সমাজে ঐ নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদই সার্বভৌম এবং এইরূপ সমাজ রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।[১]

বিশ্লেষণ: অষ্টিন-প্রদত্ত সার্বভৌমকতার উপরি-উক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ এইভাবে করা চলে: (ক) প্রত্যেক স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রেই কোন-না-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি বা যাঁহারা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

(খ) এই সার্বভৌম হইলেন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ যিনি বা যাঁহারা নির্দিষ্ট—জনসাধারণের মত অনির্দিষ্ট বা সাধারণের ইচ্ছার মত নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) নহেন।

(গ) সার্বভৌমিকতার অধিকারী বা অধিকারিগণকে অষ্টিন উর্ধ্বতন (superior) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ কাহারও আনুগত্য

১. If a *determinate human superior*, not in a habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the *bulk* of a given society, that determinate superior is sovereign in the society, and the society...is...political and independent."

স্বীকার করেন না এবং ইহার বা ইহাদের ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও অসীম। সার্বভৌমিকতা কোনরূপ আইনগত বাধা মানে না।

চরম ও অসীম বলিয়া সার্বভৌমিকতা সর্বপরিব্যাপ্ত—রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর ইহার এক্তিয়ার রহিয়াছে। যেহেতু সর্বপরিব্যাপ্ত সেইহেতু সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্যও বটে।

(ঘ) জনসাধারণের স্বভাবজাত আনুগত্যই সার্বভৌমিকতার মানদণ্ড। অর্থাৎ সার্বভৌম শক্তির প্রতি জনসাধারণ স্বতই আনুগত্য স্বীকার করিবে, সাময়িকভাবে নহে।

ল্যাস্কি কর্তৃক অস্টিনের মতবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ: ল্যাস্কির মতে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদের তিনটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। (ক) অস্টিনের মতে রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত এক সংস্থা (a legal order) যেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব সমগ্র ক্ষমতার উৎস হিসাবে কার্য করে। (খ) এই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণ অপ্রতিহত; ইহা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। রাষ্ট্র কার্যের বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত কোন বাধা সৃষ্টি করা যায় না। তৃতীয়ত, সার্বভৌমিকতার আদেশই আইন। এই আদেশ পালন না করিলে বিধিমত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সংক্ষিপ্তসার: অস্টিনের সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞার উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, অস্টিনের মতে সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম অপ্রতিহত ও শাশ্বত ক্ষমতা যাহার অবস্থান নির্দেশ করা হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে। সার্বভৌমের আদেশই আইন। আইন অমান্য করিলে সার্বভৌম শক্তি আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করিতে পারে।

সমালোচনা: সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে আইনমূলক মতবাদ। সুতরাং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। ইতিহাসের দিক দিয়া স্যার হেনরী মেইন, সিজউইক প্রভৃতি লেখক দেখাইয়াছেন যে, অস্টিনের মতবাদ সম্পূর্ণ কৃত্রিম। মেইন বলেন, আজ পর্যন্ত কোন সার্বভৌম সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন নাই। তত্ত্বের দিক দিয়া হয়ত তিনি সমাজজীবনের যে কোন নিয়মপদ্ধতির প্রবর্তন করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরূপ কোন নিয়মপদ্ধতির প্রবর্তন করিতে চাহেন নাই যাহা করিতে পারিলে তাঁহাকে অস্টিনের কল্পনা অনুসারে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যাইত। অস্টিনের মতে, ইংলণ্ডে রাজা (বা রাণী)-সহ পার্লামেণ্টের মধ্যে সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টকেও অস্টিনের অর্থে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যায় কি? ল্যাস্কিকে অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন করা যায়: আইনের দিক দিয়া কোন বাধা না থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে কোন পার্লামেণ্ট পরস্পরকে হত্যা করিবার, পরস্পরের অর্থব

অপহরণ করিবার, ধর্মীয় সংঘগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করিবার, ভোটাধিকার কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করিতে পারে কি? • মেইনের মতে, সমাজজীবনের এরূপ অসংখ্য প্রভাব কার্য করে যাহা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অস্টিন এই সকল প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

রাজনৈতিক সার্বভৌমকে উপেক্ষা: অন্যভাবে বলিতে গেলে, অস্টিন আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধিতা: দ্বিতীয়ত বলা যায়, অস্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের সহিত বর্তমানের জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণার কোন সংগতি নাই। সুতরাং ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী।

আইনের সংজ্ঞার প্রশ্ন: তৃতীয়ত, অস্টিন-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। ল্যাস্কি বলেন, আইনকে শুধু আদেশ বলিয়া অভিহিত করিলে শালীনতার সীমারেখা অবধি পৌঁছিতে হয়।[১] প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এরূপ বহু প্রথাগত আইন থাকে সার্বভৌম শক্তি যাহার বিলোপের চিন্তাও করিতে পারে না। বলা হয়, অস্টিন এইরূপ প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বস্তুত, অস্টিন প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেন নাই; তিনি ইহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনই ছিলেন। তাই তিনি 'আদেশ' শব্দের অর্থ এইভাবে করিয়াছেন: সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন তাহাই তাঁহার 'আদেশ' (What the sovereign *permits* he commands)। কিছু কিছু প্রথাকে তিনি অনুমোদন করিয়া আইনের রূপদান করিয়াছেন। এই অনুমোদন আসিয়াছে সার্বভৌমের আদালতসমূহের (courts of the sovereign power) মাধ্যমে। যতক্ষণ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, ততক্ষণ কোন প্রথাই আইনে পরিণত হয় না।

বলপ্রয়োগের পূর্ববর্তিতা: চতুর্থত, বলা হয় যে, অস্টিন প্রমুখ আইনজ্ঞগণ (Analytical Jurists) শক্তিপ্রয়োগের ভিত্তিতে নিয়মশৃংখলার কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, এই সকল আইনজ্ঞগণের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা নিয়মশৃংখলা বজায় রাখা হয়। আধুনিক ধারণানুসারে কিন্তু দণ্ডভয়ের (fear of punishment) দরুন আইন মান্য করা হয় না, মান্য করা হয় লোকে বিভিন্ন কারণে আইন মানিতে অভ্যস্ত বলিয়া।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা: পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এমন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না যাঁহার বা যাঁহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই প্রসংগে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

---

১. "To think ... of law as simply a command is ... to strain definition to the verge of decency." Laski

আরও দুইপ্রকার সমালোচনা : পরিশেষে, অষ্টিনের মতবাদ অনুসারে সার্বভৌমের যে চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বহুত্ববাদিগণ দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে। এ-বিষয়ের আলোচনাও পরে করা হইতেছে।

আধুনিক দৃষ্টিকোণ : আধুনিক লেখকগণের অনেকে কিন্তু অষ্টিনের মতবাদ সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। ইহাদের মতে, অষ্টিন সার্বভৌমিকতা এবং পাশব বলকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—সমালোচকদের এই ধারণা ভুল। কোকার স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, অষ্টিনের মতবাদে এইরূপ অভিন্নতার ইংগিত কোথাও নাই। অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসন বলেন, অষ্টিন নৈতিক ও ঐশ্বরিক আইনের শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন এবং অষ্টিন এরূপ মূর্খ ছিলেন না যে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে সরকারের যথেচ্ছাচারের ক্ষমতাকে বুঝিবেন, তবুও তাঁহার সমালোচকরা একরূপ ধরিয়া লইয়াছেন যে অষ্টিন চূড়ান্ত ক্ষমতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টিনের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জনগণের স্বভাবজাত আনুগত্যই যখন সার্বভৌমিকতার লক্ষণ তখন সাধারণের সম্মতিই ইহার ভিত্তি। সাধারণের সম্মতি না থাকলে সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না।

সুতরাং অস্টিন কখনও পাশব বলকে সার্বভৌমিকতা বলিয়া গণ্য করেন নাই।[১]

উপসংহার . উপসংহারে বলা যায়, অষ্টিনের মতবাদ কতকগুলি পূর্বধারণার (preconceptions) উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণাগুলি মানিয়া লওয়া হইলে মতবাদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অষ্টিনের উদ্দেশ্য ছিল আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বর্ণনা করা। এই উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হইয়াছে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। সমাজের অস্তিত্ব যদি বজায় রাখিতে হয় তবে উহাকে কতকগুলি নিয়মশৃংখলার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। এ-বিষয়ে হবসের সহিত অষ্টিনও ছিলেন একমত। উক্ত নিয়মশৃংখলার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করা চলিবে না এবং ইহার উৎস হইবে মাত্র একটি। অতএব, সার্বভৌম হইবেন অবিভাজ্য ও চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন। সকল বিষয়ে তিনি অযথা হস্তক্ষেপ করেন না, কারণ ইহাতে তাঁহার মর্যাদা ও কর্তৃত্বের হানি ঘটে। তবে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নাই এবং তাঁহার কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একমাত্র পন্থা হইল বিদ্রোহ করা—যাহা কোনমতেই আইনসংগত নহে।

হবসের তত্ত্বের পরিপূর্ণতা : এই আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক সার্বভৌমিকতা (legal and constitutional sovereignty) ইংল্যাণ্ডের বিধিশাস্ত্রের (British Jurisprudence) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হবসের রচনায় ইহার সূত্রপাত ঘটিলেও ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করে অস্টিনের হস্তে।

১. D. N. Banerji : *Austin and the Basis of Obedience to Law*

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগি : মোটামুটিভাবে বলা যায়, আইনগতভাবে অষ্টিনের তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। তবে সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে যে সামাজিক শক্তিসমূহ কার্য করে তাহার নির্দেশ এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। মার্ক্সবাদ অনুসারে সমাজে যে-শ্রেণী প্রতিপত্তিশালী সেই শ্রেণীর স্বার্থসাধন করাই হইল সার্বভৌম শক্তির কার্য। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজে সার্বভৌম শক্তি মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থসাধনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রযুক্ত হয়।[১]

সার্বভৌমিকতার বিভাজনতত্ত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় (Theory of Divided Sovereignty and Location of Sovereignty in a Fedaration) : অবিভাজ্যতা সার্বভৌমিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ইহা কেন্দ্রীয় সরকারে নিহিত থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রে ইহার অবস্থান কোথায় নির্দেশ করা যাইবে ?—ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন প্রথম উঠিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা : সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে পর এই সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বজায় না থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। এই উদ্দেশ্যে শাসনক্ষমতা সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশগুলির সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক সরকার নিজ নিজ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে কার্য পরিচালনা করিয়া যায়—কেহ কাহারও অধীন থাকে না।

এখন প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার সন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে ? কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন অংশের সরকার সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারীরূপে গণ্য হইতে পারে না। কারণ, উভয়ের ক্ষমতাই শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট—অপ্রতিহত, চরম ও চূড়ান্ত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিসোল্‌ম বনাম জর্জিয়া [Chisolm *vs.* Georgia (2 Dallas 435)] মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদান করে যে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিভক্ত। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ উভয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্ব রহিয়াছে দেখার যে উভয় সরকার সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করিতেছে কি না। অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও সার্বভৌমিকতা নাই।

অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস বা রাজ্যের আইনসভা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই উক্তি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

সংবিধানই কি সার্বভৌম ? : অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সার্বভৌম। কিন্তু এই ধারণা অষ্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ,

১. D. N. Sen : *From Raj to Swaraj* ; and Laski : *Crisis in the Theory of the State* in *A Grammar of Politics*

সংবিধান ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে চলিল মাত্র। উপরন্তু, সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান চরম হইলেও পরিবর্তনীয়। সুতরাং বলা হয়, সংবিধানকে সার্বভৌম আখ্যা না দিয়া সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতাকেই সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।[১] এই অভিমতের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া হয়. (ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সদা-সর্বদাই প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সংবিধানের সংশোধনকারী সংস্থা অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কার্য করিয়া থাকে। এ-অবস্থায় সংশোধনকারী সংস্থাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলিয়া গণ্য করা হইলে এই সিদ্ধান্তে আমাদের আসিতে হয় যে সার্বভৌম অধিকাংশ সময় সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকে। ইহা কি যুক্তিসংগত? (খ) সংশোধনকারী সংস্থার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ—ইহা মাত্র সংবিধানেরই সংশোধনী আইন পাস করিতে পারে, অন্য কোন আইন নহে। অধিকাংশ সময় আবার সংবিধানের সকল ধারার পরিবর্তনও করা যায় না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় ব্যতীত কোন রাজ্যকে সিনেটে সমানসংখ্যক সদস্যপ্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় সংবিধান-সংশোধনকারী সংস্থাকে কোনক্রমেই সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যায় কিরূপে?

অতএব, গেটেল প্রভৃতি লেখকের অভিমত হইল যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টিগত-ভাবে সকল আইন-প্রণয়নকারী সংস্থাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা নিহিত কারণ, সমষ্টিগত-ভাবে ইহাদের সকলের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা আইনগতভাবে প্রকাশিত হয়। এই মতানুসারে মাত্র কেন্দ্রীয় ও আংগিক আইনসভাগুলিই নয়, সংবিধান-সংশোধনকারী সংস্থা, আইনপ্রবর্তনকারী আদালত, এমনকি ভোটদাতৃগণও অল্পবিস্তর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সুতরাং তাহারা সমষ্টিগত সার্বভৌম—এককভাবে কোন সংস্থা নহে।

ল্যাস্কি: উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য ল্যাস্কি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব" (...discovery of sovereignty in a federal state is ..an impossible adventure)।

বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতাসমূহ বণ্টিত হয়, সার্বভৌমিকতা বণ্টিত হয় না। চরম ক্ষমতার বণ্টন অসম্ভব। চরম ক্ষমতার বণ্টন কল্পনা করিলে সার্ব-ভৌমিকতার সম্পূর্ণ নূতন সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হয়।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ—একত্ববাদের উপর বহুত্ববাদের আক্রমণ (Monistic and Pluralistic Theory of Sovereignty—Attacks on Monism):

বোদাঁ হবস্ বেস্থাম ও অস্টিন দ্বারা পরিস্ফুটিত সার্বভৌমিকতা

১. "It (sovereignty) lies in the body, wherever and whatever it may be, which has the power to amend the constitution." Stephen Leacock

২. "*The Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics*"-এর ৭০-৮০ ধারা।

সম্বন্ধে পরম্পরাগত (traditional) মতবাদ সাম্প্রতিক যুগে বহুত্ববাদী (Pluralists) নামে অভিহিত একদল লেখক দ্বারা বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে।

আক্রমণ: বহুত্ববাদিগণের মতে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনসংগত মতবাদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বিপজ্জনক মতবাদ। লিণ্ডসে (A. D. Lindsay) বলেন, "ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে সার্বভৌম রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।"[১] বার্কারের মতে, "অপর কোন প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ অপেক্ষা শুষ্ক ও মূল্যহীন হইয়া উঠে নাই।"[২] ল্যাস্কি বলেন, "সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনসংগত মতবাদকে রাজনৈতিক দর্শনের উপযোগী করিয়া তোলা অসম্ভব।" এবং "সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে সমগ্র ধারণাটিকেই পরিত্যাগ করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে স্থায়ী উপকার হইত।"

একত্ববাদ (Monism): সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে পরম্পরাগত বা আইনসংগত মতবাদকে একত্ববাদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। একত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস এবং তত্ত্বগতভাবে এই কর্তৃত্ব সর্বব্যাপক ও অসীম। কোন কোন লেখকের মতে, একত্ববাদ দুই প্রকারের: (১) (পূর্ণ) তত্ত্বগত একত্ববাদ (Abstract Monism এবং (২) বাস্তব একত্ববাদ (Concrete Monism)।

ক। (পূর্ণ) তত্ত্বগত একত্ববাদ: (পূর্ণ) তত্ত্বগত একত্ববাদ অনুসারে মানুষের নৈতিক ও মানসিক প্রকৃতির স্বার্থে একমাত্র রাষ্ট্রের অবস্থিতি প্রয়োজন এবং অন্যান্য সংঘ এক নয় নিষিদ্ধ করিতে হইবে আর নয় ধ্বংস করিতে হইবে।[৩] যাঁহারা এই (পূর্ণ) তত্ত্বগত একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁহাদের যুক্তি হইল যে নৈতিক দিক দিয়া অন্যান্য সংঘ থাকিলে মানুষের আনুগত্যের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিবে। মানসিক দিক দিয়াও আনুগত্যের বিভিন্ন দাবিদার মানুষের স্থিতিশীল ও সুখী জীবনকে অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

পূর্ণ বা তত্ত্বগত একত্ববাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হইলেন রুশো। তাঁহার মতে, অন্যান্য সংঘ বা সমিতির অস্তিত্ব থাকিলে 'সাধারণের ইচ্ছা (the General Will) কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারিবে না।[৪]

খ। বাস্তব একত্ববাদ: বাস্তব একত্ববাদ বাস্তবের দৃষ্টিকোণ হইতে সংঘসমূহের অস্তিত্ব ও উহাদের উপযোগিতা স্বীকার করে, কিন্তু বলিতে চায় যে সকল

১. "If we look at the facts it is clear that the theory of sovereign State has broken down."

২. "No political commonplace has become more arid and unfruitful than the doctrine of sovereign state."

৩ Abstract Monism "is the theory that the State is the only association necessitated by the moral and psychological nature of man and that all others are to be prohibited or destroyed." J. D. Mabbott: *The State and the Citizen*

৪. "... if the general will is to be able to express itself ... there should be no partial society within the state." Rousseau: *Social Contract*

সংঘ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রাধীন ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। এই মতবাদ অনুসারে সার্বভৌমিকতা এক এবং অবিভাজ্য। ইহা একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। এই কারণে রাষ্ট্র তাহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত সমগ্র ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সংঘের উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্বের অধিকারী। ইহার বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত কোন বাধাই নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম; প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংঘকে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। না মানিলে রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করিতে পারে এবং একমাত্র রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের অধিকারী।

অতএব, রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও সংঘ রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন, তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে রাষ্ট্রের উপর এবং তাহারা যে-সকল অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করে তাহা রাষ্ট্র-প্রদত্ত।

কয়েকজন একত্ববাদী: একত্ববাদীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হইলেন বোদাঁ (Bodin), গ্রোটিয়াস (Grotius), হবস (Hobbes), রুশো (Rousseau), (Bentham) এবং অস্টিন (Austin)। ইঁহারা সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্র এক অতি প্রয়োজনীয় সংস্থা এবং আইনগতভাবে ইহা চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী।[১]

অন্যান্য একত্ববাদীর মধ্যে আছেন চরমপন্থী আদর্শবাদী লেখক হেগেল (Hegel), ট্রিটস্কে (Treitschke), ব্রাডলি (Bradley), বোসানকেত (Bosanquet) ইত্যাদি। হেগেলের মতে, রাষ্ট্র মাত্র আইনের দিক হইতেই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নহে, চরম নৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী। রাষ্ট্রের সভ্য হওয়ার মধ্যেই ব্যক্তির সার্থকতা—অর্থাৎ রাষ্ট্রসত্তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা নিহিত।

ট্রিটস্কের মতে, রাষ্ট্র হইবে সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং উহা ব্যক্তির উপর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে সমর্থ। ব্রাডলি, বোসানকেত প্রভৃতি ইংরাজ আদর্শবাদী রাষ্ট্রকে চরম বলিয়া মনে করিলেও এই অভিমত প্রকাশ করেন ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য।

এইরূপ একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে বহুত্ববাদের জন্ম।

বহুত্ববাদ (Pluralistic Theory): বহুত্ববাদের উদ্ভব হয় উনিশ শতকের শেষভাগে। ঐ শতকে জৈব মতবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, বেন্থামের আশাবাদ (Optimistic Theory) যে আইন প্রণয়ন দ্বারা সংস্কারসাধন করা সম্ভব, প্রভৃতির প্রচারের ফলে রাষ্ট্র অভূতপূর্বভাবে ব্যাপক ক্ষমতা অধিকার করে। এবং এইভাবে সমাজ-জীবনের প্রায় সমগ্র কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সংঘ ও ব্যক্তির স্বতন্ত্র

১. "The common and essential feature in the systems of Bodin, Grotius, Hobbes, Rousseau and Austin, is the doctrine of the state as an essential institution of society ··· with the corollary that the state is legally supreme." F. W. Coker: *Recent Political Thought*

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র ব্যক্তির যথাসর্বস্ব দাবি করিতে থাকে, শান্তির সময়েও নিত্যনূতন আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সংঘের জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে দেখা যায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া। ইহা বার্কারের ভাষায়, 'রাষ্ট্র বনাম সংঘ' (State *v.* Group) এই রূপ ধারণ করে। সংক্ষেপে ইহাকেই বহুত্ববাদ বলা হয়।[১]

বহুত্ববাদের বর্ণনা : বহুত্ববাদ নৈরাজ্যবাদের (Anarchism) মত রাষ্ট্রের বিলুপ্তিসাধন চায় না—রাষ্ট্রকে বজায় রাখিয়া মাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে চায়। বহুত্ববাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের হাত হইতে সমস্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বণ্টন না করিলে স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে।

বহুত্ববাদিগণ মানুষের সামাজিক প্রকৃতিতে অবিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের সামাজিক প্রকৃতি পূর্ণভাবে বিকাশিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র ও সমাজ এক ও অভিন্ন নহে, সমাজ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সংগঠনের যুক্তসংঘ। অর্থাৎ, সমাজ সংঘমূলক। এই নানাবিধ সংঘের মধ্যেই মানুষের সত্তা বিকশিত হয়, একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যে নহে।

বহুত্ববাদিগণ স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, এই কারণে রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নহে; বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ইহাকে কোনপ্রকার অসাধারণত্ব দান করে না।[২]

রাষ্ট্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন করে; এই কারণে ইহা নিজস্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম হইতে পারে। অন্যান্য সংঘও মানুষের আত্মবিকাশের পথ সুগম করে। সুতরাং তাহারাও রাষ্ট্রের মত স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম।

এই সকল সংঘের উপর কর্তৃত্ব বা ইহাদের কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই।[৩] ইহারা ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য, ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিক বিকশিত করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহারা রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই এবং রাষ্ট্র হইতে ইহারা কোন প্রেরণাও লাভ করে না। বর্তমানে দেখা যায়, এই সকল সংঘ ব্যক্তি-স্বার্থসংরক্ষণের প্রচেষ্টা রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক করে বলিয়া ব্যক্তি ইহাদের প্রতি রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর আনুগত্য স্বীকার করে। সুতরাং ইহাদের মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে অস্বীকার : বহুত্ববাদিগণ অস্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া ইহা আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগের অধিকারী।

১. বহুত্ববাদকে অনেক সময় সংঘমূলক বহুত্ববাদ (Group Pluralism) বলিয়াও অভিহিত করা হয়

২. ... Pluralism "regards the State as a particular association with no superior value or status." Mabbott : *The State and The Citizen*

সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নহে, ইহা একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য নহে। অন্যান্য সংঘও সার্বভৌমিকতার অধিকারী। ইহাদের সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার সীমানির্দেশ করে।

একটি কুসংস্কার . রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা একটি কুসংস্কার মাত্র যাহাকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে (The theory of sovereign state is a venerable sup‹ rstition.)। বহুত্ববাদিগণের মতে, এই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হওয়াই অন্যতম রাজনৈতিক আদর্শ।

রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও জাতীয় আইন : বহুত্ববাদের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার আরও দুইটি বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। প্রথমটি হইল: রাষ্ট্র আইনের উৎস নহে। সুতরাং রাষ্ট্র আইনের উর্ধ্বে নহে; বরং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আইন দ্বারাই সীমাবদ্ধ।

পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার এই শ্রেণীর সমালোচকগণের মতে, সমাজের সংহতিই আইনের ভিত্তি, সমাজবদ্ধ মানুষ সচেতনভাবে আইনকে স্বীকার করিয়া লয়। সমাজজীবনের সূত্রপাতের সংগে সংগেই, যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, মানুষ কতকগুলি সামাজিক বিধিনিয়মকে মানিয়া লইয়াছিল। এইগুলিই আইন। ইহারা রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী ও উর্ধ্বতন। আইন মান্য করা সকল সামাজিক ব্যক্তি ও সংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অন্যতম সামাজিক সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রও আইনের কর্তৃত্বাধীন। অতএব, জনমত ও জনকল্যাণের দিক দিয়া দৃষ্টি রাখিয়া আইন দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাষ্ট্র মাত্র নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবে, কর্তৃত্ব প্রকাশের কোন চেষ্টা করিবে না।

বস্তুত রাষ্ট্র কর্তব্যের সমষ্টি মাত্র, অপ্রতিহত কর্তৃত্বে অধিকারী নহে।

রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আন্তর্জাতিক আইন · বহুত্ববাদের সহিত সম্পর্কিত পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সমালোচনা করা হইয়াছে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে। সংক্ষেপে সমালোচনাকে এইভাবে বিবৃত করা যায়: আন্তর্জাতিক আইনের পরিস্ফুটন ও সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা নিছক কল্পনাপ্রসূত মতবাদে পরিণত হইয়াছে। কারণ, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অধিকারী নহে—সকল রাষ্ট্রেরই বাহ্যিক চরম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এই সকল আন্তর্জাতিক আইন জনমত দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা বিশেষ কঠিন। দ্বিতীয়ত, বর্তমান যুগের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে মানুষ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের মতই বলবৎ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, বলা যায় যে বর্তমান জগৎ কয়েকটি রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র নহে—ইহা এক বিশ্বজনীন সম্প্রদায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এক বৃহৎ পরিবার। এক্ষেত্রে আইনবিদগণের পক্ষে রাষ্ট্রের

অসীম সার্বভৌমিকতার কল্পনা করা অযৌক্তিক।[১] ইহা রক্ষণশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীলের দৃষ্টিভংগি মাত্র। প্রগতিতে বিশ্বাসী প্রত্যেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে বাধ্য।

এইভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে অভ্যন্তর ও বাহির উভয় দিক হইতেই আক্রমণ করা হইয়াছে। এই প্রসংগে একজন রাজনীতিবিদের উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে; "আন্তর্জাতিকতাবাদীরা সার্বভৌম রাষ্ট্রকে যখন শৃংখলাবদ্ধ করেন বহুত্ববাদিগণ তখন অস্ত্রোপচার দ্বারা উহার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা হ্রাসে অগ্রসর হন।"[২]

সমালোচনা—গুণ : (১) বহুত্ববাদ অন্যতম আধুনিক শক্তিশালী রাজনৈতিক মতবাদ। সর্বাত্মক, সর্বময়, অপ্রতিহত ও চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়া তাহাই একদিকে মতবাদের জগতে বহুত্ববাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা ব্যবহারিক জীবনে সরকার কর্তৃকই প্রযুক্ত হয়। সরকার গঠিত হয় সাধারণ লোককে লইয়া। তাহারা আমাদের মতই দোষত্রুটিসম্পন্ন। সুতরাং তাহাদের হস্তে চরম অপ্রতিহত সর্বাত্মক ক্ষমতা অর্পণ করা বিপজ্জনক। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেরও যে একটা সীমা আছে তাহা বহুত্ববাদিগণ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন। এই দিক দিয়া বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের ভাববাদ ও আদর্শবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম কাম্য প্রতিক্রিয়া।

(২) সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে সমাজকল্যাণ ব্যাহত হয়, কারণ 'রাষ্ট্রযন্ত্র জটিল, ধীরগতিসম্পন্ন ও অপচয়পূর্ণ।' সুতরাং বহুত্ববাদিগণ যুক্তিসংগতভাবেই 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' (united power of the community) সমগ্র সামাজিক সংঘের মধ্যে বণ্টনের পক্ষপাতী।

(৩) সমাজ-সংগঠনকে পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার মত শুধু আইনের দৃষ্টিতে দেখা যায় যে যাহা ত্রুটিপূর্ণ তাহা বহুত্ববাদ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করে। সমাজজীবনে যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে এবং বর্তমানে সংঘজীবন যে বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া আছে তাহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বহুত্ববাদিগণ রাজনীতিকে বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রধানত বহুত্ববাদের ফলেই আইনসভাসমূহে সংঘপ্রতিনিধিদের (representation of the groups) ব্যবস্থা হইয়াছে।

১. "...against...assertion of absolute sovereignty, there is also a drift toward a recognition of the conception of the State as a partner with other States..., For the attainment of this purpose sovereignty must be *relative*, not *absolute*." Shotwell : *The Problem of Government*

২. "The Internationalists would shackle the Leviathan with chains while the Pluralists would perform the necessary operation of his interior."

ত্রুটি : কিন্তু উপরি-উক্ত গুণাবলী সত্বেও বহুত্ববাদ ত্রুটিহীন নহে। (১) একত্ববাদের সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে, বহুত্ববাদিগণ নৈতিক ও আইনসংগত ধারণার মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অন্যতম আইনমূলক ধারণা, ইহার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। বিভিন্ন সংঘের স্বাতন্ত্র্যের যে অধিকার রহিয়াছে বলিয়া বহুত্ববাদিগণ প্রচার করেন তাহা নৈতিক অধিকার মাত্র, আইনসংগত অধিকার নহে।

সুতরাং বহুত্ববাদে রহিয়াছে ধারণার বিশৃংখলা (conceptual confusion)।

(২) একত্ববাদের সমর্থকগণ আরও বিশ্বাস করেন যে বহুত্ববাদিগণ সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তির আনুগত্যকে বিভক্ত করিয়া বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যবাদের পথিকৃৎ হিসাবে কার্য করিতেছেন।

এই দিক দিয়া বহুত্ববাদ ইতিহাসের পশ্চাৎগতির লক্ষণ। কারণ, ইহা রাষ্ট্র সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণা (medieval idea) পোষণ করে।

(৩) বহুত্ববাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা সমাজজীবনে রাষ্ট্রের কয়েকটি মৌলিক কার্যের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করে না। ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা রক্ষা, আইনসংগত দ্বন্দ্ব-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা এবং সীমান্ত রক্ষা বা রেলপথ-ব্যবস্থার ন্যায় সম্পূর্ণভাবে ভৌগোলিক ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন মাত্র রাষ্ট্র দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। বহুত্ববাদ ইহা অনুভব করিলেও স্পষ্টভাবে স্বীকার করে না। বহুত্ববাদিগণ এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য যে-সকল সংঘের অস্তিত্বের কল্পনা করিয়া থাকেন, অন্য আখ্যা পাইলেও প্রকৃতিতে তাহারা রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নহে।[১]

(৪) বহুত্ববাদের নির্দেশমত সমাজজীবনে বিভিন্ন সংঘকে স্বাতন্ত্র্য দান করিলেও সমাজজীবনে রাষ্ট্রের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান তাহার অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা ও অসাধারণত্ব লইয়া বজায় থাকিবেই। কারণ, বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংঘের মধ্যে অন্তত দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ভার কোন-না-কোন একটি সংঘের উপর অর্পণ করিতেই হইবে। ইহার ফলে এই সংঘ রাষ্ট্র নামে অভিহিত হউক আর না-হউক, উহা কি সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না? এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাই যে রাষ্ট্র।

(৫) বহুত্ববাদের আর একটি বিপদের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘের হস্তে চূড়ান্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইলেও উহাদের স্বৈরাচারিতার প্রতিবিধান কিভাবে করা যাইবে?

বলা হয় যে, চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের ত্রুটি একাধিক চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার দ্বারা অপসারণ সম্ভব নয়।[২]

(৬) ল্যাস্কি নিজেই নিজের মতবাদকে সমালোচনা করিয়া উক্তি করিয়াছেন, রাষ্ট্র

১. K. C. Hsiao : *Political Pluralism*

২. 'The evils of an absolute state are not cured by the multiplication of absolutes." Morris Cohen : *Reason and Nature*

যে শ্রেণী-সম্বন্ধের প্রকাশ বহুত্ববাদ তাহা বিশেষ উপলব্ধি করে না।[১] ইহা বহুত্ববাদের আর একটি ত্রুটি। সমাজের যে-শ্রেণীর হস্তে উৎপাদনের উপাদানগুলি থাকে রাষ্ট্র তাহাদের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক সর্বময় চূড়ান্ত অপ্রতিহত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একটি আইনগত ব্যাখ্যা। এদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সংঘস্বার্থে গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া বহুত্ববাদ বহুলাংশে বাস্তববিচ্যুত, সন্দেহ নাই।

উপসংহার : উপসংহারে বলা যায়, যে-যুগে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বিশেষ স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তির আনুগত্য লইয়া সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় সেই যুগেই বহুত্ববাদের উদ্ভব। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংঘ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বহুত্ববাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ ও আর্থিক সংঘ প্রবল হওয়ায় বহুত্ববাদ আবার বিশেষভাবে প্রবল হইয়াছিল। রাষ্ট্র যখন এই সকল স্বার্থ ও সংঘকে মানিয়া লইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করিয়া দিল তখন আবার বহুত্ববাদ একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বর্তমানে শ্রমিক সংঘের ন্যায্য অধিকার আছে, শ্রমিক-স্বার্থ আইনানুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক হইলেও বহুত্ববাদ একরূপ ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে।

সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব (The Theory of Limited Sovereignty): বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সার্বভৌমিকতার সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) **প্রয়োগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা :** বলা হইয়াছে যে আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে সার্বভৌমিকতা অপ্রতিহত হইলেও বাস্তবে রাষ্ট্রের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

(২) **নৈতিক সীমাবদ্ধতা :** অনেকের মতে আবার রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ঐশ্বরিক আইন (divine law), স্বাভাবিক আইন (natural law), স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) বা নৈতিক নিয়মকানুন দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ঐশ্বরিক বিধান, স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি, সামাজিক নীতি বা স্বাভাবিক অধিকারকে লংঘন করিয়া চলিতে পারে না। আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে অবশ্য এগুলিকে সার্বভৌমিকতার সীমাবদ্ধতা বলিয়া মনে করা যায় না। যেমন, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি এমন আইন পাস করে যাহা লোকের ধর্মবোধ বা নীতিবোধকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা হইলেও ঐ আইনকে আদালত স্বীকার করিতে বাধ্য। তবে আইনকানুনকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে রাষ্ট্রকে বিচার করিয়া চলিতে

[১] It does not sufficiently 'realise the nature of the state as an expression of class-relations'.

হয় কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে। তাহা না করা হইলে আইনকে কার্যকর করা কষ্টসাধ্য হইতে পারে—এমনকি জনবিক্ষোভ বা বিদ্রোহও দেখা দিতে পারে। তবে বলা হয় যে সার্বভৌম শক্তি নিজেই স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সমীচীনতার কারণে সার্বভৌম শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই সমাজজীবনে হস্তক্ষেপ করে না, যদিও আইনের দিক দিয়া হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ।

(৩) অনেকেই অভিমত পোষণ করেন যে, সার্বভৌম শক্তি দেশের সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ সার্বভৌম শক্তি সংবিধান-বিরোধী কোন আইনকানুন পাস করিতে পারে না। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ সংবিধান রচনা বা সংশোধন করিবার অধিকার সার্বভৌম শক্তির রহিয়াছে। সংবিধান সার্বভৌম শক্তির উর্ধ্বে নয়। সার্বভৌম শক্তি যদি সাংবিধানিক ব্যবস্থা মানিয়া চলে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সার্বভৌম শক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে উহা করিতেছে।

(৪) বহুত্ববাদী লেখকগণও সার্বভৌম শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা বলিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, সার্বভৌমিকতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য নয় এবং সার্বভৌম শক্তি অপ্রতিহত ক্ষমতারও অধিকারী নয়। রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য সংঘ আছে যাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। ইহাদের সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সকল সংঘ যদি সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার হয় তাহা হইলে সমাজে অরাজকতা দেখা দিবে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন সংঘগুলির মধ্যে বিবাদ বা সংঘর্ষ বাধিলে উহার মীমাংসা কে করিবে? স্বভাবতই রাষ্ট্রের অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

(৫) অনেক লেখকের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আন্তর্জাতিক আইন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারলাভ করিয়াছে, যেভাবে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা সম্ভব নয়—বিপজ্জনকও বটে। এ-অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অপ্রতিহত সার্বভৌমিকতা দাবি করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি আবার সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে উহা কাম্যও নয়। আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations), আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রভৃতি রহিয়াছে যাহারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং বলা হয়, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব বাস্তবের সহিত সংগতিবিহীন আইনগত অলীক কল্পনা (a legal fiction) মাত্র।

যুক্তিটির ত্রুটি: রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা যে আন্তর্জাতিকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ—এই যুক্তি বিশেষ দুর্বল।

সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা (supreme coercive power)। আন্তর্জাতিক দিক হইতে ইহার অর্থ দাঁড়ায় শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা বা যুদ্ধের মাধ্যমে বিরোধ-মীমাংসার ব্যবস্থার অধিকার। এইভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য চরিতার্থ করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কিন্তু অন্ত-নিরপেক্ষ (neutral) নয়—ইহা শ্রেণী-সম্পর্কের (class-relations) সহিত সম্পর্কিত। সোজাসুজি বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবশীল বা প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর স্বার্থসাধন করা। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাষ্ট্র তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে—ইহা সুবিধা বুঝিয়া তথাকথিত আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম মানে বা মানে না।

অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মান্য করা না-করা নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।[১]

এই অবস্থায় কি করিয়া বলা যায় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ?

সার্বভৌমিকতা ও মার্ক্সবাদ (Sovereignty and Marxism) : মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকৃতিগত কারণে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা আন্তর্জাতিক আইন বা অন্য কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেই পারে না।

প্রতিপাদ্য বিষয় : মার্ক্সবাদীদের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হইল এক বিশেষ ধরনের সরকারী কর্তৃত্ব (special kind of public authority)। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইহা সমাজের জনগণের হস্তাধীন নয়, ইহা মালিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন।[২]

রাষ্ট্র শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ মাত্র। সমাজে যে শ্রেণীর হস্তে উৎপাদনের উপাদানগুলি থাকে রাষ্ট্র তাহাদের ইচ্ছায়ই পরিচালিত হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ধনিকশ্রেণীরই ইচ্ছা চরিতার্থ ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণীর সার্বভৌম ইচ্ছাই আইন। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ইচ্ছায় প্রতিফলন ঘটে—অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হয়। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি অনুসারে, রাষ্ট্র যে শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ বহুত্ববাদীরা ইহা বিশেষ উপলব্ধি করেন না বা করিতে চাহেন না।

মার্ক্সবাদীরা অবশ্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ ও আর্থিক সংঘের প্রয়োজনীয়তার কথাও অস্বীকার করেন না। তবে বলেন যে, রাষ্ট্র ধারণাটির মধ্যেই স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা ও প্রকাশ লক্ষণীয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইহা শ্রেণীস্বার্থ ও শোষণের

১. "The validity of international law depends upon their (states') consent to its operation." Laski

২. See Marx and Engels : *Selected Works, Vol. 3* (Moscow, 1970)

হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়। মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রের এইরূপ ধারণার বিরুদ্ধে এক সার্থক প্রতিবাদ। মার্ক্সবাদের বক্তব্য হইল যে, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার গতানুগতিক ধারণার অবসান ঘটিবে।

বিশ্লেষণ : মার্ক্সীয় বিশ্লেষণে সার্বভৌমিকতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় : (ক) মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ বলিয়া মনে করে এবং উহা কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণীই সার্বভৌম শক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। (খ) রাষ্ট্রে বিশেষ শ্রেণী সার্বভৌম বলিয়া আইন এই শ্রেণীর ইচ্ছা ও আদেশ বলিয়াই গণ্য হয়। (গ) মার্ক্সবাদ সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এবং তাহাদের স্বার্থ ও শক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সার্বভৌমিকতা যে অপ্রতিহত তাহা অস্বীকার করে না। তবে বলে যে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গোষ্ঠী ও তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকিবে এবং ইহারা রাষ্ট্রকার্যে ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে অংশগ্রহণ করিবে।[১] ইহা মার্ক্সবাদের একটি বড় শিক্ষা। (ঘ) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী সহ সামগ্রিকভাবে জনগণই সার্বভৌম শক্তি—ইহা মার্ক্সবাদের অন্যতম মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়। (ঙ) শাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় (Democratic Centralism) নীতিতে বিশ্বাসী। ক্ষমতা গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে জনগণের দ্বারা পরিচালিত হইবে। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে সর্বহারার দল (কমিউনিস্ট দল) সার্বভৌম রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিবে। নিয়ন্ত্রণকার্যে ঐ দল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিকতার (internationalism) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে।[২]

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় আইনকানুন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা বা চরম কর্তৃত্বকে।

২. সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হইল (১) পূর্ণতা বা চরমতা, (২) সর্বজনীনতা, (৩) স্থায়িত্ব, (৪) অবিভাজ্যতা ও (৫) হস্তান্তরযোগ্যতাহীনতা।

৩. অস্টিনের তত্ত্বের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সার্বভৌমিকতা চরম ও শাশ্বত ক্ষমতা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। এই ক্ষমতাবলেই আইন প্রণীত হয়।

৪. বহুত্ববাদের বক্তব্য হইল যে সমাজ সংঘমূলক বলিয়া সার্বভৌমিকতা সকল সংঘের মধ্যেই বণ্টিত—রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নহে।

১. "... it is the most characteristic feature of socialist state power ... that millions of working people participate in exercising it."
Grigoryan and Dolgopolov

২. এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কমিউনিসম জাতীয়তাবাদী (nationalist) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমিউনিষ্ট—যেমন সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশের মতবৈষম্য ও সংঘর্ষ একথাই প্রমাণ করে। ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে অনেক দেশেরই (যেমন ইতালী, স্পেন ইত্যাদি) কমিউনিষ্ট দল জাতীয়তাবাদী কমিউনিসমে বিশ্বাসী।

বহুত্ববাদের উদ্ভবের কারণ হইল, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংঘের মধ্যে ব্যক্তির আনুগত্য লইয়া সংঘর্ষ।

৫. সার্বভৌমিকতার ধারণা আক্রান্ত হইয়াছে (ক) বহুত্ববাদিগণ দ্বারা, (খ) আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ দ্বারা।

৬. বর্তমানে জনগণের বা জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতা বলিতে জনগণের নিয়ন্ত্রণক্ষমতাই বুঝায়।

৭. সার্বভৌমিকতার ক্ষমতাতত্ত্বের তাৎপর্য হইল যে, বলপ্রয়োগের অপ্রতিহত কর্তৃত্বই সার্বভৌমিকতার আসল রূপ।

৮. মার্ক্সবাদ অনুসারে সার্বভৌমিকতা বিশেষ ধরনের সরকারী কর্তৃত্ব মাত্র, যে-কর্তৃত্ব শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মালিকশ্রেণীর করায়ত্ত থাকে।

অনুশীলনী

1. Define Sovereignty. What are the attributes of Sovereignty ?

[সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহার বৈশিষ্ট্য কি কি ?] (৯৫, ১৫০-৫১ ১৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

2. What is meant by Sovereignty of the State ? Is Sovereign power unlimited ? Discuss.

[রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বুঝায় ? সার্বভৌম ক্ষমতা কি সীমাহীন ? আলোচনা কর।]
(৯৫, ১৫৩-৫৪, ১৭৯-৮১ পৃষ্ঠা)

3. Write a critical note on the Austinian Theory of Sovereignty.

[সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অস্টিনের মতবাদের উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা রচনা কর]
(১৬৭-৭০ পৃষ্ঠা)

4. Give a critical estimate of Pluralistic attacks on the traditional theory of Sovereignty.

[সার্বভৌমিকতার পরম্পরাগত মতবাদের বিপক্ষে বহুত্ববাদী আক্রমণধারার সমালোচনা কর।]
(১৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা)

5. "The State is limited within, it is also limited without." Elucidate the statement.

["রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং বহির্ব্যাপারেও সীমাবদ্ধ।" উক্তিটি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

[ইংগিত: বোদাঁ, হবস্‌, বেন্থাম ও অস্টিনের দ্বারা পরিস্ফুটিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সাম্প্রতিক যুগে দুই দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়াছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক দিয়া। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার সমালোচনা করিয়াছেন বহুত্ববাদিগণ এবং বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার সমালোচনা করিয়াছেন আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ ... এবং ১৭৪-৭৭, ১৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

6. Write an analytical note on the attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty.

[সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদের যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার উপর একটি বিশ্লেষণমূলক টীকা রচনা কর।]

[ইংগিত: এই প্রশ্নের উত্তরে একত্ববাদের যে দুই প্রকার সমালোচনা তাহাদেরই বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই সমালোচনা কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহার পর্যালোচনা করিতে হইবে না। ... এবং ১৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা]

7. "The internationalist would shackle the Leviathan with chains while the Pluralists would perform the necessary operations of his interior." Elucidate.

[আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ সার্বভৌম রাষ্ট্রকে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন বহুত্ববাদিগণ তখন অস্ত্রোপচার দ্বারা উহার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা হ্রাসে অগ্রসর হন।" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।] (১৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা)

8. "The concept of sovereignty is opposed to individual liberty and international peace." Discuss critically.

["সার্বভৌমিকতার ধারণা ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তির বিরোধী।" সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যালোচনা কর।] (১৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা)

9. Write a short explanatory note on the Marxian view of State sovereignty.

[রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণমূলক টীকা রচনা কর।] (১৮১-৮২ পৃষ্ঠা)

৯ | জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা (NATIONALISM AND INTERNATIONALISM)

"*Born in iniquity, and conceived in sin, the spirit of nationalism has never ceased to bend human institutions to the service of dissension and distress.*" Thorstein Veblen

"*My nationalism is intense internationalism. I am sick of the strife between nations or religions.*" Mahatma Gandhi

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা :

১ জাতীয় জনসমাজ ও জাতি বলিতে কি বুঝায় ?

২ জাতীয়তাবাদের অর্থ কি ? উহা কি সভ্যতার সংকটের অন্যতম কারণ ?

৩. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য কি ? এই অধিকারকে কতদূর স্বীকার করিয়া লওয়া যায় ?

৪ আন্তর্জাতিকতাকে জাতীয়তাবাদের স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ?

৫. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগির মূলকথা কি ?

জাতীয়তাবাদ ও উহার গুরুত্ব (Nationalism and its Importance) : দীর্ঘ দিন ধরিয়া ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে আমরা সম্প্রদায়গত যে জীবনে (community life) আসিয়া পৌছিয়াছি তাহাকে বলা হয় জাতীয় সম্প্রদায় (National Community)। এই জাতীয় সম্প্রদায়ের দুইটি দিক আছে : সামাজিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক দিক হইতে জাতীয় সম্প্রদায়কে বলা হয় জাতীয় সমাজ (National Society) এবং রাজনৈতিক দিক হইতে উহা জাতীয় রাষ্ট্র (National State) বলিয়া অভিহিত হয়। আজিকার দিনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই জাতীয় রাষ্ট্রের সমবায়েই গঠিত। জাতীয় রাষ্ট্রের ভাব বা 'আদর্শ'কে বলা হয় জাতীয় ভাব বা জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। অপরদিকে আবার কোন 'পরাধীন' জনসমাজ যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করে তবে উহাকেও জাতীয়তাবাদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

জাতীয়তাবাদের উৎস হইল মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি। এই কারণে জাতীয়তাবাদকে অন্যতম ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়।[১]

১. "Nationalism may be called a religion because it is rooted in the deepest instincts of man". Lloyd : *Democracy and Its Rivals*

ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, নিজ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব ও সংহতির যে আকাংক্ষা ও চেতনা প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে, তাহা হইতেই মূলত জাতীয় ভাব উৎসারিত হয়। অতীতে আদিম জনগোষ্ঠী (clan or tribe) এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও সংহতির আকাংক্ষা করিত ; বর্তমানে জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উহাই করে।

সভ্যতার সংকট : তাহারা চায় তাহাদের জাতির সংহতি, প্রমাণ করিতে চায় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। ইহার ফলে বাধে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত এবং দেখা দেয় সংকট—'সভ্যতার সংকট'।

আদর্শ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ : জাতীয়তাবাদকে 'আদর্শ' (ideal) বলিয়া অভিহিত করা কিন্তু ভুল নহে। বিকৃত বা উগ্র রূপ ধারণ না করিলে উহা মূল্যবান রাজনৈতিক আদর্শ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু বিকৃত বা উগ্র জাতীয়তাবাদ আর আদর্শ থাকে না, অন্যতম ভাবাদর্শ (ideology) হিসাবে উহা হইয়া দাঁড়ায় স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাত্রের হন্তারক এবং ফলে ব্যক্তিস্বস্ফুরণের প্রতিবন্ধক।

অতএব, জাতীয়তাবাদ কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়েরই দ্যোতক। একদিকে ইহার যেরূপ সুমহান সম্ভাবনা রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে অকল্যাণের আশংকা।

এই আশংকাই আজ কল্যাণের সম্ভাবনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ফলে বিশ্ব-দার্শনিকের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ দেখা গিয়াছে সভ্যতা ও সম্প্রসারণের (growth) শত্রুরূপে।[১] জাতীয়তাবাদের এই ভূমিকার বিশদ পর্যালোচনার পূর্বে জাতীয়তাবাদ ও সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি (People, Nationality and Nation) : জাতীয়তাবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের মধ্যে জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ (Nationality) এবং জাতি (Nation)—এই তিনটিই প্রধান।

ক। জনসমাজ (People) : বার্জেসের (Burgess) মতে, যদি একই ভূখণ্ডে এমন কিছুসংখ্যক লোক বাস করে যাহাদের ভাষায় সাহিত্যে ইতিহাসে আচার-ব্যবহারে অধিকারবোধে এবং অভিযোগে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাহাই হইল জনসমাজ। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে জনসমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায় : একই ভূখণ্ডে বসবাস বা ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস আচারব্যবহার ও অধিকারবোধে ঐক্য এবং অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সমাজবন্ধনের সূত্র—ইহারাই বিশৃংখল জনসমষ্টিকে জনসমাজে পরিণত করে। এই সূত্রগুলির সহিত অনেকে আবার উদ্ভবগত ঐক্যও যোগ করেন।

---

১. "Nationalism is a great menace" Tagore

ম্যাটসিনির মতে, উদ্ভবগত ঐক্য সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন না থাকিলে জাতির উদ্ভব ঘটে না।[১] রবীন্দ্রনাথও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।[২]

খ। জাতীয় জনসমাজ (Nationality): জনসমাজের মধ্যে যদি রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় তবে তাহাকে জাতীয় জনসমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং জনসমাজ ও জাতীয় জনসমাজের পার্থক্য হইল যে, জাতীয় জনসমাজ বিশেষ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, জনসমাজ হয় না।

এই কারণে জাতীয় জনসমাজকে 'রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ' (a politically conscious people) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। মিলের (J. S. Mill) মতে, "এই রাজনৈতিক চেতনার ফলে তাহারা একই সরকারের অধীনে বাস করিতে চায় এবং ইচ্ছা করে যে সরকার হইবে তাহাদের নিজস্ব সরকার বা তাহাদের এক অংশের নিজস্ব সরকার।"

গ। জাতি (Nation): এইভাবে মিল যাহাকে জাতীয় জনসমাজ (Nationality) আখ্যা দিয়াছেন সময় সময় তাহাকেই জাতি (Nation) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[৩] অনেকের মতে আবার রাজনৈতিক চেতনা গভীরতাপ্রাপ্ত হইলে তবেই জাতীয় জনসমাজ জাতিতে উন্নীত হয় এবং জাতি পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্র গঠিত না হইলে জাতির ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ হয় না।

সুতরাং পূর্ণ অর্থে জাতি বলিতে বুঝায় 'রাষ্ট্র-সহ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ'।

এই দ্বিতীয় অর্থে লর্ড ব্রাইস জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, জাতীয় জনসমাজ হইল ভাষা সাহিত্য ধ্যানধারণা রীতিনীতি ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এমন এক জনসমষ্টি যাহা অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিসমূহ হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে।

জাতি হইল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন এক জনসমাজ যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত অথবা মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।[৪]

---

১. "A nation is ... a race, descended from common ancestors and sharing some kind of blood consciousness." Mazzini

২. In Switzerland "in spite of race differences, the peoples have solidified into a nation ... because they are of the same blood." Tagore : *Nationalism*

৩. "A Nation is a group ... that ... resents being governed by foreigners and demands a sovereign state of its own." Watkins : *The Age of Ideology*

৪. "A nation is a nationality which has organised itself into a political body either independent or desiring to be independent." Bryce

ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, ব্রাইসের মতে জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং পৃথক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষাই থাকে, কিন্তু যখন তাহারা ঐ আকাংক্ষাকে কার্যে পরিণত করে বা করিবার প্রচেষ্টা করে মাত্র তখনই তাহারা জাতি বলিয়া গণ্য হয়। র‍্যামজে ম্যুর-ও (Ramsay Muir) জাতি গঠনের উপাদান হিসাবে রাজনৈতিক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজনৈতিক সংগঠন বা সংগঠনের ইচ্ছাই জাতিকে জাতীয় জনসমাজ হইতে পৃথক করে।[১]

দৃষ্টান্ত—(ক) পাকিস্তান : কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য বুঝান যাইতে পারে। প্রথমে ভারতীয় মুসলমানদের কথা ধরা যাউক। ইংরাজ শাসনের যুগে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে দুঃখদুর্দশার সমতা অনুভূত হওয়ায় এবং একই শাসনাধীন থাকার ফলে ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি হওয়ায় ভারতবাসীরা এক জনসমাজে পরিণত হইল। পরে মুসলমানরা যখন তাহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজেদের অবশিষ্ট ভারতবাসী হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিতে এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করিতে লাগিল তখন তাহারা এক পৃথক জাতীয় জনসমাজে পরিণত হইল। ইহার পর মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালো হইয়া উঠিলে মুসলমানরা জাতিতে পরিণত হইল। এই জাতি আরও দানা বাঁধিল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে।

(খ) বাংলাদেশ : পাকিস্তান রাষ্ট্রে ক্রমশ বাঙালীরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইতে লাগিল এবং ফলে গড়িয়া উঠিল বাঙালী জাতীয় জনসমাজ। এই জাতীয় জনসমাজ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রথমে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবিই করিয়াছিল। এই দাবি উপেক্ষিত হইলে এবং পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ দমননীতির পথে চলিলে পাকিস্তানে বাঙালী জাতীয় জনসমাজ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিল। এবং পাকিস্তান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হইলে পর ঐ বাঙালীরা সম্পূর্ণ জাতিতে পরিণত হইল।

এইভাবে জাতির ক্রমবিকাশ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করিলেও ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিলেই জাতি সৃষ্ট হইবে বা রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিলেই জাতির বিলুপ্তি ঘটিবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়া-হাংগেরী এক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু ইহার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র রাজনৈতিক বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন না থাকায় ইহা জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই। অন্যদিকে ১৯৪৫ সালে জার্মেনী ও জাপানের সার্বভৌমিকতা লুপ্ত হওয়ায় ইহাদের রাষ্ট্রত্ব লোপ পায়, কিন্তু জার্মান ও জাপানী জাতি বিলুপ্ত হয় নাই।

জাতি ও রাষ্ট্র : জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে উপরি-বর্ণিত সূক্ষ্ম পার্থক্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্তমানে 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র' শব্দ দুইটি সমার্থক-

১. M. H. Boehm : '*Nationalism*' in '*Encyclopaedia of the Social Sciences*'

ভাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সংঘের নাম দেওয়া হয় জাতিসংঘ (League of Nations) এবং বর্তমানের রাষ্ট্রগুলির সংঘের নাম হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)।[১]

জাতীয় জনসমাজ ও জাতীয়তাবাদ (Nationality and Nationalism): আমরা দেখিলাম যে, জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি গঠনের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। যে উপাদানে জনসমাজ গঠিত হয় তাহার উপর মাত্র রাজনৈতিক চেতনা থাকিলেই তাহা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। এই রাজনৈতিক চেতনা গভীর হইলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। এখন জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলি সম্বন্ধে সামান্য বিশদ আলোচনা করা হইবে, কারণ ইহা ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান: জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা ধর্ম সাহিত্য-ইতিহাস, ঐতিহ্যগত সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমচেতনা এবং অভিন্ন রাজনৈতিক আকাংক্ষাই প্রধান।

বাহ্যিক ও ভাবগত উপাদান: এই উপাদানগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: বাহ্যিক ও ভাবগত। অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা ও অভিন্ন রাজনৈতিক আকাংক্ষা হইল 'ভাবগত উপাদান'; বাকিগুলিকে 'বাহ্যিক উপাদান' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই বাহ্যিক উপাদানগুলির কোনটিই জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়।

(১) ভৌগোলিক সান্নিধ্য (Geography): ভৌগোলিক সান্নিধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকেরই সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা রহিয়াছে এবং উহাদের জাতীয় ভাবপ্রসারে এই ভৌগোলিক ঐক্য বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে।[২] নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসের দরুন লোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সহজে সম্ভব হয়। ফলে উহাদের মধ্যে ঐক্যভাব গড়িয়া উঠে। লোকে তাহাদের দেশকে পিতৃভূমি (fatherland) বলিয়া মনে করে এবং এই পিতৃভূমিকে ঘিরিয়া তাহাদের স্বাদেশিকতা জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, ভৌগোলিক সান্নিধ্য ব্যতিরেকেও জাতীয় জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদীরা পৃথিবীর নানা দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হইয়াছিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করা সত্ত্বেও পোলরা একই জাতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(২) বংশ (Race): উদ্ভবগত ঐক্যকে পূর্বে একরূপ অপরিহার্য উপাদান

---

১. সংবাদপত্র ইত্যাদিতে অবশ্য অনেক সময় 'রাষ্ট্রসংঘ' বলা হয়।

২. "Undoubtedly the most clearly marked nations have enjoyed a geographical unity, and have owed their nationhood in part to this fact." Ramsay Muir

হিসাবে গণ্য করা হইত, কিন্তু আজকাল ইহার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। কারণ, প্রমাণিত হইয়াছে যে কোন দেশের লোকের রক্তই অমিশ্রিত নয়। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতি—ইংরাজ ও ফরাসী—বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত।[১] মার্কিনদের 'জাতি' বলিয়া অভিহিত করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না, কিন্তু তাহাদের উদ্ভবগত ঐক্য নাই। তবে ভ্রান্তিমূলক হইলেও প্রচারের মাধ্যমে উদ্ভবগত ঐক্যের মোহ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং জাতীয় ঐক্য ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা যায়। হিটলারের জার্মেনীতে নাৎসীবাদ এইভাবে 'আর্য জাতি'র শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিয়া পৃথিবীতে জার্মেনীর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে।

(৩) ভাষা (Language): জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির ব্যাপারে ভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ভাষার সমতা সকলের মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনা করে। ভাষাগত ঐক্যকে অবশ্য অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুইসরা বিভিন্ন ভাষাভাষী হইয়াও এক জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীও এক জাতি।

(৪) ধর্ম (Religion): ধর্মগত ঐক্য অনেক সময় অবশ্য জনসমাজ সৃষ্টির পথে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভারতবর্ষেই মুসলমানরা ধর্মকে ভিত্তি করিয়া প্রথমে জাতীয় জনসমাজ এবং পরে জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায় না। বলা যায়, বর্তমানে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও ধর্ম-নিপেক্ষতার ভাব বিশেষ সম্প্রসারিত হওয়ায় জাতীয় জনসমাজ গঠনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের ভূমিকার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

(৫) রাষ্ট্রীয় সংগঠন (Political Organisation): জাতীয় জনসমাজ একদিকে যেমন রাষ্ট্রগঠনে প্রেরণা যোগায়, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় সংগঠনও তেমনি জাতিগঠনে সহায়তা করে। ইংরাজ, স্কট ও ওয়েলস্‌বাসীদের সমবায়ে যে এক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা একই রাষ্ট্রাধীন বাস করার জন্য।

(৬) ইতিহাস ও ঐতিহ্য (History and Tradition): এইরূপ জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে কোন অপরিহার্য বাহ্যিক উপাদানের সন্ধান না পাইয়া অধ্যাপক রেনাঁ (Renan) বলিয়াছেন, "জাতীয় জনসমাজ সম্বন্ধে ধারণা মূলগত ভাবগত" (The idea of nationality is essentially spiritually in character)।

প্রাণ বা ভাবগত নীতি: জাতীয় জনসমাজকে তিনি 'প্রাণ' বা 'ভাবগত নীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ভাবগত নীতি দুইটি বিষয়ের দ্বারা গঠিত হয়: (ক) অতীতের স্মৃতি এবং (খ) একই সংগে বসবাস ও ঐতিহ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার আকাংক্ষা।

ঐ একই কারণে অধ্যাপক গেটেল জাতীয় জনসমাজকে 'বিভিন্ন উপাদানের

১. "All the modern races have sprung up from an admixture of ... races." Vivekananda

সংমিশ্রণে গঠিত ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক অভিন্নতার ভাবগত উপলব্ধি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল: প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও (Bertrand Russell) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে জাতিকে শুশুকের দল, বা কাকের ঝাঁক, বা গরুর পালের সংগ তুলনা করা যায়। অভিন্ন ভাষা, একই বংশোদ্ভব সম্প্রদায় বলিয়া বিশ্বাস, অভিন্ন কৃষ্টি অথবা স্বার্থের সমত্ব—যে কোনটির দরুন ঐক্যবোধ জাগ্রত হইতে পারে। তবে যেভাবেই জাগ্রত হউক না কেন, এই ঐক্যবোধই জাতীয় অস্তিত্বের একমাত্র অপরিহার্য সম্বল।[১]

জাতীয় ভাব: যাহা হউক, জনসমাজ নানা কারণে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া পরবর্তী স্তরে উপনীত বা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। এই ঐক্যবোধের ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব (Nationalism) বা স্বাদেশিকতার (Pattiotism) সৃষ্টি হয়।

জাতীয় ভাব বা স্বাদেশিকতা বলিতে বুঝায় যে, ঐ জাতীয় জনসমাজে সভ্যরা নিজেদের পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া দেখে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবন্ধ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মনুষ্য সম্প্রদায় হইতে পার্থক্যবোধ হইল জাতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য।

আলোচনার সুরুতেই বলা হইয়াছে যে, ইহার উৎস হইল মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি। যে প্রবৃত্তিবশে আদিম জনগোষ্ঠী (clan or tribe) ধর্ম, দেবদেবী, আচারব্যবহারের অভিন্নতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সংহতি ও নিজ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করিত, সেই প্রবৃত্তিবশেই আজ জাতীয় জনসমাজ (বা জাতি) নিজেদের সংগতি কামনা করে—রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের দাবি করে। জাতীয় ভাবের উন্মেষের ফলে ইহুদীরা বিশ্বাস করিল যে, পৃথিবীর সকল ইহুদীই এক জনসমাজের অন্তর্গত এবং ইহুদী জনসমাজ অন্য সকল জনসমাজ হইতে পৃথক।

জাতিপূজা: জাতীয় জনসমাজের মধ্যে জাতীয় ভাব মূর্ত হইয়া উঠে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে এবং পরিণতি লাভ করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও—অর্থাৎ জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলেও জাতীয় ভাব কিন্তু লোপ পায় না। তখন ইহা জাতি-পূজায় (Nation-worship) বা জাতির রাজনৈতিক আকাংক্ষায় (political aspirations of a Nation) রূপান্তরিত হয়। এই জাতি-পূজা স্বজাতীয় সকলকে একই শাসনাধীন আনয়ন করা হইতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। এখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই হইয়া দাঁড়ায় জাতীয়তাবাদ বা

---

১. "... there is something in their (members of nationality or nation) past or present experience that makes them feel as one, all others being lumped together as foreigners." Watkins: *The Age of Ideology*

জাতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য।[1] যখন জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে ও আগ্রাসী (aggressive) হইয়া দাঁড়ায় তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ।

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Nationalism and the Right of Self-determination): জাতীয়তাবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবোধ মূর্ত হইয়া উঠে রাজনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক আকাংক্ষা ও জাতির রাজনৈতিক আকাংক্ষা এক নাও হইতে পারে। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক আকাংক্ষা হইল নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার বা স্বাধীন হইবার আকাংক্ষা। ইহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (right of self-determination) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, জাতির রাজনৈতিক আকাংক্ষা প্রথমে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির বেশে প্রকাশিত হইতে পারে এবং পরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়া স্বজাতীয় সকলকে এক শাসনাধীন আনয়ন করিবার আকাংক্ষা হইতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আকাংক্ষা পর্যন্ত যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। প্রথমে জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক রূপ বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার: স্বতন্ত্র জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন ধারণা। তবে ইহা প্রধানত ১৭৭২ সালে যখন পোল্যাণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয় তখন হইতেই কার্য করিতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রচার করিতে থাকেন যে, রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজের স্বাভাবিক অধিকার এবং বিশ্বজনীনভাবে এই অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইলে পৃথিবীতে আর কোন রাজনৈতিক সমস্যা থাকিবে না।[2] ইহার ফলে এইরূপে বিভিন্ন জনসমাজের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Polynational States) অস্বাভাবিক রাজ্যসংঘ (unnatural union) বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলিলেন: "যে রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ বাস করে

---

১. জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণা মার্ক্সের অনুগামীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় নাই। স্তালিনের মতে, জাতি হইল 'ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ইতিহাস-বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ বা সম্প্রদায়' (**A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life, and psychological make-up manifested in a community of culture.**)। এই জনসমাজের আবার ভাষাগত ঐক্য থাকা চাই। আবার ভৌগোলিক সান্নিধ্যও জাতিগঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান। পরিশেষে প্রয়োজন বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বন্ধন। সুতরাং জাতীয় ভাব সম্পূর্ণ ভাবগত ধারণা নহে, ইহা কয়েকটি অপরিহার্য উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত মূর্ত রূপ।

২. **Mazzini:** ***The Duties of Man***

সেখানে স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না" এবং ইহার জন্য "জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া উচিত।"[১]

একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ: প্রত্যেক রাষ্ট্র একটিমাত্র জাতীয় জনসমাজ বা জাতি লইয়া গঠিত হওয়ার এই যে আদর্শ ইহাকে একজাতীয় রাষ্ট্রের (Mononational States) আদর্শ বলা হয়।

(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর) রাষ্ট্রপতি উইলসন এই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার চিরন্তন সমাধানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজ বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পূর্ণ করিয়া পৃথিবী হইতে যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া চিরতরে দূরীভূত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। এইজন্য তিনি বলিয়াছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্রনেতাগণ অমংগলকেই আহ্বান করিবেন।

ইয়োরোপে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁহার এই ধারণাকে কার্যকর করা হয় ১৯১৯ সালের শান্তিসম্মেলনে (Peace Conferences)। এই সম্মেলনে প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজ বা জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য-নির্ধারণ করিবার দাবিকে সর্বসম্মতিক্রমে মানিয়া লওয়া হয় এবং নীতিকে কার্যকর করিবার জন্য ইয়োরোপের মানচিত্রকে নূতন করিয়া অংকন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে অনেক নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং কয়েকটি পুরাতন রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হয়।

এই পুনর্গঠন ও নবরাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও দেখা গেল যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হইল না ; যুদ্ধের আশংকাও বিলুপ্ত হইল না। কারণ, জাতীয় জনসমাজ বা জাতির সমানুপাতিক করিয়া নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহের সীমা-নির্ধারণ করা সম্ভব হইল না। অধিকাংশ সময় ইহা সম্ভবও নয়। নবগঠিত ও পুরাতন রাষ্ট্রসমূহে অন্যান্য জাতির অংশবিশেষ রহিয়া গেল। পরবর্তীকালে এই অংশবিশেষসমূহকে একই শাসনাধীন আনয়ন করিবার জন্য প্রচারকার্য চালানো হইতে লাগিল এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে লাগিল। ফলে ইয়োরোপে অশান্তি নূতন প্রেরণা লাভ করিয়া নূতন রূপ ধারণ করিল।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সীমা: শান্তি সম্মেলনের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগ লইয়া আলোচনাকালে লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার। একদিকে ইহা যেমন ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রেরণা যোগায়, অন্যদিকে আবার তেমনি বিচ্ছিন্ন হইতেও উন্মাদিত করে। এই বিচ্ছিন্ন হইবার উন্মাদনার পরিসমাপ্তি নাই। কার্জনের যুক্তির সারবত্তা

১. "It is a necessary condition of free institutions that the boundaries of states should coincide in the main with those of nationalities."

শীঘ্রই অধিকাংশ রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে হইল। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সৃষ্টি হইল, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কিন্তু জার্মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়া গেল। তাহারা চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবি করিতে লাগিল। শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার বেলায় নহে, অন্যান্য নবগঠিত এবং কয়েক ক্ষেত্রে পুরাতন রাষ্ট্রগুলিতেও সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের দাবি করিতে লাগিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া কখনই সম্ভব নয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগ দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা মিটানো যায় না।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাতেও আমরা এই মন্তব্যের সমর্থন পাই। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে, কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হয় নাই।

অধিকারের সমর্থন: এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা হইলেও অনেক সময় যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনেই (political expediency) ইহাকে মানিয়া লইতে হয়। যে রাষ্ট্রে বা সাম্রাজ্যে জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ অসন্তুষ্টির সহিত বাস করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়াছে সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লওয়াই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মানিয়া না লইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শক্তি বিপন্ন হইতে পারে। আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধের ন্যায় ইতিহাস ইহার প্রভূত সাক্ষ্য বহন করে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism): পূর্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাজনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে এবং জাতি গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদ স্বজাতীয় সকলকে একই শাসনাধীন আনয়ন করার আকাংক্ষা হইতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আকাংক্ষা পর্যন্ত যে কোন প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ জাতীয়তাবাদকে জাতি-পূজা (Nation-worship) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

জাতীয়তাবাদের বর্তমান রূপ: জাতি-পূজার প্রথম অধ্যায় হইল স্বাদেশিকতা (patriotism)। স্বাদেশিকতা বলিতে বুঝায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং স্বজন বা স্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অনুরাগের ফলে জাতির সভ্যগণ মাত্র নিজেদের সকল কিছুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, ক্রমে তাহারা অন্যান্য জাতির সকল কিছুকে হেয় বলিয়াও জ্ঞান করিতে থাকে। তাহারা বিশ্বাস করিতে থাকে যে তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, ভাষার মত ভাষা নাই, সাহিত্যের মত সাহিত্য নাই, সংস্কৃতির মত সংস্কৃতি নাই। ইহার ফলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভংগি ক্রমশ সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে। এই সংকীর্ণ

দৃষ্টিভংগি তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্র ও আগ্রাসী রূপ ধারণ করে এবং তাহারা প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হয়। এই পথ পৈশাচিক পাপের পথ।[১] আজিকার দিনে এই পথের শেষ কোথায়, এই প্রভুত্বলিপ্সা ও বর্বরতার পরিণতি কি, তাহা কেহই জানে না। তাই সাধারণ লোকে এক অজানা আশংকায় দিন যাপন করে।

আদিতে জাতীয়তাবাদ কিন্তু এই প্রকার রূপ গ্রহণ করে নাই। তখন জাতি-পূজা বা স্বাদেশিকতার অনুসরণ করা হইত অন্যভাবে।

জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনের ইতিহাস : আধুনিক জাতীয়তাবাদকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক যুগের সন্তান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগে মাত্র গ্রীক ও হিব্রুদের মধ্যেই জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ধারণার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমক সাম্রাজ্য ও খ্রীষ্টধর্মের অধীনে এইরূপ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া এক বিশ্বজনীন আদর্শের উদ্ভব ঘটে।[২] এই আদর্শ পরে দূরে সরিয়া গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু দিন পর্যন্ত ইয়োরোপ জনসমাজ বা জাতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিতে শিখে নাই।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে অবশ্য জাতীয় ভাবের বীজ ধীরে ধীরে অংকুরিত হইতেছিল। তবুও কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি উহার বিশ্বজনীনতাই ছিল আদর্শ এবং পরম্পরাগত কর্তৃত্বের (traditional authority) প্রতি শ্রদ্ধাবশত জাতীয় ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। জনসমষ্টির কোনরূপ সম্মতি না লইয়াই তখন ভূখণ্ডের বিনিময় করা হইত।

পোল্যাণ্ডের দ্বিখণ্ডীকরণ : কিন্তু ১৭৭২ সালে পোল্যাণ্ডের দ্বিখণ্ডীকরণের ফলে উক্ত বিশ্বজনীন আদর্শ ও পরম্পরাগত কর্তৃত্বের মূলাভিত্তিক হয় জনসমাজ ও জাতির প্রশ্ন। জনসমাজের যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, তাহারা যে রাজন্যবর্গের খেয়ালখুশিতে বাজারে পণ্যের মত ক্রীতবিক্রীত হইতে পারে না, এই দাবিই তখন হইতে উঠিতে থাকে। তখন হইতে বিভিন্ন দেশ জাতি হিসাবেই পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত হয়, রাজবংশ বা ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে নয়।

ফরাসী বিপ্লব ও আধুনিক জাতীয়তাবাদ : ইহার কিছুদিন পরেই আসে ফরাসী বিপ্লবের প্লাবন। জনগণের সার্বভৌমিকতার নামে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী প্রচারিত হয় এবং সাধারণ লোকে স্বৈরাচার হইতে মুক্তির আশ্বাসে দিন গণিতে থাকে। কিন্তু মুক্তির পরিবর্তে আসে এক নূতন অধীনতা—ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা, বিদেশীর অধীনতা। তখন প্রত্যেক দেশেই জনসমাজ নিজেদের ঐক্যবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে এবং প্রসূত হয় আধুনিক জাতীয়তাবাদ।

ম্যাট্‌সিনির আদর্শ জাতীয়তাবাদ : ইহার পর রোমান্টিক আন্দোলন এবং ম্যাট্‌সিনি (Giuseppe Mazzini) ও ফিক্‌টের (Fichte) রচনা জাতীয় ভাবকে এক নূতন পথে পরিচালিত করে। ম্যাট্‌সিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহার মতে, একই ঐতিহ্য ও বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ইতালীয়রা একটি জাতি। এইরূপে ইংরাজরা, ফরাসীরা, জার্মানরা প্রত্যেকেই একটি জাতি। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক জাতির কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ

---

১. "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইয়োরোপীয় Patriotism-ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে…।" বঙ্কিমচন্দ্র

২. "My city and country, so far as I am Antonius is Rome, but so far as I am a man, is the world." Marcus Aurelius

প্রতিভা আছে।[১] জাতীয়তাবাদের মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন এই প্রতিভার বিকাশের সম্ভাবনা। তাই তিনি মানবসমাজকে 'আত্মাভিমানী বিভিন্ন জাতির সমবায়' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সংঘাত বা বিরোধের সহিত এই সমবায়ের পথে আপনাপন পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। ফলে বিশ্ব হইয়া ওঠে সমৃদ্ধ।

ফিক্‌টের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ : ম্যাট্‌সিনির পূর্বেই কিন্তু ফিক্‌টে প্রচার করিয়াছিলেন জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বলিয়াছিলেন যে জার্মান জাতিই হইল মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। অতএব, জার্মান হইয়া জন্মগ্রহণ করার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করা।

পরবর্তী যুগে জাতীয়তাবাদ এই ফিক্‌টে-প্রদর্শিত পথেই পরিচালিত হয়। জাতি 'আত্মাভিমানী' না হইয়া, হইয়া দাঁড়ায় নিজ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। ফলে তাহারা মানবতার কথা ভুলিয়া গিয়া রাষ্ট্রীয় স্বার্থকেই ধ্রুবতারকা গণ্য করিয়া পথ চলিতে থাকে। ফলে জাতিকে করা হয় সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত এবং উহাকে পরিণত করা হয় স্বার্থসাধনের যন্ত্রে।[২]

মানবজাতির সংকট : 'স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ' বলিয়া জাতিতে জাতিতে বাধে সংঘর্ষ এবং দেখা দেয় সভ্যতার, মানবজাতির সংকট। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সংকট দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন হইল জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত সমস্ত ধারণাকেই পরিহার করা।[৩]

আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ : জাতি, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি ধারণাকে বর্জন করিয়া যে আদর্শকে উহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে হয় তাহাকে আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) আখ্যা দেওয়া যায়। যুগে যুগে বিশ্বকল্যাণকামী দার্শনিকগণ এই আন্তর্জাতিকতারই পূজা করিয়া আসিতেছেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ : বর্তমান রূপে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ হইল জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের (National States) সার্বভৌমিকতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও আশংকার স্থলে শৃংখলা ও আশা-আকাংক্ষার প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজে বাস করিবার জন্য ব্যক্তি যদি তাহার স্বাধীনতার একাংশ সমর্পণ করিয়া থাকে, বিশ্ব-সমাজের জন্য রাষ্ট্র কি তাহার সার্বভৌমিকতার একাংশ সমর্পণ করিতে পারিবে না?

আদর্শবাদী দার্শনিক বলেন, নিশ্চয়ই পারিবে, না-পারিলে বিশ্ব-সমাজ কখনই গড়িয়া উঠিবে না।[৪] ফলে মানবজাতির রাজনৈতিক সম্প্রসারণ (political

---

১. Mazzini thought "each nation possessed certain talents which, taken together, formed the wealth of the human race." Lloyd : *Democracy and Its Rivals* ; and Mazzini : *The Duties of Man*

২. "What is the Nation ? It is the aspect of a whole people as an organised power. This organisation incessantly keeps up the insistence of the population on becoming strong and efficient." Tagore : *Nationalism*

৩. "I am not against one nation in particular, but against general idea of all nations." Tagore : *Nationalism*

৪. "The individual, being pure, sacrifices for the family, the latter for the village, the village for the district the district for the province the province for the nation, the nation for all." Gandhi : *Young India*

growth) মধ্য পথেই থামিয়া যাইবে। অতএব, প্রথম প্রয়োজন হইল সার্বভৌমিকতাকে কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা, উহার একাংশকে পরিত্যাগ করা।

সার্বভৌমকতা সম্বন্ধে মতবাদের পরিস্ফুটনে বোদাঁ (Bodin) এই কথাই বলিয়াছিলেন। সার্বভৌম নৃপতিকে যে স্বাভাবিক আইন ও ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়।[১] অপরদিকে গ্রোটিয়াস্ (Grotius) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণার অবাধ অধিকার (licence) বন্ধ করিতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন সকল রাষ্ট্রকে এক সাধারণ আইনের অধীন করা।

সকল রাষ্ট্রকে এক সাধারণ আইনের অনুবর্তী করাই আন্তর্জাতিকতার শেষ কথা নয়। এই উদ্দেশ্যে আরও প্রয়োজন হইল ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রকে সমান বলিয়া গণ্য করা এবং সৌভ্রাত্রকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা। যদিও তত্ত্বগতভাবে এই সকল প্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবুও দেখা যায় উহাদের উপলব্ধিতে বাধা প্রদান করে জাতীয়তাবাদ। অতএব, জাতীয়তাবাদের সহিত সংঘর্ষে আন্তর্জাতিকতা আজও জয়ী হইতে পারে নাই। ফলে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সাম্য ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র—কোন কিছুই সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই।

আদর্শ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার পরিপূরকতা : অথচ আদর্শ জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধই নাই। ম্যাট্‌সিনি-কল্পিত জাতীয়তাবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জাতির (ইতালীর) শ্রেষ্ঠত্ব হইলেও উহা আন্তর্জাতিকতার অভিমুখেই প্রসারিত। প্রত্যেক জাতির যদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রতিভা থাকে তবে নিজস্ব সম্প্রসারণ পদ্ধতিতেই উহার বিকাশ ঘটিতে পারে। এই নিজস্ব সম্প্রসারণ পদ্ধতিকেই জাতীয়তাবাদ বলা যাইতে পারে। জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে সকলে বিকশিত হইয়া যদি সমবায়ের পথে, সৌভ্রাত্রের পথে অগ্রসর হয় তবেই সম্ভব হয় মানবজীবনের সমৃদ্ধি। আন্তর্জাতিকতার পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাট্‌সিনির ন্যায় জাতীয়তাবাদকে এইভাবেই দেখিয়াছিলেন।[২]

বিকৃত জাতীয়তাবাদ . কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ আজ ধারণ করিয়াছে সংকীর্ণ, বিকৃত ও হিংস্র রূপ। অতীতে সামন্ততন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা ও অরাজকতার যুগে জাতীয়তাবাদ ঐক্য আনয়ন করিয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রসারের সংগে ঐ জাতীয়তাবাদই পরিণত হয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদে—জাতীয়তাবাদ হইয়া দাঁড়ায় দুর্বল 'জাতি'দের শোষণের যন্ত্র।

রাষ্ট্রস্বার্থের প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রেই অনুরূপ এবং লোভের কোন পরিসমাপ্তি নাই। সুতরাং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘাত, সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের পরিণতি আজিকার এই পারমাণবিক যুগে অকল্পনীয়।

১. Article on *Sovereignty* by Coker in *Encyclopaedia of the Social Sciences*

২. ' Each nation ... has one theme in his life and " ... each must assimilate the spirit of the others and yet ... preserve his individuality and *grow according to his own law of growth.*" Vivekananda (*italics ours*)

আন্তর্জাতিকতার প্রসারে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব: তাই বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। সাধারণ মানুষকেই আজ জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকতার সহিত বিশ্বের নাগরিকতাও স্বীকার করিতে হইবে। নাগরিক হিসাবে তাহার কর্তব্য শুধু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নয়—বিশ্বের প্রতিও তাহার কর্তব্য স্বীকার করিলে জাতীতাবাদকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, লোভ ও শোষণের প্রতিমূর্তি 'পালিশ-করা সভ্যতার' বিরুদ্ধে অসহযোগ ঘোষণা করিতে হইবে।[১] নিয়ন্ত্রিত হইলেই জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে। তখনই সম্ভব হইবে অতিজাতীয় আন্দোলন (supernational movements) এবং সার্থক হইয়া উঠিবে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র বা সমবায়ের নীতি। তখনই দেখা দিবে নূতন প্রভাত।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা: মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি (Nationalism and Internationalism: The Marxist Approach): সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদকে একটি আদর্শ বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটে জাতীয়তাবাদের মধ্যে। অনেকে ইহা স্বাভাবিক এবং অনেকে ইহাকে আদর্শ বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন।

মার্ক্সবাদী-দৃষ্টিভংগি: মার্ক্সবাদিগণের মতে কিন্তু জাতীয়তাবাদের যে-ধারণা সাধারণত প্রচার করা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসূত।[২] এই চিন্তাধারা বিভ্রান্তিমূলক। মার্ক্সবাদ অনুসারে জাতীয় সমস্যার প্রশ্নটিকে শ্রেণী-সমস্যা ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

চিরাচরিত জাতীয়তাবাদের সমালোচনা: (ক) জাতীয়তাবাদের চিরাচরিত বা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগির সমালোচনা করিয়া মার্ক্সবাদীরা বলেন, এই দৃষ্টিভংগি এক বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের দৃষ্টিভংগিকেই প্রকাশ করে। সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতা এবং বাস্তব জ্ঞানের অভাব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইহাদের ধারণা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। কল্পনা ও আদর্শের স্থান ইহাদের ব্যাখ্যায় যতটা স্থান পাইয়াছে, বাস্তব সমস্যা ততটা স্থান পায় নাই। ইতিহাস ও দর্শনের এক কল্পনামূলক চিন্তাধারা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারণার সূত্র।

(খ) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ অর্থনীতিকে জাতির দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করে। স্বভাবতই জাতিসমূহের ঐক্যবোধের ধারণা ইহা দ্বারা ব্যাহত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত প্রকট হইয়া উঠে।

১. "Our Non-co-operation is ... with the material civilisation and its attendant greed and exploitation of the weak." Gandhi

২. "Bourgeois nationalism or bourgeois-democratic nationalism, always thrives for the priority of its own ... for its national bourgeoisie." Lyekhin and Petrov: *Dictionary of Foreign Words*

(গ) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় অধিক সচেষ্ট হয় বলিয়া 'জাতি' ধারণাটিকে নিজস্ব ধারণা হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহা এই বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শ প্রচার করে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে এই মতবাদ প্রচারে নিয়োগ করে এবং স্বাদেশিকতার নামে এই শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠারই প্রচেষ্টা করে।

(ঘ) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ সীমিত অর্থে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্বক্ষেত্রেই যে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও গুণাবলীর কথা ভাবিয়াই জাতিকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

অপরদিকে মার্ক্সবাদীদের মতে, যে-কোন জাতিই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবি করিতে পারে। শোষিত মানুষের একনায়কত্ব যেমন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের হাতিয়ার, ঠিক তেমনি শোষিত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জাতিসমূহের সংহতির প্রধান অবলম্বন। অবশ্য কোন প্রতিক্রিয়াশীল জাতি বা গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি থাকিতে পারে না। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী হইলে সংশ্লিষ্ট জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য এ-প্রশ্নও কোন কোন মার্ক্সবাদী বিবেচনা করার পক্ষপাতী। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রশ্নে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল জাতির অধিকারকে ইঁহারা অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

(ঙ) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ উগ্র ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের ধারণাকেও সমর্থন করে। স্বজাত্যাভিমান জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়, ইহা মানবজাতির রাজনৈতিক সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ করে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এই মৌল সত্যকে গ্রহণ করিতে চায় না। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ নয়, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের (Proletarian Internationalism) স্বীকৃতি[১] —জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সবাদীদের ইহাই মূল কথা। প্রলেতারীয় জাতীয়তাবাদের মূল কথা হইল : বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য, জাতীয় সমস্যার সমষ্টিগত সমাধান, জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমানুভূতিশীল মনোভাব, সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ, সমাজতন্ত্রের পথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং শ্রেণীশোষণের অবসান বুর্জোয়া বা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারণায় এই সমস্ত চিন্তাধারার বিশেষ প্রকাশ ঘটে না।

মার্ক্সীয় জাতীয়তাবাদের মূল কথা : প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের শিক্ষায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে শিক্ষিত করাই মার্ক্সীয় জাতীয়তাবাদের মূল শিক্ষা। মার্ক্সবাদীদের মতে, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয় বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিনাশের প্রয়োজনে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ভাবধারা কার্যকর, কিন্তু যে মুহূর্তে এই ভাবধারা সর্বহারার বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ

১. See Carew Hunt : *A Guide to Communist Jargon*

করার বিরোধী—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শের পরিপন্থী হয়, সেই মুহূর্তে ইহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় শক্তির আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন পরিচালনা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের বিভিন্ন পথ প্রস্তুত করার মধ্যেই রহিয়াছে জাতীয়তাবাদের প্রকৃত সাফল্য।

মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ মনে করেন যে জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি জানানো এবং একই সংগে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রসারকার্য ও সহযোগিতার পথ সৃষ্টি করা, সামগ্রিকভাবে জাতিসত্তা-সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বভাব জাগ্রত করা এবং সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করার মধ্যেই জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল লক্ষ্য নিহিত।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজকেই বলা হয় 'জাতীয় জনসমাজ' এবং 'জাতি' বলিতে বুঝায় রাজনৈতিক সংগঠন-সহ জনসমাজকে।

২. জাতীয় ভাব জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক আকাংক্ষার মূর্ত রূপ। এককথায় ইহা হইল স্বাতন্ত্র্যবাদ। আগ্রাসী হইলেই ইহা সভ্যতার সংকটরূপে দেখা দেয়।

৩. প্রত্যেক রাষ্ট্র একটিমাত্র জনসমাজ লইয়া গঠিত হইবে—ইহাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্য। রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই এই অধিকারের সীমা নির্দেশ করিয়া থাকে।

৪. আন্তর্জাতিকতাকে জাতীয়তাবাদের স্থলাভিষিক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা হইল বিকৃত, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পথ পরিহার করিবার জন্য।

৫. জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি জানানো এবং একই সংগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করাই হইল জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগির মূলকথা।

অনুশীলনী

1. Point out the essential elements of Nationality. Which of them appears to you to be most important, and why ?

[জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলির উল্লেখ কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় এবং কেন হয় ?]

[ইংগিত. জাতীয় জনসমাজ যে যে উপাদান লইয়া গঠিত হয় তাহাদের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা-ধর্ম-সাহিত্য-ইতিহাস, ঐতিহ্যগত সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা এবং

অভিন্ন রাজনৈতিক আকাংক্ষাই প্রধান। ইহাদের মধ্যে কোনটিই অপরিহার্য নয়, অথচ কয়েকটি না থাকিলে জাতীয় জনসমাজ গড়িয়া উঠে না। উপাদানগুলির মধ্যে যদি বাছিতে হয় তবে অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে যে সমচেতনাই জাতি গঠন করিয়া থাকে (equal feeling makes a nation)।...এবং ১৮৯-৯১ পৃষ্ঠা।]

2. **Distinguish between a State and a Nation. What are the principal elements of Nationality?**

[রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। জাতীয় জনসমাজের মূল উপাদান কি কি?]

(১৮৬-৮৮ এবং ১৮৯-৯১ পৃষ্ঠা)

3. **What do you mean by the right of self-determination? Discuss, in this connection, the value and limitations of this doctrine.**

[জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বুঝ? আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।] (১৯১-৯৪ পৃষ্ঠা)

Or,

Do you agree with the view that the boundaries of States should coincide with the boundaries of nationalities? Give reasons for your answer.

[তুমি কি এই যুক্তি সমর্থন কর যে রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সীমারেখার সহিত সমানুপাতিক হওয়া উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (১৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

4. **Discuss how far nationalism constitutes a menace to civilisation.**

[জাতীয়তাবাদ কিভাবে সভ্যতার শত্রু হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে তাহা আলোচনা কর।]

(১৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা)

5. **Discuss the problem of Nationalism vs. Internationalism.**

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।] (১৯৫-৯৮ পৃষ্ঠা)

Or, "The road to Internationalism lies through Nationalism." Discuss.

"জাতীয়তাবাদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকতায় পৌছান যায়।" আলোচনা কর।] (১৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

Or, "The future of civilisation lies in a synthesis of nationalism and internationalism." Explain fully and give your own views with reasons thereof.

["জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়সাধনের উপর সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।" উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা কর এবং যুক্তিসহ তোমার নিজস্ব অভিমত প্রদান কর।] (১৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

6. **Discuss the value and limitations of Nationalism as a political ideal.**

[রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।] (১৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

7. **Nationalism is a highway to internationalism. Comment on the statement.**

[জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা রূপায়ণের পথ।— উক্তিটির উপর মন্তব্য কর।] (১৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

8. **Discuss the Marxist view of Nationalism and Internationalism.**

[জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগির পর্যালোচনা কর।] (১৯৮-২০০ পৃষ্ঠা)

১০ সাম্রাজ্যবাদ (IMPERIALISM)

> "... *imperialism is the monopoly stage of capitalism.*"
>
> Lenin

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা :

১. সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা কিভাবে নির্দেশ করা যায় এবং ইহার বৈশিষ্ট্যই বা কি কি ?

২. সাম্রাজ্যবাদের উৎস কোথায় ?

৩. সাম্রাজ্যবাদে সমস্যা বলিতে কি বুঝায় ?

৪. সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন কিভাবে গড়িয়া উঠে ?

৬. সাম্রাজ্যবাদের কোন সীমা নির্দেশ করিতে পারা যায় কি ?

সাম্রাজ্যবাদের উল্লেখ বহু পুরাতন হইলেও নির্দিষ্ট অর্থে সাম্রাজ্যবাদের ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। সাধারণ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ হইল 'সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাংক্ষা।'[১] যে-ইতিহাস আমরা পাঠ করি অনেকাংশেই তাহা হইল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তারের ইতিহাস। অতীত যুগের ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস খাঁ ও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ইঁহাদের ক্ষেত্রে প্রেরণা ছিল বংশগত ব ব্যক্তিগত আকাংক্ষা। ব্যক্তির মত জাতীয় রাষ্ট্রও (Nation-State) সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণে আধুনিক ইতিহাসে ব্রিটেন ফ্রান্স আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্রাজ্যবাদ অন্যতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। কান্ত, ফিকটে, হেগেল প্রমুখ জার্মান রাষ্ট্রদার্শনিকের আদর্শবাদী চিন্তাধারার (idealistic thought) এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ট্রিটস্‌কে (Trietschke) প্রচারিত যুদ্ধবাদের (militarism) মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্যবাদের কারণ : প্রাচীনকালে সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাংক্ষার মধ্যে যে-সমস্ত কারণ উল্লেখযোগ্য ছিল তাহা হইল ধর্মপ্রচার ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ করা। ইয়োরোপের ইতিহাসে স্প্যানিস, পর্তুগীজ বা ডাচদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পশ্চাতে মুখ্য ছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল উপনিবেশগুলির স্বার্থের বিনিময়ে দেশীয় অর্থ-ব্যবস্থাকে সজীব ও সতেজ করিয়া তুলিবার আকাংক্ষা। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যবসায়িক সুযোগসুবিধা লাভ করা। উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের উপগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক পথ ও মত দ্বারা পরিচালিত হইত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উপনিবেশগুলিকে তাহাদের স্বার্থে এবং সুবিধার্থে ব্যবহার করিত।

[১] "Imperialism is a policy which aims at creating, organising and maintaining an empire." *Encyclopaedia of the Social Sciences*

অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Characteristics) : ক্রিস্টোফার লয়েড (Christopher Lloyd) বলেন, সাম্রাজ্যবাদ শুধু জাতীয় রাষ্ট্রগুলির পরিধি ও প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রচেষ্টাই নহে, ইহা একপ্রকার অর্থ-ব্যবস্থা—ধনতন্ত্র (capitalism)—সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাও বটে। ইহা একদিকে যেমন জাতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির আকাংক্ষা অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়াবার কৌশলও বটে।[১]

হলগার্টেনের (Hallgarten) মতে, সুনির্দিষ্ট অর্থে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ধারণা। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদের অর্থ ছিল রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতা (political colonialism)—এক জাতি কর্তৃক অন্যান্য দুর্বল দেশ ও জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন। ইহার পর ধারণাটির অর্থ ব্যাপকতর করা হয়। তখন ধারণাটির অর্থ দাঁড়ায় কোন দেশ কর্তৃক বৈদেশিক বাজারের উপর প্রাধান্য বিস্তার, বৈদেশিক বাজার হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ। এইভাবে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব করিতে থাকে।

হবসন (Hobson) প্রমুখ লেখক রাজনৈতিক শোষণ বা শাসনকে গৌণ মনে করেন এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য বা শোষণকে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করেন।

পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে জার্মানীর অন্যতম মার্ক্সবাদী বিশ্লেষক রুডলফ হিলফার্ডিং (Rudolf Hilferding) সাম্রাজ্যবাদের আরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ হইল ফিনান্স মূলধনের প্রকাশ (emanation of finnace capital) এবং বৃহদাকারের আর্থিক ও শিল্পজোট বা ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া মালিকদের মুনাফা লাভের সংগ্রামের ফলস্বরূপ।

লেনিনের সংজ্ঞা : পরিশেষে, লেনিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া বলেন যে ইহা হইল ইতিহাস বিবর্তিত একপ্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

তাঁহার সংজ্ঞা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ হইল 'ধনতন্ত্রের বিবর্তনে একচেটিয়া ব্যবসায়ের স্তর' (the monopoly stage of capitalism)।

লেনিনের তত্ত্ব : ব্যাখ্যা করিয়া লেনিন বলিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদ হইল ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের বিশেষ স্তর এবং ইহা ধনতন্ত্রের শেষ পর্যায় বা অন্তিম পর্যায় (imperialism is moribund capitalism)। ইহার পরিণতি হইল দ্বন্দ্ব ও সর্বহারাদের বিজয়।

স্তর-বিশ্লেষণ : তিনি উল্লেখ করিয়াছেন : প্রথম পর্যায়ে উৎপাদন ও মূলধন পুঞ্জীভূত হইয়া মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাংক-মূলধন ও শিল্প-মূলধন মিশিয়া গিয়া ফিনান্স-মূলধনের (finance capital)

১. *Democracy and Its Rivals*

সৃষ্টি হয় এবং এই মূলধনের মুষ্টিমেয় ধনী মালিকগণ দেশের শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন স্থানে মূলধন রপ্তানির প্রবণতা দেখা দেয়। চতুর্থ পর্যায়ে বৃহৎ বৃহৎ আন্তর্জাতিক শিল্পজোটের সৃষ্টি হয় এবং ইহারা পৃথিবীর বাজার নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। পরিশেষে, সমগ্র পৃথিবীই কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।[১]

সুইজি-নির্দেশিত বৈশিষ্ট্য. প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ পল সুইজি সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় লেনিন-প্রদত্ত 'ফিনান্স মূলধন' (finance capital) কথাটির পরিবর্তে 'একচেটিয়া মূলধন' (monopoly capital) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। সুইজির মতে, সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত রূপ: (১) উন্নত ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিযোগিতা। (২) একচেটিয়া মূলধনের প্রাধান্য। (৩) বিদেশে মূলধন রপ্তানির প্রাধান্য। (৪) আন্তর্জাতিক বাজারে ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া শিল্পজোটের সৃষ্টি। (৫) প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিশ্বের অনধিকৃত অঞ্চলসমূহের বণ্টন।[২]

বার্নাড শ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি দুর্বল জাতিসমূহের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ঐ সমস্ত দেশে মূলধন রপ্তানি করে, উহাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনে, ক্রমশ এই সকল দেশে নিজস্ব নীতি কার্যকর করে এবং উহাদিগকে উপনিবেশ হিসাবে গড়িয়া তোলে। বার্নাড শ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসংগে বলিয়াছেন, প্রত্যেক ইংরেজ জন্ম হইতেই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে গণ্য হইবার অদ্ভুত ক্ষমতা অর্জন করে।[৩]

সাম্রাজ্যবাদের উৎস (Sources of Imperialism):

বিভিন্ন লেখক নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদের কারণসমূহের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদের মূলে প্রধান কারণ হইল অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ কোন-না-কোন ভাবে মৌল অর্থনৈতিক কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট। বলা যায়, উল্লিখিত কারণগুলি মোটামুটি এইরূপ: (ক) জাতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা জাগিয়া উঠিবার একটি কারণ জাতীয়তাবাদী আকাংক্ষা। এক সময় জাতীয়তাবাদ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাইয়া ধনতন্ত্রের বিকাশসাধনে সহায়তা এবং অর্থনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রবর্তন করিয়াছিল। বর্তমানেও জাতীয়তাবোধ অনুন্নত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়তা

---

১. V. I. Lenin. *Imperialism. The Highest Stage of Capitalism*

২. P. M Sweezy: *The Theory of Capitalist Development*

৩. "Every Englishman is born with a certain miraculous power that makes him the master of the world. ...As the great champion of freedom and national independence, he conquers and annexes half the world, and calls it Colonization." *The Man of Destiny* (1896)

এবং ফলে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে। কিন্তু উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে সহায়তা করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ অনেক ক্ষেত্রেই আগ্রাসী সংকীর্ণতাবাদে রূপান্তরিত হয়। যাহার ফল এক জাতির অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের আকাংক্ষা। (খ) অনেকে আবার মনে করেন, দুর্বল ও অনুন্নত জাতিসমূহের মুক্তি ও আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে এই সকল জাতি সবল জাতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আদিম জনগোষ্ঠীগুলিকে পরস্পরের হাত হইতে রক্ষা করাও সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সকল জাতি সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ক্রমশ নিজেদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নত করিতে সমর্থ হয়।

শ্বেতকায় জাতিসমূহের উপর অর্পিত ভার: শ্বেতকায় জাতিসমূহের লোকেরা ইহাকে তাহাদের উপর অর্পিত ভার (the whiteman's burden) বলিয়া প্রচার করিত।

(গ) প্রাচীনকালে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেও সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। (ঘ) বার্ক (Edmund Burke) সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে যুক্তি দিয়া বলিয়াছিলেন: সুশাসন, সতর্ক শাসন পরিচালনা এবং অধীনস্থ রাজ্যগুলির প্রজাদের—অর্থাৎ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমেই ঐ সকল রাজ্যকে শাসন করা সম্ভব। ক্ষমতার অপব্যবহার, অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে শোষণ বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই।[১] লর্ড লুগার্ড মনে করেন, সাম্রাজ্য বাদী শক্তি হিসাবে ব্রিটেন দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইবে: (ক) ইহা অভিভাবক হিসাবে প্রজারাষ্ট্রগুলির সামগ্রিক উন্নয়নে সচেষ্ট হইবে এবং (খ) আর্থিক সম্পদের প্রসার ঘটাইয়া মানবকল্যাণ সাধন করিবে।[২]

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ: সর্বশেষে, সাম্রাজ্যবাদের কারণ হিসাবে মার্ক্সবাদীদের যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে ধনতন্ত্রের একটি বিশেষ পর্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ অর্থনৈতিক—ইহা পৃথিবীর বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার একটি পুঁজিবাদী প্রচেষ্টা মাত্র। একচেটিয়া মূলধন গড়িয়া তোলা, আন্তর্জাতিক শিল্পজোট সৃষ্টি করা, পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য বিস্তার করা সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কারণ। অনুন্নত দেশগুলিতে নানাপ্রকার সাহায্য (aid)

১. "The question is not whether you have a right to render your people miserable but whether it is not your interest to make them happy." Burke : *Impeachment of Warren Hastings*

২. Britain must act "as trustee, on the one hand for the advancement of the subject races, and on the other hand for the development of the material resources for the benefit of mankind." Lord Lugard

প্রদান করিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক—এমনকি রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তারের প্রচেষ্টা চালায়।

সাম্রাজ্যবাদের আরও দুইটি কারণ: ক্রিস্টোফার লয়েড সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের আরও দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উনবিংশ শতাব্দী হইতেই ইয়োরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এশিয়া ও আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি উদ্দেশ্য হইল ইয়োরোপীয় দেশগুলির জনসংখ্যার চাপ প্রতিরোধ করিবার প্রচেষ্টা। উপনিবেশগুলি জনবহুল হওয়ার অন্যতম কারণ এই সকল অঞ্চলে ইয়োরোপীয়দের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা। ইহা সাম্রাজ্যবাদের এক অন্যতম কৌশল। সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় কৌশল হইল পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে সামরিক বা অন্যান্য সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ঘাঁটি বা কেন্দ্র গড়িয়া তোলা। অতীতে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশের এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইদিকে ঝোঁক ইহার দৃষ্টান্ত বহন করে।

আদর্শবাদী বনাম বস্তুবাদী যুক্তি: সাম্রাজ্যবাদের কারণগুলি ব্যাখ্যা করিলে মোটামুটি দুইটি পরস্পরবিরোধী যুক্তির অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়: আদর্শবাদী (idealist) যুক্তি এবং বস্তুবাদী (materialist) যুক্তি। আদর্শবাদ সাম্রাজ্যবাদকে নীতিগত দিক হইতে বিবেচনা করে এবং এই মতানুসারে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল অনুন্নত জন-সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের অন্যতম উপায় বলিয়া মনে করে। বস্তুবাদী ব্যাখ্যা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে বিচার করে। এই মতানুসারে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শোষণের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে।[১]

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দ্বৈত পদ্ধতি: সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাধারণত দ্বৈত পদ্ধতিতে উপনিবেশ শাসন করে: (ক) সামরিক ক্ষমতা দখল করিয়া এবং (খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া। ইহা সাধারণত তত্ত্বাবধানের শাসন (Mandate System) বলিয়া পরিচিত। ইরাক যখন ব্রিটেনের অধীন ছিল তখন ব্রিটেন এই ধরনের শাসনের প্রবর্তন করিয়াছিল। মিশর ব্রিটেনের আশ্রিত (Protectorate) রাজ্য ছিল। ভারতেও ব্রিটেনের তত্ত্বাবধানে শাসন-পরিচালনা করা হইত। ভারতের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের শাসন একদিকে ব্রিটেনের উপর এবং অন্যদিকে ভারতীয়দের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এই ধরনের শাসন ক্রমশ উপনিবেশকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রেরণা দেয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মধ্যে এই প্রেরণা উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিভেদনীতি বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি করে: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রশ্ন, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন, ইত্যাদি। বর্তমানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে অনেক ঔপনিবেশিক দেশই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। এবং ইহারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

---

১. "Two attitudes predominate in modern Imperialism: the idealist excuse for Protection, the materialist necessity for Exploitation." C. Lloyd

কিন্তু এই সকল দেশের বৈদেশিক সাহায্য প্রার্থনার সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক ও কলাকৌশলগত সাহায্য দিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশের লক্ষ্য হইল নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাজার অধিকার করা এবং বহুজাতীয় শিল্পজোট (multinational combinations) সৃষ্টি করিয়া মুনাফা অর্জন করা। ফলে অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে কোন সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আবার অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়া অনুন্নত দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ও কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে। অপরদিকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ করা হয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও অন্যান্য দেশে প্রভাব বিস্তার করিবার দিকে ঝুঁকিতেছে।[১]

সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা (Problems of Imperialism) : সাম্রাজ্যবাদ অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধ জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদে পরিণত হয়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদ ক্রমশই ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। ইহার চরম ফল হইল অর্থনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। যুদ্ধবাদের দরুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক মনোনিবেশ করে এবং একচেটিয়া মূলধনকে এই ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। সামরিক ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যয় হওয়ার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই জনকল্যাণমূলক ও সেবামূলক কার্যাদি ব্যাহত হয়। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি আগ্রাসী মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে স্বজাত্যবোধ (patriotism) বৃদ্ধি পায়। বর্ণবৈষম্য ইহাদের আর একটি দিক।

বিভিন্ন শ্রেণীর উপর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব : এখন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদ সকল বিত্তশালী শ্রেণীকে একচেটিয়া মূলধনের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ করে। শিল্পপতি, জমিদার প্রভৃতি নিজস্ব স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সম্পত্তিভোগী সকল শ্রেণীবিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবোধের প্রেরণায় সংগঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও সংগঠনকেও দৃঢ় করিয়া তুলিতে সাহায্য করে—সম্পদশালী ব্যক্তিদের ঐক্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রমিকদের মধ্যেও ঐক্যের প্রেরণা জাগ্রত হয়। ঐক্য ও সহযোগিতা যে তাহাদের শক্তির উৎস শ্রমিকশ্রেণী একথা ক্রমশ বুঝিতে পারে। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদ মধ্যবিত্ত শক্তিকে ধ্বংস করে এবং তাহাদের গুরুত্ব ক্রমশই হ্রাস পায়। পুরাতন মধ্যবিত্তশ্রেণী (মাঝারী ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, মধ্যবিত্ত, কৃষক প্রভৃতি) ক্রমশ বিলুপ্ত হইলেও এক ধরনের নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে—যথা, আমলাশ্রেণী, বিক্রেতা ও অন্যান্য পেশাগত জীবিকাসন্ধানী।

১. ইহাদের সাম্প্রতিক আখ্যা হইল 'সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী' দেশ (socialist-imperialist countries)।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিয়া উহাকে অধিকমাত্রায় শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হয়। আবার একচেটিয়া মূলধনের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রকে সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করিতে হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থেও রাষ্ট্রকে পরিবহণ ও সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ শিল্পে উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশৃংখলা পরিহার করিবার জন্ত হস্তক্ষেপ করিতে হয়। আবার যে-সকল শিল্প রুগ্ন বলিয়া চিহ্নিত হয় তাহাদিগকে রাষ্ট্রাধীন করা হয়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম তীব্রতর হইতে থাকিলে রাষ্ট্রকে শ্রমিকদের জন্ত যথাসম্ভব সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিতে হয়। তৎসত্ত্বেও কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং শ্রমিক সংঘের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, যুদ্ধবাদ, সামরিক নীতির উপর গুরুত্ব, আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি, শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠনের উপর আঘাত হানে এবং শ্রমিকশ্রেণীর জীবিকাতে সংকট সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থে জনসাধারণের আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টাও করিতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করিলেও জনগণের প্রতিনিধিকক্ষের বা আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস করে। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আবার এই প্রতিনিধিকক্ষ ধনিকশ্রেণী ও প্রতিপত্তিশীল স্বার্থের যন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। শাসন বিভাগের হাতে অধিকমাত্রায় ক্ষমতা সমর্পিত হইতে থাকে। ইহার কাজ হয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে সতর্ক প্রহরী হিসাবে কাজ করিতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন (Imperialism and National Liberation Movement): সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকৃত জাতীয়তাবাদী মোহ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহারা নিজেদের কৃষ্টি ঐতিহ্য শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে অন্ধ অনুরাগ পোষণ করে এবং অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হইয়া উঠে। স্বভাবতই দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপরই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ করিবার মনোভাব গড়িয়া উঠে। দুর্বল জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দমনমূলক প্রবৃত্তির শিকার হয়। জাতিগুলি নানাভাবে ঔপনিবেশিকতার হাত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে।[১]

১. "The national liberation movement is a movement which is engendered by, and is aimed at, shacking off oppression." *Fundamentals of Political Science* (Progress Publishers, Moscow, 1976)

রাশিয়ার বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চেতনা : ঊনিশ শতকের শেষভাগ হইতেই উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এই মুক্তি-আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এই বিপ্লবই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্গে আঘাত হানে এবং এসিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা সৃষ্টি করে। রাশিয়ার মুক্তিকামী জনগণ সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে এবং মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালেই বিভিন্ন জাতি মুক্তি-আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালায় এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইতে প্রস্তুত হয়।

প্রধানত এসিয়া, ল্যাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকাতেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। রাশিয়ার গণবিপ্লবের সাফল্য এই দুইটি মহাদেশের শোষিত জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। ইহারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মুক্তি-আন্দোলনের প্রয়াস চালাইয়া যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হস্ত হইতে মুক্তির আন্দোলন। চীনের জনগণও জাপানের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অবদান : জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর অংশ হইল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। প্রধানত ইহাদের সংগ্রামী ভূমিকার মধ্যেই এই আন্দোলনের সাফল্য নিহিত থাকে। রাশিয়া এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহা অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীকে সংগঠিত করিয়াছে এবং শোষণের অবসান ঘটাইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন পৃথিবীর সকল দেশের শোষিত শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করে ("Workers of all countries and oppressed peoples, unite." Marx and Engels)[১]। এই মুক্তি-আন্দোলন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারারও প্রসার ঘটায়। ইহা শুধুমাত্র জাতির মুক্তির পথই নির্দেশ করে না, জাতির প্রগতি ও অন্যান্য সংস্কারের পথও নির্দেশ করে।[২] জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনও বটে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করিলেও অনেক দেশ এখনও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শক্তির প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই।

১. *The Communist Manifesto*

২. "The nationalism of the peoples of the colonial and dependent countries... reflects the sound democratism of the national-liberation movements, the protest of the masses against imperialist oppression and the striving for national independence and social reforms." *Fundamental of Marxism-Leninism* (Moscow)

একটি প্রমাণিত সত্য : জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদ শান্তির শত্রু এবং সভ্যতার বিঘ্নস্বরূপ। সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে অনিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদ। উহা উগ্ররূপ ধারণ করিলে দেখা দেয় সভ্যতার সংকট এবং বিঘ্নিত হয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এক দেশের সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা অন্য দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতায় আঘাত হানে। দেশে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংঘাত-সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতার, অপচয় ঘটে মানবসম্পদের।

সাম্রাজ্যবাদের সীমা : পৃথিবীকে বিভক্ত করার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্র সর্বদাই ক্রিয়াশীল। সমাজতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে রাশিয়া এবং পরবর্তীকালে চীনের প্রবেশ, কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রভাব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাময়িক কালের জন্য স্তব্ধ করিলেও, ইহাকে সম্পূর্ণ রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচার, জাতিগুলির স্বার্থবুদ্ধির পরিহার, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রয়োগ এবং সর্বোপরি মানবজাতির ঐক্যবোধ ও বিচারবুদ্ধির সুস্থ প্রকাশ ও ব্যবহারেই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিবে আশা করা যায়।

পল্ সুইজি মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ বিকাশেই ইহার সীমা নিহিত।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব যত প্রকট হইবে, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস তত শীঘ্রই লক্ষ্য করা যাইবে। শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব ইহার বিরোধী শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ও সুস্থ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও সাম্রাজ্যবাদের বিকাশকে সীমিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে।[১]

বার্কারের (Prof. Ernest Barker) অভিমত হইল, নিয়ন্ত্রিত হইলেই জাতির সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে। সাম্রাজ্যবাদের অবসানে প্রয়োজন হইল অতিজাতীয় আন্দোলন (Supernational Movement)—অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রসার। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতিসংঘ (The League of Nations) কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে ব্যর্থ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষময় ফল আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা : জাতিপুঞ্জের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা পালনের কথা বলা হইয়াছে : ইহা ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ সংগঠিত হইয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত

১. Paul M. Sweezy : op. cit.

শক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবস্থা জাতিপুঞ্জ করিবে। শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দেওয়া ও শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করাও ইহার লক্ষ্য। স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য অনুন্নত দেশগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও ইহা গ্রহণ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council)। এই সকল দেশের পরিচালনভার বৃহৎ শক্তিগুলির উপরে ন্যস্ত হইবে না। ইহাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত না হইলেও জাতিপুঞ্জও পুরাপুরি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. সংজ্ঞা নির্দেশে লেনিনের অনুসরণে বলা যায় : সাম্রাজ্যবাদ 'ধনতন্ত্রের বিবর্তনে একচেটিয়া ব্যবসায়ের স্তর'। বৈশিষ্ট্য হইল (ক) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা, (খ) একচেটিয়া কারবারের প্রাধান্য, (গ) বিদেশে মূলধন রপ্তানি, (ঘ) আন্তর্জাতিক শিল্পজোট এবং (ঙ) ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে অনধিকৃত অঞ্চল বণ্টন।

২. সাম্রাজ্যবাদের উৎস হিসাবে (ক) আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী আকাংক্ষা, (খ) দুর্বল ও অনুন্নত জাতিসমূহের মুক্তি ও আধুনিকীকরণের ইচ্ছা, (গ) ধর্মপ্রচার এবং (ঘ) অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—এই চারিটির নির্দেশ করা হয়।
মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী প্রচেষ্টার অন্যতম অধ্যায় মাত্র।

৩. সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা হইল উহার অন্ধ, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদে পরিণতির সম্ভাবনা।

৪. সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সূচিত হয় গণ-মুক্তি আন্দোলন। ইহার পুরোভাগে থাকে বুদ্ধিজীবিগণ এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী।

৫. উহার আভ্যন্তরীণ বিকাশের মধ্যেই রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের সীমা।

অনুশীলনী

1. **Define Imperialism and indicate its characteristics.**
[সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দাও।] (২০৩—০৪ পৃষ্ঠা)

2. **Write a note on the sources of Imperialism.**
[সাম্রাজ্যবাদের উৎসের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (২০৪—০৬ পৃষ্ঠা)

3. **Briefly describe the modes of Imperialist Rule.**
[সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (২০৬—০৭ পৃষ্ঠা)

4. **What are the problems that Imperialism ordinarily creates ?**
[সাম্রাজ্যবাদী শাসন সাধারণত কি কি সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে?] (২০৭—০৮ পৃষ্ঠা)

5. **Write a short essay on Imperialism and National Liberation Movement.**
[সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উপর একটি নিবন্ধ রচনা কর।] (২০৮-১০ পৃষ্ঠা)

১১ বিশ্বশান্তি ও জাতিপুঞ্জ
(WORLD PEACE AND THE UNITED NATIONS)[১]

> "*All nations shall beat their swords into ploughshares, and their spears into pruning-hooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.*"
> *Isaiah* ii, 4

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা :

১. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতি-সংঘ সার্থক হইতে পারে নাই কেন ?

২. এ-ব্যাপারে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ কতদূর কার্যকর হইয়াছে ?

৩. সাম্প্রতিককালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রাধান্যের কারণ কি ?

৪. ভিটো-ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি কি কি ?

৫. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ কি ?

অতিজাতীয় আন্দোলন ও বিশ্বমানব (Supernational Movements and the Universal Man): জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation-States) উদ্ভবের বহু পূর্ব হইতেই মানুষ বিশ্ব-সংগঠন ও বিশ্বশান্তি এবং বিশ্ব-মানবের ভিত্তিতে বিশ্ব-ঐক্যের সন্ধান করিয়া আসিতেছে।

নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন : আদর্শবাদী দার্শনিকগণ এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন যেখানে যুদ্ধ বলিয়া কিছু থাকিবে না, যেখানে সকল রাষ্ট্র মিলিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে এবং যাহার ফলে পৃথিবীতে বিরাজ করিবে আবার শান্তি। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা আন্তর্জাতিক আইন, কূটনীতি ও বিচার নিষ্পত্তির মাধ্যমে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আবার আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, যানবাহন ও আদানপ্রদানের সুযোগসুবিধার উন্নতিসাধন প্রভৃতির ফলে বহু প্রকারের সাধারণ আন্তর্জাতিক সমস্যা আসিয়াও দেখা দিতে থাকে। ইহাদের সমাধানকল্পে রাষ্ট্রনেতৃগণ বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়িয়া তুলিতে একপ্রকার বাধ্য হন। এইভাবে একদিকে আদর্শবাদীদের তত্ত্ব এবং অপরদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (The League of Nations) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতা ও তত্ত্ব উভয়ই প্রেরণা যোগাইয়াছে।

বিশ্বশান্তির বিভিন্ন সমস্যা ১—। জাতীয়তাবাদ : বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হইল জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব। জাতীয়তাবাদ প্রায় সকল রাষ্ট্রের

১. মাত্র উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত।

অনুসৃত নীতি এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহা সংকীর্ণ আত্মস্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল যুদ্ধবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ (militarism, imperialism and racism)। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলি—বিশেষ করিয়া ধনতান্ত্রিক দেশগুলি—অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে সমরোপকরণে সজ্জিত এবং প্রয়োজনবোধে মারণাস্ত্র ব্যবহারে পরাঙ্মুখ নহে। পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের স্বরূপ এইরূপ যে একবার উহার ব্যাপক ব্যবহার ঘটিলে সমগ্র মানবজাতিই ধ্বংস হইবে।

২। **সাম্রাজ্যবাদ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক উপনিবেশই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কিন্তু উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার এবং বহির্বাজার সৃষ্টি করিতে উন্মুখ। এ-অবস্থার অবসান না ঘটাইতে পারিলে বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনকি সমাজতান্ত্রিক জগতেও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহাও বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে।

৩। **বর্ণবৈষম্য :** ইহা ছাড়া রহিয়াছে বর্ণবৈষম্যের প্রশ্ন। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া অভিহিত হইলেও এই ধরনের বিরোধে যখনই বৃহৎ জাতিগুলিকে পক্ষসমর্থন করিতে দেখা যায় তখনই আভ্যন্তরীণ গোলযোগ পরিণত হয় আশংকাজনক আন্তর্জাতিক সমস্যায়।

শোষণের অবসান-দাবি : এই সকল কারণে অনেকে অভিমত পোষণ করেন যে-পর্যন্ত না বিভিন্ন শোষণমূলক অর্থ-ব্যবস্থার (exploiting economic system) অবসান ঘটিবে এবং যে-পর্যন্ত জাতীয় সার্বভৌমিকতাকে সীমাবদ্ধ করা না যাইবে সে-পর্যন্ত স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না।[১]

সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘের (The League of Nations) মত জাতিপুঞ্জ (The United Nations) যৌথ নিরাপত্তার (collective security) নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তার নীতি কার্যকর করা তখনই সম্ভব যখন সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতৈক্য সম্ভব হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মতৈক্য হওয়া একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবে বুঝাপড়া ও অস্ত্রশস্ত্র সীমাবদ্ধকরণ প্রভৃতির মধ্যে সাময়িকভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে সীমিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। বলা যায়, শান্তি রক্ষাকল্পে অন্তত সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কতকটা সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা ও জাতিসংঘ (Historical Retrospect and The League of Nations) : শান্তি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা

১. Laski: *A Grammar of Politics*

দ্বারা। মিত্রশক্তির জাতিসমূহ বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে স্থায়ী এক বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯১৯ সালে শান্তি-বৈঠকের (The Peace Conference) অন্যতম কার্য হয় এক বিশ্বসংঘের প্রতিষ্ঠা। অনেক আলাপ-আলোচনার পর জাতিসংঘের নিয়মপত্র প্রণীত হয় এবং উহা ১৯১৯ সালের ২৮শে এপ্রিল সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে গৃহীত হয়। পরিশেষে ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারী জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হইলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু জাতিসংঘে যোগদান করিতে অস্বীকার করে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রধান ছিল (ক) সভা (Assembly), (খ) পরিষদ (Council) এবং (গ) কর্মদপ্তর (Secretariat)।

ক। সভা (Assembly): সভা গঠিত হইত সকল সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তিনজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোটপ্রদানের অধিকার ছিল। সংঘের এলাকাধীন অথবা বিশ্বশান্তি-সংক্রান্ত যে-কোন বিষয় লইয়া বিচারবিবেচনা করিতে পারিত। কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইত উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোট। সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দ্বারা নূতন সদস্য নির্বাচিত হইত। ইহা আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের সাহায্যে সংঘের চুক্তিপত্র সংশোধন করিতে পারিত, কিন্তু উহা পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন হইত। অন্যান্য কার্যের মধ্যে সভা আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন সাধারণ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার বিচারবিবেচনা করিত, পরিষদের কার্যের তদারক করিত এবং জাতিসংঘের বাৎসরিক বাজেট নির্ধারণ করিত।

খ। পরিষদ: জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল এই পরিষদ। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পরিষদে গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স ও সোবিয়েত ইউনিয়ন এই তিনটি রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য এবং অপরাপর ১১ জন অস্থায়ী সদস্য ছিল।

জাতিসংঘের সভার মত পরিষদও সংঘের এলাকাভুক্ত ও বিশ্বশান্তি-সম্পর্কিত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিতে সমর্থ ছিল। পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটদানের অধিকার ছিল এবং কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইত। আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ, নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সভার সুপারিশসমূহ কার্যকরকরণ ইত্যাদি ছিল পরিষদের কার্যপরিধিভুক্ত। কার্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা ছিল পরিষদের প্রধান দায়িত্ব।

গ। কর্মদপ্তর ও প্রধান কর্মসচিব: সংঘের তৃতীয় অংগ পরিচালিত হইত প্রধান কর্মসচিবের (The General-Secretary) তত্ত্বাবধানে। প্রধান কর্মসচিব সভার সম্মতিক্রমে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। দপ্তরের কার্য ছিল সভা কিংবা

পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের কর্মসূচী প্রণয়ন, জাতিসংঘের দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ, জাতিসংঘের কার্যকলাপসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা, ইত্যাদি।

১৯২০ সালে জাতিসংঘ এক আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice) স্থাপন করে। আদালত ১৫ জন বিচারক লইয়া গঠিত হয়। চুক্তির ব্যাখ্যা, আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, দায়িত্বভংগ এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্বভংগের দরুন ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিবাদের বিচার ইহার এলাকাভুক্ত ছিল।

এই আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের অবিচ্ছেদ্য অংগ না হইলেও ইহা জাতিসংঘের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations): জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘ কিন্তু ইহা করিতে সমর্থ হয় নাই। অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহা কতকটা সফলতার সাক্ষর রাখিয়াছিল। যেমন, ইহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসারসাধন, স্বাস্থ্য সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কলেরা বসন্ত ইত্যাদি রোগ নিবারণের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ সম্পর্কে গবেষণা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রে বিবাদের বিচার প্রভৃতি অনেক কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিল।

প্রধান কর্মক্ষেত্রে কিন্তু—অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ব্যাপারে জাতিসংঘের ইতিহাস হইল চরম ব্যর্থতার ইতিহাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ১৯৩৫ সালে ইতালীর আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথোপিয়া) অধিকার, জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই চুক্তি ও জাতিসংঘের চুক্তিপত্রকে অস্বীকার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষ পর্যন্ত, হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মেনী এক এক করিয়া একরকম বিনা বাধায় অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র গ্রাস করিয়া লইয়া জাতিসংঘের সমাধি রচনা করে। এখন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে নিম্নলিখিতগুলিই ছিল জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ: (১) অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় সংঘ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। (২) জাতিসংঘের সদস্যপদও অতি সহজে ত্যাগ করা যাইত। (৩) ভার্সাই চুক্তি আক্রোশমূলক ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই যাহাদের উপর উহা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। (৪) জাতিসংঘের বলপ্রয়োগের কোন সংস্থা ছিল না। সদস্য-রাষ্ট্রের স্বপ্রয়োজন সীমিত করিবার কোনও উপায় ছিল না। সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে গঠিত জাতিসংঘের এই দুর্বলতা থাকিতে বাধ্য। (৫) আবার এই জাতীয় সার্বভৌমিকতাকে আশ্রয় করিয়াই চলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী সার্বভৌমিকতাকে পরিহার

করিয়া আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকে সহ্য করিবে এরূপ আশা করা যায় না। ইহাই বোধ হয় জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

বিশ্বশান্তি ও জাতিপুঞ্জ (World Peace and the United Nations): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতিসংঘের উদ্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা মহত্তর যুদ্ধের ফলে ঐ একই উদ্দেশ্যে উদ্ভব হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations)। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যুদ্ধবিহীন করিবার উদ্দেশ্যে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পূর্বের জাতিসংঘকে (League of Nations) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে নূতন বিশ্ব-সংগঠন প্রবর্তনের কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয়, জাতিসংঘের সহিত যে ব্যর্থতার ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের বিরুদ্ধে যে বিরূপ মনোভাব ছিল তাহাতে নূতন এক বিশ্বসংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হইয়াছিল।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমাবস্থাতেই কয়েকটি মিত্রশক্তি ঘোষণা করে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যেন সকলেই আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই ঘোষণা (London Declaration, 1941) নামে পরিচিত।

ঐ বৎসরই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁহাদের বিখ্যাত অ্যাটলান্টিক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদে যুদ্ধোত্তর যুগে অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৪২ সালের সূচনায় বিভিন্ন মিত্রশক্তি-স্বাক্ষরিত যে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা' (United Nations Declaration) প্রকাশ করা হয় তাহাতে অ্যাটলান্টিক সনদ কার্যকর করিবার নীতি সমর্থিত হয় এবং এইভাবে প্রথম ব্যবহৃত হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' কথাটি।

এ-পর্যন্ত অবশ্য বিশ্বসংঘ প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ করা হয় নাই—জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। ইহা করা হয় মিত্রশক্তিসমূহের পরবর্তী চুক্তিতে যাহা 'মস্কো ঘোষণা' (Moscow Declaration, 1943) নামে পরিচিত। ঘোষণায় বলা হয় যে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সাম্যের ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

পরবর্তী অধ্যায়গুলি এই সংগঠনের রূপদান করে। ইহার জন্য ওয়াশিংটনে ও ইয়াল্টায় মিত্রশক্তিসমূহের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা সম্মিলিত

১. H. G. Nicholas : *The United Nations—As a Political Institution*

জাতিপুঞ্জের সংবিধান গৃহীত হয় (ঘোষণাপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী সদস্য পোল্যাণ্ড ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই) এবং ঐ বৎসর ২৪শে অক্টোবর তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ৫১টি রাষ্ট্র (পোল্যাণ্ড সহ) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়।

উদ্দেশ্য : সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ দৃঢ়সংকল্প।[১] এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ, শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রকে সকলে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দিবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করিবে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা। সম্মিলিতভাবে—অর্থাৎ সকল রাষ্ট্রের দ্বারা প্রত্যেক রাষ্ট্রের—নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যমে এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া ইহাকে সামগ্রিক নিরাপত্তা (Collective Security) বলে।[২]

প্রাথমিক ও চরম লক্ষ্য : অতএব, বলিতে পারা যায় যে সামগ্রিক নিরাপত্তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক লক্ষ্য। পরোক্ষ চরম লক্ষ্য হইল বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা।

গৌণ উদ্দেশ্য : সংবিধানে আরও কয়েকটি গৌণ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে : (১) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা, (২) মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা, (৩) জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং (৪) পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা।

শেষোক্ত উদ্দেশ্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে গৌণ হইলেও কার্যত তাহারা চরম লক্ষ্য বা 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, পরাধীন জাতিগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না পাইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হইবে না।

নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের কল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া, মানুষের অধিকারের প্রতি বিশ্বজনীন শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া এবং সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়া এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। এই পৃথিবীতে জাতি থাকিলেও জাতি নাই, রাষ্ট্র থাকিলেও রাষ্ট্র নাই। সকল জাতি ও রাষ্ট্র সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে

১. "The peoples of the United Nations are determined to save succeeding generations from the scourge of war."

২. "Collective security implies the guarantee of peace and security of each state by all." Friedmann

পরস্পরের সহিত আবদ্ধ—সমগ্র মানবজাতি যেন এক পরিবার। এ এক নূতন পৃথিবী।

গঠন (Organisation): জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে যে মিত্রশক্তি (Allied Powers) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের সকল সদস্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য। স্বাধীনতার পর ভারত মূল সদস্যপদে আসীন রহিল। পাকিস্তান নূতন সদস্য হিসাবে জাতিপুঞ্জে গৃহীত হইল। মূল সদস্যগণ ব্যতিরেকেও যে-কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। সদস্যসংখ্যা ৫১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৮-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে (অক্টোবর, ১৯৮৪)।[১] বাংলাদেশ সদস্যপদ পায় ১৯৭৪ সালে।[২]

বিভাগ বা অংগ: জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন; ইহা নানা বিভাগে বিভক্ত। তবে মূল বিভাগ বা অংগ সংখ্যায় ছয়টি:

১। সাধারণ সভা (General Assembly): ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। ইহাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মাত্র একটি করিয়াই ভোটদানের ক্ষমতা আছে, যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রই পাঁচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে পারে।

সুতরাং সাধারণ সভা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমানাধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত।

সভার নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থাও আছে, তবে ইহা নিরাপত্তা পরিষদ কিংবা অধিক সংখ্যক সদস্যদের অনুরোধক্রমেই করা যায়। প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সভা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে এবং যে-কোন সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে।

ভোটদান-পদ্ধতি: সভায় যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা উপস্থিত ভোটগ্রহণকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক ভোটে করা হয়। তবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়—যথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ সম্পর্কে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন, জাতিপুঞ্জে নূতন সদস্য গ্রহণ, কোন সদস্যকে বহিষ্করণ, বাজেটসংক্রান্ত প্রশ্ন, অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থাসংক্রান্ত প্রশ্ন, ইত্যাদি।

১. *Newsweek* 1. 9. 84.

২. জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে: (১) যে-কোন শান্তিকামী রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সনদভুক্ত দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইলে এবং জাতিপুঞ্জ সংগঠনের মতে ঐ দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইলে ঐ রাষ্ট্র সদস্য হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। (২) নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা প্রত্যেক সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদভুক্ত করিবে। [অনুচ্ছেদ: (১) (২)] নিরাপত্তা পরিষদে চীন বিরোধিতা করায়—অর্থাৎ ভিটো প্রয়োগ করার ফলেই বাংলাদেশ প্রথমে সদস্যপদ পায় নাই। পরে চীন ভিটো প্রয়োগে বিরত থাকিলে বাংলাদেশ সদস্যরূপে গৃহীত হয়।

পাঁচ প্রকার কার্য : সাধারণ সভার কার্য ও ক্ষমতা মোটামুটি পাঁচ প্রকার : (ক) বিতর্ক ও বিশ্বমনোভাবপ্রসার কার্য, (খ) আন্তর্জাতিক আইনসংক্রান্ত কার্য, (গ) শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্য, (ঘ) তত্ত্বাবধান কার্য (supervision) এবং (ঙ) নির্বাচনমূলক কার্য।

ক। বিতর্ক ও বিশ্বমনোভাবপ্রসার কার্য : সাধারণ সভার অন্যতম প্রধান কার্য হইল 'বিশ্বের বিতর্ক সভা' হিসাবে কার্য করা এবং বিতর্কের মাধ্যমে বিশ্ব মতামত ও মনোভাবকে প্রকাশিত করা। জাতিপুঞ্জের সনদে (১০ম অনুচ্ছেদ) এ-সম্পর্কে সাধারণ সভাকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সভা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় এবং জাতিপুঞ্জের যে-কোন সংগঠনের ক্ষমতা ও কার্যের আলোচনা করিতে পারে এবং ঐ সম্পর্কে সদস্য-রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদ বা উভয়ের নিকট নিজস্ব সুপারিশ জানাইতে পারে। ইহা ছাড়া সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণকল্পে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাধারণ নীতিগুলি লইয়া বিচারবিবেচনা করিতে সমর্থ (১১ অনুচ্ছেদ)।

এই ক্ষমতাবলে সাধারণ সভা বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সাধারণ সমস্যাগুলি লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৯ সালের শান্তির মূলনীতি (Essentials of Peace) সম্পর্কে এবং ১৯৫৭ সালের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (peaceful co-existence) উপর প্রস্তাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিরস্ত্রীকরণ ও সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও সাধারণ সভা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

খ। আন্তর্জাতিক আইনসংক্রান্ত কার্য : সভার এই কার্য জাতীয় আইন-সভার আইন প্রণয়নমূলক কার্যের সহিত কতকটা তুলনীয়। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে আন্তর্জাতিক আইন প্রসারসাধনের উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা অনুসন্ধান ও আলোচনার ব্যবস্থা করিবে এবং প্রয়োজনমত সুপারিশ করিবে।[১] তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ সভা কোন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নয়, ইহা কূটনীতিবিদগণের সম্মেলন মাত্র।[২] সদস্যগণ নানা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা, অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিতে পারে, কিন্তু এমন কোন নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে পারে না যাহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হইবে।

আইন-প্রণয়ন সদৃশ কার্য : সুতরাং সাধারণ সভার এই কার্যকে সঠিক আইন প্রণয়নকার্য বলিয়া অভিহিত না করিয়া, 'আইন-প্রণয়ন সদৃশ কার্য' (quasi-legislative functions) বলিয়া বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত।

১. "The General Assembly shall initiate studies and make recommendation for the purpose of (a) ... encouraging the progressive development of international law and its codification." *Article 13 (1)*

২. "The Assembly is no more a legislative body than any other conference of diplomats." Schuman

এই দায়িত্ব পালনে সভা ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন (International Law Commission) নিযুক্ত করে। কমিশন নিয়মকানুন ও ঘোষণার খসড়া রচনা করিয়া সাধারণ সভার নিকট পেশ করে। দ্বিতীয়ত, এই খসড়ার ভিত্তিতে সভা আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মাবলী ঘোষণা করে। তৃতীয়ত, সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের যথোপযুক্ত আচরণ সম্পর্কে নিয়মাবলী সাধারণ সভা নিজেই নিয়মপত্র ঘোষণার দ্বারা স্থির করিয়া দিতে পারে এবং সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে ঐ ঘোষণাকে গ্রহণ ও কার্যকর করার জন্ম আহ্বান জানাইতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, জাতিহত্যাসংক্রান্ত নিয়মপত্র (Convention on Genocide) এবং উদ্বাস্তদের মর্যাদা সম্পর্কিত নিয়মপত্রের (Convention relating to the Status of Refugees) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, আন্তর্জাতিক আইনের প্রসারসাধন কার্যে সাধারণ সভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ হইল এ-ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে আগ্রহ, উদ্যোগ ও পারস্পরিকভাব অভাব।

গ। শান্তি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্য: শান্তিস্থাপন ও রক্ষা এবং রাজনৈতিক মনোমালিন্যের মীমাংসার ক্ষেত্রে সাধারণ সভা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য ছিল যে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাধান্ত ভোগ করিবে নিরাপত্তা পরিষদ। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ সভা এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণ সভা জাতিপুঞ্জের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয় বা প্রশ্ন লইয়া বিচারবিবেচনা এবং সুপারিশ করিতে পারে। ইহা ছাড়া যে-কোন সদস্য কিংবা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সদস্য নয় এমন যে কোন রাষ্ট্র শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণসংক্রান্ত প্রশ্ন সাধারণ সভার নিকট আলোচনার জন্ম উপস্থিত করিতে পারে এবং সাধারণ সভা ঐ প্রশ্নের বিচারবিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কিংবা নিরাপত্তা পরিষদ অথবা উভয়ের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাপারে সাধারণ সভার স্থলে নিরাপত্তা পরিষদকে প্রাধান্ত দেওয়া যে জাতিপুঞ্জের সনদের উদ্দেশ্য ছিল তাহা সভার ক্ষমতার উপর আরোপিত বাধানিষেধ হইতেই বুঝা যায়। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে শান্তি ও নিরাপত্তার কোন প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন থাকিলে পরিষদের অনুরোধ ব্যতীত সেই সম্পর্কে সাধারণ সভা কোন সুপারিশ করিতে পারিবে না।[১] আবার শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইলে সভাকে তাহা পরিষদের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু জাতিপুঞ্জ

---

১. **"While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendations with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests."** ***Article 12 of the Charter***

প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, নিরাপত্তা পরিষদের অকার্যকারিতার দরুন শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাপারে সাধারণ সভা নানাভাবে ক্ষমতা আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যেমন, গ্রীক সমস্যা, কোরিয়ার স্বাধীনতা, প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদের সমালোচনাক্ষেত্র (agenda) হইতে সরাইয়া লইয়া সাধারণ সভার হস্তে প্রদান করা হয়। কিছুদিন পূর্বে (১৯৮০) ইরাক ও ইরাণ এবং আফগানিস্তানের সমস্যাকেও সাধারণ সভায় হস্তান্তরিত করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫০ সালের 'শান্তির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হওয়ার প্রস্তাববলে ('Uniting for Peace' Resolution) সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের এক্তিয়ারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ, সংবিধান অনুসারে শান্তিভংগ ও আক্রমণাত্মক কার্যাদির বেলায় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা হইল নিরাপত্তা পরিষদের।

ঘ। **তত্ত্বাবধান কার্য :** জাতিসংঘের (League of Nations) পরিষদের উপর কর্মদপ্তরের (the Secretariat) কার্যের তদারক করার ভার ন্যস্ত ছিল, কিন্তু জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে কর্মদপ্তর এবং সংগঠনের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের তদারকের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে সভাকে। এই কারণেই নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এবং অভিভাবক পরিষদকে (Trusteeship Council) সাধারণ সভার নিকট উহাদের রিপোর্ট পেশ করিতে হয়। তবে এই তত্ত্বাবধান ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। যেমন, সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যে-সকল সুপারিশ প্রেরণ করে তাহা পরিষদ অগ্রাহ্যও করিতে পারে। অপরপক্ষে অভিভাবক পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সাধারণ সভার কর্তৃত্বাধীন থাকিয়া কার্য করিতে হয়। কর্মদপ্তর সম্পর্কেও সাধারণ সভা পূর্ণ তত্ত্বাবধানক্ষমতা ভোগ করে। কর্মদপ্তরকে উহার কার্যাদির সম্পূর্ণ রিপোর্ট সাধারণ সভার নিকট পেশ করিতে হয়।

'বিশ্ব-নাগরিক সভা' : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সাধারণ সভার কার্যের প্রকৃতি মোটামুটি উপলব্ধি করা যাইবে। জাতীয় আইনসভার মত তর্কবিতর্ক ও ভোটাভুটি দ্বারা ইহার কার্য পরিচালিত হইলেও ইহাকে আইনসভার পর্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ ইহার সুপারিশ বা প্রস্তাবের পশ্চাতে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই। সুতরাং ইহাকে 'বিশ্ব-নাগরিক-সভা' ('town meeting of the world') বা বিশ্ব সম্মেলন ('world conference') বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত। ইহার কার্য হইল মূলত রাজনৈতিক। প্রকাশ্যে সাধারণ সভায় বিভিন্ন সমস্যা লইয়া বিতর্ক, বিবেচনা ও ভোটগ্রহণ চলিলেও নেপথ্যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চলে গোপন শলাপরামর্শ, কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও যৌথ দরাদরি। প্রত্যেক সদস্যকে একই সংগে জাতীয় প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংরক্ষক হিসাবে কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে সাধারণ সভার মাধ্যমে যে প্রচারকার্য চলে তাহার ফলে আন্তর্জাতিকতার পথ সম্প্রসারিতই হয়। কারণ, রাষ্ট্রগুলিকে সকল সময়ই স্মরণ

রাখিতে হয় যে বর্তমান পৃথিবীতে মাত্র ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। **নিরাপত্তা পরিষদ** (Security Council): নিরাপত্তা পরিষদই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ—শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রকৃত ভার ইহারই হস্তে ন্যস্ত।

গঠন: ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ ৫ জন স্থায়ী ও ৬ জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত ছিল। ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা ৬ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০-এ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ফলে বর্তমানে পরিষদ ৫ জন স্থায়ী ও ১০ জন অস্থায়ী—মোট ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। ৫ জন স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চীন।[১] অস্থায়ী সদস্যের প্রত্যেকে সাধারণ সভা দ্বারা দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কোন অস্থায়ী সদস্যকে পুনর্নির্বাচিত করা হয় না।

দশটি অস্থায়ী সদস্যের আসনের মধ্যে দুইটি ও তিনটি (মোট পাঁচটি) নির্দিষ্ট আছে যথাক্রমে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জন্য।

ক্ষমতা ও কার্য. বিশ্বশান্তির রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষা বিপন্ন হইতে পারে এমন অবস্থা বা বিবাদের উদ্ভব হইলে নিরাপত্তা পরিষদ তাহার অনুসন্ধান করে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে আলাপ আলোচনা, সালিশী, বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদের মীমাংসা করিতে বলে। পরিষদের যদি মনে হয় যে কোন বিবাদ চলিতে থাকিলে আন্তর্জাতিক শান্তিভংগ ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা আছে তাহা হইলে পরিষদ নিজেই মীমাংসার সর্তাদি সম্পর্কে সুপারিশ করিতে পারে। শান্তিভংগ হইয়াছে কি না, অথবা শান্তিভংগের আশংকা আছে কি না, অথবা আক্রমণ করা হইয়াছে কি না এবং শান্তিভংগ হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে—এ-সমস্তই নির্ধারণ করে নিরাপত্তা পরিষদ।

শান্তিভংগের বিরুদ্ধে অবলম্বনীয় ব্যবস্থা: শান্তিভংগ হইলে যে ব্যবস্থা পরিষদ অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইল এইরূপ: সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রকে পরিষদ শান্তিবিপন্নকারী দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলিতে পারে। এই ব্যবস্থা অ-পর্যাপ্ত হইলে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত দেশের বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত বিমান, নৌ এবং স্থলবাহিনী প্রয়োগ করিতে পারে। এই সশস্ত্রবাহিনী পরিষদের সামরিক কর্মচারী কমিটি (Military Staff Committee)

১. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হইতে চীনের জন্য সংবিধান-নির্দিষ্ট স্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছিল জাতীয়তাবাদী বা তাইওয়ানে (ফরমোজা) প্রতিষ্ঠিত চীন. ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয়তাবাদী চীনকে সরাইয়া ঐ স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয় মূল ভূখণ্ডের চীনদেশকে (Mainland China) বা চীনের জনগণের গণতন্ত্রকে (People's Republic of China)।

দ্বারা পরিচালিত হয়। জাতিপুঞ্জের সনদের ৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদকে সামরিক বাহিনী দ্বারা সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে কি পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা হইবে তাহা বিশেষ বিশেষ চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

জাতিসংঘের পরিষদের সহিত তুলনা: ক্ষমতার দিক দিয়া জাতিসংঘের পরিষদের (the Council of the League) তুলনায় জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদকে অধিক শক্তিশালী করিয়া গঠিত করার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। জাতিসংঘ শান্তিভংগকারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিত না; যে-ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত সে-ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মাত্র সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের নিকট সামরিক সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইতে পারিত, কিন্তু এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া বা না-দেওয়া উহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। ইহা ছাড়া সামরিক বাহিনী সংগঠনের কোন পূর্বপ্রস্তুতির ব্যবস্থা ছিল না। জাতিপুঞ্জের সনদে এই সকল দুর্বলতা পরিহার করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষাকল্পে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের হস্তে বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা স্থলবাহিনীর সাহায্যে যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। সামরিক বাহিনীর প্রয়োগ ও সংগঠন যাহাতে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী হইতে পারে তাহার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের একটি সামরিক কর্মচারী কমিটি গঠনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কমিটির মাধ্যমেই আবার কোন্ সদস্য-রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদকে কত সশস্ত্রবাহিনী দিয়া সাহায্য করিবে, সে সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত চুক্তি সম্পাদনের পরিকল্পনা হয়।

সামরিক কর্মচারী কমিটি গঠিত হইলেও সদস্যগণের মধ্যে মতানৈক্যের দরুন নিরাপত্তা পরিষদ উহার প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সাধন—অর্থাৎ শান্তিভংগের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই।

দায়িত্ব ও কার্যসম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য: সকল দিকের পর্যালোচনা করিয়া উক্তি করা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও সফলতার মধ্যে যে-পরিমাণ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহা বোধ হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর কোন সংস্থার বেলায় দেখা যায় না।[১]

সাধারণ সভার প্রাধান্য: নিরাপত্তা পরিষদের এই ব্যর্থতাই হইল জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার (General Assembly) প্রাধান্য লাভ করার কারণ—সদস্য-রাষ্ট্রগুলি এখন শান্তিভংগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সাধারণ সভার উপরই অধিক নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া আত্মপক্ষ সমর্থন ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রগুলি জাতিপুঞ্জের বাহিরে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার (regional organisations) আশ্রয় গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইয়াছে।

---

১. "Of all the organs of the UN none has shown a greater discrepancy between promise and performance than the Security Council." H. G. Nicholas. *The United Nations—As a Political Institution*

ব্যর্থতার কারণ: নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার কারণ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে মনোমালিন্যের আবহাওয়া যতদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত শান্তিরক্ষাকল্পে কার্যকর আন্তর্জাতিক অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। সেদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশগুলির নায়কত্ব করিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাচ্য দেশগুলির অধিকাংশ অনুসরণ করিত সোবিয়েত ইউনিয়নকে। বর্তমানে প্রাচ্য দেশের নায়কত্বের দাবি লইয়া চীন সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয়েরই মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। বস্তুত, নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের আসনটি অধিকার করিয়া বৃহৎ শক্তি হিসাবে চীন 'তৃতীয় বিশ্বে' (Third World) নায়কত্ব লাভের প্রচেষ্টায় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—ফলে নিরাপত্তা পরিষদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ত্রিমুখী—অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের—দ্বন্দ্বক্ষেত্র। অপরদিকে আবার কমিউনিস্ট জগতের নায়কত্ব লইয়া চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়াই আছে। কিন্তু এই অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা যে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইতে বাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা থাকিলেও শান্তিরক্ষার সমস্যার আলোচনার প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসাবে ইহার গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।[১]

ভোটদান-পদ্ধতি: নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যগণের গুরুত্ব অধিক। প্রত্যেক সদস্যের মাত্র একটি করিয়া ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে। পদ্ধতিগত বিষয় (procedural questions) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় ৯ জন সদস্যের সম্মতিসূচক ভোট। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে (on substantive matters) ৯ জন সদস্যের সম্মতিজ্ঞাপক ভোটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু সম্মতিজ্ঞাপক ভোটপ্রদানকারীদের মধ্যে অবশ্যই স্থায়ী সদস্যগণকে থাকিতে হইবে।

ভিটো: সুতরাং দেখা যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে—যেমন, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগসংক্রান্ত প্রস্তাবকে—পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের যে-কোন একটি অসম্মতিজ্ঞাপক ভোটপ্রদানের সাহায্যে বাতিল করিয়া দিতে সমর্থ। স্থায়ী সদস্যদের এই ক্ষমতাই 'ভিটো' (Veto) নামে পরিচিত।

ইহার ফলে কোন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্যের কোনটির সাহায্য পাইলে তাহার বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। ইহার দরুন আবার কোন নবোদ্ভূত রাষ্ট্রের পক্ষে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ

১. "In a world where undeclared and lightning war appears henceforth to be the rule rather than the exception, an agency which can respond at once, however in adequately, is always likely to remain at least a forum of first resort." H. G. Nicholas

করাও কঠিন। বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে বিলম্বের দ্বারা এই সত্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।[১]

উপসংহার : উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে যেন মনে করা হয় না যে নিরাপত্তা পরিষদের কোন গুরুত্ব বা কার্য নাই। অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং নিরস্ত্রীকরণ ('regulation of armaments and possible disarmaments') বিষয়েও নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার সহিত একযোগে ক্ষমতা ভোগ করে। তবে দুঃখের বিষয় যে সামরিক কর্মচারী কমিটির নিকট এই কার্য হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই ফলে ১৯৫২ সালে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন (Disarmament Commission) গঠন করা হয়। এই কমিশনও কোন উল্লেখযোগ্য কার্য করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার দরুন ১৯৭৮ সালে আবার গঠন করা হয় একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন। সাধারণ সভার সদস্যগণই এই কমিশনের সদস্য। ইহার তাৎপর্য: পরিষদের হস্ত হইতে সভার নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর।

ভিটোই কি দুর্বলতার কারণ ?: অনেকের মতে, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির 'ভিটো' (Veto) ক্ষমতাই হইল জাতিপুঞ্জের দুর্বলতার প্রকৃত কারণ এবং ইহার জন্যই সামগ্রিক নিরাপত্তার (Collective Security) ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা যাইতেছে না।[২]

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সামাগ্রক নিরাপত্তার পথে প্রকৃত বাধা 'ভিটো' ক্ষমতা নয়, প্রকৃত বাধা হইল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এত শক্তিশালী যে তাহাদের কোনটির বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াইবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।[৩] অথচ এই যুদ্ধের আশংকা দূর করার জন্যই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পৃথকভাবে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যৌথভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে 'ভিটো' ক্ষমতা কোনপ্রকার বাধার সৃষ্টি করে না। কারণ, জাতিপুঞ্জের সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন আক্রমণ হয় তাহা হইলে যে পর্যন্ত না নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে সে-পর্যন্ত সদস্য-রাষ্ট্রের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার রহিয়াছে। আবার যদি নিরাপত্তা পরিষদ 'ভিটো' প্রয়োগের ফলে কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলেও সদস্য-রাষ্ট্রের এই অধিকার থাকে। আসল কথা হইল, আন্তর্জাতিক শান্তি

১. শতাধিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাইলেও পাকিস্তানের প্ররোচনায় চীনের 'ভিটো'র দরুন বাংলাদেশ প্রথম বার সদস্যপদ লাভে বঞ্চিত হয়।

২. "The veto reduces the powers of the Security Council to a nullity···it is a clause of escape and evasion." J. W. Fulbright : *For a Concert of Free Nations*

৩. "Collective coercion of any of the major powers will result in another world war." Schuman

ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার উপর। 'ভিটো' ব্যবস্থা থাকুক আর নাই থাকুক, এই সহযোগিতার অভাব হইলে বিশ্বশান্তি কোনক্রমেই সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয় বরং 'ভিটো' ব্যবস্থা থাকায় নিরাপত্তা পরিষদের নামে বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হইতে পারে না এবং জাতিপুঞ্জকে হেয় প্রতিপন্ন করা সহজে সম্ভব হয় না। ইহাও বলা যাইতে পারে যে ভিটো ক্ষমতা (veto power থাকায় পরিষদ যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা কার্যকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কারণ সিদ্ধান্তসমূহের পশ্চাতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমর্থন থাকে। অপরদিকে এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় না যাহা জাতিপুঞ্জের পক্ষে বাস্তবে কার্যকর করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।[১]

৩। **আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice):** ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার বিভাগ। এই বিচারালয় ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। জাতিপুঞ্জের সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন। জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারে

নূতন নামকরণ: জাতিসংঘের (League of Nations) অধীন যখন প্রথম আন্তর্জাতিক আদালতটি স্থাপিত হয় তখন উহার নাম ছিল আন্তর্জাতিক ন্যায়-বিচারের চিরস্থায়ী আদালত (Permanent Court of International Justice)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীন নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত (International Cour of Justice)। অধ্যাপক শুম্যানের মতে, ইহার কারণ বোধ হয় যে ন্যায়বিচার কোন আন্তর্জাতিক ব্যাপার নয় এবং ইহার জন্য প্রতিষ্ঠিত আদালতও চিরস্থায়ী হইতে পারে না—ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদপ্রণেতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়াছিলেন[২] যাহা হউক, এই আদালতের এক্তিয়ার ও কার্যাবলী পূর্বতন আন্তর্জাতিক আদালতের মতই

৪। **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council or ECOSOC).** বর্তমানে ইহা সাধারণ পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ৫৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত। প্রতি বৎসর এক-তৃতীয়াংশ করিয়া সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অবশ্য সদস্যসংখ্যা ছিল ১৮ দুই দফায় (১৯৬৫ ও ১৯৭৩) বৃদ্ধি করিয়া সদস্যসংখ্যা ৫৪-এ লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

---

১. "The veto is the safety-valve that prevents the UN from undertaking commitments in the political field which it lacks the power to fulfil." Philip Jessup

২. "The change of nomenclature perhaps suggests, albeit unintentionally, that 'justice' is seldom *international* and that courts among nations are peculiarly *impermanent.*"

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। এই সকল ব্যাপারে পরিষদ অনুসন্ধান চালায় এবং রিপোর্ট প্রদান ও সুপারিশ পেশ করে। যাহাতে মানবাধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে তাহার জন্য পরিষদকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। পরিষদ আবার বিভিন্ন আন্তঃসরকার এজেন্সি বা সংগঠনের সহিত চুক্তি সম্পাদন করে এবং পরামর্শ ও সুপারিশের মাধ্যমে উহাদের কার্যের সমন্বয়সাধন করে।

ঐ পরিষদের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কমিশন ও সংস্থা রহিয়াছে।

এই সকল কমিশন ও সংস্থাসমূহ ব্যতীত রহিয়াছে পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি আন্তঃসরকার এজেন্সি (Inter-governmental Agencies)। এজেন্সিগুলি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন। ইহারা রাজনীতির সহিত সম্পর্কিত নয় এমন সকল আন্তর্জাতিক স্বার্থসাধন করিয়া থাকে। ইহারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হইয়াছে। পরিষদ এই এজেন্সিগুলির কার্যাবলীর সমন্বয়সাধন করিয়া থাকে।

৫। অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council): স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছে। এই তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করে অভিভাবক পরিষদ। এই পরিষদ তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত দেশগুলি, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি এবং সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত আরও কয়েকটি দেশ লইয়া গঠিত।

প্রধান কর্মসচিব: উপরি-উক্ত বিভাগগুলি ছাড়া জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তর আছে। কর্মদপ্তর প্রধান কর্মসচিবের (Secretary-General) তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক এক একবারে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা—সার্থকতার পথে সমস্যা (The Role of UN—Problems faced by the Organisation): সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহার সাফল্য চমকপ্রদ না হইলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিগত ৩২-৩৩ বৎসরে[১] এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার প্রত্যেকটির মধ্যে ছিল পারমাণবিক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা—শুধু জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব ও ভূমিকার দরুনই পৃথিবী এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভে সক্ষম হইয়াছে। এই দাবি মানিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার পরিমাণ উহার সাফল্যকে বহুলাংশে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বলা যায় যে, বিরাট প্রতিশ্রুতি আয়োজনের দরুন জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে যে আশা পোষণ করা হইয়াছিল তাহা মোটেই পূরিত হয় নাই—বিশ্বজনীন পূর্ণ সহযোগিতার কথা দূরে থাকুক, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও জাতিপুঞ্জ বিশেষ সমর্থ হয় নাই। ফলে বিশ্বের

১. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালের '২৪শে অক্টোবর' তারিখে। ২১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তিভংগের আশংকা সকল সময়ই বর্তমান রহিয়াছে এবং কয়েকটি স্থান—বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূরপ্রাচ্য (Middle East and Far East)—শুধু বিঘ্নিত শান্তির নিদর্শন নহে, বিস্ফোরণেরও প্রতীক হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার দেখা যায় যে সকল জাতিই সমরায়োজনক দৃঢ় করিতেই ব্যস্ত—জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বের ন্যায় পুরাদমেই চলিয়াছে। বিমান ছিনতাই এবং অন্যান্য প্রকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের (international terrorism) পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার বিরুদ্ধেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই।

অসাফল্যের কারণ: অনেকে জাতিপুঞ্জের এই যে দুর্বলতা—মূল উদ্দেশ্যসাধনে আংশিক ব্যর্থতা তার দুইটি মৌল কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন: (১) নিরাপত্তা পরিষদের ভোট-পদ্ধতি এবং (২) শান্তিভংগকারীকে শাস্তিপ্রদানের জন্য জাতিপুঞ্জের নিজস্ব শক্তির অভাব।[১] বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের উপর শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার অর্পিত থাকিলেও এই দায়িত্ব কতদূর পালিত হইবে তাহা নির্ভর করে 'ভিটো' ক্ষমতার অধিকারী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির উপর। তাহাদের কেহ 'ভিটো' ব্যবহার করিলে অথবা 'ভিটো' ব্যবহার না করিয়াও পরোক্ষভাবে পরিষদ-অনুসৃত পন্থার বিরোধিতা করিলে অবলম্বিত ব্যবস্থা কোনমতেই কার্যকর হয় না।[২]

ক। ভাবাদর্শের সংগতি ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা: এখন প্রশ্ন, কেন ঐ রাষ্ট্রগুলি 'ভিটো' ব্যবহার করে বা পরোক্ষভাবে পরিষদ-অবলম্বিত ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া থাকে? ইহার উত্তর পাওয়া যায় ভাবাদর্শের সংঘাত ও শক্তি-প্রসারের প্রতিযোগিতার (ideological and power conflicts) মধ্যে। ইহাকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সার্থকতার পথে বাধা—প্রধান সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা যায়। নিম্নে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে জাতিপুঞ্জকে দুই প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। (ক) আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, (খ) চরম অবস্থায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামগ্রিক শক্তি প্রয়োগ। এই দুই কার্য সম্যকভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি-গুলির মধ্যে আবশ্যিকভাবে সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। আশা করা হইয়াছিল যে

---

১. এই প্রসংগে স্মর্তব্য যে, ১৯৫৬ সালে জাতিপুঞ্জ এক জরুরী বাহিনী সংগঠন করে। এই বাহিনী প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য কংগো সাইপ্রাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষায় বেশ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরে অবশ্য সাইপ্রাস ও মধ্যপ্রাচ্যে দারুণ সংঘর্ষ বাধে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষ নানাদিক দিয়া বিশেষ তাৎপর্যমূলক। যাহা হউক, আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষে অস্ত্র-সংবরণের পর শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত হয় জাতিপুঞ্জের শান্তিবাহিনীর (UN Peace-keeping Force) উপর।

২. F. G. Fulbright: *For a Concert of Free Nations*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে গড়িয়া উঠা সহযোগিতা যুদ্ধোত্তরকালেও বজায় থাকিবে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাবাদর্শের সংঘাত, শক্তিপ্রসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরতিবিহীনভাবেই চলিয়াছে—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পর তিন দশকের মত অতিক্রান্ত হইলেও উহাতে ছেদ পড়ে নাই।

এতদিন আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ মোটামুটি দুইটি দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের পুরোভাগে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অপর দলের নেতৃত্ব করিয়া চলিতেছিল সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং জাতিপুঞ্জ উভয় দলেরই স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল।

স্নায়ুযুদ্ধ: ইহার ফলে যে যুদ্ধের আবহাওয়া পৃথিবীকে ঘিরিয়াছিল তাহাকেই সংক্ষেপে স্নায়ুযুদ্ধ (cold war) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।[১] অর্থাৎ, পৃথিবীতে যুদ্ধ না বাধিলেও যুদ্ধের আয়োজন পুরাদমেই চলিতেছিল, যুদ্ধের আবহাওয়াতেই আমরা বাস করিতেছিলাম। ফলে ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে-দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল।

নয়া চীন ও তৃতীয় বিশ্ব: ইহার উপর আছে নয়া চীনের অভ্যুত্থান এবং পরে—১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে—তাইওয়ানের পরিবর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ এবং উহার নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই দশকের অধিককাল অচ্ছুৎ থাকিবার পর ন্যায্য স্বীকৃতি লাভ করিয়া পারমাণবিক শক্তির অধিকারী মোটামুটি তৃতীয় বৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিগণিত (এবং সমগ্র মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশ সমন্বিত) চীন বা নয়া চীন তৃতীয় বিশ্বের (Third World) নায়কত্ব লাভ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং যে-সকল রাষ্ট্র এই তৃতীয় বিশ্বের নীতিতে বিশ্বাসী (The Third Worlders)—অর্থাৎ যাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোবিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে রাজী নয় তাহাদের অনেকে চীনের নায়কত্ব মানিয়া লইতেছে। অপরপক্ষে, একদিকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের কিছুটা কাছাকাছি আসিলেও চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘাত মোটেই প্রশমিত হয় নাই বলা যায়। চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংঘাত হইল কমিউনিস্ট জগতের নেতৃত্ব লইয়া। চীনের মতে, সোবিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদী দেশ (Social Imperialistic Country) এবং একজন সোবিয়েত মুখপাত্রের ভাষায়[২] চীনের রাষ্ট্রনেতারা 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতক' (Social Traitors) ছাড়া আর কিছুই নন।

১. "The tension which developed between Soviet Union and Western Powers in post-war period came to be known as the 'cold war'." G. C. Smith : *Pattern of the Post-War World*

২. জ্যাকব মালিক

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা পরস্পরের কাছাকাছি আসিলেও এবং শেষ পর্যন্ত অনমনীয় মার্কিন নীতির পরিবর্তনের ফলে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করিলেও চীন কিন্তু মার্কিনবিদ্বেষী মনোভাব মোটেই ত্যাগ করে নাই। 'দুষ্ট দুই বৃহৎ শক্তি' (Two Wicked Super-powers)—সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করিয়া তৃতীয় বিশ্বকে জবরদস্ত চীনের আদর্শ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসাবে চীনের ভূমিকা হইতে তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তবে বলা যায়, এ-পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 'সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে পরিচালিত সংগঠন' বলিয়া চীনের যে ঘোষিত দৃষ্টিভংগি ছিল তাহা সামান্য কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। চীনের বর্তমান নীতি হইল এই 'প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনকে' (reactionary organisation) দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ও শোষিত জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করিতে হইবে।

সোবিয়েত ইউনিয়ন. সোবিয়েত ইউনিয়ন জাতিপুঞ্জকে বিশ্বশান্তির মাধ্যম হিসাবে শক্তিশালী করিবার পক্ষপাতী।[১] কারণ, জাতিপুঞ্জ সংগঠনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রভাব ক্রমশ বর্ধমান। কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রভাববিস্তার ও শক্তিপ্রসারের প্রতিযোগিতা লাগিয়াই আছে। আফগানিস্তান হইল এই ব্যাপারে অন্যতম প্রকৃষ্ট সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত।

এইভাবে ভাবাদর্শের সংঘাত ও শক্তি প্রসারের প্রতিযোগিতার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে বৃহৎ শক্তিসমূহের কূটনৈতিক দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

খ। জাতীয়তাবাদ: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আংশিক বিফলতার কারণ *হইল জাতীয়তাবাদ। প্রত্যেকটি নবগঠিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ বিশেষ উগ্র রূপ ধারণ করিয়া সমস্যাকে সংকটে পরিণত করিয়াছে। কারণ, এই সংকট হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাও জাতিপুঞ্জের করায়ত্ত নয়।*

গ। আঞ্চলিক শক্তিজোট: বিশ্বমানব এবং 'এক পৃথিবীর' আদর্শ সার্থক না হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্র রূপ ধারণ করায় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আঞ্চলিক শক্তিজোটের দিকে ঝুঁকিয়াছে—ইহাদের মধ্যে 'ইয়োরোপের অর্থনৈতিক গোষ্ঠী' (EEC) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আঞ্চলিক শক্তিজোটের আর একটি রূপ হইল ধর্মভিত্তিক মিলন। ইহার দরুনই মধ্যপ্রাচ্যে নানারূপ শক্তিজোটের উদ্ভব ঘটিতেছে, এবং তৈলসংকটজনিত কারণে পৃথিবীর অর্থব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ. এখন প্রশ্ন, সমস্যাবহুল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ কি? জাতিপুঞ্জ কি জাতিসংঘের (League of Nations) পথেই চলিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, জাতিপুঞ্জকে ঘিরিয়া হতাশার মেঘ জমিয়া উঠিলেও সম্পূর্ণ

---

১. "The Soviet Union is doing its utmost to promote the role and prestige of the United Nations Organisation." *Soviet Foreign Policy* (Progress Publishers, Moscow, 1967)

নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই—নিয়মিতভাবে আশার আলোকও দেখা যাইতেছে। প্রথমত বলা যায়, জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই তিন দশকের উপর সময় কোরিয়া ভিয়েতনাম ভারত-পাকিস্তান আরব-ইসরায়েল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া বেশ কয়েকবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা দেখা দিলেও ঐ সকল সংঘর্ষ ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধও সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয় নাই। বলা যায়, এই সকল আশংকা কার্যে পরিণত না হওয়ার মূলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সচেতন অবদানই অধিক। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে কিছুটা কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে, তাহাও অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত, এতদিন ধরিয়া চীনকে অযৌক্তিকভাবে জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখিয়া কোরিয়া ভিয়েতনাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমস্যাকে জটিল করিয়া তোলা হইয়াছিল। কিন্তু সদস্যপদ প্রাপ্তির পর চীনের দৃষ্টিভংগি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। চীনের বর্তমান লক্ষ্য যে 'তৃতীয় বিশ্বে'র নেতৃত্ব করা, তাহা সফল করিতে হইলে চীনকে দায়িত্বশীলতার সহিত কার্য করিতে হইবে।

দায়িত্বশীলতার সহিত কার্য করিতে হইলে চীনকে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি'ও (Peaceful Co-existence) বিশ্বাস করিতে হইবে, যে নীতিকে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই সমর্থন জানাইয়াছে।

তৃতীয়ত, 'শিল্প দৈত্য' (industrial giants) জাপান ও পশ্চিম জার্মেনীও যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিশ্বযোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইহাতেও তিনটি বৃহৎ শক্তির প্রভাব বেশ কিছুটা হ্রাস পাইবে। যে-সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নূতন সদস্য হইয়াছে তাহারাও দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করিবে—ইহাও আশা করা যায়।

চতুর্থত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীন অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিমাণও দিন দিন মোটামুটি বৃদ্ধি পাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত এজেন্সি ও কার্যক্রমসমূহ দিন দিন ব্যাপকতর হইতেছে। ইহাও যে সফলতার পথ কিছুটা প্রস্তুত করিবে, সে আশা করা মোটেই অযৌক্তিক নহে। অবশ্য ইউনেস্কো হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাহির হইয়া আসিবার সিদ্ধান্ত এ-ব্যাপারে একটা বড় ধাক্কা দিয়াছে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশার কারণ. তবুও কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার বিশেষ কারণ নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহার যে উপযোগিতা আছে, সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে অভিযোগ আনয়ন করিবার এবং অভিমত জ্ঞাপন করিবার ইহাই যে উপযুক্ত ফোরাম, জোট বাঁধার ইহাই উপযুক্ত মাধ্যম—এই ধারণা সকলেরই আছে। তাই এত বৎসর পরে সদস্যপদ পাইয়া চীন যেন কৃতার্থ, তাই একবার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া আবার আবেদনের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া সদস্যপদ লাভ করিয়াছিল, তাই নবোদ্ভূত বাংলাদেশ সদস্যপদ পাইবার জন্য উদগ্রীব ছিল এবং অবশেষে সদস্যপদ লাভ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হয়। সাধারণ সভায় বিশেষ বিরোধিতা এবং বারবার পরাজয় সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ পরিত্যাগ করে নাই—উহাতে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহার কারণ ঐ একই। সুতরাং এই সচেতন উপলব্ধির জন্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কারণ নাই। জাতিপুঞ্জের পতন ঘটিলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা যে ঘনীভূত হইবে, এ-সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। সুতরাং ইহাও এক আশার কথা।

আশংকার হেতু: অপরদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে 'এক পৃথিবীর স্বপ্ন' সফল করিতে পারে নাই, পৃথিবীকে যুদ্ধের আতংক মুক্ত করিতে পারে নাই—তাহাও সত্য। বরঞ্চ আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যেভাবে প্রসারসাধন করা হইয়াছে তাহাতে আতংক বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ইহার উপর রহিয়াছে নয়া-ঔপনিবেশিকতা, সমরবাদ, অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনকে অন্যতম বৃহৎ শিল্পে পরিণতকরণ, ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরও অস্ত্রসজ্জার ও প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরাম নাই।

এমতে অবস্থায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংরক্ষণের প্রয়োজন হইল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির—বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশগুলির—মধ্যে সদ্ভাব, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোষণের অবসান করিয়া অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করা। উল্লেখ্য যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন উহাদের সংবিধানে সহ-অবস্থানের কথা বলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া থাকে যে উহারাও সহ অবস্থানের নীতি অনুসরণ করিবে। এ ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসৃত হইলে যুদ্ধের আশংকা অনেকটা প্রশমিত হইবে ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। এবং এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ মাত্রকেই সজাগ হইতে হইবে —রাষ্ট্রনায়কদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

উপসংহার: শ্রীঅরবিন্দের মতে, সমগ্র মানবজাতির ঐক্যই হইল মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ।[১] এই আদর্শকে রূপ দিবার প্রচেষ্টা মানুষ সভ্যতার প্রারম্ভকাল হইতেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত ধারণার সহিত এই আদর্শের সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই আদর্শটির উপলব্ধি দূরে রহিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধই (ego sense) এই আন্দোলনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে কার্য করিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইল এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান গড়িয়া তোলা যাহা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ বিকশিত করিয়া উহাকে মানবজাতির সম্মিলিত জীবনের অনুপন্থী করিবে। ইহাকে তিনি মানবজাতির ধর্ম (Religion of Humanity) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২]

---

১. *The Ideal of Human Unity*

২. "Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats, to have new little dreams. It is rather hard work: there is no smooth road into the future: but we go round, or scramble over the obstacles. We've got to live, no matter how many skies have fallen." D. H. Lawrence: *Lady Chatterly's Lover*

বলা যায়, যতদিন আমরা মানবজাতির এই ধর্মকে বরণ করিয়া না লইব ততদিন আমাদিগকে যুদ্ধের আতংকে আতংকিত থাকিতে হইবে—নানাভাবে দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন সত্ত্বেও, বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-সমবায়ের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমানে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেই যে আমরা আছি তাহা সর্ববাদিসম্মত। আশাবাদিগণ বলেন, এই কারণেই আমরা ইহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিব। আলোড়নের ফলে আমরা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছি সত্য কিন্তু ইহাদের মধ্য হইতে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্ন দেখিতে হইবে। এই কার্য অতি কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ অভিমুখে কোন পাকা সড়ক ত নাই। হয় আমাদের ঘুরিয়া যাইতে হইবে, না-হয় বাধাবিপত্তি কোনরকমে অতিক্রম করিতেই হইবে। যতই আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক না কেন, আমাদের বাঁচিতে হইবে।

প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে আমাদিগকেও এক পৃথিবীর স্বপ্ন সফল করিতে হইবে।

স্মর্তব্য জিজ্ঞাসার উত্তর

১ জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল মূলত নিজ সংগঠনগত দুর্বলতার জন্য।

২ এ-ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ আংশিক সফল হইয়াছে মাত্র— যে সফলতা অপেক্ষা বিফলতার পাল্লাই বেশী ভারী।

৩ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ঐক্যমতের অভাব এবং এশীয়-আফ্রিকার দেশগুলি হইতে বহুসংখ্যক সদস্য গ্রহণ হইল সাধারণ সভার সাম্প্রতিক প্রাধান্যের কারণ।

৪ ভিটো-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি হইল যে ইহার দরুনই বৃহৎ শক্তিগুলি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়ে নাই। বিপক্ষে যুক্তি হইল যে ভিটো সামগ্রিক নিরাপত্তার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

৫ বহু পরিমাণ অসাফল্য সত্ত্বেও লোকে জাতিপুঞ্জের উপযোগিতা সম্পর্কে অল্পবিস্তর সচেতন। এবং এখানেই রহিয়াছে জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা।

অনুশীলনী

1. Briefly describe the structure and organisation of the UNO Describe its aims and objectives as set forth in the UN Charter

[সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামো ও সংগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও, এবং সংস্থার সনদে বর্ণিত উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি বর্ণনা কর। (২১৮-১৮, ২২২-২৩, ২২৬-২৭ এবং ২১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

2 Discuss the composition and functions of the General Assembly and the Security Council of the United Nations.

[সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা কর।] (২১৮-২৬ পৃষ্ঠা)

3 Discuss the present weakness of the United Nations What do you think to be its future ?

[সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান দুর্বলতাগুলি আলোচনা কর। জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ?] ([illegible], ২৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

4. Comment on the working of the United Nations indicating its successes and failure

[সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সফলতা ও ব্যর্থতা উল্লেখ করিয়া কার্যকলাপ সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ কর] ([illegible] পৃষ্ঠা)

5 What are the main problems of World peace

[বিশ্বশান্তির প্রধান সমস্যাগুলি কি ?] ([illegible]-৩২ পৃষ্ঠা)

6 Comment on the Veto Power of the permanent members of the Security Council of the UN (C. U 1974)

[illegible] ([illegible] পৃষ্ঠা)

১২ আইন (LAW)

"The law of any given society is the expression of the push of social forces in that society; and we cannot explain its substance or its operation without regard to those forces."
H. J. Laski

সার্বভৌমিকতার পরই আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়, কারণ সার্বভৌমিকতা হইল আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. কিভাবে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়?
২. আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব কি কি?
৩. আইন কি সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ?
৪ স্বাভাবিক আইন সম্পর্কে বর্তমান ধারণা ঠিক কি?
৫. আইনের উৎস কি কি?
৬ আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃত অর্থে আইন?
৭ আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি?
৮ আইন মান্য করা হয় কেন?

আইনের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Law): আইনকে নিয়মকানুন বা বিধি বলিয়া অভিহিত করা হয়। ব্যাপকভাবে দেখিলে এই নিয়মকানুন বা বিধির বিভিন্ন অর্থ করা যায়। প্রাকৃতিক জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে যে-কার্যকারণ সম্পর্ক দেখা যায় তাহাকে বৈজ্ঞানিক বিধি (Scientific Law) বলা হয়। যে-সকল নিয়মকানুন ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নের সহিত জড়িত তাহাদিগকে নৈতিক বিধি (Moral Laws) বলা হয়। আবার দেখা যায়, মানুষের বাহ্যিক আচরণকে (external behaviour) নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সমাজে নানাপ্রকার রীতিনীতি (customs), চিরাচরিত প্রথা (conventions), ফ্যাসন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে। এগুলিকে সামাজিক বিধি বা আইন (Social Laws) বলা হয়। জনমতের চাপে মানুষ এই সকল সামাজিক বিধি মানিয়া চলে, কারণ অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকলের উপহাস বা নিন্দার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। পরিশেষে, মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত যে-সকল নিয়মকানুন থাকে তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় বিধি (Political Laws or Positive Laws) বলা হয়। রাষ্ট্রের বিধি বা আইনের

সংগে সমাজজীবনের অন্যান্য বিধির প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। আইন মান্য না করিলে সার্বভৌম শক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাস্তিপ্রদান করিতে পারে;[১] অন্য কোন প্রকার বিধি অমান্য করিলে ব্যক্তিকে বিবেকের দংশন অথবা সমাজের সমালোচনা অথবা সভ্যপদচ্যুতির শাস্তি সহ্য করিতে হইতে পারে মাত্র। সভ্য সমাজে আইন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিধি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বলবৎ করা হয় না, তাহারা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্টও নহে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একমাত্র রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিধি বা আইন লইয়াই আলোচনা করা হয়।

আইনের প্রকৃতি লইয়া মতবিরোধ. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিধি বা আইনের সংজ্ঞা দিয়াছেন।

অস্টিন [illegible] বিশ্লেষণী আইনজ্ঞগণের (Analytical Jurists) মতে, আইন হইল নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ মাত্র (Law is the command of the political superior, i.e., sovereign, to the political inferior). সার্বভৌমের আদেশ বা আজ্ঞাই আইনের ভিত্তি। অস্টিনের সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচিত হইয়াছে। [illegible] মতে, এই সংজ্ঞা বর্তমান অবস্থার সহিত সংগতিহীন।[২] রাষ্ট্র ও জনসাধারণ আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত [illegible] জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত সাংবিধানিক আইন রহিয়াছে. ইহা ছাড়া প্রায় সকল আইনই জনসাধারণের প্রতিনিধি কর্তৃক রচিত ও প্রযুক্ত হয়। সুতরাং আইনকে জনসাধারণের প্রতি উর্ধ্বতনের আজ্ঞা বলিয়া গণ্য করা ভুল।

স্যর হেনরী মেইন-এর ন্যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকগণও আইনের এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া বর্ণনা করা অযৌক্তিক, কারণ এমন অনেক আইন আছে যাহা সম্পর্কে [illegible], সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কখনও ঘোষিত হয় নাই। এই ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণের মতে জনসাধারণের সম্মতি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উভয়ে মিলিয়াই আইনের সৃষ্টি করে; একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নহে।

ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণের সমালোচনার উত্তরে অস্টিনের অনুগামীরা বলেন যে, প্রথা আপনা হইতেই আইনে পরিণত হয় না; আইনে পরিণত হইবার জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। ইহা অবশ্য সত্য যে, বহুদিন পর্যন্ত প্রথাগত আইনই একমাত্র আইন ছিল এবং আজও আইনের উপর প্রচলিত প্রথার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। জনমত, ধর্ম এবং সাধারণভাবে গ্রাহ্য নৈতিক বিধি আজও আইনকে রূপদান করিয়া থাকে—সম্পূর্ণভাবে জনমতবিরোধী কোন আইন

১. "The last resort of enforcement lies behind law." MacIver

২. The Austinian view of law "does not square with the facts and ideas of contemporary life." Barker

কার্যকর হয় না। তবুও যতক্ষণ-পর্যন্ত না কোন প্রথা বা নৈতিক বিধি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা আইনে পরিণত হয় না। সমাজজীবনে বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য প্রথা প্রচলিত থাকে।* উহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বাছিয়া লইয়া সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের কায। ইহাকেই ব্যাপক অর্থে 'আইন প্রণয়ন' (Law-making) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সার্বভৌম শক্তি তাহাই করে।

সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত ও প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন।

উইলসন: আইনের উপরি-উক্ত প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে রাষ্ট্রপতি উইলসন-প্রদত্ত সংজ্ঞায়। উইলসনের মতে, "আইন হইল মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয়-কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।"[১] অতএব, আইনের উপাদান হইল প্রচলিত আচারব্যবহার। এগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইলে তবেই আইনের মর্যাদালাভ করে। আইন সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহাদের সাহায্যে সাধারণভাবে সকলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহারা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাদের অমান্য করিলে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য বার্কারের মত এমন অনেক লেখক আছেন যাঁহাদের মতে, আইনকে আদর্শ আইন হইতে হইলে উহা মাত্র রাষ্ট্রীয় সংগঠন কর্তৃক স্বীকৃত, ঘোষিত ও প্রযুক্ত হইলেই চলিবে না, উহাকে ন্যায়সম্মত এবং যুক্তিসংগতও হইতে হইবে।

অন্যভাবে বলা যায়, আদর্শ আইন দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত হইবে: (১) বৈধতা (validity), এবং (২) নৈতিক মূল্য (value)।[২]

'বৈধতা' বলিতে বুঝায় যে আইনটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত, ঘোষিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে। অপরপক্ষে 'নৈতিক মূল্যে'র তাৎপর্য হইল, আইনটি ন্যায়বোধের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বলা হয়, সামগ্রিক ও সাধারণভাবে এই দুইটি বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন হয় বলিয়াই আইন কার্যকরভাবে বলবৎ হয়।[৩]

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগি: মার্ক্সবাদীরা আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আইন হইল সেই সকল নিয়মকানুন যাহা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রয়োজন হইলে ঐ নিয়মকানুনকে বলপ্রয়োগের দ্বারা বলবৎ

১. "Law is htat portion of the established thought and habit which has found a distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the governmeet." Woodrow Wilson: *The State*

২. "Ideally law ought to have both validity and value." Barker

৩. "... it is only because law, *as a whole and in its general nature*, possesses both attributes that it actually operates and is actually effective." Barker

করা হয়।[1] এখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও চরিত্র নির্ভর করে সমাজের চরিত্রের উপর। শোষণমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত প্রতিপত্তিশালী শোষক-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত করা। যেমন, দাস-ব্যবস্থায় দাসপ্রভুদের স্বার্থ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুদের স্বার্থ এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আইনকানুনের প্রধান উদ্দেশ্য। শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আইনকানুনের উদ্দেশ্য হইল শ্রমজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনকাযকে সহায়তা করা এবং দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমন করা।

অতএব, আইন শ্রেণী-সম্পর্কের আপেক্ষিক।

আইন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Law): আইনের অর্থ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদের ইংগিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখানে কয়েকটি প্রধান তত্ত্বের বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

ক। বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব (Analytical Theory): এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তাগণের মধ্যে আছেন বোঁদা (Bodin), হবস (Hobbes), বেন্থাম (Bentham), হল্যাণ্ড (Holland), উইলোবি (Willoughby) ও অস্টিন (Austin)। ইঁহারা প্রাকৃতিক আইনের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইঁহাদের মতে, রাষ্ট্রীয় আইনই প্রকৃত আইন। ইহা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ।[2] অস্টিনের মতে, আইন হইল নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ মাত্র (Law is the command of the political superior, i.e. sovereign, to the political inferior)। বোঁদা তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সার্বভৌম শক্তিই হইল চরম আইন প্রণয়নের অধিকারী। বেন্থামের মতানুসারে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় এবং সংখ্যাধিক লোকের কল্যাণ সাধিত হয়। এই আইন রচনা ও বলবৎ করিবে সরকার।

সমালোচনা: বিশ্লেষণমূলক আইনানুগগণের তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হইয়াছে। বার্কার বলেন, অস্টিনের সংজ্ঞা বর্তমান অবস্থার সহিত সংগতিবিহীন।[3] রাষ্ট্র হইল আইনগতভাবে সংগঠিত সংঘ। সাংবিধানিক আইন এবং জনপ্রতিনিধিগণ রচিত সাধারণ আইন অনুসারেই ইহার কার্যপদ্ধতি চলে। সুতরাং আইনকে অধস্তনের প্রতি উর্ধ্বতনের আজ্ঞা বলিয়া মনে করা ভুল। স্যার হেনরী মেইনের ন্যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন লেখকগণের মতে, সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির আদেশ

১. H. J. Laski: *Grammar of Politics*

২. Coker: *Recent Political Thought*

৩. "The Austinian view of law does not square with the facts and ideas of contemporary life." Barker

বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক, কারণ এমন অনেক আইন আছে যাহা সম্পূর্ণ প্রথাগত—সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কখনও প্রণীত হয় নাই। অর্থাৎ, সাধারণের সম্মতি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উভয়ে মিলিয়াই আইনের সৃষ্টি করে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নহে। ইহার উত্তরে অষ্টিনের অনুগামীরা বলেন যে, প্রথা আপনা হইতেই আইনে পরিণত হয় না। অপর দিকে মার্ক্সবাদীদের অভিযোগ হইল, আইন যে শ্রেণীস্বার্থের সহিত সংযুক্ত তাহা বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বে প্রকাশ পায় না।

খ। ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Historical Theory): এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন জার্মানীর স্যাভিনী (Savigny), স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine), মেটল্যাণ্ড (F. W. Maitland), এবং স্যার ফ্রেডরিক পোলক (Sir Frederick Pollock)। ইহারা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাদের মতে, আইন প্রকৃতির নির্দেশ, ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সার্বভৌম শক্তির আদেশ প্রণীত হয় না—আইন দীর্ঘ সমাজ বিবর্তনেরই ফল (result of slow development of society through centuries)।

সুতরাং আইন রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী।

মেইন দেখাইয়াছেন যে কিভাবে রোমক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে আধুনিক আইন গড়িয়া উঠিয়াছে।

ত্রুটি : ঐতিহাসিক তত্ত্বের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হয়, আইন যে রাষ্ট্রের আদেশ তাহা এই তত্ত্বে অপেক্ষাকৃতভাবে উপেক্ষিত। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব কতকটা রক্ষণশীলতাকে সমর্থন জানায়। কারণ, প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করিয়া আইন ও আইন-ব্যবস্থার উন্নয়ন বা সংস্কারসাধনকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখা যায়।

গ। সমাজবিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Sociological Theory): সমাজবিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব কতকটা ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুরূপ। মূল কথা হইল যে আইন সামাজিক শক্তিগুলি (social forces) হইতে উদ্ভূত এবং ইহা সামাজিক প্রয়োজনই (social needs) মিটায়। আইন কোন ব্যক্তিসমষ্টির নির্দেশও নয় অথবা সার্বভৌমশক্তির আদেশও নয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্র কোন আইন সৃষ্টি করে না, সামাজিক প্রয়োজনে উদ্ভূত রীতিনীতিকে আইনের রূপদান করে মাত্র।

সুতরাং আইনের উৎস রাষ্ট্রের গণ্ডির বাহিরে এবং আইন রাষ্ট্রকর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে।[১]

এই সমাজবিজ্ঞানমূলক তত্ত্বের লেখকগণের মধ্যে আছেন দুগুই (Duguit), ক্র্যাব (Krabbe), রস্কো পাউণ্ড (Roscoe Pound), ইত্যাদি।

ত্রুটি : সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় উপর গুরুত্ব আরোপ কিন্তু আইন মান্যকরণে বলপ্রয়োগের ভূমিকা লঘু করিয়া দেখাই তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি। ইহা ছাড়া আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজেই অনেক সামাজিক সংস্কারসাধন করিয়া থাকে।

১. "Law in this sense exists outside of and is of superior validity to the authority of the state itself." Gettell

রস্কো পাউণ্ডের সমালোচনায় ল্যাস্কি বলিয়াছেন, আইনগত সম্পর্ক যে শ্রেণীসম্পর্কের উপর নির্ভরশীল পাউণ্ড তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন।[১]

ঘ। মার্ক্সবাদী তত্ত্ব (Marxist Theory) : মার্ক্সবাদী তত্ত্ব অনুসারে আইন হইল শাসকশ্রেণীর নীতিকে কার্যকর করার এক উপায়। ইহার মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর চিন্তাধারাই প্রতিফলিত হয়। আইন রাজনীতি বহির্ভূত নহে। শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে আইনের মাধ্যমে। শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের প্রতিফলন ঘটানোই আইনের উদ্দেশ্য।[২]

সংজ্ঞা : ল্যাস্কির অনুসরণে আইনের মার্ক্সীয় সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় : আইন হইল মানুষের আচরণ-নিয়ন্ত্রণকারী সেই সকল নিয়মকানুন যাহার মাধ্যমে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা হয় এবং প্রয়োজনমত এই সকল নিয়মকানুনকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দ্বারা বলবৎ করা হয়।[৩]

আইন সমাজের আপেক্ষিক। একদিকে ইহা যেমন সামাজিক অবস্থার প্রকাশ, অপরদিকে ইহা সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক। সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ভর করে সম্পত্তি-ব্যবস্থার (property relations) উপর। আইনের উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধন করা এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক আইন : অতএব, বুর্জোয়া সমাজে আইন বুর্জোয়া-শ্রেণীর ধ্যানধারণা, মতামত ও আদর্শকেই প্রতিফলিত করে।

সমাজতান্ত্রিক আইনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য : সমাজতান্ত্রিক সমাজে আইনের লক্ষ্য ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক আইন বুর্জোয়া মতাদর্শের অবসান ঘটাইয়া সর্বহারাশ্রেণীর শাসন ও মতাদর্শের পথ উন্মুক্ত করে।

বুর্জোয়া চিন্তাধারা আইন সম্পর্কে শ্রেণীগত ধারণাকে অস্বীকার করে। বুর্জোয়া ধারণার বিরোধিতা করিয়া মার্ক্সবাদীরা বলেন, আইন যাহারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সেই শ্রেণীর ইচ্ছা ও ক্ষমতারই প্রকাশ। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহা সামন্তপ্রভু ও ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহা কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া আইনের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন, সমাজতান্ত্রিক আইনের লক্ষ্য কিন্তু উৎপাদনের উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানার প্রসার ঘটানো এবং এই উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম করা।

---

১. Laski : *A Grammar of Politics*

২. "The nature of law is determined by economic relationship *via* the political demands of the dominant class." V. Chkhikvadze : *The State Democracy and Legality in the USSR—Lenin's Ideas Today*

৩. "Law is those rules of behaviour which secure the purposes of the society's class structure and will be, it necessary, enforced by the coercive power of the state." H. J. Laski : *A Grammar of Politics*

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক আইনের অন্যান্য উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসারসাধন, মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটানো এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকাশে সাহায্য করা।

চতুর্থত, সমাজতান্ত্রিক আইন সরকারী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পরিশেষে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আইন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে এই শোষণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটানোই সমাজতান্ত্রিক আইনের লক্ষ্য। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা, সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণ, মুক্তি-আন্দোলনে সহায়তা প্রভৃতি হইল সমাজতান্ত্রিক আইনের কাষ।

আইন কি সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ? (Is Law the Expression of the General Will of the Community ?) : রুশোর অনুসরণ করিয়া অনেক সময় আইনকে 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য নিয়ন্ত্রণ—এই দুই-এর মধ্যে সার্থক সমন্বয়সাধনই ছিল রুশোর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার অনন্যকরণীয় 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে। ইহাতে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, সামাজিক জীবনকে তখনই কাম্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে যখন (১) উহার কার্যাবলী জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয়, এবং (২) ঐ কার্যাবলীর উদ্দেশ্য হয় সাধারণের কল্যাণসাধন।

ইহা হইতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে ব্যক্তিবিশেষ বা কোন শ্রেণীর ইচ্ছাতে আইন প্রণীত হইবে না, আইন প্রণীত হইবে 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) দ্বারা। অতএব, সমগ্র সম্প্রদায়কে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে হইবে—প্রত্যেক নাগরিকেরই আইনের রূপদানে সমভূমিকা থাকিবে। যদি ইহা ঘটে মাত্র তবেই নাগরিক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। কারণ, রুশোর মতে স্বাধীনতা বলিতে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না, বুঝায় রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা—আইন প্রণয়নে অপর সকলের সমান ভূমিকা গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা।[১]

সকলে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিলেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকলে একমত পোষণ না করিতে পারে। এরূপ ঘটিলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতই কার্যকর হইবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে বুঝিতে হইবে যে তাহারা ভুল করিতেছে—তাহারা তাহাদের অপ্রকৃত ইচ্ছা, যাহা সাধারণের কল্যাণের (common good) অনুগামী নহে, দ্বারাই

১. "By liberty Rousseau ... means not freedom *from* political control but freedom *for* political control, freedom to determine course of legislation." Mabbott : *The State and the Citizen*

পরিচালিত হইতেছে। তাহারা যদি নিজ হইতে ইহা বুঝিতে না চায় তবে তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতএব, রুশোর মতে আইনের একটিমাত্র উৎস থাকিতে পারে এবং তাহা হইল সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছা—যে ইচ্ছা সকলের প্রকৃত ইচ্ছার (Real Will) সমন্বয় বলিয়া সকল সময়ই সাধারণের কল্যাণের অনুপন্থী। অন্য যে-কোন সূত্র হইতে উদ্ভূত আদেশ বা নিয়মকে আইন বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা: ল্যাস্কি বলেন, আইনের এই অর্থ গ্রহণ করিলে কল্পনা করিতে হইবে যে, সাধারণের ইচ্ছা সর্বদাই কার্য করিতেছে—জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার অধীন রাষ্ট্র চিরন্তন গণভোট (permanent referendum) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।[১] বস্তুত, এইরূপ চিরন্তন গণভোট দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রকেই রুশো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দিয়াছেন।

সমালোচনা: আইনকে সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া এইভাবে অভিহিত করার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, রুশো তাঁহার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে—যেখানে চিরন্তন গণভোট দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানের বিরাট রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার কল্পনাই করা যাইতে পারে না। সুতরাং আজিকার দিনে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে—যে-ব্যবস্থাকে রুশো কোনমতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই এবং যাহাকে দাসত্বেরই ব্যাপকতর রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।[২] বার্কারের অনুসরণে বলা যায়, যাহাকে সম্প্রদায়ের সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা হয় প্রকৃতি-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। বস্তুত, রুশোর 'সাধারণের ইচ্ছা মতবাদে'র (Theory of General Will) ইহাই প্রধান ত্রুটি, কারণ ইহাকে অবলম্বন করিয়া আদর্শবাদে ন্যায় ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারিতার সমর্থন করা হইয়াছে।[৩]

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আরও বক্তব্য হইল যে, রুশো সাধারণের ইচ্ছাকে সর্বদাই সাধারণের স্বার্থের অনুপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণের ইচ্ছায় প্রণীত সকল আইনই সাধারণের স্বার্থসাধন করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আইন মাত্র শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসাধনই করে। আইনের কাজ হইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি হইবে না-হইবে, তাহা মূলত নির্ধারিত হয় সম্পত্তি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তিশীল শ্রেণী-সম্পর্কের দ্বারা। বলা হয়, শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রে

১. ১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "Representative government is a specious form of slavery." *Social Contract III*, Ch. XV|

৩. ১৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

যে শ্রেণী প্রতিপত্তিশালী তাহাদের স্বার্থেই প্রধানত আইন কার্য করে।[১] যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে আইন প্রধানত মূলধন-মালিকের স্বার্থসাধনই করিয়া থাকে, যদিও শ্রমিকদের তুলনায় মালিকরা সংখ্যায় নগণ্য। সুতরাং রাষ্ট্রের আইনকানুন সাধারণত রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ অর্থ-ব্যবস্থা (economic system) এবং শ্রেণী-সম্পর্কেরই আপেক্ষিক হয়।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয়ের কোনটির দিক দিয়াই আইনকে 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ' (expression of the General Will of the community) বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে না। আদর্শের দিক দিয়া হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিপদের বিশেষ আশংকা রহিয়াছে। ইহাতে আইন ও স্বাধীনতা অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিয়া স্বৈরাচারিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আদর্শবাদে তাহাই করা হইয়াছে।

এক অর্থে গ্রহণযোগ্য : তবে 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছা' কথাটিকে যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়—অর্থাৎ সাধারণের ইচ্ছা (General Will) বলিতে যদি জনমতকে নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে আইনকে ইহার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন সাধারণ ক্ষেত্রে জনমতেরই অনুগামী হয়। যে-আইন জনমতবিরোধী, যে-আইন জনসাধারণের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন। অনেক সময় তর্জনগর্জন গুলিগোলা ইত্যাদিতেও বিশেষ ফল হয় না। শাসনের বেড়াজাল দিন দিন কঠিনতর করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্বলেরও বল আছে, তাহারাও বিশেষ ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আইনের বিরোধিতা করিতে চেষ্টা করে।[২] অতএব, অকাম্য আইন যদি চালু করিতে হয় তবে জনমতকেও প্রয়োজনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই দিক দিয়া গ্রীণ বলিয়াছিলেন যে, সার্বভৌমিকতা চরম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা তখনই মাত্র চরম ক্ষমতারূপে পরিগণিত হয় যখন ইহা সাধারণের ইচ্ছা দ্বারা সমর্থিত হয়।[৩]

স্বাভাবিক আইন (Natural Law) : একদল লেখক আছেন যাঁহারা বলেন, আইন সার্বভৌম শক্তির আদেশও নয়, প্রচলিত আচারব্যবহারও নয়।

ধারণার সংক্ষিপ্তসার : ইঁহাদের মতে, ঐশ্বরিক অনুজ্ঞা কিংবা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতিগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের

---

১. "Law is a form of the expression of the policy of the dominant class. With the aid of law a dominant class gives the requirements of its policy universally obligatory force, the force of law." V. Chkhikvadze

২. "Obedience is the normal habit of mankind, but marginal cases continually occur in history when decision to disobey is painfully taken and passionately defended." Laski

৩. "Sovereignty, he (Green) says, is supreme power, but it is only supreme power when supported by the General Will." Wayper : *Political Thought*

অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই আইন রূপে প্রচলিত থাকে। এই অর্থে আইন রাষ্ট্রের পূর্বতন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উর্ধ্বতন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে এই ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অ্যারিষ্টটল বিশেষ আইন (particular law) এবং বিশ্বজনীন আইনের (universal law) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া শেষোক্ত আইনকে স্বাভাবিক আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ইহা স্বাভাবিক যেহেতু সকল মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায়বোধ রহিয়াছে, ইহা তাহারই প্রকাশ। এ ন্যায়-অন্যায়বোধ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বাভাবিক আইন রাষ্ট্রের পূর্বতন। অ্যারিষ্টটলের পর জেনো (Zeno) এবং রোমক স্টোইক দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বাভাবিক আইন পরিস্ফুটিত হইবার পর ইহা রোমক বিধিশাস্ত্রের (Roman Jurisprudence) অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর মধ্য যুগে আসিয়া স্বাভাবিক আইন প্রকৃত আইনের মর্যাদা পাইবার জন্য নির্দিষ্ট আইনের (positive law) সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এবং এই ব্যাপারে স্বাভাবিক আইন প্রথমেই খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের ও পরে ধর্ম-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদীদের (secular rationalists) সমর্থন লাভ করে। লক বলেন, স্বাভাবিক অধিকারের (Natural Rights) ন্যায় কতকগুলি স্বাভাবিক আইনও আছে এবং স্বাভাবিক অধিকারের ন্যায় ইহারাও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের কোন আইন এই স্বাভাবিক আইনকে অস্বীকার বা উহাকে অপসারিত করিতে পারে না। বার্কারের ভাষায় বলা যায়, এইভাবে নির্দিষ্ট আইন ও স্বাভাবিক আইন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। এইভাবে বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে ধারণা আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বর্তমান ধারণা : বর্তমানে কেহ স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিলেও অনেকে বলেন যে, কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নীতি আছে যেগুলি ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে বলবৎ করা উচিত। স্বাভাবিক আইনের এই সমর্থকগণের মতে, প্রত্যেক ন্যায়বোধ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এই অপরিবর্তনীয়, ন্যায্য ও যুক্তিসংগত নীতিগুলি স্বতঃপ্রকাশিত—তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করার প্রশ্ন উঠে না। কেহ যদি স্বাভাবিক আইনকে গ্রহণ করিতে না পারে—উহার উপযোগিতা উপলব্ধি বা মূল্য অনুধাবন করিতে না পারে, তবে রুশোর অনুসরণে বুঝিতে হইবে যে সে অপ্রকৃত ইচ্ছা (Unreal Will) দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।

সমালোচনা : কোকার বলেন, "বিশ্বজনীনভাবে এই বাধ্যতামূলক স্বাভাবিক আইনের ব্যবহারিক ফল বিভিন্ন রকম দেখা গিয়াছে। যেমন, উহা মধ্য যুগে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা অপরের সিংহাসন অধিকারের পথরোধ করিতে পারে নাই। স্বাভাবিক আইনকে বলবৎ করিবার কোন উপায় নাই—উপায় কোনকালেই ছিল না। স্বাভাবিক সময়ে যখনই নির্দিষ্ট আইনের সহিত স্বাভাবিক আইনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে যে, নির্দিষ্ট আইনই বলবৎ হইয়াছে এবং স্বাভাবিক আইন যতদূর বিরোধ ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবের সময় অবশ্য বিপরীত ঘটিয়াছে,—তখন স্বাভাবিক আইনই কার্যকর হইয়াছে। যথা, আমেরিকার বিদ্রোহ ও ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষের নির্দিষ্ট আইন উপেক্ষা

করিয়া স্বাভাবিক আইনের স্বতঃপ্রকাশিত অনুশাসনগুলিকেই মান্য করা হইয়াছিল। বার্কার বলেন, যে আইন কেবল বিপ্লবের সময় এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসকার্যেই প্রযুক্ত হয় তাহাকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দেওয়া চলিতে পারে না। প্রকৃত আইন সর্বদাই কার্যকর হইবে এবং রাষ্ট্রের সংরক্ষণ করিবে। উপরন্তু, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় নীতি বলিয়াও কিছু নাই। মানুষের ধারণা ও নীতি স্থান কাল ও সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক বলিয়া বিশেষ বিবর্তনশীল। ফলে আইনও বিবর্তনশীল ও স্থানকালের আপেক্ষিক।

প্রকৃতপক্ষে, স্বাভাবিক আইন আদর্শবাদী বা উদ্দেশ্যবাদীর কল্পনা মাত্র। আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা বা লকের মত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানির্দেশের উদ্দেশ্যেই ইহার কল্পনা করা হইয়াছে।[১]

সাধারণভাবে বলা যায়, এই আদর্শ কাজ আজ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই এবং এই উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই।

আইনের উৎস (Sources of Law): আনুষ্ঠানিকভাবে দেখিলে সার্বভৌম শক্তির অনুমোদনকেই একমাত্র আইনের উৎস বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কারণ, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত না-হওয়া পর্যন্ত কোন প্রথা বা রীতিনীতি বা ধর্মীয় অনুশাসন আইন বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে আলোচনা করিলে আইনের বিভিন্ন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত, আইন রাষ্ট্রের মতই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল ও বিভিন্ন উৎস-প্রসূত। হল্যাণ্ডের মতে, নিম্নলিখিতগুলি হইল আইনের প্রধান উৎস :

ক। প্রথা (Custom): প্রথাই আইনের প্রাচীনতম উৎস। আচার-ব্যবহার বহুদিন ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে প্রথায় পরিণত হয়। প্রাচীনকালের আইন সাধারণত প্রথামূলকই ছিল। তৎকালীন সমাজে প্রথার সাহায্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করা হইত। কবে এবং কিভাবে প্রথার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা অবশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে, ইহা নিশ্চিত যে ধর্মের ভয়েই হউক বা অপরকে অনুকরণ করিয়াই হউক বা উপযোগিতার জন্যই হউক তখন লোকে অধিকাংশ প্রথাকে মান্য করিয়া চলিত। রাজনৈতিক অর্থে প্রথাকে আইন বলিয়া গণ্য করা না গেলেও, বর্তমানে প্রথা যে প্রবর্তিত আইনসমূহের অন্যতম প্রধান উৎস সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রচলিত প্রথাকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্র আইনের ইমারতের ভাঙাগড়ার কাজ করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডে প্রথাগত আইন তাহার বর্তমান বিধি-ব্যবস্থায় (legal system) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

---

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে লক চাহিয়াছিলেন ন্যূনতম সংখ্যক আইন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন যে, এই ন্যূনতম আইনও স্বাভাবিক আইনের ভিত্তির উপর রচিত হইবে। Ref. Mabbott: *The State and the Citizen* এবং Andrew Hacker: *Political Theory: Philosophy, Ideology, Science*

খ। **ধর্ম (Religion)**: প্রাচীনকালে প্রথা ছিল আইন এবং আইন ছিল ধর্ম। অর্থাৎ, আইন ও ধর্ম পরস্পরের সহিত এমনভাবে মিশিয়া ছিল যে, কোন্‌টি ধর্মীয় অনুশাসন আর কোন্‌টি আইন তাহা সকল সময় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যাইত না। প্রকৃতপক্ষে, আদিম যুগে সমগ্র জীবনযাত্রার নীতির পশ্চাতে ধর্মের সমর্থন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে ইহাই 'ধর্মশাসন' নামে অভিহিত।[১]

ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আইনের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে ইহা রাজা বা দলপতিকে ঈশ্বর বা পূর্বপুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিয়া তাঁহার নির্দেশকেই আইন বলিয়া মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। উইলসন দেখাইয়াছেন যে প্রথম যুগে রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় সূত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বর্তমানেও হিন্দু ও মুসলমান আইনে ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

গ। **বিচারের রায় (Judicial Decisions)**: গেটেল বলিয়াছেন, "আইন প্রণেতা হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, উদ্ভব হইয়াছিল প্রথার ব্যাখ্যাকর্তা ও প্রয়োগকারী হিসাবে।" আদিম যুগে প্রথা এবং ধর্মীয় নীতির সাহায্যে সহজেই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সমাজজীবনে জটিলতার বৃদ্ধির ফলে প্রথা ও ধর্মের স্থান সংকুচিত হইয়া আসিলে প্রয়োজন হইল নূতন ধরনের বিচার-ব্যবস্থার। দলপতি বা রাজার উপরই বিচারের ভার ন্যস্ত হইল। দলপতি বা রাজা প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইলেন না; ফলে তিনি স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল।

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়। আইন স্থিতিশীল, সমাজ কিন্তু গতিশীল। অতএব, প্রয়োজন হয় আইনকে গতিশীল করিয়া তুলিবার। আইনসভা দ্বারা সকল সময় ইহা সম্ভব হয় না বলিয়া বিচারপতিগণকেই এ-কাজের ভার গ্রহণ করিতে হয়। উপরন্তু, আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে, আইন অস্পষ্টও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের সৃষ্টি করেন।

অতএব, বিখ্যাত মার্কিন বিচারপতি হোমসের (Holmes) ভাষায় বলা যায়, "বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করিয়া যাইবেন।"

ঘ। **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Commentaries)**: বিখ্যাত আইনজ্ঞগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও আইনের আর একটি উৎস। প্রত্যেক সভ্য দেশেই আইন সম্বন্ধে প্রখ্যাত আইনজ্ঞগণের মতামত ব্যবহারজীবী ও বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইন কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র, ইহা অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক হইতে পারে, আবার অনেক সময় সমাজের প্রচলিত

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায় : সামাজিক প্রবন্ধ।

ধারণার সহিত অসংগতও হইতে পারে। কারণ, যে-উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয় তাহা লোকে অনেক সময় ভুলিয়া যায়। আইনানুগগণের টীকা ও আলোচনা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত মর্ম স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা হয়। ইংল্যাণ্ডে ব্ল্যাকস্টোন, কোক প্রভৃতির টীকা ব্রিটেনের আইন-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশেও মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার হিন্দু আইনের পরিবর্তন ও সংস্কারসাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

ঙ। **ন্যায়বিচার (Equity)**. ন্যায়বিচার আইনের আর একটি উৎপত্তিস্থল। বিচারপতির কার্য ন্যায়বিচার করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে অনেক সময় ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না। কোন আইন কিছুদিন প্রবর্তিত থাকিলে পর সমাজের ন্যায়বোধের (idea of justice) সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিজস্ব ন্যায়বোধ অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, নূতন আইনেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

সার হেন্‌রী মেইন বলেন, আইনকে সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কিত রাখিতে হইলে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে সর্বদা আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থাই হইল ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচারের ফলে প্রণীত আইন বিচারপতিগণ কর্তৃক প্রণীত আইনের একটি অংশ।

চ। **আইন প্রণয়ন (Legislation)** : ব্যাপক অর্থে 'আইন প্রণয়ন' বলিতে বুঝায় বিচারপতিগণ বা আইনসভা বা অন্য কোন উপায়ে আইনের সৃষ্টি। সংকীর্ণ অর্থে আইন প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আইনসভা দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে আইন রচনা। বর্তমান যুগে সাধারণত 'আইন প্রণয়ন' কথাটি এই সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণয়ন আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওপেনহাইম (Oppenheim) জনমতকেই আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জনমত ছাড়াও প্রথাগত বিধি, ন্যায়ের নীতি প্রভৃতি আইনসভা দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইয়া বিধিবদ্ধ হইতেছে।

উপসংহার : আইনের উৎস আলোচনার উপসংহার হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আইনের পরিস্ফুটনসংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি উইলসনের মত উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় :

প্রথা আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস হইলেও ধর্ম সমসাময়িক ও প্রায় সমান ফলপ্রসূ উৎপত্তিস্থল। প্রথা ও ধর্মের পরবর্তী উৎস হইল বিচারকের রায় ও ন্যায়বিচার। ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণয়ন এবং আইনানুগগণের আইন সম্বন্ধে

বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বারা আইনের সৃষ্টি সভ্যতা এক বিশেষ স্তরে উন্নীত না-হওয়া পর্যন্ত আইনের উৎসরূপে গণ্য হয় নাই।

আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Laws): রাজনৈতিক আইনের শ্রেণীবিভাগে অনুসৃত বিভিন্ন নীতির মধ্যে 'সম্বন্ধ নীতি'ই প্রধান। 'সম্বন্ধ নীতি' বলিতে বুঝায়, আইন কি কি সম্বন্ধের সমন্বয়সাধন করিতেছে তাহা নির্ধারণ করা। এই নীতি অনুসরণ করিয়া হল্যাণ্ড আইনসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (ক) জাতীয় আইন (Municipal Law), এবং (খ) আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইন বলিতে সেই সকল আইনকেই বুঝায় যাহা মাত্র রাষ্ট্রাভ্যন্তরেই প্রযুক্ত হয়, অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নহে।

জাতীয় আইনকে সরকারী আইন (Public Law) এবং ব্যক্তিগত আইন (Private Law)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সরকারী আইন রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং ব্যক্তিগত আইন নির্ধারণ করে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক। অনেকের মতে, আইন প্রধানত দুই প্রকারের—আন্তর্জাতিক ও জাতীয় (International and National)। জাতীয় আইন আবার দুই অংশে বিভক্ত: শাসনতান্ত্রিক (Constitutional) এবং সাধারণ (Ordinary)। সাধারণ আইন আবার দুই প্রকারের: সরকারী ও ব্যক্তিগত। মোটামুটিভাবে ম্যাকআইভার প্রমুখ লেখককে অনুসরণ করিয়া রাজনৈতিক বিধি বা আইনের এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়:
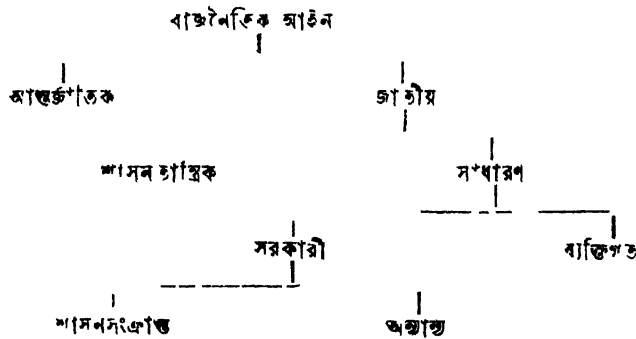
শাসনতান্ত্রিক ও শাসনসংক্রান্ত আইন (Constitutional and Administrative Laws): শাসনতান্ত্রিক আইনকে (Constitutional Law) জাতীয় আইনের মধ্যে মৌলিক বলিয়া গণ্য করা হয়। মৌলিক অর্থে ইহা সকল প্রকার আইনের ঊর্ধ্বে। শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের সংগঠন এবং সরকারের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে। গেটেলের ভাষায়, "ইহা রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম শক্তির অবস্থানক্ষেত্র নির্ণয় করে এবং আইনের উৎসের নির্দেশ করে।"[১] শাসনতান্ত্রিক

১. "In a word, it (Constitutional Law) locates sovereignty within the state and thus indicates the source of all law."

আইন লিখিত ও অলিখিত—উভয়ই হইতে পারে। ইহা গণপরিষদ (Constituent Assembly) দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত হইতে পারে ; আবার ইহা ক্রমবিকাশের ফলও হইতে পারে। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন ক্ষেত্রেই শাসনতান্ত্রিক আইনের সম্পূর্ণটা লিখিত বা অলিখিত হইতে পারে না। শাসনতন্ত্র একবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত হইলেও সময়ের সংগে সংগে ইহার সহিত নানা প্রকার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Constitutional Conventions), বিচারকগণের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ প্রভৃতি জড়িত হইয়া পড়ে। অপরদিকে আবার অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ অংশও গৃহীত হইয়া থাকে।

শাসনসংক্রান্ত আইনের স্বরূপ : 'শাসনসংক্রান্ত আইনে'র (Administrative Law) বিভিন্ন অর্থের মধ্যে যেটি বর্তমান সময়ে শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহা অনুসারে ইহা সেই সকল আইনের সমন্বয়ে গঠিত যাহা শাসনকর্তৃপক্ষের সংগঠন, ক্ষমতা এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে। এই শাসনসংক্রান্ত আইনের উৎস হইল একদিকে যেমন বিধিবদ্ধ আইন এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত—অন্যদিকে তেমনি আবার আইন-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শাসনকর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মকানুন, নির্দেশ এবং শাসন বিভাগীয় আদালতের সিদ্ধান্ত।

আন্তর্জাতিক আইন—ইহার প্রকৃতি (International Law—Its Nature):

যে-সমস্ত নীতির দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারিত হয় সংক্ষেপে সমগ্রভাবে তাহাদিগকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়।

লরেন্সের (T. J. Lawrence) মতে, আন্তর্জাতিক আইন বলিতে সেই সমস্ত বিধিনিয়মকে বুঝায় যাহা সাধারণভাবে সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে।

অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার, অধিকার-সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং অধিকার ভংগ হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করে। মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে বিধিনিয়মের প্রয়োজন আছে, এই উপলব্ধিই অন্যান্য প্রকার আইনের মতই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি। জাতীয় আইনের মত অবশ্য ইহাকে বলবৎ করিবার জন্য কোন চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা নাই। তবুও আন্তর্জাতিক শান্তিশৃংখলা রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত ইহাকে মান্য করিয়াই থাকে।[১]

আন্তর্জাতিক সৌজন্যবিধি : দেখা গেল, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও দায়িত্বের নির্দেশ করে। এইরূপ নির্দেশক আইন ছাড়াও আন্তর্জাতিক

১. "Certainty international law is *not* law in exactly the same sense as is domestic law, yet it certainly plays a significant role in international relations."—Austin Ranney : *The Governing of Men*

ক্ষেত্রে কতকগুলি সৌজন্যবিধি (rules of courtesy) আছে যাহাদিগকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার নির্দিষ্ট চুক্তি না থাকিলেও সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের খাতিরে সাধারণত মান্য করিয়া চলে—যথা, আশ্রয়গ্রহণকারী অভিযুক্ত বা দণ্ডিত অপরাধীকে তাহার নিজ রাষ্ট্রে প্রেরণ (extradition), কূটনৈতিক প্রথাসমূহ পালন, ইত্যাদি। এগুলিকে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রথা হিসাবে গণ্য করা যায়। ইহা ছাড়াও সাম্প্রতিক যুগে উদ্ভূত আর একপ্রকার আন্তর্জাতিক আইন আছে যাহাকে আন্তর্জাতিক শাসনসংক্রান্ত আইন (International Administrative Law) বলা হয়। এই প্রকার আন্তর্জাতিক আইনানুসারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, পুস্তকাদির স্বত্ব সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্যক্তিগত ও সরকারী আন্তর্জাতিক আইন. যাহাকে শুধু আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law) এবং সরকারী আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law)। ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনানুসারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তিগত অধিকারের সহিত সম্পর্কিত নহে—ইহা সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্বের নির্দেশক।

অনেকের মতে, ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে গণ্য করা যায় না। কারণ, সংজ্ঞানুসারে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রগত সম্বন্ধ নির্ধারণ করে মাত্র, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নহে। উপরন্তু, ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক আদালত দ্বারা প্রযুক্ত হয় না, প্রযুক্ত হয় জাতীয় আদালত দ্বারা।

আন্তর্জাতিক আইন কি আইন? (Is International Law Law?). বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারক নীতিসমূহ যাহাদিগকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহারা কি প্রকৃত আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নাই।

বিপক্ষে যুক্তি: বিপক্ষে অভিমত হইল বিশ্লেষণী আইনানুগগণের (Analytical Jurists)। ইহাদের মতে, আইন নিম্নতনের প্রতি সার্বভৌম রাষ্ট্রকর্তৃত্বের নির্দিষ্ট আদেশ মাত্র; ইহাকে অমান্য করিলে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলপ্রয়োগ করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃত আইন উৎস ও বাধ্যতার দিক দিয়া নির্দিষ্ট, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের উৎস নির্দিষ্ট নহে—ইহা কোন সার্বভৌম শক্তির আদেশ হিসাবে প্রচারিত হয় না। ইহাকে বলবৎ করিবারও কোন নির্দিষ্ট শক্তি নাই; যাহাদের উপর প্রযুক্ত হয় তাহাদের সম্মতিই ইহার একমাত্র সমর্থন। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহ অনির্দিষ্ট। কারণ, ইহাদের সম্পর্কে কোন বিশ্বজনীন মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় না। দেখা যায় যে অবস্থা অনুসারে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ সুবিধামত ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এই সকল কারণের জন্য অস্টিন প্রমুখ

বিশ্লেষণী আইনবিদ্ আন্তর্জাতিক আইনকে 'আন্তর্জাতিক নীতিশাস্ত্রে'র (International Ethics) অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী।

অস্টিন-অনুগামী আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের অন্যতম লর্ড সল্সবেরী বলিয়াছেন, "যে অর্থে 'আইন' শব্দটি আমরা সচরাচর বুঝিয়া থাকি সেই অর্থে আন্তর্জাতিক আইনের কোন অস্তিত্বই নাই।"[১]

সপক্ষে যুক্তি: অপরদিকে ওপেনহিম (Oppenheim), মেইন, স্যাভিনি (Savigny) প্রভৃতি আইনবিদের সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। ঐতিহাসিক আইনানুগগণ বলেন, আইনকে সর্বদাই যে নির্দিষ্ট আদেশের রূপ ধারণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং দেখা যায়, আইন প্রধানত প্রথা এবং আচারব্যবহারের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে। তাঁহাদের মতে, আইনের মূলভিত্তি হইল সাধারণের সম্মতি। সাধারণে যদি নৈতিক কারণে উপযোগিতা হেতু কোন নিয়মকে মান্য করিয়া চলে তবে তাহাই আইন। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কল্পনা করা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক। আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত নীতিসমূহ জনমত দ্বারা সমর্থিত এবং নানা কারণে রাষ্ট্রসমূহ উহাদিগকে মান্য করিয়াই চলে। সুতরাং উহাদিগকেও আইন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবিরোধ: দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে আইন কি না, ইহা লইয়া যে মতবিরোধ তাহা আইনের সংজ্ঞা লইয়া মতবিরোধেরই ফল।

আইনকে যদি অস্টিনের অর্থে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া গণ্য করা হয় তবে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। অপরদিকে কিন্তু ঐতিহাসিক আইনানুগের দৃষ্টিতে দেখা হইলে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইনের পর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণেরই পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উপর বিখ্যাত লেখক সুম্যান (Frederick L. Schuman) বলেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে কার্য করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে, ততদিন আইনের নীতির জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান সমষ্টি হিসাবে আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান থাকিবে।" গেটেল বলেন, "আন্তর্জাতিক আইনের যে ত্রুটি তাহা যে কোন প্রকার আইনের প্রথম পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়।"

আন্তর্জাতিক আইনের গঠনকার্য: আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন বলবৎকরণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু এই দিকে গঠনকার্য যে চলিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) বর্তমানে আন্তর্জাতিক

---

১. "International law has not any existence in the sense in which the term law is usually used."

আইনকে সুসংবদ্ধ ও বলবৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রচেষ্টায় ইহা কতকটা সফলকামও হইয়াছে। জাতিসংঘের (The League of Nations) স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারের আদালতও (Permanent Court of International Justice) এই দিকে কিছু কার্য করিয়াছিল। উপরন্তু, জাতীয় আদালতে আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয় এবং জাতীয় আইনের সহিত সংঘর্ষ না বাধিলে সেগুলিকে বলবৎ করিবারই চেষ্টা করা হয়।

উপসংহার—বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান? উপসংহারে বলা যাইতে পারে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন নৈতিক বিধি এবং প্রকৃত আইনের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে।[১] 'আইনের দৃষ্টি'তে দেখিলে আন্তর্জাতিক আইন 'আইন' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ এই দৃষ্টিভংগি অনুসারে আইনের একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। বিশ্বজনীন সার্বভৌমিকতার সন্ধান যখন পাওয়া যায় না তখন আন্তর্জাতিক আইনকে 'আইন' বলিয়া গণ্য করা যায় কিরূপে? এজন্য হল্যাণ্ড (Holland) আন্তর্জাতিক আইনকে 'বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান' ("International Law is the vanishing point of jurisprudence.") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে কিন্তু অস্টিনের মত আন্তর্জাতিক আইনকে শুধু নৈতিক বিধির সমষ্টি বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। যদিও আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন সুসংগঠিত হয় নাই তবুও ইহা আইনের রূপ ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে।

আন্তর্জাতিক আইনের রূপ পরিগ্রহ বলা যায়, বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন নৈতিক বিধির স্তর হইতে প্রকৃত আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে চলিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইনের সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to the Growth of International Law). গতি প্রকৃত আইনের দিকে হইলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের দরুন আন্তর্জাতিক আইন ঠিক সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। ল্যাস্কির মতে, প্রধান প্রতিবন্ধক হইল তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য রাষ্ট্রে শ্রেণী-সম্বন্ধ। এই সকল রাষ্ট্রে যে শ্রেণীর হস্তে উৎপাদনের উপকরণ-সমূহের মালিকানা থাকে তাহাদের স্বার্থেই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়—শ্রেণীস্বার্থে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে প্রয়োজনমত উপেক্ষা করিয়া থাকে।

তত্ত্বের দিক দিয়া, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অনুসরণে বলা যায়, মানুষের যুক্তিহীন শক্তিমত্তা হইল আর একটি প্রতিবন্ধক। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সংগে সংগে ঘটিয়াছে তাহার বুদ্ধিমত্তা বা দূরদর্শিতার হ্রাস। প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তিতে মত্ত হইয়া

---

১. "At present international law is in an uneasy stage between morality and law proper." Lloyd : *Democracy and Its Rivals*

মানুষ আজ সেই শক্তি মানুষের উপরই প্রয়োগ করিতে চাহিতেছে। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের রূপ পরিগ্রহের আশা দিন দিন বিলীন হইয়া যাইতেছে।[১]

বাস্তবের দিক দিয়া অবশ্য দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক আইন সৃষ্টির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন শুভ প্রস্তাবই কার্যকর হয় না—এক বৃহৎ শক্তি উহা সমর্থন করিলে অন্য এক শক্তি ঐ কারণেই উহার বিরোধিতায় অগ্রসর হয়। আবার আঞ্চলিক শক্তিজোট, নির্জোট রাষ্ট্রসমূহের জোটবাঁধার প্রচেষ্টা প্রভৃতির প্রবণতাও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই সকল কারণে যুদ্ধকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা, নিরস্ত্রীকরণ, এমন কি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বিমান-চুরি, বিমান-ধ্বংস, কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নৃশংসভাবে হত্যা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে। এই স্বপ্ন কি সফল হইবে না? আদর্শবাদীর এই প্রশ্নের উত্তরে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন যে, পৃথিবীব্যাপী ধনবৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে পর হইবে—তাহার পূর্বে নহে।

আইন ও নৈতিক বিধি (Law and Morality): আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সহিতও গভীরভাবে সম্পর্কিত (৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা)। রাষ্ট্রের ইচ্ছা যখন আইনের মাধ্যমে রূপগ্রহণ করে, অপরদিকে তেমনি সমাজের নৈতিক বিশ্বাস সূত্রের রূপ ধারণ করিয়া সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্ক এত গভীর যে, প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতেন না। প্রাচীন ভারতে আইন ছিল নৈতিক সূত্রেরই প্রতিফলন এবং রাজা ছিলেন শাস্ত্রীয় দণ্ড বা আইনের পরিচালক এবং 'ধর্মে'র প্রতিভূ মাত্র।[২] বর্তমানে অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং ফলে আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে পার্থক্যও সুনির্দিষ্ট হইয়াছে।

আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে পার্থক্য: প্রথম পার্থক্য হইল বিষয়বস্তু লইয়া। নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের বাহিক আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের আত্মশুদ্ধিই নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আত্মশুদ্ধি ঘটিলে মানুষ চিন্তায় ও আচরণে উন্নত হইবে এবং ফলে সমাজজীবনেও মংগলের পদধ্বনি শুনা যাইবে। এই ধারণার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নৈতিক সূত্র রচিত হয়। অপরদিকে আইন প্রধানত বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে, যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। স্বভাবের বশে চুরি করিলে যে শাস্তি হয়, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া সামান্য খাদ্যদ্রব্য চুরি করিলে তাহা অপেক্ষা লঘুদণ্ডই হয়। উপরন্তু,

১. Bertrand Russell: *Has Man a Future*

২. স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূ স্মৃতঃ।

আইন দ্বারা মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় না, কিন্তু নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায় বলিয়া কোন বাহ্যিক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখা যায়, এরূপ অনেক কার্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া ঘোষিত হয় যাহা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে। মিথ্যা বলাকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না, কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা যতক্ষণ না কাহারও ক্ষতি হয় ততক্ষণ ইহা আইনের এলাকায় আসে না। আইন সাধারণত সামগ্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে, নৈতিক সূত্র ব্যক্তিকে লইয়াও ব্যস্ত থাকে। এজন্য সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া আইন প্রণীত হয়, কিন্তু নৈতিক সূত্র রচিত হয় একমাত্র ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে যাহা বেআইনী তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। রাস্তার কোন বিশেষ দিক দিয়া মোটরগাড়ী চালানো বেআইনী, কিন্তু দুর্নীতিমূলক নহে।

দ্বিতীয়ত, সমর্থনের দিক দিয়াও আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আইনের পশ্চাতে থাকে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সমর্থন। কেহ আইন ভংগ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয়। রাষ্ট্র কিন্তু নৈতিক সূত্রের প্রয়োগ করে না; ফলে নৈতিক বিধি ভংগ করিলে কোনপ্রকার নির্দিষ্ট দৈহিক শাস্তিভোগের সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয়ত, আইন নির্দিষ্ট, নৈতিক সূত্র কিন্তু অনির্দিষ্ট। কোন্‌টি সুনীতি এবং কোন্‌টি দুর্নীতি তাহা সকল সময় নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নৈতিক বিশ্বাস কিছুটা ব্যক্তিগত এবং কিছুটা সামাজিক ব্যাপার। অনেক সময় সমাজের সহিত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তির সহিত সমাজ সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না বলিয়া সুনীতি ও দুর্নীতির মধ্যে সীমারেখা অনেক সময় অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। আইনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না। থাকিলে আইনসভা বা আদালত তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক: আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য দেখানো হইলেও উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আজও বর্তমান আছে—চিরকালই থাকিবে।

আইন ও নৈতিক সূত্র—উভয়ই মানুষের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে বাধ্য। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনেক সময় আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনও আবার অনেক সময় কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। লর্ড আ্যাকটনের মতে ইহাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য।[১] কিন্তু রাষ্ট্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা লোকের উপর চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে আইনকে কার্যকর করা কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগরাজ্যে মদ্যপান-বিরোধী আইন, ভারতে হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোটকথা, আইনের কার্যকারিতা মানুষের

১. ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

নৈতিক বিশ্বাসের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অপরদিকে কিন্তু রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল সর্বদাই নৈতিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পথ চলা। ফলে রাষ্ট্রের আইন কখনই নৈতিক ধারণা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। হইলে ঐরূপ আইন শীঘ্রই বাতিল হইয়া যায়।

আইন মান্য করা হয় কেন? (Why is Law Obeyed?): আইনের স্বরূপ উৎস এবং ইহার পশ্চাতে সমর্থন সম্বন্ধে আলোচনা করার পর সংক্ষেপে আইন মান্য করা হয় কেন, সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে।

দুই প্রকার মতবাদ: প্রধানত আইনের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ আছে: (ক) লোকে শাস্তির ভয়ে বা অরাজকতার আশংকায় আইন মান্য করিয়া থাকে, এবং (খ) আইনের উপযোগিতার উপলব্ধিই আইন মান্য করার হেতু। প্রথম মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে হবস্, বেন্থাম ও অস্টিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থক হিসাবে নামোল্লেখ করিতে পারা যায় রুশো এবং কয়েক ভাববাদী দার্শনিকের (idealist philosophers)।

হবস্-অনুপন্থীদের মতে, কিছু লোক আইন মান্য করে অরাজকতার আশংকায়, আর কিছু লোক শাস্তির ভয়ে। অতএব, আশংকা বা ভয়ই (fear) আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণ। অপরদিকে রুশো-অনুসরণকারীদের মতে, লোকে আইন মান্য করে আইনের উপযোগিতার জন্য—অর্থাৎ আইন যে সাধারণের কল্যাণসাধন করে তাহা উপলব্ধি করে বলিয়া।

সমন্বয়: এই দুই মতের সমন্বয়সাধন করিয়া স্যার হেন্‌রী মেইন প্রভৃতি ঐতিহাসিক আইনানুগ বলিয়াছেন, মানুষ দণ্ডের ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি উভয় কারণেই আইন মান্য করিয়া থাকে।

আইন মান্য করার পঞ্চবিধ কারণ: লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর মতে, আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণ আরও জটিল ও বিবিধ কারণ-গুলিকে মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) নির্লিপ্ততা (Indolence), (২) শ্রদ্ধাভক্তি (Deference), (৩) সহানুভূতি (Sympathy), (৪) দণ্ডভয় (Fear) এবং (৫) উপযোগিতার উপলব্ধি (Reason)।

নির্লিপ্ততা বলিতে বুঝায় যে, সাধারণে রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চাহে না—কোন আইন প্রণীত ও বলবৎ করা হইলে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়াই তাহাকে মান্য করিয়া চলে। শ্রদ্ধাভক্তি বলিতে বুঝায় যে, রাষ্ট্রনায়ক বা জননেতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিবশত লোকে আইন মান্য করিয়া থাকে। সহানুভূতি হইল সাধারণ আচরণের প্রতি সহানুভূতিবশত কোন কার্য করা। অধিকাংশ লোকে যখন কোন বিশেষ আইনকে মান্য করে, তখন তাহাদের অনুবর্তী হইয়া ইহাকে মান্য করাই উচিত—এইরূপ মনোভাবকেই সহানুভূতি বলে।

অনুকরণপ্রিয়তা : নিলিপ্ততা, শ্রদ্ধাভক্তি ও সহানুভূতিকে একযোগে অনুকরণ (imitation) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মানুষ অনুকরণপ্রিয় বলিয়াই আইন মান্য করিয়া থাকে।

ব্রাইসের মতে, অনুকরণপ্রিয়তার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন মান্য করা হইয়া থাকে।

দণ্ডভয় : সকলে না হউক, অনেকে যে দণ্ডের ভয়ে আইন মান্য করিয়া থাকে ইহাও সত্য। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি থাকে যাহারা সর্বদাই সামাজিক বিধিনিয়মের বিরুদ্ধে কার্য করিতে চায়। ইহাদের জন্য প্রয়োজন হয় বলপ্রয়োগের। তবে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে সর্বশেষে। কারণ, শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা আইন বলবৎ করা যায় না। এই কারণেই রুশো মন্তব্য করিয়াছেন : "শক্তিশালী সর্বাবস্থায় প্রভুত্ব করিতে পারে না। সুতরাং শক্তিকে অধিকারে পরিণত করিতে হইবে এবং আনুগত্যকে কর্তব্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে।"[১]

এই প্রসংগে গ্রীণের বিখ্যাত উক্তি যে 'জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশব বল নহে—' (Will, not force, is the basis of the State.) তাহাও স্মরণ করা যাইতে পারে।

উপযোগিতার উপলব্ধি : উপযোগিতার উপলব্ধি হইতে যে আইন মান্য করা হয় ইহাও বর্তমানে মাত্র কতকাংশে সত্য। সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের প্রসারের সংগে সংগেই এই উপলব্ধি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং যে দেশ যত উন্নত, যে দেশের অধিবাসী যত বেশী শিক্ষিত সেই দেশে লোকে উপযোগিতার কারণেই আইনের প্রতি তত বেশী শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকে।

কেন এবং কোন্ অবস্থায় আইন মান্য করা উচিত ? : লোকে আইন মান্য করে কেন, এই প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি প্রশ্ন হইল, কোন্ অবস্থায় এবং কেন লোকের পক্ষে আইন মান্য করা উচিত ? বিভিন্ন লেখক এ-সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বার্জেসের মতে দুইটি কারণে লোকের পক্ষে আইন মান্য করার বাধ্যবাধকতা থাকে : (ক) বৈধ অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ হইতে আইনের উৎপত্তি হয় বলিয়া আমাদের পক্ষে আইন মান্য করিয়া চলার বাধ্যবাধকতা থাকে। (খ) আইন আমাদের ধ্যানধারণা ও আদর্শকে সার্থক করিয়া তুলে বলিয়া উহাকে মান্য করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া ধরা হয়।[২] এই দুইটি যুক্তির মধ্যেই ত্রুটি রহিয়াছে। আইন করার অধিকার আছে বলিয়াই যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সকল আইনকে মানিতে হইবে, এ-যুক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। কারণ, রাষ্ট্রের আইনের সংগে আমাদের অন্যান্য কর্তব্যের বিরোধ বাধিতে পারে। যেমন, কোন নির্দিষ্ট আইন

১. "The strongest is never strong enough to be always master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty." Rousseau

২. *J. W. Barges : Sanctity of Law*

বিবেকসম্মত নয় বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে। এ-অবস্থায় বিবেকের অনুশাসন, না রাষ্ট্রের আইন মান্য করা হইবে? আবার অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট আইনের গুণাগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়—নির্দিষ্ট আইন আমাদের ধ্যানধারণা ও মূল্যমানের অনুপন্থী না পরিপন্থী, সে-সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, লোকে সংশ্লিষ্ট আইনকে স্বীকার করিয়া লয় এবং মান্য করিয়া চলে। এই প্রসংগে অধ্যাপক ল্যাস্কির অভিমতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে, আইন কার্যকর হয় বলিয়াই যে উহা যুক্তিযুক্ত অথবা লোকের পক্ষে উহাকে মান্য করিয়া চলা উচিত, এমন কোন কথা নাই। আইনের প্রতি লোকের আনুগত্য রাষ্ট্র তখনই দাবি করিতে পারে যখন আইন নিরপেক্ষভাবে সকলের স্বার্থের অনুকূল হয় এবং সকলের স্বার্থ সাধিত হইতেছে কি না, তাহা বিচার করার অধিকার একমাত্র নাগরিকদেরই আছে।[১]

স্মর্তব্য - জিজ্ঞাসার উত্তর .

১. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে আইনের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়: "মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং সমর্থিতও হয় তাহাকেই বলা হয় আইন।"

২. আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব হইল: (ক) বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব, (খ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব, (গ) সমাজবিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব, এবং (ঘ) মার্ক্সবাদ।

৩ জনমতকে 'সাধারণের ইচ্ছা' বলিয়া গ্রহণ করিলে তবেই আইনকে সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

৪ স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা হইল যে, ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ কতকগুলি নীতি আছে সেগুলিকে বলবৎ করা উচিত।

৫. আইনের উৎস হইল: (ক) প্রথা, (খ) ধর্ম, (গ) বিচারের রায়, (ঘ) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, এবং (ঙ আনুষ্ঠানিকভাবে আইন-প্রণয়ন।

৬. বর্তমানে বিশ্ব-জনমত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিশ্বজনীন নৈতিক বিধি-সমূহকেই আন্তর্জাতিক আইন বলা যাইতে পারে।

৭. আইনও নৈতিক বিধি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

৮. আইন মান্য করা হয় পাঁচটি কারণে: (ক) নির্লিপ্ততা, (খ) শ্রদ্ধাভক্তি, (গ) সহানুভূতি, (ঘ) দণ্ডভয়, এবং (ঙ) উপযোগিতার উপলব্ধির দরুন।

অনুশীলনী

1. Define Law. Discuss the nature and sanction of Law.

(আইনের সংজ্ঞা লিখ। আইনের প্রকৃতি ও অনুমোদন সম্পর্কে আলোচনা কর।)

(২৩৫-৩৭, ২৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)

১. Law has 'no claim to obedience merely because it is effective. Its claim to obedience depends upon what it does to the lives of individual citizens. Of this they alone can judge.' H. J. Laski

2. Discuss the nature and importance of Law and point out the sources of law with their relative importance.

['আইন'-এর প্রকৃতি ও গুরুত্বের পর্যালোচনা করিয়া আইনের উৎস এবং উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ কর।] (২০৫-৩৭, ২৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা

3. Is it enough to say that Law is the command of the sovereign?

[আইনকে সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া অভিহিত করাই কি যথেষ্ট ?] (২৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

4. Define Law, and point out the distinction and relation between Law and Morality.

[আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য উভয়ই নির্দেশ কর।] (২৩৫-৩৭, ২৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

5. Can International Law be regarded as law in the strict sense of the term? Give reasons.

[আন্তর্জাতিক আইনকে কি প্রকৃত অর্থে আইন বলিয়া গণ্য করা যায় ? যুক্তি প্রদর্শন কর।] (২৪৯-৫১ পৃষ্ঠা)

6. Write notes on . (*a*) **Natural Laws**, (b) **International Laws.**

[টীকা রচনা কর : (ক) স্বাভাবিক আইন, (খ) আন্তর্জাতিক আইন।] (২৪১-৪৫, ২৪৯-৫১ পৃষ্ঠা)

7. Explain the Marxist Theory of Law.

আইনের মার্ক্সবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর।] (২৩৮-৩৯, ২৪০-৪১ পৃষ্ঠা)

১৩ | অধিকার—স্বরূপ
(RIGHTS—NATURE)

Rights "are based on human needs and possibilities and the recognition by members of a society of the conditions necessary in order that they may fulfil their ends." John Lewis

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. বর্তমানে অধিকার বলিতে কি বুঝায়? এবং অধিকারের তাৎপর্য কি?

২. 'স্বাভাবিক অধিকার'কে কোন অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে?

৩. অধিকার সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী ধারণার মূল বক্তব্য কি?

৪. কিভাবে অধিকার দিন দিন সম্প্রসারিত হইতেছে?

৫. কোন্ সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হয়?

৬. কিভাবে অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত?

আঠার শতকের বৈপ্লবিক যুগেই অধিকার সম্বন্ধে ধারণা ইতিহাসের পাতায় জ্বলন্ত হইয়া উঠে। 'মানুষের অধিকারের' (Rights of Man) ধ্বনিতে ঐ শতকের শেষার্ধে ইয়োরোপ ও নূতন মহাদেশ আমেরিকা কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু কর্তব্য যে ধারণাটি পরিস্ফুট হয় ইহার অনেক পরে—এই আধুনিক যুগে।

অধিকারের অর্থ ও স্বরূপ (Meaning and Nature of Rights): মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই অধিকারের প্রশ্ন উঠে। সমাজ-বহির্ভূত মানুষের অধিকার বলিতে কিছুই নাই। আইনানুগের নিকট *অধিকার হইল রাষ্ট্র-কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি। সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি* কাহার উপর দাবি স্বীকার করিয়া লইয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে? সুতরাং অধিকার সম্বন্ধে ধারণা সামাজিক। এই কারণেই গ্রীণ বলিয়াছেন যে, একমাত্র সমাজের সভ্য হিসাবেই মানুষ তাহার অধিকার লাভ করে এবং সমাজবিবর্তনের সংগে সংগে অধিকারও বিস্তৃতিলাভ করে।

ক। **আইনানুগের দৃষ্টিতে অধিকার:** বর্তমানে সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রই আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

সুতরাং আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে অধিকারের এই আইনগত ধারণাই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আইনগত ধারণা রাষ্ট্রদর্শনের (Political Philosophy) পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না, কারণ রাষ্ট্রদর্শনে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্নও উঠে। আবার রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অধিকার সম্বন্ধে শুধু আইনগত ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষেও যথেষ্ট হইতে পারে না। আইনগত ধারণা অনুসারে বলা যায়

যে, কোন বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকার কি কি—কিন্তু বলা যায় না যে, রাষ্ট্রে কোন্ কোন্ অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত।

খ। রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিতে অধিকার : রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সকল সময় সুন্দর জীবন গঠনের সহায়ক হইবে। বলা যায়, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চায় তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় কতকগুলি সামাজিক অবস্থার (conditions)। রাষ্ট্রদর্শনে এই প্রয়োজনীয় সামাজিক অবস্থাগুলিকেই অধিকার আখ্যা দেওয়া হয় এবং ইহাদের উপলব্ধিই সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

ল্যাস্কি-প্রদত্ত সংজ্ঞা : রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে অধ্যাপক ল্যাস্কি অধিকারের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন "অধিকার হইল সমাজজীবনের সেই সকল অবস্থা যাহা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে মানুষ তাহার পূর্ণ ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সচেষ্ট হইতে পারে না" Rights ... are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best)।

অধিকার ও সামাজিক ন্যায় : রাষ্ট্রদর্শনে যাহাদিগকে 'সামাজিক অবস্থা' বলা হয় ব্যক্তিগত দিক হইতে তাহাদিগকে 'সুযোগসুবিধা' (opportunities)—ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সুযোগসুবিধা বলা যাইতে পারে। এই সকল সুযোগসুবিধা সকলেরই ব্যক্তিত্বস্ফুরণের উপযোগী হইবে—কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের নয়। সুতরাং অধিকার হইবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত—উভয় প্রকার কল্যাণের সহায়ক। ইহাই হইল সামাজিক ন্যায়ের (social justice) নীতি। উভয় প্রকার কল্যাণের সহায়ক না হইলে কোন অবস্থা বা সুযোগসুবিধা আইনের চক্ষে অধিকার বলিয়া গণ্য হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'অধিকার' পদবাচ্য হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন রাষ্ট্রে দাসত্বপ্রথা আইনানুমোদিত হইলে আইনের দৃষ্টিতে ক্রীতদাস পোষণের অধিকার বর্তমান থাকে, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী হওয়ায় ইহা রাষ্ট্রদর্শনে এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না।

পূর্ণ অর্থে অধিকার সকল সময়েই সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক হইবে। এই কারণেই গ্রীণ বলিয়াছেন যে, সমষ্টিগত নৈতিক কল্যাণ সম্বন্ধে চেতনা ব্যতীত অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।[১]

অপরদিকে আবার আইনানুমোদিত না-হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির এবং সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন অবস্থাকে পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া গণ্য করা

১. "Without a society conscious of common moral interests, there can be no rights." Green

চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ক্রীতদাসগণের মুক্তি তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু রাষ্ট্রের আইন ইহাকে সমর্থন না-করা পর্যন্ত ইহা ক্রীতদাসগণের 'অধিকারে' পরিণত হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রকৃত পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য কোন দাবি বা সুযোগসুবিধা দুই প্রকার গুণসম্পন্ন হইবে—ইহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে : ১) ইহা প্রত্যেকের (সুতরাং সমষ্টির) ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সহায়ক হইবে এবং (২) ইহা আইনানুমোদিত হইবে।

কতক পরিমাণে অধিকার : বার্কারের মতে, এই দুইটি সর্তের একটি পূরণ করিলে সেই প্রকার সুযোগসুবিধাকে 'কতক পরিমাণে অধিকার' (Quasi-Right) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যেমন, ক্রীতদাসগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার হইল 'কতক পরিমাণে অধিকার', কারণ উহা ব্যক্তি ও সমষ্টি কল্যাণের অনুপন্থী হইলেও আইনানুমোদিত নয়। অপরদিকে আবার মূক-বধিরের বিবাহের অধিকারও 'কতক পরিমাণে অধিকার', কারণ উহা আইনানুমোদিত হইলেও সমাজ-কল্যাণের সহায়ক নয়।

পূর্ণ অর্থে অধিকারের সংজ্ঞা উপরি-উক্ত পূর্ণ অর্থে অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় : অধিকার হইল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির (সুতরাং সমষ্টির) অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের উপযোগী সকল সুযোগসুবিধা। আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে অধিকারকে এইভাবেই দেখিতে হয়।

ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য সব সময় অধিকারকে এই দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ফলে দেখা যায় যে, অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের উপযোগী সকল প্রকার সুযোগকে রাষ্ট্র স্বীকার করে নাই—অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সকল অধিকার সমষ্টিগত কল্যাণের উপযোগী নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বলিতে হইবে যে, ব্যবহারিক জীবনের রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র নয়, উহা জাতীয় সমাজের (National Society) প্রতিভূ নয়।

আদর্শ রাষ্ট্র পূর্ণ অর্থে সকল অধিকারকেই স্বীকার করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে এবং সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক নয় এরূপ কোন দাবিকেই আইনানুমোদিত অধিকারের মর্যাদা দিবে না। হবসের অভিমত যে অধিকার ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা, তাহা ভুল। অধিকার ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা নহে—অধিকার অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের সুযোগ কোন বিশেষ রাষ্ট্র অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা কতটা পরিমাণে এই অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশে সহায়তা করে তাহাই উৎকর্ষের মানদণ্ড।

অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Rights) :

অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে প্রথমেই আসে স্বাভাবিক অধিকার।

ক। স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights) : এক শ্রেণীর লেখকের মতে, মানুষের অধিকার নৈসর্গিক, সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ। ইহারা স্থান, কাল

বা সামাজিক অবস্থার অপেক্ষা রাখে না। ইহাদের সংগে লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। চলনশক্তি বা দেহের বর্ণ যেরূপ মানুষের প্রকৃতির অংশ, এই অধিকারগুলিও সেইরূপ মানুষের অংগীভূত। এই স্বাভাবিক ও অপরিত্যাজ্য অধিকার ঠিক কোনগুলি সে-সম্বন্ধে বিশেষ মতবিরোধ দেখা যায়।

তিনটি মৌল অধিকার : তবে মোটামুটি তিনটি অধিকারকে মৌলিক বলিয়া ধরা হয় : (ক) জীবনের অধিকার, (খ) স্বাধীনতার অধিকার এবং (গ) সুখসন্ধানের (pursuit of happiness) অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে ধারণা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিলেও ইহা চুক্তিবাদী হবস্, লক ও ও রুশোর হস্তেই বর্তমান রূপ ধারণা করে। ইহাদের মধ্যে আবার লক ও রুশোর রচনাতেই এই ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লকের মতে, মানুষ স্বাভাবিক আইন (Natural Law) প্রদত্ত কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। চুক্তি সম্পাদন করিয়া আদিম মনুষ্যসকল এই স্বাভাবিক অধিকারের কিয়দংশ রাষ্ট্রকে (Commonwealth) সমর্পণ করিয়াছিল অবশিষ্টাংশকে সংরক্ষিত করিবার জন্য।[১] সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরও স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, বরং স্বাভাবিক অধিকার-সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থায় স্বাভাবিক অধিকারের সংরক্ষণ করিত স্বাভাবিক আইন, এখন উহা করিবে রাষ্ট্রের আইন। রুশোর মতবাদে স্বাভাবিক অধিকার সাধারণের ইচ্ছার (General Will) অংগীভূত হইল এবং সাধারণের ইচ্ছাই হইয়া দাঁড়াইল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ের সংরক্ষক। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণের ইচ্ছার অংগীভূত বলিয়া ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই রহিল।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অধিকার : কার্যক্ষেত্রে স্বাভাবিক অধিকারের এই ধারণার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণায়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, মানুষ কতিপয় অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণায় হইয়াছিল, মানুষের স্বাভাবিক সমানাধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, আঠার শতকে স্বাভাবিক অধিকার সামন্ততন্ত্র ও ঐশ্বরিক অধিকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রগতিমূলক কাজই করিয়াছিল

১. "He has given a right to the Commonwealth to employ his force for the execution of the judgements of the Commonwealth." Locke: *Second Treatise.* অনেকের মতে, অবশ্য এই অধিকার প্রদান বলিতে কোন স্বাভাবিক অধিকার পরিত্যাগ (abdication) বুঝায় না। ইহা রাষ্ট্রকে প্রয়োজনবোধে তাহার (নাগরিকের) শক্তিসামর্থ্য ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান মাত্র। বস্তুত স্বাভাবিক অধিকার অপরিত্যাজ্য বলিয়া উহা পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করা যায় না।···Andrew Hacker: *Political Theory*: *Philosophy, Ideology, Science*

পরবর্তী সময়ে কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণায় ত্রুটি প্রকট হইয়া পড়ে।

আধুনিক দৃষ্টিভংগি: বর্তমান যুগে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অধিকারের তুলনায় সামাজিক বা অর্থনৈতিক অধিকারের (Social or Economic Rights) উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সাম্প্রতিক যুগে সমাজবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক অধিকারের এক নূতন অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থে স্বাভাবিক অধিকার সহজাত, চিরন্তন বা অপরিত্যাজ্য নহে—ইহা সামাজিক নীতির সম্পূর্ণ সহায়ক ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধা মাত্র। একমাত্র সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই এই প্রকার অধিকারের কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং ইহা প্রযুক্ত হয় স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র (natural selection) দ্বারা। গিডিংসের ভাষায় বলা যায়, "সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকারই স্বাভাবিক অধিকার।[১] অন্য সকল প্রকার অধিকার অস্বাভাবিক।

সমালোচনা: স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদের প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে 'স্বাভাবিক' শব্দটির বিভিন্ন অর্থের জন্য স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে ধারণা কোনক্রমেই সর্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে একবার ছয় মাস ধরিয়া সংবাদপত্রে জনমতের (correspondence column) বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছিল যে লোকে কোন্‌গুলিকে স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া মনে করে। দেখা গিয়াছিল, ন্যায্য মজুরি, জুরির সাহায্যে বিচার প্রভৃতি হইতে রাত্রি ৮টার পর সিগারেট ক্রয়ের অধিকার, রাজপথে তাঁবু ফেলিবার অধিকার প্রভৃতি সকলই স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। অতএব, সর্ববাদিসম্মত অধিকারের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, চুক্তি মতবাদী দার্শনিকগণ-কল্পিত সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ অধিকার বলিয়া কিছুই নাই। মানুষের অধিকার সমাজ হইতে উদ্ভূত এবং সামাজিক সম্পর্কেরই (social relations) নির্দেশক। সমাজ-বহির্ভূত কোন অধিকারের ধারণাই করা যায় না।[২] স্থাবর ও অস্থাবর দ্রব্যাদির ভোগদখল (possession) সমাজের মধ্যেই 'সম্পত্তির অধিকারে' পরিণত হয়।[৩] অধিকার আত্মবিকাশের পথ বলিয়া

১. Natural rights are "socially necessary forms of right, enforced by natural selection in the sphere of social relations."

২. 'Rights and duties define social relations. Thus there are no 'natural rights' in the sense of pre-social rights, or rights of man in a state of nature." Morris Ginsberg: *On Justice in Society*

৩. "It is only in a social setting that mere possessions become property." Mabbot: *The State and the Citizen*

আদিম যুগ হইতে মানুষ সংগঠিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সে নিজেকে বিকশিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সমাজ আবার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে এবং সমাজসঞ্জাত অধিকারও অনুরূপভাবে রূপান্তরিত হইতেছে। সুতরাং শাশ্বত ও সহজাত অধিকার বলিয়া কিছুই নাই। অধিকার সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একসময় ক্রীতদাস পোষণের অধিকার ছিল, কিন্তু আজ তাহা বিলুপ্ত।

সুতরাং অধিকার সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক।

তৃতীয়ত, স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের অজুহাতে অনেক সময় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির মতে, আত্মকেন্দ্রিক কার্যাদি (self-regarding actions)—অর্থাৎ যে-কার্যের ফলাফল শুধু ব্যক্তিকেই স্পর্শ করে তাহা অনুসরণ করিবার অধিকার মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে উহাতে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। রাষ্ট্র কেবল যে-কার্যের ফলাফল অপরকেও স্পর্শ করে—অর্থাৎ পরকেন্দ্রিক কার্যাদিই (other-regarding actions) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু কতকগুলি এমন আত্মকেন্দ্রিক কার্য আছে যাহাদের ফলাফল সমাজ নিরপেক্ষ নহে—যেমন মদ্যপান। ইহাতে ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে সমাজেরও ক্ষতি হয়। অতএব, এই আত্মকেন্দ্রিক কার্যকে স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

পরিশেষে, স্বাভাবিক অধিকার স্বাভাবিক আইন অথবা রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কোন কিছুর দ্বারাই সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণের অর্থ হইল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রকে যদি আমার সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ করিতে হয়, তবে করধার্য ইত্যাদির মাধ্যমে উহা ঐ অধিকারকে অন্তত আংশিকভাবে আক্রমণ করিবেই। আমরা যদি বাক্-স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর রাখি, তবে রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে যেন অপরে চীৎকার করিয়া আমার মুখ বন্ধ না করে। ফলে নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত হইবেই—তাহাদের তারস্বরে চীৎকারের অধিকার থাকিবে না।

এই সকল কারণের জন্য স্বাভাবিক অধিকার বলিতে সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ অধিকার না বুঝিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির উপযোগী সামাজিক অবস্থাসমূহকেই বুঝা উচিত। এই অর্থে স্বাভাবিক অধিকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে।[১] যে অধিকার ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করে তাহাই ত স্বাভাবিক। ইহা আইনানুমোদিত না হইলেও আদর্শের মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে ইহাকেই স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সমাজবিজ্ঞানগত ধারণা: এই দিক দিয়া সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা কতকটা সমর্থনযোগ্য। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ উন্নয়নের সহায়ক ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধাকেই

১. "... there are natural rights in the sense of rationally justifiable rights." Morris Ginsberg

স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং ইহা স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত হয় বলিয়াও প্রচার করিয়াছেন। সমাজ উন্নয়নের সহায়ক সুযোগসুবিধাকেই স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি নাই; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত হয় মনে করিলে ভুল করা হইবে। স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কর্তব্য। কোন বিশেষ রাষ্ট্র এই কর্তব্য কতটা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে তাহাই তাহার উৎকর্ষের পরিচায়ক।

খ। নৈতিক ও আইনগত অধিকার (Moral and Legal Rights): সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিকেই 'নৈতিক অধিকার' বলা হয়। এই অধিকার সমাজের সদস্যদের কল্যাণের অপরিহার্য অংগরূপে গণ্য হয়।[১] নৈতিক অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনের কোন প্রশ্ন থাকে না। ফলে নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানেরও কোন উপায় থাকে না। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন দাবি পূর্ণ অধিকারে পরিণত হয় না। সুতরাং নৈতিক অধিকার 'কতক পরিমাণে অধিকার' (quasi-right) মাত্র।

আইনগত অধিকার হইল আইনানুমোদিত পারস্পরিক দাবি। অ্যালেনের সংজ্ঞা অনুসারে, যে-কোন স্বার্থপূরণের জন্য আইন কর্তৃক প্রদত্ত ও সংরক্ষিত ক্ষমতাকে আইনানুমোদিত অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২] আইনানুমোদিত বলিয়া রাষ্ট্র ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আইনানুগের দৃষ্টিতে ইহাই একমাত্র অধিকার। আইনানুমোদিত অধিকার নীতি বা সমাজকল্যাণ দ্বারা সমর্থিত নাও হইতে পারে। না হইলে ইহা মাত্র অপূর্ণাংগ বা 'কতক পরিমাণে' অধিকার (quasi right) বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল একদিকে নৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দান এবং অপরদিকে সমাজকল্যাণের পরিপন্থী অধিকারের বিলোপসাধন করা। আদর্শ রাষ্ট্র ইহাই করে।

গ। অধিকার সম্বন্ধে আদর্শবাদী ধারণা (Idealist Theory of Rights): আদর্শবাদ বা ভাববাদ রাষ্ট্রকে মানুষের স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন বলিয়া গণ্য করিয়া ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করিতে। আদর্শবাদ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের নিজস্ব ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থ আছে। ব্যক্তির ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থ ইহার অধীন।[৩]

গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য হইল সার্বিক কল্যাণসাধন। সুতরাং ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের অধিকারের

১. "A right may be defined as a claim that ··· can be justly made .... Moral justification of the claim is that the condition or power is an element of well-being or a means to it." Morris Ginsberg

২. Rights are "legally guaranteed powers to realise an interest." G. K. Allen : *Legal Duties*

৩. ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

মধ্যেই নিহিত। জার্মান আদর্শবাদী হেগেল মনে করেন, রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যেই রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তির ইচ্ছার সার্থক উপলব্ধি সম্ভব। ব্যক্তির অধিকার বা ইচ্ছার সহিত রাষ্ট্রের ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধিলে ব্যক্তির ইচ্ছাকে দমন বা পরিবর্তিত করার অধিকার রাষ্ট্রের আছে।

ইংরাজ আদর্শবাদিগণ অবশ্য মনে করেন, ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

গ্রীনের মতে, অধিকার হইল ব্যক্তির স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সেই দাবি যাহা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রদত্ত হয়।[১] ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানির্দেশের কথাও ইহারা বলেন।

সমালোচনা: আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া ব্যক্তির অধিকারের প্রতি অবিচার করিয়াছে। হেগেলের মত আদর্শবাদীদের বক্তব্য সমর্থন করিতে হইলে রাজতন্ত্রে রাজার সীমাহীন অধিকারকে সমর্থন করিতে হয়, জাতির আগ্রাসী জাতীয়তাবাদকে এবং সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকাকে সমর্থন করিতে হয়। ধনতন্ত্রকে যাঁহারা আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদেরও সমর্থন করিতে হয়। ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত—এই ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিসত্তার বিনাশের পথ প্রশস্ত করে, ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়।

মার্কসবাদীরা মনে করেন, রাষ্ট্রকে আদর্শরূপে কল্পনা করিয়া প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীশোষণ, বৈষম্য প্রভৃতিকে স্বাগত জানানো হয়।

ঘ। অধিকার সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব (Marxian Theory of Rights): মার্ক্সীয় চিন্তাবিদগণের মতে, অধিকারের স্বাভাবিক, আদর্শবাদী ও আইনগত ধারণা প্রকৃতপক্ষে অধিকারের বিকৃত অবৈজ্ঞানিক এবং বাস্তববুদ্ধি-বর্জিত ধারণা। অধিকার কখনই সহজাত ও স্বাভাবিক হইতে পারে না। অধিকার হইল সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে বলিয়া ইহা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারই সংরক্ষিত করে তৃতীয়ত, অধিকারের আইনগত ধারণাটিও ভ্রান্ত। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি থাকিলেও প্রশ্ন উঠে, এইরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কাহার অধিকার সংরক্ষণ করে?

মার্ক্সীয় তত্ত্বের পূর্ণাংগ অর্থে অধিকার হইল সেই সকল সুযোগ-সুবিধা যাহার ফলে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইতে পারে।[২]

ইহারই কতকটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ইউনেস্কো কমিটি[৩] কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞায়। এই সংজ্ঞা অনুসারে অধিকার হইল জীবনযাত্রার সেই সকল সুযোগ বা অবস্থা যাহা

১. Amal Kumar Mukhopadhya: *The Ethics of Obedience—A Study of the Philosophy of T. H. Green*

২. *Fundamentals of Marxism-Leninism* (Moscow)

৩. The UNESCO Committee on the Theoretical Bases on Human Rights

না থাকিলে সমাজের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরে মানুষ সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসাবে সমাজের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই প্রসংগে প্রধান দুইটি বিষয় বিশেষভাবে স্মর্তব্য: (ক) অধিকার অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের আপেক্ষিক, (খ) ইহা সামাজিক বা সম্পত্তি সম্পর্কেরও (social or property relations) আপেক্ষিক। অতএব, জ্ঞানবিজ্ঞান ও উৎপাদনের কলাকৌশলের সংগে সংগে অধিকারভোগের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। কারণ পূর্ণাংগ জীবন ভোগ করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অধিকতর বিকশিত হয়।

ইতিহাসের দিক দিয়া মানুষ যখন খাদ্যাহরণের যুগ হইতে খাদ্যোৎপাদনের যুগে উপনীত হইল তখন তাহার দাবি বা অধিকারের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইল। অপরদিকে কিন্তু সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িলে মালিকশ্রেণী বিত্তহীনদের শোষণ করিতে এবং অধিকাংশ সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। অতএব, জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও উহার ফল হইতে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত হইতে থাকিল।[১]

বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ: সংক্ষেপে বলা যায়, মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ্‌গণ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার (materialist interpretation of history) পরিপ্রেক্ষিতে অধিকার ধারণাটির স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে বিশেষ সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাই ঐ সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। এবং ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে অধিকারের ধারণা।

ক। **সমভোগী সম্পদ**. সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে উৎপাদনের উপকরণ ছিল অতি সামান্য এবং সমাজ ছিল সমভোগী[২] শ্রেণীশোষণের কোন সুযোগ বা অবকাশ ছিল না বলিয়া এ সমাজে প্রত্যেকেই সমানাধিকার ভোগ করিত। ক্রমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের (owners of the instruments of production) পরিশ্রম ছাড়াই অপরের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল। মানব ইতিহাসে শোষণমূলক সমাজের সূত্রপাত ঘটিল। শোষিতেরা পরিণত হইল দাসে এবং দাসপ্রভুরা রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হইল।

খ। **সামন্ততান্ত্রিক সমাজ**: পরবর্তী স্তরের সামন্ততান্ত্রিক সমাজও শোষণমূলক। এই সমাজ-ব্যবস্থায় ভূমিদাসরা (serfs, সামন্ত প্রভুর জমিতে কৃষিকার্য করিত এবং মাত্র জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিত। আর সমস্ত ছিল সামন্তপ্রভুর যাহা সংরক্ষণ করিত রাষ্ট্র।

গ। **ধনতান্ত্রিক সমাজ**. সামন্ততন্ত্রের পর ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিলেও উৎপাদন-সম্পর্ক আরও শোষণমূলক হওয়ায়

---

১. Rodney Hilton: *Communism and Liberty*

২. এই অংশের বিস্তৃত আলোচনা ১১১ ১৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে

ক্রমশ সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বিশৃংখলা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিল।[১] শ্রমিকের শ্রমশক্তি (labour power) ক্রয় করিয়া মূলধন মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের (surplus value) সবটুকুই নিজে ভোগ করিতে থাকায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অধিকার বলিয়া কিছু রহিল না—রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল মূলধন-মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের শোষণের যন্ত্র। শ্রমিকশোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় দারিদ্র্য, দুর্দশা, শ্রমিক-অসন্তোষ প্রভৃতিও বাড়িতে লাগিল। শ্রমিকদের ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রভৃতির জন্য আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগানো হইল।

অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় ধনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের ধারণা ও অধিকার ভোগের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হইল। কিন্তু কতকগুলি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার (political and civil rights)—ভোটাধিকারের ও মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি স্বীকৃত হইলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হইল না।

অনেক ক্ষেত্রে আবার স্বীকৃত অধিকার আনুষ্ঠানিকই রহিয়া গেল—উহাদের কার্যকর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হইল না।[২] তবে ধনতন্ত্রের সংকট যত ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং শ্রমজীবীদের আন্দোলন যত তীব্র হইতে থাকিল মালিকশ্রেণী সাধারণ লোককে কিছু কিছু সুযোগসুবিধা (concessions) দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার দরুনই জন্মগ্রহণ করিল বর্তমান দিনের সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রে উৎপাদন অনেকাংশে সামাজিক (social) কিন্তু সম্পদের ভোগদখল এখনও ব্যক্তিগত (private)।

ঘ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ. সুতরাং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া সকল লোকের অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এই কারণেই মার্ক্স-বাদী চিন্তাবিদগণ মনে করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজেই অধিকারের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব।

এই সমাজ-ব্যবস্থা সর্বপ্রকার শোষণের অবসান দাবি করে. বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ন্যায় ইহা জনগণের শুধু আনুষ্ঠানিক নেতিবাচক অধিকারে বিশ্বাস করে না। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিলেই জনগণের বিভিন্ন অধিকারের বাস্তব প্রকাশ ঘটিবে। কর্মের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, সমান সুযোগের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অধিকার অবসানের দাবি জানায় ("The abolition of bourgeois

---

১. "Constant revolutionising of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones." *Manifesto of the Communist Party*

২. See John Lewis. *On Human Rights*

individuality, bourgeois independence, and bourgeois freedom is undoubtedly aimed at." Marx and Engels)[১]।

অধিকার ও কর্তব্যের অংগাংগিতা : মার্কসবাদীদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার অপর সকলের অধিকারের উপর নির্ভরশীল। অতএব, সমাজস্বার্থকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থলাভিষিক্ত করিতে হইবে ইহার তাৎপর্য হইল ব্যক্তির মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা কর্তব্য ছাড়া অধিকারের কল্পনা করা যায় না, আবার অধিকার না থাকিলে কর্তব্যের প্রশ্নও উঠে না। ('No rights without duties, no duties without rights.' Marx)।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের সমন্বয়ে এবং অধিকার ও কর্তব্যের সামঞ্জস্য-বিধানেই অধিকারের স্বার্থকতা।[২]

সামাজিক মালিকানা : ইহার জন্য প্রয়োজন হইল উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা। এই সামাজিক মালিকানাই শোষণ ও বৈষম্য দূর করিয়া সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিবে। ইহার ফলে ব্যক্তি সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবে এবং সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটিবে।

বিরোধিতা এবং বিপ্লবের অধিকারের সমর্থন : মার্কসবাদিগণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিরোধিতা ও বিপ্লবের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে, উহার শোষণমূলক নীতি ও লক্ষ্যের অবসানে সর্বহারাদের বিরোধিতা করার অধিকার আছে—ইহাই মার্কসবাদীদের সুস্পষ্ট অভিমত। সংগ্রামের অধিকার, মেহনতী শ্রেণীর অন্যতম মৌল অধিকার। এই অধিকারই তাহাদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে—বিরোধিতা ও বিপ্লবের অধিকারের মধ্যেই সমাজের অন্যায়, অবিচার, অন্ধ বিশ্বাস, দমনমূলক কার্যকলাপ প্রভৃতি হইতে মুক্তির আশ্বাস পাওয়া যায়।

সমাজতান্ত্রিক আইন : মার্কসবাদিগণ মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অধিকারের সঠিক প্রয়োগ সম্ভব। সুতরাং প্রয়োজন এইরূপ আইন-প্রণয়নের।

অধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভংগির সমালোচনা : অধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভংগির সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহাতে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের প্রভাবের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে ব্যক্তির অধিকারের প্রশ্নে ধর্ম আদর্শ নীতিবোধ ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের গুরুত্বকে পুরাপুরি অস্বীকার করা উচিত নয়।

---

১. *Manifesto of the Communist Party*

২. "Under socialism individual freedom is based upon the identity of personal and social interests and upon the unity of rights and obligations." V. Chkhikvadze : *The State, Democracy and Legality in the USSR*.

দ্বিতীয়ত, মার্ক্সীয় তত্ত্বে অধিকারের প্রশ্নে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজকেই প্রাধান্য দেয় বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করিতে পারে না, সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই তাহাকে কার্য করিতে হয়—মার্ক্সবাদিগণের এই বক্তব্য হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনের ন্যায় চরম (absolute) মতবাদ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ব্যক্তির ইচ্ছা, চিন্তা ও মতবাদের ভূমিকা সভ্যতার প্রসারে কোন অংশে কম নয়।

তৃতীয়ত, সমালোচকদের মতে, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নতিশীল রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ও মর্যাদার উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে—সকল সময়ই তাহারা অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়।

চতুর্থত, মার্ক্সবাদিগণ অধিকারের ধারণাটিকে যে-অর্থে ব্যাখ্যা করেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ঠিক-সেই অর্থে অধিকার ধারণাটিকে গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা, বা হইলেও কতটা গ্রহণ করা হইয়াছে এ সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেন। ইহা ছাড়া অনেকেই মনে করেন, মার্ক্সবাদিগণের 'রাষ্ট্র ও আইনের বিলুপ্তি'র ধারণা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির অধিকারের বিরোধী[১] সমভোগবাদী সমাজে ব্যক্তির অধিকার কি রূপ লইবে ইহাও প্রশ্ন।

উপসংহার: উভয়দিক বিচার করিয়া বলা যায় যে, প্রকৃত অধিকারের উপলব্ধির জন্য মার্ক্সবাদীদের নির্দেশ—শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা একরূপ অপরিহার্য। সামাজিক মূল্যবোধের বিচারেই অধিকারের ধারণা করা উচিত। নচেৎ অধিকার বলিয়া অভিহিত যে-কোন দাবি তাৎপর্যহীন।

বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকারের প্রকৃতি—সংক্ষিপ্তসার (Nature of Rights in Different Social System—a Summary):

বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকারের প্রকৃতি উপরি-বর্ণিত বিশ্লেষণের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে।

এই প্রসংগে পুনরুক্তি করা প্রয়োজন যে অধিকার নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর (ক) প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ (man's control over natural forces) এবং (খ) সামাজিক সম্পর্ক (social relations)।

খাদ্যাহরণভিত্তিক আদিম সমভোগী সমাজে অধিকার ও সুযোগসুবিধার বৈষয়িক ভিত্তি গড়িয়া উঠে নাই ("The material basis for rights and privileges did not exist." Rodney Hilton)।

কঠোর জীবনসংগ্রামমূলক এইরূপ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাই ছিল না বলা চলে। মাত্র অস্ত্রশস্ত্র, আহারের জন্য পাত্র, বলয় (bracelets) প্রভৃতি নিজস্ব সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২]

---

১. "The doctrine of withering away of State and law (is) decidedly hostile to the very idea of the rights of man and of the liberties of the individual." Sergius Hessen: *The Rights of Man in Liberalism, Socialism and Communism*

২. John Eaton: *Political Economy—A Marxist Textbook*

দাস সমাজ : ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব সমসাময়িক। এই অবস্থাতেই দাস সমাজের পত্তন হয়। এই দাস-সমাজে দাস-প্রভুরা উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা ভোগ করিত এবং দাসরা দাস-প্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইত।

দাসরা শুধু ভরণপোষণের অধিকার ভোগ করিত আর দাস-প্রভুরা দাসদের শ্রমের ফল ভোগ করিত। রাজনৈতিক ব্যাপারে মাত্র স্বাধীন দাস-প্রভুরা অধিকার ভোগ করিত।

গ। **সামন্ততান্ত্রিক সমাজ** : সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দুইটি প্রধান শ্রেণী হইল সামন্তপ্রভু এবং ভূমিদাস (serfs)। উৎপাদনের উপকরণের—যেমন, জমি—মালিকানাসত্ত্ব ভোগ করিত সামন্তপ্রভুরা, আর ভূমিদাসদের ছিল জীবনের অধিকার—দাসদের মত প্রভুরা তাহাদের হত্যা করিতে পারিত না। উপরন্তু, পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ভূমিদাসদের একখণ্ড করিয়া চাষের জমি দেওয়া হইত। বাকী সময়ে তাহাদিগকে সামন্তপ্রভুদের জমিতে খাটিতে হইত। ভূমিদাসদের জমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং ইহাদের সামন্তপ্রভুদের ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া যাওয়ার কোন অধিকার ছিল না। এইভাবে সামান্য কিছুটা স্বাধীনতা পাইলেও ভূমিদাসদের উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করিয়া সামন্তপ্রভুরা শোষণকার্য চালাইত।

তবুও কিন্তু এই শোষণমূলক সামন্ততান্ত্রিক সমাজেই অধিকারের ধারণা কতকটা বিস্তৃতি লাভ করে।

ইহার মূলে ছিল সামন্তপ্রভুদের শীর্ষে অবস্থিত রাজা ও সামন্তপ্রভুদের মধ্যে সংঘর্ষ যাহার দরুন রাজা অভিজাতশ্রেণীকে বা অভিজাত শ্রেণীসহ সকলকে কিছু কিছু অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta—1215) বা অধিকারের আবেদনপত্রের (Petition of Right—1628) উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১]

ঘ। **ধনতান্ত্রিক সমাজ** : সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় সাধারণের সমর্থন পাইবার জন্য অধিকারগুলিকে সর্বজনীন আকার দেওয়া হয় যদিও এই অধিকারগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং বুর্জোয়াশ্রেণী বা মালিকদের এই অধিকার হইল শ্রমিক শোষণের অধিকার। যেমন, ফরাসী বিপ্লবীদের ঘোষিত স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারকে আইনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়। অর্থাৎ, স্বাধীনতা ও সাম্য বলিতে বুঝান হয় আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও সাম্যকে।[২] মৌল বিষয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারকে এড়াইয়া যাওয়া হয়। বলা যায়, ইহা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, আইনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ অধিকার শূন্যগর্ভ না হইয়া পারে না।

১. ম্যাগ্না কার্টা দ্বারা অভিজাত শ্রেণী গির্জার স্বাধীনতা, শাসনের স্বাধীনতা প্রভৃতি আদায় করে এবং 'আবেদনের অধিকার পত্র' দ্বারা পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমেই করধার্যের ব্যবস্থা নির্বাচিত করে।

২. Howard Selsam : *What is Philosophy ?*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ঐ একই মন্তব্য করা যায়। অর্থাৎ, শোষণমূলক সামাজিক সম্পর্ক বর্তমান থাকায় যে-সকল অধিকারের কথা মার্কিন সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের কিছুটা মূল্য থাকিলেও ওগুলি দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না, বা তাহাদের অধিকার ভোগ তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, (পরবর্তীকালে সংযুক্ত) মার্কিন সংবিধানে উল্লেখিত অধিকারসমূহের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারও আছে। সম্পত্তির অধিকার শ্রেণীবিশেষেরই অধিকার—সর্বসাধারণের নহে।

সংকট ও সংঘর্ষের মুখে পড়িয়া বর্তমানে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কিছু কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার (যেমন, শিক্ষার অধিকার, বেকার ভাতার অধিকার, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ সংক্রান্ত অধিকার প্রভৃতি) দেওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছে। তবুও কিন্তু বলা যায়, যে ধনতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের উপর ততটা জোর দেওয়া হয় না।

৬। **সমাজতান্ত্রিক সমাজ**: সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসংঘর্ষ এবং শোষণের অবসান ঘটে। সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য সাধিত হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুত অগ্রগতি হইতে থাকে। সকল প্রকার ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হয়। সকলেই উৎপন্ন সম্পদের অংশীদার হয়। ফলে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকারের সংগে সংগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারও সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।[১] সমাজতান্ত্রিক সমাজে বেকারত্ব থাকে না এবং সকলকেই কর্মের অধিকার দেওয়া হয়। ধর্ম, বংশ, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ প্রভৃতির ভিত্তিতে কোন রকম ভেদাভেদ করা হয় না। এই অধিকারগুলি যাহাতে কার্যকর হয় তাহার জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা করা হয়।

বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক অধিকার: সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকারের ধারণা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগিপ্রসূত। অধিকার সম্বন্ধে বুর্জোয়া ধারণা মূলত নেতিবাচক (negative) হইলেও মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি সম্পূর্ণ ইতিবাচক (positive)। ব্যক্তিত্ববিকাশের পূর্ণ সুযোগসুবিধা প্রদানই সমাজতান্ত্রিক অধিকার ব্যবস্থার লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া সমাজে অধিকার দুই দিক দিয়া সীমাবদ্ধ: (১) সংবিধান-নির্দিষ্ট বাধানিষেধ দ্বারা, (২) উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দ্বারা; সমাজতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু অব্যাহত ও সমবণ্টিত: এইজন্য বলা হয় যে, মাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই অধিকার তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

---

[১] John Somerville's Article on "*Comparison of the Soviet and Western Democratic Principles with special reference to Human Rights* in '*Human Rights*' (A Symposium, UNESCO)

বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার (Right to Private Property in Different Social Systems) : ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বলিতে সম্পত্তি অর্জনের, ব্যবহারের এবং দান-বিক্রয়ের অব্যাহত অধিকারকে বুঝায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণ দ্বিধাবিভক্ত। প্রত্যেক যুগেই একদিকে প্লেটোর ন্যায় রাষ্ট্রদার্শনিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহারা মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান হওয়া উচিত, অন্যদিকে আবার অ্যারিস্টটলের ন্যায় চিন্তাবিদ্‌ও রহিয়াছেন যাহারা মনে করেন সম্পত্তির অধিকার সমাজবন্ধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র—ইহাকে ছিন্ন করা অযৌক্তিক। কেহ কেহ এই অধিকারকে মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে বাধাস্বরূপ বলিয়া চিহ্নিত করেন।[১] কাহারও কাহারও মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নীতি-সমর্থিত, আবার কেহ কেহ মনে করেন ইহা চৌর্যবৃত্তিরই নামান্তর মাত্র।[২]

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে যুক্তির পর্যালোচনা : ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সপক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে ইহা ব্যক্তিকে অভাবের তাড়না হইতে মুক্ত করিতে পারে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ইচ্ছামত সৃজনধর্মী কাজে নিযুক্ত হইতে পারে এবং অবসরভোগের মাধ্যমে 'সুখী' জীবনও যাপন করিতে পারে।[৪]

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগিপ্রসূত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বিত্তশালীর দিক হইতে যুক্তিযুক্ত হইলেও বিত্তহীনের দিক হইতে ইহা ভয়াবহ। এই অধিকার সমাজকে ধনী এবং দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে,[৩] সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ববিকাশে বাধা সৃষ্টি করে এবং সৃজনশীল কার্যে অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করে।[৪]

দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। বলা হয়, সম্পত্তি ব্যক্তির পরিশ্রমের পুরস্কার বলিয়া এই অধিকার ব্যক্তিকে কার্যে উৎসাহিত করে, যাহা সমাজের দিক হইতে মংগলজনক।

বিরোধিতা করিয়া বলা যায় যে, এই পুরস্কার সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে সকল সময় সমর্থনযোগ্য নাও হইতে পারে (যেমন, ক্ষতিকারক ঔষধ উৎপাদন করিয়া মুনাফা অর্জন করা কোন ব্যক্তির পক্ষে শ্রেয় হইলেও, সমাজের দিক হইতে উহা নিন্দনীয়)। উপরন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কর্মে উৎসাহপ্রদানের পরিবর্তে এই উৎসাহকে

---

১. Luc Somerhausen : *Human Rights in the World Today*

২. "Property is theft." Prudhon

৩. এই প্রসংগে ডিজরেইলীর দ্বি-জাতীয় তত্ত্বের (Two-Nation Theory) কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। "দ্বি-জাতি" বলিতে ধনী ও দরিদ্র—এই দুই অংশে বিভক্ত একই জাতিকে বুঝায়।

৪. "Leisure is essential to happiness." Aristotle

ধ্বংস করিতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারিগণ বিনা পরিশ্রমে—কর্মে নিযুক্ত না থাকিয়াও ভোগ করেন।

তৃতীয় যুক্তিটি নৈতিক। বলা হয়, যে-সকল ব্যক্তি জনকল্যাণমূলক দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে তাহারা অবশ্যই ইহার বিনিময়ে কিছু অর্জন করিবে। সম্পত্তি অর্জনের অধিকার এই অর্থে কাম্য।

এই যুক্তিও সমর্থনীয় নহে। কারণ, কার্যক্ষেত্রে প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা হয় সামর্থ্যের মাপকাঠিতে—কে কতটা উপার্জন করিতে পারিল তাহার দ্বারা। সমাজের দিক দিয়া এই প্রচেষ্টার মূল্য কতটুকু তাহার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না।

আরও মনে করা হয় যে সম্পত্তির অধিকার সমাজ-সমৃদ্ধকারক বিভিন্ন গুণাবলী —যেমন পরিবারের প্রতি ভালবাসা, উদারতা, আবিষ্কারের ইচ্ছা, উৎসাহ প্রভৃতি বিকাশের সহায়ক।

প্রতিবাদে বলা হয়, যুক্তিটি সম্পূর্ণ অসার। ল্যাস্কি বলেন, রকফেলারের (Rockfeller) ন্যায় সম্পত্তি না থাকিলে কাহারও মধ্যে উদারতা থাকিবে না একথা বিশ্বাস করা যায় না। অধ্যাপক হাক্সলীর (Huxley) উৎসাহ, নিউটনের আবিষ্কার-ক্ষমতা নিশ্চয়ই সম্পত্তির অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দরিদ্র ব্যক্তিরও পরিবারের প্রতি ভালবাসা আছে।[১]

সম্পত্তির অধিকারের পশ্চাতে ঐতিহাসিক সমর্থন আছে বলিয়াও অনেক উন্নত ও গতিশীল সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমাজ-ব্যবস্থা সমষ্টিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে গঠিত সমাজ-ব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নতিশীল এবং ফলে জনগণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করিতে অধিক সমর্থ।

বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে, এই সকল উন্নত দেশে জনগণের একাংশ দারিদ্র্য-সীমার নীচে অবস্থান করে এবং বিশেষভাবে উন্নয়নের ফল ভোগ করে মুষ্টিমেয় লোক। কোন কোন সমাজ এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়াছে আবার কোন কোন সমাজ দেয় নাই। যেমন ইংল্যাণ্ডে ব্যারণ (barons) ও অন্যান্য অভিজাতের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছিল, কিন্তু মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় চিন্তাবিদ্‌গণ সম্পত্তির উপর গঠিত অর্থ-ব্যবস্থাকে ধর্মীয় রাষ্ট্রগঠনের পথে বাধাস্বরূপ বলিয়াই মনে করিতেন। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই অধিকারকে সমর্থন করে কিন্তু সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State) সম্পত্তিকে সমাজের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত করিতে চায়। সমভোগ-বাদীরা (Communist) আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনেরই পক্ষপাতী।

মন্তব্য : ব্যক্তিগত সম্পত্তির সপক্ষে যুক্তির পর্যালোচনার পর মন্তব্য হিসাবে বলা যায় যে, ইতিহাসে এই অধিকারকে স্থান-কাল ও পরিবেশের আপেক্ষিক হিসাবেই দেখা গিয়াছে।

---

১. *A Grammar of Politics*

মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ ও সম্পত্তির অধিকার: মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা করিলে সম্পত্তির অধিকার কিভাবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর।

ক। আদিম সমভোগী সমাজ: মানব-জীবনের খাদ্যাহরণের যুগে (food-gathering stage) সমাজ ছিল সমভোগী। মাত্র আহৃত খাদ্যই যে সকলে সমভাবে ভোগ করিত তাহা নহে, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সকল দ্রব্যই ছিল গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পত্তি। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের কোন প্রশ্নই ছিল না।

খ। দাস-সমাজ—সম্পত্তি-ব্যবস্থার উদ্ভব: খাদ্যাহরণকারী সমাজ, খাদ্যোৎপাদনের সমাজে (food-producing stage) রূপান্তরিত হয় পশুপালন ও কৃষিকার্যের আবিষ্কার ও ধাতু ব্যবহারের ফলে। এই অবস্থাতেই উদ্ভব ঘটে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির।

পণ্য উৎপাদন ও দ্রব্য বিনিময়ের সংগে সংগে মানুষ আপন-পর ভেদ করিতে শিখিল। শ্রমবিভাগের উদ্ভবের ফলে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইল। দাস ও দাসপ্রভুদের সৃষ্টি হইল।[১]

এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিল দাস-সমাজ ও দাস-রাষ্ট্র। সেনাবাহিনী, বিচারালয়, সরকার প্রভৃতি শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। দাস-প্রভুদের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি রক্ষায় এই সকল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল।

গ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ: উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সূচনা করিল। সামন্তপ্রভুরা জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর অধিকার করায়ত্ত করিল এবং এই অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে সূচনা হইল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের। সামন্তপ্রভুরাই এই রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করিল। শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রসার ঘটিল।[২]

ঘ। ধনতান্ত্রিক সমাজ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলস্বরূপ ও প্রয়োজনে সামন্ততন্ত্রের মধ্য হইতেই ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। শেষোক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের স্থান অধিকার করিল মালিকশ্রেণী ও মজুরশ্রেণী। ক্রমশ মূলধন ও সম্পদ মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত হইল।[৩] শ্রেণীশোষণ বৃদ্ধি পাইল। শ্রেণীশোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য বাড়িল।

---

১. "Slavery, was the first form of exploitation, peculiar of the world of antiquity." F. Engels. *The Origin of the Family, Private Property and the State*

২. "Religion, a loyal hand-maiden of private property and defender of exploitation, gained a dominating position in society's spiritual life." V. Afanasyev : *Marxist Philosophy—A Popular Outline*

৩. "It has agglomerated population, centralised means of production, and has concentrated property in a few hands." *Communist Manifesto*

এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অধিকারের ধারণা আরও দানা বাঁধিল ও গুরুত্ব পাইল—কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধানেও স্বীকৃত হইল।

৬। সমাজতান্ত্রিক সমাজ: ধনতন্ত্রে শ্রমিকশোষণের পরিমাণ ও তাহাদের দারিদ্র্য-দুর্দশা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এবং মুষ্টিমেয় শ্রেণীর সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার স্বীকৃত থাকায় ইহার বিকল্প সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি ধনতন্ত্রের সংকট বৃদ্ধি করিল। এ-হেন অবস্থায় একাধিক দেশে ধনতন্ত্রের উপর আঘাত হানিল সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো, সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন করা, এবং ধীরে ধীরে সমাজকে সমভোগবাদী সমাজে পরিণত করা।

এই মতবাদ অনুসারে শ্রেণীসংঘর্ষ ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিরই ফল এবং রাষ্ট্রযন্ত্র এই সম্পত্তির অধিকারেরই সংরক্ষক। যতই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটিবে রাষ্ট্রের পক্ষে ততই শক্তি প্রয়োগ এবং সামাজিক সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্ন: ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দেশের শাসনতন্ত্রের পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে কাহাকেও আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি (Due Process of Law) ব্যতীত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। পঞ্চম সংশোধনে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় সরকার ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ ছাড়া কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে না। জাপানী সংবিধান, ফরাসী সংবিধান এবং ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত।[১]

খ। সোবিয়েত ইউনিয়ন: অপরদিকে সোবিয়েত ইউনিয়নের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা, উৎপাদনযন্ত্র ও উপায়সমূহের উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। এই প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি (state property) এবং সমবায় ও যৌথ খামারের সম্পত্তি (co-operative and collective farm property) অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[২] নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারের (personal

১. D. N. Sen: *From Raj to Swaraj*

২. 'The foundation of the economic system of the USSR is socialist ownership of the means of production in the form of state property (belonging to all the people) and collective farm and co-operative property." Art. 10 of *the Constitution of the USSR*

property) বিষয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে, পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বসবাসগৃহ, গৃহে পৃথকভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ, গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবহারের জিনিসপত্র প্রভৃতির উপর নাগরিকের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার থাকিবে।[১]

গ। চীন : বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। এখানে উৎপাদনের মাধ্যমগুলির উপর প্রধানত দুই ধরনের মালিকানার কথা বলা হইয়াছে—সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের যৌথ মালিকানা।[২] অবশ্য সমালোচকগণ বলেন, সাম্প্রতিক কালে সোবিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক আমলা (political bureaucrats) এবং অর্থনৈতিক পরিচালকবৃন্দ (economic managers) প্রভৃতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে যাহারা উৎপাদনের উপায়সমূহের নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় এক বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করেন। ইহাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও জনসাধারণের তুলনায় অনেক বেশী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের এই ধরনের প্রবণতা অনেক সমাজতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় লেখক শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না।[৩]

ঘ। ভারত স্বাধীন ভারতের মূল সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডকে অনুসরণ করিয়া সম্পত্তির অধিকারকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার বলিয়া চিহ্নিত করে। সংবিধানের ৩১ ধারায় 'প্রত্যেক নাগরিককে সম্পত্তি অর্জনের, ভোগদখলের ও হস্তান্তর' করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য জনস্বার্থ ও আদিম উপজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সম্পত্তির অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল।

ইহার পর সম্পত্তির অধিকার ভূমিসংস্কারের পথে প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেওয়ায় সংবিধানের দুইবার সংশোধন (১৯৫১ ও ১৯৫৫) করিয়া রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও সংকুচিত করা হয় এবং আরও পরে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে বলা হয় যে, রাষ্ট্র যদি কোন নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য আইন পাস করে তবে উহা সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলেও অবৈধ হইবে না। শেষ পর্যন্ত ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যতম আইনসিদ্ধ অধিকার (statutory right) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

অতএব, ভারত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা হইতে এখনও বিদায় লয় নাই। সংবিধানের ৩০০ ক) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে আইনের ভিত্তিতে ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। সুতরাং সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার না হইলেও উহা অন্যতম সাংবিধানিক অধিকার (constitutional right)।

---

১. Art. 13.
২. Art. 5. *of the Constitution of the People's Republic of China*
৩. Paul M. Sweezy and C. Bettelheim : *On the Transition to Socialism*

অবশ্য কি উদ্দেশ্যে ও কি অর্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না যাইবে তাহা সাধারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

বিরোধিতার অধিকার (Right of Resistance): বিরোধিতার অধিকারের ধারণাটি মানুষের লিখিত ইতিহাসের ন্যায়ই প্রাচীন। প্রায় প্রত্যেক যুগেই এই অধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

প্রাচীন দৃষ্টিভংগি: প্রাচীন গ্রীসে সোফিস্টরা (Sophists) বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার সমর্থক ছিলেন এবং ইহারা নাগরিকের বিরোধিতার অধিকারকে সমর্থন করিয়াছেন। প্লেটো বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে, ইহা অরাজকতার নামান্তর। অ্যারিস্টটল সম্পূর্ণ আধুনিক ও বাস্তব দৃষ্টিবোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাষ্ট্রের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং কিভাবে রাষ্ট্র বিরোধিতা হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহার উপায়ও নির্দেশ করেন। কাণ্ট (Kant) ও হেগেলের (Hegel) রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতাকে অন্যায় ও অযৌক্তিক বলা হইয়াছে।

ধারণাটির জনপ্রিয়তা: আঠার শতক হইতেই প্রকৃতপক্ষে বিরোধিতার অধিকারটি জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ধারণাটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীকালে। ইহার পূর্বে অবশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ (Crusade), ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮), আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে বিরোধিতা বা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। ইংল্যাণ্ডে হবস ও লক বিরোধিতার অধিকারকে স্বীকার করিয়া লন। চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিলেও হবস স্বীকার করেন যে জীবনের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা যাইতে পারে। লকের মত হইল, জনগণের স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিলে সরকারের বিরুদ্ধে লোকের বিদ্রোহ করিবার অধিকার রহিয়াছে।[১] জন মিলটনও (John Milton) রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিবার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।[২] রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও চীনের গণবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগের পরিবর্তনে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং চিন্তার পরিমার্জনে ধারণাটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

আধুনিক সমর্থন: গ্রীণ, ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক চিন্তাবিদ্ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতার অধিকারকে নাগরিকের অন্যতম অধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ল্যাস্কি: ল্যাস্কির মতে, কোন রাষ্ট্রের পরিচয় সেই রাষ্ট্রে নাগরিককে কতটা অধিকার প্রদান করে তাহার মধ্যে ("A State is known by the system of rights that it maintains")। রাষ্ট্র নাগরিক-কল্যাণের প্রতি সচেতন না হইলে নাগরিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। ব্যক্তির প্রাথমিক আনুগত্য তাহার বিবেকের নিকট এবং তাহার পর রাষ্ট্রের নিকট। রাষ্ট্র নাগরিকের কল্যাণ সম্বন্ধে

১. L. J. MacFarlane: *Political Disobedience*

২. C. J. Friedrich: *An Introduction to Political Theory*

কতটা সচেতন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র তখনই নাগরিকের নিকট আনুগত্য দাবি করিতে পারে যখন উহা নাগরিকের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে। নতুবা রাষ্ট্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ল্যাস্কি নাগরিকের বিরোধিতার অধিকারকে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, বিরোধিতা করা নাগরিকের কর্তব্য। অবশ্য বিরোধিতা নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থার শেষ বা চরম অস্ত্র।

বিরোধিতার অধিকারের সীমা: ল্যাস্কি মনে করেন, যে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন সে-ক্ষেত্রে নাগরিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিবে না। দ্বিতীয়ত, বিরোধিতার পূর্বে নাগরিককে বিচার করিতে হইবে তাহার এই অধিকার প্রয়োগ সঠিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা। তৃতীয়ত, পরিবর্তনের নীতি ও সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া নাগরিক বিরোধিতার অধিকারকে কাজে লাগাইবে না।

গ্রীণ: গ্রীণও মনে করেন, সঠিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিরোধিতার অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। উপরন্তু, ব্যক্তির বিরোধিতার অধিকার জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট হওয়া দরকার ('One ought not to resist unless at least a considerable body of persons share his view and are willing to act with him.'—Green)।

ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়, গ্রীণের মতে রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত উহার প্রকৃত কর্তব্য পালন করিয়া যাইবে ততক্ষণ কোন নাগরিকের আইন অমান্য করিবার অধিকার থাকিবে না। যখনই রাষ্ট্র আদর্শভ্রষ্ট হয় তখনই নাগরিকের অধিকার থাকে আইনের বিরোধিতা করিবার। প্রথমে কিন্তু বৈধ উপায়ে অন্যায় আইনের বাতিলের প্রচেষ্টা করিতে হইবে, এবং শেষ পর্যন্ত কর্তব্য হইবে আইনের বিরোধিতা করা।

তবে যে-ক্ষেত্রে আইন অমান্যের ফলে সামাজিক মংগলের পরিবর্তে ব্যাপক অরাজকতার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে আইন অমান্য করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।[১]

গ্রীণের সমালোচনায় ল্যাস্কি: গ্রীণের এই অভিমতের সমালোচনা করিয়া ল্যাস্কি বলিয়াছেন: গ্রীণ ঠিক যুক্তির পথ অনুসরণ করেন নাই ('Green's view is a wiser one, but what he urges is rather the higher expediency than a rigorous logic.'—Laski)। বিরোধিতার অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে—ল্যাস্কি ইহা সমর্থন করেন না। তিনি একথাও মনে করেন না যে বিরোধিতার অধিকার অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি করে। বার্টাও

১. Amal Kumar Mukhopadhyay: *The Ethics of Obedience—A Study of the Philosophy of Green*

রাশেলের মতে, আইনানুমোদিত সরকার অনেক সময় এতই নিকৃষ্ট হয় যে অরাজকতার সম্ভাবনা থাকিলেও বিদ্রোহ করা প্রয়োজন হয়। বিদ্রোহের অধিকার না থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়িবে, সমাজ-সংগঠনের স্বার্থ ব্যাহত হইবে।

মূল্যায়ন : মূল্যায়নে বলা যায়, গ্রীণ বিরোধিতার অধিকার প্রশ্নে রক্ষণশীল চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন, ল্যাস্কি কিন্তু ধারণাটিকে গণতান্ত্রিক বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে পরবর্তী কালের লেখায় ল্যাস্কি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগি লইয়া দেখাইয়াছেন যে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক বা উদারনৈতিক রাষ্ট্র বিত্তহীন জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ পূরণ করিতে অপারগ। এ-অবস্থায় মালিকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ অবধারিতভাবে বাধিবেই এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে যে বিপ্লব ব্যতীত সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব নয়।[১]

অতএব, ল্যাস্কির বিশ্বাস হইল যে শ্রেণীসংগ্রাম দ্বারাই সামাজিক পরিবর্তন আসিবে।

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন : এই প্রসংগে ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণের মতামতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর মত হইল যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অধিকার লোকের আছে। তবে এই আন্দোলন বা সংগ্রাম হইবে অহিংস আন্দোলন বা সত্যের উপর ভিত্তিশীল আন্দোলন (non-violent struggle)—সত্যাগ্রহ। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি এই আন্দোলন চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অহিংস আন্দোলনের দুইটি প্রধান দিক হইল : (ক) অসহযোগ আন্দোলন (non-cooperation) এবং (খ) আইন অমান্য আন্দোলন (civil disobedience)। বলা যায়, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন নৈতিক বিপ্লবী (moral revolutionary)।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী : উদারনৈতিক চিন্তাবিদ্ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীরও অভিমত হইল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য বা অধিকার রহিয়াছে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিবার। যখন কোন নাগরিক দেখে যে সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাষ্ট্রকৃত অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হইতেছে না এবং যখন তাহার বিবেক বলে রাষ্ট্রের অন্যায়কে মানিয়া লওয়া যায় না তখন তাহার পক্ষে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তবে তাহাকে সকল দিক বিচার করিয়া এই বিরোধিতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।[২] এই অধিকার হইল নৈতিক অধিকার, আইনগত কোন অধিকার নয়।

---

১. "The result of the incompatibility of the views of the use to which the state-power should be put is revolution." Laski's *'Crisis in the Theory of the State' in 'A Gammar of Politics'*

২. V. S. Srinivasa Sastri : *The Rights and Duties of the Indian Citizen : Kamal Lectures* (*Kamala Lecture 1925, Calcutta University*)

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ : মার্ক্সীয় রাষ্ট্রদর্শনে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিরোধিতার অধিকার নাগরিকের একটি পবিত্র অধিকার বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মার্ক্সের মতে, মানবসমাজের ইতিহাসই হইল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শোষণমূলক সমাজে একশ্রেণী আর একশ্রেণীকে তাহার শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার প্রাপ্য অংশ ভোগদখল করে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রদার্শনিকগণ বিরোধিতাকে হিংসাত্মকও বলিয়া বর্ণনা করেন।

মার্ক্সবাদিগণ মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়িয়া তোলার হাতিয়ার হইল বিরোধিতার অধিকার। ইহার মাধ্যমে শাসককে সংযত করা যায়, শ্রেণীশোষণ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়, প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে; এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

মার্ক্সবাদিগণের মধ্যে মাও জে-দং-এর (Mao Ze-Dong) দৃঢ় ধারণা যে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে শোষণমূলক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা ছাড়া মানুষের মুক্তি আসিবে না।[১] অপরপক্ষে বর্তমান স্পেন ইতালী প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট নেতারা বিশ্বাস করেন গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ও সমীচীন।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen) : নাগরিকের অধিকারের আলোচনার পর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়, কারণ অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তাহা হইলে অপরকে কর্তব্যপালন করিয়া চলিতে হইবে। আবার অপরে যদি অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে আমাকে কর্তব্যপালন করিতে হইবে।[২] যেমন, আমার যদি জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকে তাহা হইলে অপরের কর্তব্য রহিয়াছে আমার জীবননাশ না করার। অনুরূপভাবে অপরের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকিলে আমার কর্তব্য রহিয়াছে অপরের জীবনহানি না করার। সুতরাং কর্তব্যের তাৎপর্য, বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

কর্তব্য কাহাকে বলে ? (What are Duties ?) : কোন কিছু করিবার অথবা না-করিবার দায়িত্বকেই কর্তব্য আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রকে আনুগত্য প্রদান করিবার এবং অপরদিকে অন্যের জীবনহানি না-করিবার।

১. "Experience ... teaches us that the working class and toiling masses cannot defeat the armed bourgeoisie and landlords except by the power of gun." Mao Tse-tung (quoted in Stuart R. Schram) *The Political Thought of Mao Tse-tung* (1963) (১৯৬৩ সালে মাও-সেতুং-ই ছিল বানান ও উচ্চারণ)

২. "If we are to have our rights, others must accept duties : if others are to have rights, we owe them duties." John Lewis : *On Human Rights*

আইন-নির্দিষ্ট ও নৈতিক কর্তব্য (Legal and Moral Duties): কর্তব্যকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (১) আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্য এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। আইন দ্বারা যে-সকল দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা ভংগ করিলে রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা থাকে তাহাদিগকেই আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্য বলা হয়। যেমন, আয় অনুযায়ী আয়কর দেওয়া নাগরিকের আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্য। কেহ এই কর্তব্য পালন না করিলে তাহাকে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে নৈতিক কর্তব্য হইল সেই সকল দায়িত্ব যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক বোধের উপর নির্ভরশীল। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করা হইলে ব্যক্তি সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় হয় না। যেমন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য মাত্র—ইহার সহিত শাস্তিভোগের প্রশ্ন জড়িত নহে। অবশ্য নৈতিক ও আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ সকল দেশে এক নহে। আবার এক দেশে যাহা নৈতিক কর্তব্য অপর দেশে তাহা আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। যেমন, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের নির্বাচনের সময় ভোটপ্রদান করা নৈতিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বেলজিয়াম বা সুইজারল্যাণ্ডে ভোটপ্রদান করা আইনগত অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

উভয় প্রকার কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা: অনেক সময় নৈতিক কর্তব্য ও আইন নির্দিষ্ট কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। যেমন, আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য কিন্তু অত্যাচারী শাসক ও বিকৃত আইনের বিরোধিতা করা নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব (কর্তব্য) বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আইন অমান্য আন্দোলনের উৎস এখানেই। তবে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সকল দিকের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত আইন ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে।[১]

নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য (Different Kinds of Duties of a Citizen):

ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রত্যেক নাগরিকের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য রহিয়াছে।

ক। পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য. নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইল পরিবারের প্রতি। কারণ, পরিবারই সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু এবং সুস্থ ও সবল পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের অপরিহার্য সর্ত।

অন্যভাবে বলা যায়, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের দ্বারাই নাগরিক কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করিতে পারে। যেখানে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল সেখানে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে।

---

১. ২৮০ পৃষ্ঠাও দেখ।

খ। সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য : পরিবারের পর আছে বাহিরের সমাজ। সমাজকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে; সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই সে বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রা সম্ভব করিয়াছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণ বিকাশের যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে তাহা কখনও সমাজের বাহিরে সফল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মংগল এবং সমষ্টিগত কল্যাণ অংগাংগিভাবে জড়িত। অপরের শক্তির সহিত নিজের শক্তিকে সংযুক্ত করিয়া, অপরের কল্যাণের সহিত নিজের কল্যাণের সমান্বয়সাধন করিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে পরস্পরের প্রতি। এই কর্তব্যপালন করিয়া সামাজিক শান্তি, সামঞ্জস্য ও মংগল প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

গ। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য : রাজনৈতিক সংস্থার সদস্য হিসাবে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতিও কতকগুলি কর্তব্যপালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনগত পালনীয় হইলেও কতকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। মোটামুটিভাবে এই ক্ষেত্রে নাগরিকের কর্তব্য চারি প্রকারের : (ক) আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) আইন মান্য করা, (গ) কর প্রদান করা, (ঘ) ভোটদান করা। ইহা ছাড়া নাগরিকের অন্যান্য কর্তব্যও রহিয়াছে।

(১) আনুগত্য (Allegiance) : নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল আনুগত্য (allegiance)। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয়, তবে তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতিও অনুগত হওয়া। নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শকে মানিয়া লইয়া সর্বদা তাহার উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হইবে, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষায় সর্বদা তাহাকে সরকারী কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। এইভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়।

(২) আইন মান্য করিয়া চলা (Obedience to Law) : নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত। সুতরাং সে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলিবে। নিজে আইন মানাই যথেষ্ট নয়, অপর সকলে যাহাতে মানিয়া চলে তাহার দিকেও নাগরিককে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তবে সকল আইনই যে বিনা প্রতিবাদে মান্য করিয়া চলিতে হইবে এই অভিমত অনেকে সমর্থন করেন না। আইন যদি ব্যক্তির অধিকার হরণ করে, ইহা যদি সুষ্ঠু সমাজজীবনের পরিপন্থী হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নাগরিকের কর্তব্য।

---

(৩) নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান (Honest and Regular Payment of Taxes) : রাষ্ট্র নাগরিকগণের সংগঠন ; নাগরিকগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কোন সংগঠনের কার্যই অর্থ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। নাগরিকগণের

সংগঠন রাষ্ট্র যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্ম নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান করা। যে-ব্যক্তি কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে সে নাগরিক-মর্যাদা পাইবার অধিকারী নহে।

(৪) ভোটদান করা (Exercise of Franchise): গণতন্ত্র হইল জনগণের স্বার্থে জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার। বর্তমান বৃহৎ রাষ্ট্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য করিতে পারে না। তাহারা সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাষ্ট্রের কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। অংশগ্রহণের প্রধান উপায় হইল নির্বাচনের সময় ভোটদান করা। ইহার দ্বারা তাহারা সরকার গঠনে এবং সরকারের কর্মসূচী নির্ধারণে সাহায্য করে। সুতরাং ভোটদান করা নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য। যাহারা ভোটদান করে না বা করিতে চায় না তাহারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সদস্য হইবার যোগ্য নয়।[১]

অন্যান্য কর্তব্য (Other Duties): উপরি-উক্ত চারিটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়া নাগরিকের আরও কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের উপর কোন কর্মভার অর্পণ করে তবে নাগরিকের পক্ষে তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যদি নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নাগরিকের পক্ষে সে-কর্ম গ্রহণ করা উচিত। যেমন, কোন বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে, আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের ঊর্ধ্বে সংভাবে ভোট দেওয়াও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties): অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। কারণ, মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবি থাকে। এই দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ হইল কতকগুলি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই দায়িত্বগুলিই কর্তব্য। আইন দ্বারা অনুমোদিত হইলে ইহারা আইনগত কর্তব্যে পরিণত হয়। বস্তুত, কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের কল্পনাই করা যায় না। আমার অধিকারভোগ অপরের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের অধিকারভোগ আমার কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে। যেমন, ধাক্কা না খাইয়া পথ চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দেওয়া।[২] যাহাতে এই অধিকার অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য আমারও কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়া দেওয়া। আবার জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার

১. "I have always felt that the person, man or woman, who refuses to vote when he or she can do so, deals a blow at the establishment ... of a democratic constitution." V. S. Srinivasa Sastri

২. "If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement, your duty is to give me reasonable room." Hobhouse

জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করিবার।

প্রত্যেকটি অধিকারের সংগে কর্তব্য সংযুক্ত: অধিকার হইল আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা সমাজ-বহির্ভূত নয়, সমাজের মধ্যেই ইহা নিহিত। সুতরাং এই সকল সামাজিক সুযোগসুবিধা এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন ব্যক্তি ও সমাজের উভয়েরই সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অসামাজিকভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকারের উদ্ভব হয় নাই। এইজন্য প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। মোটকথা, সমাজের মধ্যে থাকিয়া অধিকার ভোগ করা হয় বলিয়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিদান দেওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে, যে-ব্যক্তি কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সমাজের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ না করিয়া সমাজের নিকট হইতে অর্থনৈতিক বা সামাজিক অধিকার ভোগের দাবি করিতে পারে না। আবার নাগরিকের যদি ভোটদানের অধিকার থাকে, তাহার কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমস্যাসমূহের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটদান করা।

ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণে রাষ্ট্র: অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই আইনের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং ঐ অধিকারকে আইনগতভাবে বলবৎ করিবারও উপায় থাকে না। শুধু ইহাই নয়। স্বীকৃত অধিকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত না করিলে উহার মূল্য বিশেষ থাকে না—উহা নামমাত্র অধিকার হইয়া পড়ে। আমাদের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তবেই রাষ্ট্র আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য, কর প্রদান প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য দাবি করিতে পারে।

সুতরাং একদিকে অধিকার ভোগের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যেমন কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রের কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার।

এই কারণেই প্রগতিশীল দেশসমূহে মৌলিক অধিকারসমূহকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেশের প্রধান আদালতের উপর উহাদের সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ইহাই করা হইয়াছে।

বিরোধিতার অধিকার: রাষ্ট্র যদি তাহার কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় তবে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ল্যাস্কি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষী বলেন যে, প্রতিবাদ ও

বিরোধিতা করা নাগরিকের কর্তব্য ; কিন্তু সমস্ত দিকের বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা আইনশৃংখলার পরিবর্তে অরাজকতা ও সমাজবিরোধী শক্তিই প্রশ্রয় পাইবে।[১]

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. বর্তমানে অধিকার বলিতে বুঝায় ব্যক্তিত্বস্ফুরণের উপযোগী সুযোগ-সুবিধার অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বস্ফুরণ বা আত্মোপলব্ধিতেই রহিয়াছে অধিকারের তাৎপর্য।
২. মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সামাজিক ব্যবস্থাসমূহকেই স্বাভাবিক অধিকার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।
৩. অধিকার সম্বন্ধে মার্ক্সবাদের বক্তব্য হইল যে অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের অপসারণেই রহিয়াছে ইহার মূল্য।
৪. মানুষ যতই প্রকৃতির দাসত্ব ও মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত হইতেছে অধিকার ততই সম্প্রসারিত হইতেছে।
৫. মাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই অধিকার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হয়।
৬. কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের এবং অধিকার ব্যতীত কর্তব্যের কল্পনা করা যায় না বলিয়া উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার দুইটি দিক।

অনুশীলনী

1. What are Rights? Discuss the doctrine of Natural Rights.
[অধিকার কাহাকে বলে? স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(২৫৯-৬১, ২৬১-৬৫ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the Marxian Theory of Rights.
[অধিকার সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্বের আলোচনা কর।] (২৬৬-৭০ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the different theories of Rights.
[অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের উপর একটি টীকা রচনা কর।]
(২৬১-৬৪, ২৬৫-৬৬, ২৬৬-৭০ পৃষ্ঠা)

4. Briefly discuss the nature of Rights in different social systems.
[বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকারের প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।] (২৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

5. Indicate the main points of distinction in the nature of Rights in Capitalist and Socialist societies.
[ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকারের পার্থক্যগুলি নির্দেশ কর।]
(২৭১-৭২ পৃষ্ঠা)

6. Discuss how the arguments for private property have been assailed.
[সম্পত্তির অধিকারের যুক্তিসমূহকে কিভাবে খণ্ডনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহা দেখাও।]
(২৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

---

১. ২৮০ পৃষ্ঠা দেখ।

7. Describe the different attitudes to private 'property in different political systems.

[বিভিন্ন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগির বিবরণ দাও।] (২৭৫-৭৮ পৃষ্ঠা)

8. Write a note on the Right of Resistance.

[বিরোধিতার অধিকারের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (২৭৮-৮১ পৃষ্ঠা)

9. "Rights imply Duties." Explain.

["অধিকার বলিতে কর্ত্তব্যও বুঝায়।" ব্যাখ্যা কর।] (২৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the duties of the citizen of a State.

[রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্ত্তব্যগুলির আলোচনা কর।] ২৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

স্বাধীনতা ও সাম্য
(LIBERTY AND EQUALITY)

Liberty is "*free action the whole man according to the will of the best part of his being.*" Plato

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা :

১. স্বাধীনতার প্রাচীন ও বর্তমান অর্থ কি ?

২ স্বাধীনতার সহিত সাম্যের সম্পর্ক কি ?

৩ স্বাধীনতা, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আইন কিভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত ?

৪ কিভাবে স্বাধীনতার শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে ?

৫ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিতে কি বুঝায় এবং উহা কয় প্রকারের ?

৬ সাম্যের তাৎপর্য ঠিক কি ?

৭ বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্য কতদূর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ?

৮ স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণার মূল কথা কি ?

স্বাধীনতা (Liberty) : পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অধিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এখন স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানে 'অধিকার' ও 'স্বাধীনতা' ধারণা দুইটি প্রায় সমার্থবোধকভাবেই ব্যবহৃত হয়। অধিকার হইল আত্মশক্তির বিকাশ বা ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সুযোগ এবং স্বাধীনতা হইল ব্যক্তিত্বস্ফুরণের অনুকূল পরিবেশ। স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট হয় অধিকার দ্বারা। ইহা অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে অংগাংগ সম্পর্কের একটি দিক। অন্য দিকটির আলোচনা করিয়া দেখানো হইবে যে, অধিকার নাহিত হইলে—অর্থাৎ অধিকারভোগে স্বাধীনতা না থাকিলে অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে। নিম্নে এই উভয় দিকেরই বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে

স্বাধীনতার প্রকৃতি, উদ্ভব ও প্রসার (Nature, Origin and Development of Liberty) : সকল রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতাই সর্বাধিক অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে এবং সর্বাধিক বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। মণ্টেস্কু বলেন, স্বাধীনতার ন্যায় আর কোন রাজনৈতিক শব্দ এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, মানুষের মনে এত গভীরভাবে রেখাপাতও আর কোন শব্দ করে নাই। স্বাধীনতা-হীনতা অপেক্ষা যে মৃত্যু ভাল ইহাই স্বাধীনতাকামীর ধারণা,[১] কিন্তু স্বাধীনতার তাৎপর্য যে কি, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগের স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে মতৈক্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

১. "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?" রঙ্গলাল,
"Give me Liberty, or give me Death" Patrick Henry, ইত্যাদি এই প্রসংগে স্মরণ করা যাইতে পারে।

বিবর্তন-ইতিহাস : স্বাধীনতা[১] সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীতে। এই স্বাধীনতাকে এথেনীয় স্বাধীনতা (Athenian Liberty) বলিয়া অভিহিত করা হয় :

এথেনীয় স্বাধীনতা : স্বাধীনতা বলিতে এথেন্সবাসীরা সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ই বুঝিতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আবার দুইটি দিক ছিল : স্ব-শাসন (self-rule) ও দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্তি বা স্বাধীনতা। এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে স্ব-শাসন নীতির প্রয়োগের ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল; তবে ক্রীতদাস সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত থাকার দরুনই নাগরিকগণের পক্ষে দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

স্টোইক দর্শন ও মধ্যযুগ : প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় স্টোইক দর্শনে। স্টোইকরা বলিতেন : 'প্রকৃতির সংগে জীবনের সংগতিসাধন কর' এবং প্রকৃতি বলিতে স্টোয়িকরা বুঝিতেন বিশ্বের নিয়ামক সেই নীতিকে যাহা একাধারে প্রজ্ঞা (Reason) ও ঈশ্বরের (God) প্রতিফলন। ইহার অর্থ হইল যে ঈশ্বরের অংশীদার হিসাবে মানুষ প্রজ্ঞার অধিকারী। সুতরাং সে প্রজ্ঞাশীল জীব (a rational creature)। যেহেতু সে প্রজ্ঞাশীল জীব—অর্থাৎ সে যখন ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত তখন তাহাকে স্বাধীন (free), এবং স্ব-শাসিত (self-governing) বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে স্টোয়িকরা স্বাধীনতার নীতিতে পৌঁছান। ইহার পর খ্রীষ্টধর্ম প্রথমে ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর জোর দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গির্জা যাজক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। মধ্য যুগের স্বাধীনতার ধারণা ছিল গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা। যেমন, ইংল্যাণ্ডে ১২১৫ সালে ব্যারণরা (Barons) রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং ন্যায়বিচারের অধিকার লাভ করিবার জন্য মহাসনদে (Magna Carta) স্বাক্ষর করিতে রাজা জনকে বাধ্য করে। রিফরমেশন যুগে স্টোয়িকদের মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতে থাকে।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা ও ফরাসী বিপ্লব : সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন লক (Locke)। তাঁহার মত ছিল ব্যক্তি কতকগুলি প্রাকৃতিক ও অহস্তান্তরযোগ্য স্বাধীনতার অধিকারী এবং কর্তৃপক্ষের এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। ইহার পরবর্তী স্বাধীনতা প্রচারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব। দুইটি বিপ্লবেরই বাণী হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন রুশো। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ স্বাধীনতা ও সাম্য ভোগ করিত। নানা অসুবিধার ফলে মানুষ চুক্তি করিয়া সমাজ গঠন করিল এবং সৃষ্টি হইল সাধারণের ইচ্ছা (General Will)। এই জনসাধারণের ইচ্ছা সমগ্র ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমষ্টি এবং চরম সার্বভৌম শক্তি। এই সার্বভৌম শক্তি আইনকানুন রচনা করিবে—অর্থাৎ সমগ্র জনসমষ্টি দ্বারা আইন রচিত হইবে। সুতরাং সকলের কল্যাণ ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে শাসিতের সম্মতি, ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা, মানুষে মানুষে সাম্য ইত্যাদি গণতান্ত্রিক নীতিগুলির ক্রমবিকাশ এবং সম্প্রসারণে রুশো ও লকের মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

---

১. স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই (Individual Liberty) পর্যালোচনা করা যাইবে। সম্প্রদায়গত বা জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty or Independence) স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের আলোচনা প্রসংগে আলোচিত হইবে।

তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উপরি-উক্ত বিপ্লবগুলির মাধ্যমে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হয়। বিপ্লবের সময় সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইলেও জনগণের স্বাধীনতা ও সাম্য আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের কোঠায় সীমাবদ্ধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ধনতন্ত্র প্রসারের সংগে সংগে স্বাধীনতা হইয়া দাঁড়ায় নেতিবাচক। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও অর্থনৈতিক বা সামাজিক অধিকার দেওয়া হয় না।

উনিশ শতক: উনিশ শতকে যখন ধনতন্ত্র পরিণতি লাভ করে তখন স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা—অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। ব্যক্তির নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় এবং ক্রয়বিক্রয় বাধাহীন হইবে। রাষ্ট্রের কার্য ন্যূনতম হইবে। অ্যাডাম স্মিথের মতে অবাধ প্রতিযোগিতা বজায় থাকিলে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইয়া দাঁড়ায় স্বাধীনতার অন্যতম নীতি।

রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিস্ফুট হওয়ার পর সার্বভৌমিকতার ধারণা ও স্বাধীনতার এই ধারণার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কারণ, সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা আর স্বাধীনতা হইল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। ব্যক্তির যদি স্বাধীনতা থাকে তবে তাহার উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ, কোনরূপ বাধানিষেধ থাকিবে না। কিন্তু সার্বভৌমিকতার অর্থই যে নিয়ন্ত্রণ বাধানিষেধ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টতই অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণের জন্য রাজনৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জগতে নানা প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে স্বাধীনতার অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে।

মিল-প্রদত্ত স্বাধীনতার ধারণা: জন স্টুয়ার্ট মিলই এই পরিবর্তনের সূচনা করেন। তিনি তাঁহার 'স্বাধীনতার উপর রচনা' গ্রন্থে (Essay on Liberty) স্বাধীনতাকে বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বলিয়া কল্পনা না করিয়া এই ধারণা প্রচার করেন যে, স্বাধীনতা হইল মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির বিবিধ বিভিন্নমুখী ও অব্যাহত প্রকাশ। ব্যক্তিকে যখন তাহার মানসিক বৃত্তির প্রকাশে এইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে—অর্থাৎ তাহার আত্মকেন্দ্রিক কার্যে (self-regarding action) কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তখনই সুন্দর সুস্থ সবল সমাজজীবন গড়িয়া উঠিবে।

বর্তমান অর্থে স্বাধীনতার ভিত্তি: এইভাবে মিল বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা হইতে মানসিক বৃত্তির অব্যাহত প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও স্বাধীনতার স্বরূপ তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বার্কার বলেন, "মিল ছিলেন শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার প্রচারক ··তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, একমাত্র যে ধারণার মাধ্যমেই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থসমন্বিত হয়।"[১]

অতএব, বর্তমান অর্থে স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থসমন্বিত হয় অধিকারের মাধ্যমে। অধিকার ব্যতীত স্বাধীনতা অবাস্তব—শূন্যগর্ভ। স্বাধীনতার ভিত্তিই অধিকার, স্বাধীনতা অধিকার হইতে উদ্ভূত।[২]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধের একটি দিক।

১. "Mill was the prophet of an empty liberty.... He had no clear philosophy of rights through which alone the conception of liberty attains concrete meaning."

২. "Liberty is ··· a product of rights". Laski

রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব: বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।[১] ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দেশগুলি উপরি-উক্ত দুইটি স্বাধীনতার দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। বলা হয় বর্তমান রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র এবং আন্দোলনের চাপের ফলে ইহা কিছু কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সকলকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা স্বাধীনতার মূল প্রশ্নের সমাধান সম্ভবপর হয় না। যে-পর্যন্ত না শ্রেণীশোষণ ও ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হয় সে-পর্যন্ত স্বাধীনতার পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে না।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা: সম্বন্ধের অপর দিকটি দিয়া অবশ্য স্বাধীনতাকে 'নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা দ্বারা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি মৌলিক বিষয় বা অবস্থার উপর বাধানিষেধ অপসারিত থাকা। এই বিষয় বা অবস্থাগুলিকেই বর্তমানে অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ল্যাস্কি-প্রদত্ত সংজ্ঞা: ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেই সকল সামাজিক অবস্থার উপর হইতে বাধানিষেধের অপসারণ, যাহা বর্তমান সভ্যজগতে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পক্ষে অপরিহার্য।"

ল্যাস্কি যাহাদিগকে 'সামাজিক অবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদিগকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পক্ষে কতকগুলি অধিকার অপরিহার্য। এগুলির উপর কোনরূপ বাধানিষেধ থাকিবে না—এগুলি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে।

এই প্রকার বাধানিষেধের অপসারণ, এই প্রকার নিয়ন্ত্রণবিহীনতাই বা অবাধ অধিকার ভোগই স্বাধীনতা।

স্বাধীনতাকে একটি পরিবেশ (atmosphere) বলিয়া বর্ণনা করা যায়, যে পরিবেশে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই পরিবেশের সৃষ্টি হয় অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ দ্বারা।

ল্যাস্কি-প্রদত্ত আর একটি সংজ্ঞা: এই প্রসংগে ল্যাস্কি-প্রদত্ত আর একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সযত্নে সেই পরিবেশের সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়" (By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.)। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকার ভোগ করিয়াই নাগরিক তাহার সত্তাকে বিকশিত করিতে পারে। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে এই প্রকার অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বার্কার বলেন,

১. E. H. Carr; *The Rights of Man in 'Human Rights'* (*a symposium edited by UNESCO*)

ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিই যখন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য, তখন রাষ্ট্র গঠিত হইবে মাত্র স্বাধীন মনুষ্য সম্প্রদায়কে লইয়া, কোন ক্ষেত্রেই ক্রীতদাস সম্প্রদায়কে লইয়া নহে।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব: মার্ক্সীয় তত্ত্বে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের পূর্ণাংগ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ (full freedom of development of the human personality)। কিন্তু এই সুযোগ শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজে দেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র শোষণমূলক সমাজের অবসান ঘটাইয়া শোষণবিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তন করিতে পারিলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ খুলিয়া যাইবে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে এমন প্রাচুর্য আসে না যাহার ফলে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্রমপ্রসারের ফলে যখন কমিউনিস্ট সমাজ প্রবর্তিত হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী সকল সুযোগসুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়।

অতএব, মাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই পূর্ণাংগ স্বাধীনতা বিরাজ করিতে পারে।[১]

স্বাধীনতা ও সাম্য: অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত সাম্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখও পূর্বে করা হইয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ দ্বারাই স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই অধিকার সকলকে সমভাবে দিতে হইবে—অধিকার ভোগ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা একই নিয়ম দ্বারা করিতে হইবে। এককথায়, সাম্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা বা অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ল্যাস্কি প্রভৃতির মতে, (১) সমাজজীবনে যদি বিশেষ সুবিধার (special privileges) অস্তিত্ব থাকে, অথবা (২) যদি একজনের স্বাধীনতা অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, অথবা (৩) যদি রাষ্ট্রকার্যের ফল পক্ষপাতশূন্য না হয় তবে প্রকৃত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

বৈষম্য বর্তমান থাকলে সকলের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের পূর্ণ সুযোগসুবিধা থাকে না। ফলে স্বাধীনতার পরিবেশেরও সৃষ্টি হয় না।

টনি (R. H. Tawney) উক্তি করিয়াছেন যে, সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী নয়—স্বাধীনতার জন্য সাম্য অপরিহার্য।[২]

স্বাধীনতা ব্যবহারের প্রশ্ন: ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ইহা পন্থা মাত্র, পরিণতি বা উদ্দেশ্য নহে। ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) বলিয়াছেন: "যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না-পাই তাহাতে কিছু যায়

১. "The supreme goal of communism is to ensure full freedom of development of the human personality, to create conditions for the boundless development of the individual, for the physical and spiritual function of man." *Fundamentals of Marxism-Leninism* (Moscow)

২. "A large measure of equality, ··· far from being inimical to liberty, is essential to it." R. H. Tawney: *Equality*

আসে না।" ব্যক্তি যদি স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তবেই স্বাধীনতা হইয়া উঠে সার্থক।

স্বাধীনতা, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আইন (Liberty, Authority and Law): স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট ও রক্ষিত হয় যথাক্রমে রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ দ্বারা। আইন দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

স্বাধীনতার আইন-নির্ভরশীলতা: সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

আইনগত স্বাধীনতা: রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও সংরক্ষিত স্বাধীনতা আইনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে আইনগত বা আইনানুমোদিত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। "আইনানুমোদিত স্বাধীনতা আইনানুমোদিত বলিয়াই কখনও অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না।" আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ—সকলের জন্য ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ। সকলের স্বাধীনতা স্বীকার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হয়। বার্কারের ভাষায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বতই সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।"[১] শিল্পপতির পক্ষে শ্রমিকের কার্যের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শ্রমিকের পক্ষেও সে যে কার্যে নিযুক্ত হয় তাহার সর্তাবলী নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকের স্বাধীনতা না থাকিলে শ্রমিক ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, সে তাহার আত্মশক্তিকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইবে না। অতএব, শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই শিল্পপতির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্বই বজায় থাকিতে পারে না—উহা তখন শ্রেণীবিশেষের বিশেষ সুবিধায় (special privilege) পরিণত হয়। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র এই অপরিহার্য নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করিয়া—বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া স্বাধীনতার স্বরূপকে বজায় রাখে—কোনমতেই স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে না। এই বাস্তব সত্যটি উগ্র স্বাধীনতার অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার উগ্র উপাসকগণ মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য—নিয়ন্ত্রণ: স্বাধীনতা সম্ভব হয় সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে, দার্শনিকগণ-কল্পিত প্রাকৃতিক পরিবেশের (State of Nature) মধ্যে নহে। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাধীনতার কল্পনা করা যাইতে পারে তাহা বলহীনের দাসত্ব ও বলবানের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ মাত্র। সমাজজীবনে স্বাধীন আচরণকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে অপরের স্বাধীন আচরণ ব্যাহত

---

১. "The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all ... ."

না হয়। এইজন্যই অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন, "স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ" (Liberty . involves in its nature restraints...)।

আইনগত স্বাধীনতা আইনানুমোদিত বলিয়াই ইহা নির্দিষ্ট। ব্যক্তির সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য যতটুকু পরিমাণ স্বাধীনতার প্রয়োজন ততটুকু স্বাধীনতাই ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। সংগে সংগে আবার ইহাও দেখা হয় যে, একজনের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের প্রচেষ্টা যেন অপরের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি না করে। স্বাধীনতাকে নির্দিষ্ট ও আপেক্ষিক করিয়া দিলে তবেই তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে পারে। আইনের মাধ্যমে ইহা করাই রাষ্ট্রকর্তৃত্বের কর্তব্য।

সামাজিক স্বাধীনতার আইনগত রূপ দেওয়ার প্রশ্ন: অবশ্য আইনগত স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা নহে। আইনানুসারে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বাহিরে বৃহত্তর,সমাজজীবনে সামাজিক স্বাধীনতাও (Social Liberty) থাকে। তবে সামাজিক বিধি অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বলিয়া সামাজিক স্বাধীনতাও অনির্দিষ্ট। উপরন্তু, সামাজিক বিধির পশ্চাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের সমর্থন না থাকায় ইহা পদে পদে ব্যাহত হইয়া অলীক প্রতিপন্ন হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আদর্শ রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় অংশকে আইনের সমর্থন দ্বারা আইনসংগত স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্মাচরণের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অন্যতম সামাজিক স্বাধীনতা (Social Freedom)। ব্যক্তির এই স্বাধীনতা অপরের উগ্রতার ফলে বিপন্ন হইলে রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ইহাকে আইনগত স্বাধীনতায় (Legal Freedom) পরিণত করিতে পারে। আইনগত হইলে উগ্রতা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত হয়।

উপসংহার—স্বাধীনতাও আইন: উপরি-উক্ত আলোচনার পর আইনই যে স্বাধীনতার ভিত্তি সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি না করিলেও চলে। বার্কার বলেন, স্বাধীনতার নীতি অনুসারেই প্রয়োজনীয় অধিকার আইন দ্বারা সকলের মধ্যে বণ্টিত হয়। সুতরাং 'স্বাধীনতাও আইন, অন্তত আইনের এক অংশ।' তবে এই প্রসংগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু স্বাধীনতা আইনের সহিত সম্পর্কিত এবং আইনের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে না, সেই হেতু স্বাধীনতার প্রকৃতি আইনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আবার আইনের স্বরূপ সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থার চরিত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।[১] অতএব, বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থায় আইন বৈষম্যমূলক হইতে বাধ্য। একমাত্র সাম্যভিত্তিক সমাজেই আইন প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে পারে।

---

১. "Liberty in fact always means in practice liberty within law, and law is a body of regulations enacted in a particular society for its protection. Their color for the most part depends upon its economic character." H. J. Laski : '*Liberty*' in *Encyclopaedia of the Social Sciences*

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty) : স্বাধীনতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হয়। ফলে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপেরও সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিয়া এই সকল রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইতেছে।

ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা (Individual and National Liberty) : ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা শব্দটি দ্বারা ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত উভয় প্রকার স্বাধীনতাই বুঝায়। প্রাচীন গ্রীকরা স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন।

সম্প্রদায়গত স্বাধীনতাকে (liberty of the group) বর্তমানে 'জাতীয় স্বাধীনতা' (National Libertys) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয় স্বাধীনতা অন্যান্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি।

বার্ণসের (Delisle Burns) ভাষায় বলিতে গেলে, "সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার স্বাভাবিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।"[১] দেশ পরাধীন থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে তাহার আত্মোপলব্ধির পথে সহায়ক আইনসংগত অধিকারসমূহ ভোগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় স্বাধীনতার—বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার।

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকার দ্বারা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির উপযোগী যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাহাকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলা হয়। এ-সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে (২১১-১২ পৃষ্ঠা)

স্বাভাবিক ও আইনসংগত স্বাধীনতা (Natural and Legal Liberty) : অধিকাংশ সময় স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) বলিতে সেই স্বাধীনতাকে বুঝায় যাহা মানুষ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে কাল্পনিক প্রাকৃতিক পরিবেশে ভোগ করিত। ঐ অবস্থায় মানুষের যথেচ্ছাচরণের ক্ষমতাকে 'স্বাভাবিক' বলিয়া ধরা হইয়াছে। রুশো হইলেন এই স্বাধীনতার মন্ত্রের প্রধান প্রচারক। তিনি সখেদে বলিয়াছিলেন : "মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু চতুর্দিকে সে আজ শৃংখলাবদ্ধ" (Man was born free but everywhere he is in chains.)। রুশোর উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় দর্শনমূলক নৈরাজ্যবাদে (Philosophical Anarchism)। নৈরাজ্যবাদিগণের মতে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিসমূহ মানুষের চতুর্দিকে শৃংখল রচনা করিয়া আছে। মানুষের সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পথে আজ অসংখ্য বাধা। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজের বিলোপসাধন করিয়া স্বাভাবিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে, স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

প্রকৃত অর্থে 'স্বাভাবিক স্বাধীনতা' : কিন্তু রুশো প্রমুখ দার্শনিক ও নৈরাজ্যবাদীরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, আইন ব্যতিরেকে যে-স্বাধীনতার

১. "Liberty of the group is regarded as the basis for all natural development of the country or the race."

কল্পনা করা যাইতে পারা যায় তাহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। একজনের অবাধ স্বাধীনতা যে অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে ইহা তাঁহাদের নিকট প্রতীয়মান হয় নাই। এই প্রসংগে ল্যাস্কি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরস্পরবিরোধী আকাংক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পরবিরোধী আচরণ করিবে ততক্ষণ স্বাভাবিক স্বাধীনতার কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইহা যদি সমাজের কল্যাণকৃৎরূপে পরিগণিত হয় তবে ইহাই স্বাভাবিক।

রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দ্বারা স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত পরস্পরের আপেক্ষিক, নির্দিষ্ট স্বাধীনতাই আইনসংগত স্বাধীনতা। হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায়, ইহা হইল 'অপর কাহারও অনুরূপ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির যথেচ্ছাচরণের স্বাধীনতা।'

সামাজিক ও আইনগত স্বাধীনতা (Social and Legal Liberty): সমাজ ও রাষ্ট্র এক বা অভিন্ন নহে বলিয়া মানুষের সমাজজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনও অভিন্ন নহে। রাজনৈতিক গণ্ডির বাহিরে বৃহত্তর সমাজজীবনে মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাকেই সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। সামাজিক স্বাধীনতা সমাজের বিবেক বা ন্যায়বোধ দ্বারা স্বীকৃত এবং সামাজিক বিধি দ্বারা সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক বিধিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলিয়া সামাজিক স্বাধীনতাও অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। উপরন্তু, এই কারণেই ইহা ব্যাহত হইতে পারে অথবা বিকৃত রূপ ধারণ করিতে পারে। দেখা গিয়াছে, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ধর্মাচরণের নামে অনেক ক্ষেত্রে দাসত্বপ্রথা গড়িয়া তুলিয়াছে।

সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে যদি এইরূপ স্বাধীনতাকে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করিয়া তুলিয়া ইহার স্বরূপ বজায় রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব আইনের মাধ্যমে সামাজিক স্বাধীনতার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করিয়া ইহাকে আইনগত স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করে। এবং এইরূপ রূপান্তরের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আইনগত স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক (Different Aspects of Legal Liberty):

আইনগত অধিকারের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—এই তিনটি প্রধান দিক আছে। সুতরাং আইনসংগত স্বাধীনতাও তিন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে: ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

ক। ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Civil Liberty): ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যে আইনসংগত স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাকেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলা হয়। ইহাকে অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও (personal liberty) বলে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সংঘবদ্ধ জীবনে সেই সমস্ত আচরণের স্বাধীনতা যাহার ফলে লোকে বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত সুনাম রক্ষায় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত সুনাম

রক্ষায় সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিই অধিকতর আগ্রহশীল। ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone) ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার—প্রধানত এই তিনটি বিষয়কেই বুঝিয়াছিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে আজিকার দিনে এই তিনটি অধিকার ছাড়াও চিন্তা, বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের সংগে চুক্তি সম্পাদন করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতিও বুঝায়।

খ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty): রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে ব্ল্যাকস্টোন বুঝিয়াছিলেন প্রধানত সরকারকে দমিত রাখার ক্ষমতা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সরকারী ক্ষমতা ব্যবহারের (বা অপব্যবহারের) ফলে জনসাধারণের স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে যে প্রতিকারসমূহের ব্যবস্থা ছিল তাহাদিগকে ব্ল্যাকস্টোন রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অর্থে আবেদনের অধিকার, বিচারালয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা, সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলোপসাধন প্রভৃতিই ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। বর্তমানে কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে এইরূপ পরোক্ষভাবে না দেখিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখা হয়। এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে সরকারকে দমিত রাখার ক্ষমতা না বুঝিয়া সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাই বুঝায়।

ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রকার্যে কর্মশীল হইবার ক্ষমতা" (Political liberty means the power to be active in affairs of State)।

নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইয়া জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার পরিচালনায় অধিকার প্রভৃতিকেই বর্তমানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। এইগুলিই বর্তমান দিনের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে রুশো-নির্দেশিত 'রাষ্ট্রকার্যে সম-অংশগ্রহণে'র প্রতিফলিত রূপ (২৪১-৪২ পৃষ্ঠা)। রুশো-কল্পিত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আজ আর সম্ভব নহে; তাই প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় এইভাবেই নাগরিকগণ তাহাদের স্বাধীনতা ভোগ করে।

গ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty): ব্যক্তিগতভাবে এবং নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতা ভোগ করা ছাড়া অন্নসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বলা হয়, এই অন্নসংস্থান হইতেই সুরু হয় প্রকৃত স্বাধীনতা।[১] আইনগত স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। ল্যাস্কির মতে, ইহা হইল "দৈনন্দিন অন্নসংস্থানে যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজিয়া

---

১. "… 'bread without liberty *in the long run* is poison'. But liberty without bread is immediately derision 'Men who do not have bread call bread liberty and do not care for any other kind'. … *liberty begins at breakfast*." G. A. Borgese in *Democracy in a World of Tensions*

পাইবার সুযোগ ও নিরাপত্তা।"[১] ব্যাখ্যা করিয়া ল্যাস্কি বলিয়াছেন, ব্যক্তি যদি দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ, বেকারত্ব, ভবিষ্যতের অভাব-অনটনের ভয়ে সর্বদাই ভীত থাকে তবে সে কোনমতেই তাহার সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "অর্থ ব্যবস্থায় পরাধীন শ্রমিক রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও স্বাধীন হইতে পারে না।" সুতরাং তাহাকে উপযুক্ত মজুরি দিতে হইবে, যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে—তাহার কর্মসংস্থান-ক্ষেত্রে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সমর্থ হয়। এইজন্য বর্তমান শিল্প-ব্যবস্থায় প্রয়োজন হইল শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনায় ক্ষমতা দিবার। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমেই এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty): স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আইন ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দ্বারা। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কার্যকর হয় সরকার দ্বারা। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের মতই সাধারণ লোককে লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। এই প্রসংগে লর্ড অ্যাক্টনের সুপ্রচলিত উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ক্ষমতা লোককে আদর্শভ্রষ্ট করে এবং অবাধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবেই আদর্শভ্রষ্ট করে (Power corrupts and absolute power tends to corrupt absolutely)। শাসনকার্য পরিচালকগণ নির্বাচিত হইলেও ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময় জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন। উপরন্তু, যে-শ্রেণী সমাজে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব করায়ত্ত করে তাহারা সার্বভৌম শক্তিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। ফলে সমাজে বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রকার্য পক্ষপাতমূলক হয় এবং একজনের স্বাধীনতা অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে প্রয়োজন হয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচের। এই প্রসংগে ল্যাস্কি বলেন, সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অধিকাংশ লোকে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।

১। সংবিধানে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার: স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত হওয়া। বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারকে কোনরূপে খর্ব করা হইলে আদালতে প্রতিকারবিধানের ব্যবস্থা থাকে। বিধিবদ্ধ হইলে মৌলিক অধিকারগুলির একটি বিশেষ মর্যাদাও থাকে; জনসাধারণ জানিতে পারে তাহাদের অধিকার কি কি। নির্দিষ্ট অধিকারভংগের বিরুদ্ধে প্রতিকার-বিধানের প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট স্বাধীনতার ব্যাঘাতের অভিযোগে আন্দোলন অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর।

---

১. "...security and the opportunities to find reasonable significance in the earning of one's daily bread."

এই রক্ষাকবচের প্রতি সাম্প্রতিক আকর্ষণ: এই কারণেই বর্তমানে লিখিত শাসনতন্ত্রসমূহে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের আইনের অনুশাসনের নীতিতে বিশ্বাসী ডাইসির অভিমত যে, মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা নিরর্থক—তাহাতে আর বর্তমানে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি সায় দেন না।

২। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ**: মন্টেস্কু, ম্যাডিসন প্রভৃতির প্রচারের ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিয়া আসা হইতেছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, একই ব্যক্তি বা একই বিভাগের হস্তে বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা থাকিলে স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে—জনসাধারণ অত্যাচারিত হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স মেক্সিকো চিলি প্রভৃতি রাষ্ট্র নীতিগতভাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ইহার পূর্ণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। অপরদিকে আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ব্যতিরেকেও স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্পূর্ণ সম্ভব। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ অন্য কোন দেশের নাগরিক অপেক্ষা কোন অংশে কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ না হইয়া স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সত্ত্বেও শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা সহজেই স্থাপিত হয়। এই সহযোগিতা যদি স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে স্বাধীনতার বিনাশে মনঃসংযোগ করে, তবে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার কিছুই থাকে না।

এই সকল কারণে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে বর্তমানে আর অষ্টাদশ শতাব্দীর মত স্বাধীনতার অপরিহার্য রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হয় না।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা: অবশ্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা হইল বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হইতে মুক্তকরণ বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। জনসাধারণের অধিকারকে খর্ব করা হইলে, স্বাধীনতা ব্যাহত করিলে বিচার বিভাগই ইহার প্রতিকার করে। কোন্ আইন ক্ষমতাবহির্ভূত, কোন্ আইন অযৌক্তিকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করে বিচার বিভাগ। যাহাতে বিচারপতিগণ সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার।

৩। **আইনের অনুশাসন**: স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল আইনের অনুশাসন (Rule of Law)। অনেকে মনে করেন, ইংল্যাণ্ডের শাসন-

ব্যবস্থা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইংল্যাণ্ডে নাগরিক স্বাধীনতা বিশেষভাবে সংরক্ষিত। আইনের অনুশাসন বলিতে প্রধানত দুইটি জিনিস বুঝায়: আইনের পূর্ণ প্রাধান্য (absolute supremacy of law) ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (equality in the eye of law)। আইনের পূর্ণ প্রাধান্য থাকায় সরকার পূর্ব-ঘোষিত আইন অনুসারে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়।[১] আইন হইতে প্রাপ্ত নয় এরূপ কোন ক্ষমতা সরকারী কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত থাকিতে পারে না। এই কারণে বেআইনীভাবে কাহারও অধিকার খর্ব করা যায় না—স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। উপরন্তু, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য—অর্থাৎ সকলের জন্য একই আইন থাকায়, একই অধিকার থাকে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া প্রকৃত রূপ ধারণ করে।

আইনের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আইন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অলীক কল্পনা মাত্র। যে-সমাজ উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত, সে-সমাজে আইন প্রধানত আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর অনুকূলেই কার্য করে, কারণ প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ককে (social relations) অটুট রাখাই আইনের উদ্দেশ্য। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইলেও আদালতে মামলা দায়ের করিবার ব্যয় দরিদ্রের নিকট ঐ অধিকারকে অলীক করিয়া তুলে।[২] সুতরাং আইনের অনুশাসন যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে সেখানেও স্বাধীনতা সকল সময় সংরক্ষিত হয় না। একমাত্র উৎপাদনের উপাদানসমূহের (instruments of production) সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিহীন সমাজেই আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রকৃত হইতে পারে।[৩]

৪। **দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা**: অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান রক্ষাকবচ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সমালোচনা প্রসংগে জেনিংস (Jennings) বলিয়াছেন, "শাসন বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সন্ধান ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মধ্যে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় নির্বাচিত কমন্স সভায় যেখানে দলীয় ব্যবস্থা সমালোচনাকে স্পষ্ট ও কার্যকর করিয়া তুলে।" অন্যভাবে বলিতে গেলে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব সাধারণের স্বাধীনতাকে

---

১. "Stripped of all legal technicalities Rule of Law means that Government in all its actions is bound by rules fixed and announced beforehand." Hayek: *The Road to Serfdom*

২. "All may be equal before the law but in fact the expenses of filing a law suit may place justice beyond the reach of the poor." Benham: *Economics*

"... আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়া এতই ব্যয়সাপেক্ষ যে দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাহা আশাও করা যায় না।" স্বামী অভেদানন্দ: ভারতীয় সংস্কৃতি

৩. "There cannot ... be equality before the law, except in a narrowly formal sense unless there is a classless society." Laski

অব্যাহত রাখে। ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলকে স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরীরূপে গণ্য করা হয়। ইহা সরকারী কার্যের পথরোধ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ইহা সমালোচনা দ্বারা সকল সময় রাষ্ট্র-রথকে জনমত অনুমোদিত পথে চালিত করিতে চেষ্টা করে। স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে কার্যকর হইবার জন্য বিরোধী দলের পক্ষে সুসংবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৫। **গণভোট, গণ উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি :** প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই সকল পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসৃত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই।

৬। **জনগণের সাহসিকতা :** স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল স্বাধীনতাকামী জনগণের সাহসিকতা। স্বাধীনতাকে উপলব্ধি ও রক্ষা করিতে হইলে নাগরিকগণের পক্ষে প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ। বিনামূল্যে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না—ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিকগণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মূল্য। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিসের (Pericles) ভাষায় বলিতে পারা যায়, 'চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য" (Eternal vigilance is the price of liberty)। স্বাধীনতাকামী নাগরিককে ক্ষুদ্র সুখশান্তি বিসর্জন দিয়া যক্ষের মত সজাগ থাকিতে হইবে এবং স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত হইলে অবিলম্বে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সংগ্রামে ছোটখাট নহে, চরম ত্যাগের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এইজন্য পেরিক্লিস আরও বলিয়াছেন যে, "সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র" (The secret of liberty is courage) এবং মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "যে জনসমাজ চরম ত্যাগ করিতে সমর্থ তাহারাই আদর্শের উচ্চতম শিখরে উঠিতে সমর্থ হয়।"[১] জনগণের সাহসিকতা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য আকাংক্ষা থাকিলেই বিচারালয়ের স্বাধীনতা, সংবিধানে অধিকার ঘোষণা ইত্যাদি অধিকার-সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা (institutional devices) কার্যকর হইতে পারে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় অনেক দেশেই প্রতিষ্ঠানগত সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জনগণের আগ্রহ ও দৃঢ়তার অভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।[২]

কয়েকটি রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা : ল্যাস্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও এরূপ কতকগুলি পদ্ধতির প্রয়োজন হয় যাহা অবলম্বন করিয়া সাহসিকতা লক্ষ্যাভিমুখে চলিবে। সুতরাং স্বাধীনতাকাংক্ষী সাহসী নাগরিক

১. "... a nation that is capable of limitless sacrifice, is capable of rising to limitless heights." *Gandhi : Young India*

২. "If enough people are sufficiently determined to preserve and exercise their rights, these rights will be exercised and preserved, and the institutions will then be found to do the job." Leslie Lipson : *The Great Issues of Politics*

সম্প্রদায়ের পক্ষে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। এককভাবে স্বাধীনতার জন্য আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার আবেগ প্রধান হইলেও সম্পূর্ণ রক্ষাকবচ নহে।

সাম্যের প্রকৃতি, উদ্ভব ও প্রসার (The Nature, Origin and Development of Equality) : আমরা দেখিয়াছি যে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা (opportunities) স্বীকার করিয়া লইয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং ইহাই রাজনৈতিক ন্যায় (political justice)। এই সকল সুযোগসুবিধাকে অধিকার (Rights) বলা হয়। অধিকার নাগরিকগণের মধ্যে বণ্টিত হয় স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতি অনুসারে।

অতএব, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ধারণা।

ল্যাস্কির মতে, বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি যে-সকল ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া নাগরিকগণের সাহসিকতা স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় রাখে তাহারা সাম্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। অর্থাৎ, বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার সকলেই সমভাবে ভোগ করিবে ; নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা সকলেরই অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করিবে। অতএব, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। রুশোর ভাষাতে বলা যায় যে সাম্য ব্যতিরেকে স্বাধীনতার অস্তিত্বই বজায় থাকিতে পারে না।

পূর্বে কিন্তু স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ককে এইভাবে দেখা হইত না। তখন স্বাধীনতাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এবং সাম্যকে সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হইত। সুতরাং টক্‌ভিল, লর্ড অ্যাক্টন প্রভৃতি সাম্য ও স্বাধীনতাকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অ্যাক্টন এক স্থানে বলিয়াছেন, "সাম্যের জন্য আবেগ স্বাধীনতার আশাকে নির্মূল করিয়াছে।" তাঁহারা সাম্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

সাম্যের স্বরূপ : টনির (R. H. Tawney) মতে, সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী নয়, ইহা স্বাধীনতার জন্য অত্যাবশ্যক।[১] ল্যাস্কি বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলিতে সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতা বা অভিন্নতা বুঝায় না। সাম্য বলিতে ব্যবহারের অভিন্নতাও বুঝায় না। কার্যক্ষেত্রে যতক্ষণ মানুষের ক্ষমতা ও স্বভাবে পার্থক্য থাকিবে ততক্ষণ সকলে সমাজের নিকট হইতে একই প্রকার ব্যবহার পাইতে পারে না, পাইলে সাম্যের আদর্শ ব্যাহত হয়। প্রকৃত সাম্য প্রত্যেকের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে। সমাজের নিকট হইতে সকলে যদি একই প্রকার ব্যবহার পায় তবে সকলের আত্মোপলব্ধির পথ সুগম হইতে পারে না। সকল মানুষ একই প্রকার কর্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই—সকলের অভাব-অভিযোগও এক নহে। সুতরাং তাহাদের

১. "... a large measure of equality, so far from being inimical to liberty, is essential to it." R. H. Tawney : *Equality*

একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি অভিন্ন ব্যবহার করা সাম্যের উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং বর্তমানে সাম্য বলিতে ব্যবহারের অভিন্নতা বুঝায় না বুঝায় সুযোগের সমতা। অন্যভাবে বলা যায়, সাম্য বলিতে বুঝায় সমাজের সকল ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা প্রদান এবং বিভেদমূলক বিশেষ সুযোগের বিলোপসাধন।[১] মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে সাম্য হইল সকল শ্রেণীর অবসান। একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজ প্রবর্তিত হইলেই পূর্ণাংগ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সমাজতন্ত্রে সাম্যের দিকে বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইলেও পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।

সাম্য সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটন : রিচি (Ritchie) বলেন, সাম্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মগ্রহণ করে বৈষম্যের 'উত্তরাধিকার' হিসাবে। প্রাচীন অভিজাততান্ত্রিক দাসপোষণকারী সমাজে অভিজাতগণ প্রজা ও ক্রীতদাসের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের স্বাধীন ও পরস্পরের সহিত সমান মনে করিতে থাকেন। স্টোইকদের মতামত, রোমক আইন ও খ্রীষ্টধর্ম সাম্যের ধারণার বেশ কিছুটা প্রসার-সাধন করে। স্টোইকরা প্রচার করেন, যেহেতু মানুষ প্রজ্ঞাশীল জীব—অর্থাৎ ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত—সেহেতু সামাজিক বা অন্য কোন মর্যাদায় সকলেই সমান। রোমক আইন সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কতকগুলি নীতির (*jus gentium*) কথা উল্লেখ করে। অপরদিকে আবার নীতি ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণ ইতর জীবগণের সহিত তুলনায় মানুষের আত্মায় অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া প্রচার করিতে থাকেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। পরে ইহা হইতে আরও একপদ অগ্রসর হইয়া প্রচার করা হইতে লাগিল যে, মানুষের দৃষ্টিতে এবং আইনের সমক্ষে সকলেই সমান।

সাম্য সম্বন্ধে ধারণা এইভাবে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহা বহুদিন পর্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের সময় সাম্যের সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। উভয় বিপ্লবের বাণী হইল সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রী। ১৭৮৯ সালে ফরাসী জাতীয় সংসদের (National Assembly) অধিকার ঘোষণায় বলা হয় যে অধিকার সম্পর্কে সকল মানুষই পরস্পরের সমান (All men are born free and equal in respect of their rights)। অর্থাৎ, সকলকে সমান গণ্য করিতে হইবে, প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির জন্য সমান সুযোগসুবিধা দিতে হইবে।[২] 'সমান সুযোগসুবিধা' বলিতে বুঝায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কর্মদক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করা। উপরি-উক্ত উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে, কারখানার সাধারণ শ্রমিকের শ্রমের মূল্য আইনস্টাইনের শ্রমের মূল্যের সমান হইবে না সত্য, কিন্তু কারখানার শ্রমিকের সন্তানকে আইনস্টাইন হইবার সুযোগ দিতে হইবে। এই প্রসংগে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে উপরি-উক্ত দুই বিপ্লবই হইল বুর্জোয়া বিপ্লব। সুতরাং সাম্যের অর্থ করা হইল আনুষ্ঠানিক আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হইল না।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র 'অনিষ্টকর অথচ অপরিহার্য' প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। সকলের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রকে বর্তমানে এক বিরাট জনকল্যাণ সমিতি (a benefit club on a grand scale) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্যের জন্য দাবি করা হইত যে, সকল প্রকার বিশেষ সুযোগের বিলোপসাধন ও ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার

১. Laski : *A Grammar of Politics*

২. "This means that all men are to be *treated as equal*. ...There should be equality of opportunity." Lloyd : *Democracy and Its Rivals*

রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবসান করা হউক। বর্তমানে দাবি করা হয় যে, সকল প্রকার বিশেষ সুযোগের বিলোপসাধন করা হউক কিন্তু রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) রিকার্ডো (Ricardo) প্রভৃতি অর্থবিভাবিদ্ ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে বৈষম্যমূলক সমাজে সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুযোগসুবিধা দেওয়া যায় না। সকলকে যথাযোগ্য সুযোগসুবিধা দিতে হইলে প্রয়োজন হইল বৈষম্য অপসারণের।

রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বৈষম্যের অপসারণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং সাম্য স্বাধীনতার মতই রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

স্বরূপ: উভয়েই আইনের মাধ্যমে রূপ গ্রহণ করে বলিয়া বর্তমানে স্বাধীনতার মত সাম্য সম্বন্ধে ধারণাও আইনগত। আইনসংগত সাম্য কখনও স্বাধীনতার বিরোধী হইতে পারে না। স্বাধীনতা হইল প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির উপযোগী পরিবেশ। ইহা সৃষ্ট হয় রাষ্ট্র কর্তৃক সকলের সমান অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং সকল প্রকার বিশেষ সুবিধার বিলোপসাধন দ্বারা। এই সমানাধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং বিশেষ সুবিধার বিলোপসাধনই প্রকৃত সাম্য। ইহাই স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব করে।

সুযোগসুবিধার সমতা সমান পরিণতি নয়: সাম্যের স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাম্যের অবস্থা বলিতে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা বুঝায় মাত্র, সকলের সমান পরিণতি বুঝায় না। সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিলেও পরিণতিতে বিভিন্ন ফল দেখা যাইবে। পরিণতি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে না, করে ব্যক্তির উপর।[১] রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট সাম্যের অবস্থাকে ব্যক্তি কিভাবে নিজের আত্মশক্তির বিকাশের কার্যে লাগাইবে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। সাম্যের ভিত্তিতে আত্মোপলব্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের কার্য। আদর্শ রাষ্ট্র তাহাই করে।

আইনগত সাম্য ও উহার বিভিন্ন রূপ (Legal Equality and Its forms): রাষ্ট্রাভ্যন্তরে, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সম্পর্কে মানুষে মানুষে যে সাম্য তাহাকেই আইনগত সাম্য বলা হয়। সংক্ষেপে ইহাই হইল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বা সমানাধিকার। রাষ্ট্রের আইন সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে, সকলের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

আইনগত সাম্য রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ সাম্য। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য স্বীকৃত হইলেও বৃহত্তর সমাজজীবনে বৈষম্য ইহার উপলব্ধিকে অসম্ভব করিয়া

---

১. "Equality is ... the beginning, not the end; the end depends on ourselves and on the use which we make of the equal conditions guaranteed to us, *as a beginning*, by the State." Barker

তুলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সকলের সমানভাবে নির্বাচিত হইবার অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ-না সকলের সমান শিক্ষার সুযোগ থাকে ততক্ষণ অধিকাংশের নিকট এই সমানাধিকার বা সাম্য মূল্যহীন। তেমনি আবার ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যও অর্থহীন। রাষ্ট্রের আইন সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, কিন্তু ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের দ্বারস্থ হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং আইনগত সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সমাজের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। এই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রকে সাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়, আইন দ্বারা বর্ণ বৈষম্য, ধর্মগত বৈষম্য দূর করিতে হয়, ইত্যাদি। ফলে দেখা যাইতেছে, আজ যাহা সামাজিক বৈষম্য বলিয়া পরিগণিত, কাল তাহা আইনগত সাম্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

আইনগত সাম্য—ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—এই তিন রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

১। **ব্যক্তিগত সাম্য (Civil Equality)**: সমস্ত সামাজিক অধিকার সমভাবে ভোগ করিবার সুযোগ থাকিলে ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যায়। ব্যক্তিগত সাম্য থাকিতে হইলে সকল নাগরিকের একই প্রকার মৌলিক অধিকার থাকিবে। অর্থ প্রতিপত্তি ধর্ম বর্ণ বা অন্য কোনও কারণে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করা চলিবে না। আইনের অনুশাসন দ্বারাই হউক আর সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াই হউক, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক অধিকারভোগে সমতা বজায় রাখিতে হইবে।

২। **রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality)**: রাজনৈতিক অধিকারভোগের ক্ষেত্রে সমতাকেই রাজনৈতিক সাম্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে দণ্ডিত অপরাধী, বিকৃত মস্তিষ্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যতিরেকে সকলেরই অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের সংগে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনারও সমান সুযোগ থাকে। বর্তমান দিনের বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগ বলিতে বুঝায় নির্বাচনাধিকার—অর্থাৎ নির্বাচিত হইবার ও নির্বাচন করিবার অধিকার এবং সরকারী চাকরিতে অধিকার। সুতরাং রাজনৈতিক সাম্য উপলব্ধির জন্য জাতি-ধর্ম, ধনী নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্যতার সর্ত পূরণ করিলে সকলকে নির্বাচনাধিকার এবং সরকারী চাকরিতে অধিকার দিতে হইবে।

৩। **অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality)**: অর্থনৈতিক সাম্যকে বর্তমানে আইনসংগত সাম্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কারণ ইহা ব্যতিরেকে অন্য প্রকার আইনসংগত সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়িতে পারে। সকলকে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করিবার জন্যই সাম্যের প্রয়োজন। বলা যায়, এই উদ্দেশ্যে প্রথম প্রয়োজন হইল অর্থনৈতিক সাম্যের।

ম্যাথু আরনল্ড বলিয়াছেন, "অর্থনৈতিক সাম্যহীন সমাজে সকলেই জরাগ্রস্ত। এরূপ সমাজে, উচ্চশ্রেণী উদরপূর্তির দিকে লক্ষ্য রাখে, মধ্যবিত্তশ্রেণী নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয় এবং নিম্নশ্রেণী পশুতে পরিণত হয়।" সুতরাং কাহারও সত্তার বিকাশ সম্ভব হয় না।

অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিতে দেখিলে—অর্থাৎ সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইহাতে বিশ্বাস করিলে, এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় বলা চলে। অতএব, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।

স্বরূপ: অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় প্রথমে সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয় অভাবের পরিতৃপ্তি। সকলের বিশেষ অভাব পরিতৃপ্ত হইবার পর সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী বৈষম্য বর্তমান থাকিতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাত্র সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী বৈষম্য বর্তমান থাকিতে পারে, তাহার অধিক নহে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ডে বৈষম্যের পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক অপ্রয়োজনীয় অসংগত বৈষম্যের বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ল্যাস্কির ভাষায় ইহা হইল, "অনুপাত নির্ধারণের সমস্যা" (Equality is most largely a problem of proportions)। প্রত্যেক বৈষম্য যে অনুপাতে সামাজিক কল্যাণ সাধিত করে সেই অনুপাতেই তাহাকে বর্তমান রাখা যাইতে পারে—কোন ক্ষেত্রেই অনুপাতাতিরিক্তভাবে নহে।

স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্য: স্বাধীনতা হইল আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ রক্ষার জন্য মানুষকে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির। শৃংখলাবদ্ধ থাকিয়া কেহ সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্যই আত্মশক্তিকে মুক্ত করে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মুক্ত আত্মশক্তি সমাজে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সাম্যের স্বরূপ বজায় রাখিয়া স্বাধীনতার সেই পরিবেশ রক্ষা করে একমাত্র যেখানে মানুষ তাহার পূর্ণ আত্মোপলব্ধির সুযোগ পায়।

বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বরূপ (Nature of Liberty and Equality in different Social Systems)

উপক্রমণিকা: স্বাধীনতা ও সাম্য ধারণা দুইটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত। ধারণা দুইটিকে এক অর্থে সামাজিক অনুভূতি, আকাংক্ষা ও মূল্যবোধের প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিপূরকতা: ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা হইল এমন পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যাহার ফলে ব্যক্তি তাহার সত্তাকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।[১] স্বাধীনতা মানুষের লক্ষ্য নয়, ব্যক্তিসত্তা উপলব্ধির পন্থা

১. ২৮৮, ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

মাত্র।[১] সাম্য স্বাধীনতার অন্যতম সর্ত: সাম্যের উপরই নির্ভর করে স্বাধীনতা সৃষ্টির পরিবেশ। সাম্যের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগত সুযোগ সৃষ্টিতে বাধা বা রাষ্ট্রকে পক্ষপাতদুষ্ট হইতে দেয় না। আবার অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে অন্যান্য প্রকারের সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ধনী-দরিদ্রে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সম-নির্বাচনাধিকারের তাৎপর্য কোথায় ?

বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ: মানবসমাজের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে বিভিন্ন যুগে স্বাধীনতা ও সাম্য বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। খাদ্যাহরণের যুগে মানুষ প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নক—অর্থাৎ পরাধীন থাকিলেও ঐ সমাজ ছিল সম্পূর্ণ সমভোগী—মানুষে মানুষে পূর্ণ সাম্যের অবস্থা বর্তমান ছিল। সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য সকলে মিলিয়া ভোগ করিত, সম্পত্তি যাহা ছিল তাহা হইল গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পত্তি—ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বলিয়া কিছু ছিল না।

কালক্রমে সমাজ জীবনের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। মানুষ আপন-পর বিচার করিতে শিখিল। ক্রমশ দাস-সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন হইল। দাস-সমাজে দাসদের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না বলিয়া সাম্যেরও অস্তিত্ব ছিল না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্ত-প্রভুরা ভূমিদাসদের উপর তাহাদের অধিকার কায়েম করিয়া সাম্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিল। ইহার পর ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হইল। সুতরাং সাম্যবিহীন স্বাধীনতার তাৎপর্য হইয়া দাঁড়াইল মূলধন-মালিকদের কর্তৃত্ব। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ গণতান্ত্রিক হইলেও (কারণ ইহারা আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রভৃতি অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করে) গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইয়া মূলধন-মালিকদের হাত হইতে ক্ষমতা শ্রমজীবীদের হস্তে অর্পণ করে। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শোষণ প্রভৃতির অবসান ঘটে এবং সমাজে অধিকমাত্রায় স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের আহ্বান জানানো হয় যাহাতে সমাজ সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত ও স্বাধীন সমাজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং এই সমাজের লক্ষ্য হইবে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র।

বর্তমানে মোটামুটিভাবে প্রধানত দুই প্রকারের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (ক) উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। স্বাধীনতা ও সাম্য প্রসংগে উভয় সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টিভংগি পৃথক।

ক। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য (Liberty and Equality in Liberal Democracy): উদারনৈতিক গণতন্ত্রে স্বাধীনতার ধারণাটি গ্রহণ করা হইয়াছে প্রাচীন গ্রীস, বিশেষ করিয়া, এথেন্স হইতে। এথেন্সবাসীরা স্ব-শাসন ও দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্তির মধ্যে স্বাধীনতার তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এই ধারণা বিবর্তিত হইয়া পরবর্তীকালে বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা হইয়া দাঁড়াইল। জন স্টুয়ার্ট মিল কিছুটা পরিবর্তিত আকারে

১. *"Liberty is the means, not the end."*

ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার মতে, স্বাধীনতা বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা নয়। স্বাধীনতা হইল মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির বলিষ্ঠ বিভিন্নমুখী ও অব্যাহত প্রকাশ। মিলের মতে, সুস্থ সবল সমাজজীবনের স্বার্থে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক কাজে (self-regarding action) হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। তাঁহার মানসিক বৃত্তির সুস্থ প্রকাশ ঘটা দরকার।[১]

উদারনৈতিক স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য : উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা—অর্থাৎ সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার অবসান। এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মুনাফা প্রভৃতিকে সমর্থন করে। স্বভাবতই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব সংখ্যালঘু মালিকশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্র অবাধ ও প্রতিবন্ধকতাহীন স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত (civil) স্বাধীনতার (যথা, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার ইত্যাদি) উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity) স্বাধীনতার অংগ হিসাবে গণ্য হয়। এই ধারণা অনুসারে পুঁজিবাদ (capitalism) ও ইহার বিকাশকে স্বাভাবিক অবস্থা (natural order) বলিয়া মনে করা হয়। চতুর্থত, এই ব্যবস্থা কতিপয় অভিজাতশ্রেণীর শাসনকে (elitism) সমর্থন করে। বিশেষ শ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত।[২]

সাম্য : সাম্য সম্পর্কে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ধারণা পোষণ করা হয় তাহার উৎস হইল ১৭৮৯ সালে ফরাসী জাতীয় সংসদের ঘোষণা। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়, "সকল মানুষই পরস্পরের সমান"। ডাইসির আইনের অনুশাসন (The Rule of Law) তত্ত্বের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality before the Law)। ভারতীয় সংবিধান ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সাম্যের অধিকারকে অন্যতম অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করিবে (Equal Protection of the Laws) এ-ধারণা স্বীকৃত। অবশ্য ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে যতটা সত্য কার্যক্ষেত্রে ততটা সত্য নয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সাম্যের স্বরূপ : উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বৈষম্যের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ডাইসি কল্পিত 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণাটি ব্রিটেনে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নহে। সরকারী কর্মচারী ও শাসনকর্তৃপক্ষ আইনের দৃষ্টিতে পৃথক মর্যাদা পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অব্যাহত বিকাশ সমর্থিত হয় বলিয়া আর্থিক বৈষম্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা

১ ২২০ পৃষ্ঠা দেখ।

২. Herbert Aptheker : *The Nature of Democracy, Freedom and Revolution*

যায়[১]। পৃথিবীর বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবিদ্বেষ আজও রহিয়াছে। জনগণের অধিকারের সমতা রক্ষায় বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা অনেক রাষ্ট্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সমাজজীবনে ব্যক্তিগত বা বিশেষ সুবিধার অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ সাম্য ধারণাটির প্রতি আঘাত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।[২] সুতরাং বলা হয়, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য বর্তমান থাকিলে স্বাধীনতাও অর্থহীন হইয়া পড়ে।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণবিহীন বলিয়া কল্পনা করা হয়। স্বভাবতই স্বাধীনতা কতিপয় ব্যক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা অসম স্বাধীনতা বলিয়াই বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক প্রতিপত্তিশালীর স্বার্থকে রক্ষা করে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেই থাকে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যে স্বাধীনতা নির্ভরশীল একথা সমর্থিত হয় না। স্বভাবতই বৈষম্য এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।

খ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্য (Liberty and Equality in Socialist System): সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌গণ মনে করেন যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পক্ষপাতমূলক। ইহা শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। স্বাধীনতা কোন অবস্থাতেই আর্থিক কাঠামোর সহিত সংগতিবিহীন হইতে পারে না—সর্বদাই আর্থিক কাঠামোর চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণের মতে, রাষ্ট্রে যতদিন শ্রেণীবিভাগ থাকিবে ততদিন স্বাধীনতার ধারণা বৈষম্যমূলক হইতে বাধ্য।[৩] মাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বৈষম্যের অবসান ঘটাইয়া আর্থিক স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রসার সম্ভবপর।

বুর্জোয়া দৃষ্টিভংগির বিরোধিতা: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রাধান্যের নীতিকেও স্বীকার করে না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইল সংখ্যালঘিষ্ঠ দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শোষণ এবং সবকিছু প্রতিষ্ঠা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থের ও দৃষ্টিভংগির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই বুর্জোয়া দৃষ্টিভংগির তীব্র প্রতিবাদ করে। ইহা বুর্জোয়া শাসকদের ঔপনিবেশিক

১. ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অধিকার ঘোষণায় দেখা যায় যে এই অধিকার ছিল মূলত আইনগত ও রাজনৈতিক এবং জনগণের অধিকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাইলেও শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে ইহাকে সীমিত করা হয়।

২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য এই প্রসংগে উল্লেখ্য।

৩. "In exposing the class basis of past and present ideas and realisation of liberty, Marxism shows that only by the abolition of class liberties and class privileges can the goal of a truly free society be achieved." R. Hilton

শাসনের প্রতিষ্ঠা, শাসকের জাতিগত উৎকর্ষতার তত্ত্ব প্রসার ও শোষিত জনগণের উৎকর্ষহীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অর্থনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ : সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সাম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। উৎপাদনের উপাদানের সামাজিক মালিকানা ও ইহার সমবণ্টন নীতিই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

আর্থিক বৈষম্য সামাজিক বৈষম্যের নামান্তর। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া এই বৈষম্যের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দান, অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য। বিশেষ সুযোগের বিলোপসাধন, রাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক আচরণের অবসান, ন্যায় ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে কার্যকর করা, সহযোগিতার নীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়। তবে মনে রাখিতে হইবে সমাজতন্ত্রে এমন প্রাচুর্য আসে না যে উৎপন্ন সম্পদকে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী দেওয়া সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রধান নীতি হইল প্রত্যেকের কার্য অনুসারে আয় বণ্টন করা। সুতরাং সমাজতন্ত্রে আয়ের বৈষম্য কিছুটা থাকিয়াই যায়। একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

পুরস্কারের তারতম্য : সমব্যবহার এবং সমপুরস্কার (equality of attitude and reward) প্রদানের মাধ্যমেই সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব—সমাজতন্ত্রবিদগণ এই ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে, মানুষের সামর্থ্য, প্রয়োজন এবং চাহিদা যতদিন পৃথক ততদিন সকলের প্রতি সমব্যবহার সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া পুরস্কারের তারতম্য (variation of reward) বৈষম্যের লক্ষণ নয়। কোন ব্যক্তির সামর্থ্য এবং কাজ করিবার ক্ষমতা বেশী হইলে সে অতিরিক্ত পুরস্কার দাবি করিতে পারে।

সাম্যের পরিবেশের সর্তাবলী : সমাজতন্ত্রবিদগণের অনুসরণে ল্যাস্কি সাম্যের পরিবেশের তিনটি সর্ত নির্দেশ করিয়াছেন : (১) সমাজজীবনে বিশেষ সুবিধার অনস্তিত্ব, (২) প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্ব-নির্ভরশীলতা (অর্থাৎ, একজনের স্বাধীনতা অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না এবং (৩) রাষ্ট্রের পক্ষপাতহীন আচরণ। ইহাদের ফলে সকলে মোটামুটি সমপর্যায়েই স্থিত হইবে।[১] ইহারা আবার প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্তও বটে।

আন্তর্জাতিক সাম্য : সমাজতন্ত্রবিদ্‌গণ আন্তর্জাতিক সাম্যেও বিশ্বাসী। বক্তব্য : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ স্বাধীনভাবে নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করিবে। অবশ্য ইহার অর্থ অবাধ স্বাধীনতা নয়। বৈদেশিক ব্যাপারে সকল দেশ অবশ্যই

১. "Equality implies a certain levelling process ... no man shall be so placed that ... he can overreach his neighbours." Laski

আন্তর্জাতিক আইন (International Law), রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্রের (cooperation and brotherhood) পথ প্রশস্ত করিবে। পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সাম্যের নীতিকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্বীকৃতি দিলেও সাম্রাজ্যবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নীতি এই সকল রাষ্ট্রে প্রশ্রয় পায়। স্বভাবতই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধ, সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে।

ল্যাস্কি বলেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠনেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের বিস্তার ঘটানো সম্ভব।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করেন, পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রসারের ফলেই প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশ্বের সর্বহারা জনগণের ঐক্যবোধে, নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যে, শোষণের অবসানেই আন্তর্জাতিকতাবাদের সাফল্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের সম্যক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সাম্য ও স্বাধীনতার পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে পারে।

গ। কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বরূপ (Liberty and Equality in Authoritarian System): কোন কোন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা (Authoritarian System) বলিয়া এক পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এই ব্যবস্থা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির শাসনকে সমর্থন করে এবং ইহাতে সর্বাত্মক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার (Totalitarian System) কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যাদির সকল দিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, রাজনৈতিক কাজকর্ম এক বিশেষ মতাদর্শ (যেমন, ফ্যাসীবাদী মতাদর্শ) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রচারযন্ত্র ও বিচার-ব্যবস্থা শাসনকর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্রের (Autocracy) কতকগুলি লক্ষণও দেখা যায়। যেমন, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনকে সীমাবদ্ধ করা, জনমতকে অগ্রাহ্য করা, শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা জনগণের আনুগত্য লাভের প্রচেষ্টা, ইত্যাদি।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এই ধরনের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বরূপ কি? সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, ইহাতে জনগণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং আধিপত্য বিস্তার করে। সাম্য বলিয়া কিছু থাকে না। রাষ্ট্রের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট হয়। একদিকে থাকে, জনগণের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব অন্যদিকে কতিপয় ব্যক্তি ভোগ করে বিশেষ সুবিধা। কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া ধ্যানধারণা, রীতিনীতিকেই সমর্থন করে।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতার যে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আছে, এই ব্যবস্থায় তাহারও অভাব লক্ষ্য করা যায়। আইনের অনুশাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতির কোন উল্লেখই এইরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে উপেক্ষা করে। ইহা সর্বাত্মক রাষ্ট্রের হাতে ব্যক্তির অধিকারকে বলি দেয় এবং যুদ্ধবাদকে সমর্থন করিয়া আন্তর্জাতিকতাবাদের বিনাশ ঘটায়। সুতরাং কোন দিক দিয়াই ইহা স্বাধীনতা ও সাম্যের অনুপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণা (The Marxist View of Liberty): স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

মার্ক্সবাদিগণ স্বাধীনতা বলিতে সেইরূপ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে মানুষ তাহার চাহিদা ও আশা-আকাংক্ষা পূরণ করিয়া তাহার কায়িক ও মানসিক বিকাশের পূর্ণাংগ সুযোগ পায়, এবং তাহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি ও তাহার সৃজনশীল শক্তির উন্মেষ-সাধনে সমর্থ হয়। মার্ক্সবাদিগণ মাত্র ব্যক্তিবিশেষের বিকাশকেই স্বাধীনতার লক্ষ্য মনে করে না, ইহারা সমষ্টিগতভাবে সকল ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির কথাই বলেন।

সংজ্ঞা: মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি হইতে অন্যতম লেখক সেলসাম (Howard Selsam) স্বাধীনতার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সমাজে বসবাসকারী লোকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণপ্রাপ্তির স্বাধীনতা।[১]

মার্ক্সের মতে, মানুষের সমগ্র প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক দ্রব্যাদি লাভ, পরিতৃপ্তিভোগ এবং আশা-আকাংক্ষা পূরণের সামর্থ্যকে স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।[২] এইরূপ স্বাধীনতাই হইল মানুষের লক্ষ্য এবং ইহার দিকেই ইতিহাসের গতি। এখন এই আদর্শের উপলব্ধির দুইটি বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন: (ক) মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তির (the forces of nature) উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া উৎপাদনে প্রাচুর্য (abundance) আনিতে হইবে, (খ) সামাজিক সংগঠনকে সচেতনভাবে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে (conscious and rational) সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এই স্বাধীনতা সমভোগবাদী সমাজেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

স্বরূপ—ইতিবাচক স্বাধীনতা. স্বাধীনতা নেতিবাচক নয়—ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা (absence of restraints) বুঝায় না। ইহা ইতিবাচক কারণ,

---

১. "Freedom in the fullest sense can mean only the freedom of men collectively, living together in society, to attain the highest individual and collective well-being—to attain fullest, freest functioning of each individual in relation to every other." Howard Selsam: *What is Philosophy?*

২. "For Marx freedom means the ability to achieve the totality of human goods satisfactions and aspirations, material and spiritual ... ." John Lewis *Marxism and the Open Mind*

ইহা দ্বারা বুঝায় প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার অস্তিত্ব।[১] এই সকল সুযোগসুবিধাকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। অতএব, মার্ক্সীয় ধারণায় স্বাধীনতাকে অধিকার হিসাবেই গণ্য করা যায়।

স্বাধীনতার সম্প্রসারণ : ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে স্বাধীনতা সম্প্রসারণশীল ধারণা। অর্থাৎ, সমাজ-বিবর্তনের সংগে সংগে স্বাধীনতাও সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। আদিম সমাজে মানুষ প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নক ছিল। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ভিত্তি (material base) গড়িয়া উঠে নাই।

এই বৈষয়িক ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে সুরু করিল মানুষ খাদ্যাহরণের যুগ হইতে খাদ্যোৎপাদনের যুগে পদসঞ্চার করিলে। অবশ্য তখন মানুষ অভাব হইতে মুক্ত হইলেও আর এক দিক দিয়া গিয়া পড়িল স্বাধীনতা-হীনতার মধ্যে—সমাজে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উদ্ভব ও শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টির ফলে মালিকশ্রেণী বিত্তহীন শ্রেণীকে তাহার শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত করিতে লাগিল। অর্থাৎ, মালিকশ্রেণী বিত্তহীন শ্রেণীকে শোষণ করিয়া সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল।

ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের সিংহভাগ মালিকশ্রেণী ভোগ করিতে লাগিল আর সহায়সম্বলহীন শ্রেণী উন্নতির ফলভোগ হইতে বিশেষভাবে বঞ্চিত হইতে লাগিল। সুতরাং বিত্তহীন শ্রেণীর স্বাধীনতা বিত্তবানদের স্বাধীনতা দ্বারা সংকুচিত হইয়া পড়িল (The liberty of one class is negated by the liberty of another class)। তবে ইহা অনস্বীকার্য সমাজ বিবর্তনের ফলে ধাপে ধাপে সমাজের অগ্রগতি হইয়াছে এবং স্বাধীনতার পরিধি বিস্তৃততর হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে উৎপাদনের উন্নতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার এবং শ্রমজীবীদের সংগ্রামের ফলে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের অসংগতি এবং করণীয় : তবুও কিন্তু মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমজীবীদের শোষণের ফলে প্রাচুর্য ও স্বাধীনতাভোগের যে-সম্ভাবনা রহিয়াছে ধনতান্ত্রিক সমাজে কার্যকর করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং জনগণের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিতে হইলে ও মানবকল্যাণে উৎপাদনের অভূতপূর্ব উন্নতিকে নিয়োজিত করিতে হইলে সামাজিক ব্যবস্থা ও সম্পর্ককে পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদন-শক্তির সহিত সংগতি স্থাপন করিতে হইবে।[২] ইহার জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইবে। মানুষ ইচ্ছামত সামাজিক সংগঠনকে ঢালিয়া সাজিতে পারিবে এবং কমিউনিস্ট সমাজ-গঠনের দিকে অগ্রসর হইবে। এঙ্গেলসের ভাষায়, মানুষ তখন প্রয়োজনীয়তার

১. "No satisfactory conception of liberty in society can be arrived at unless it includes positive rights and privileges". R. Hilton : *Communism and Liberty*

২. John Lewis : *Marxism and the Open Mind*

রাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার রাজ্যে পদার্পণ করিবে ('leap from the realm of necessity into the realm of freedom')।[১]

সমালোচনা: একাধিক দিক দিয়া স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণার সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, মিল্টন ফ্রীডম্যানের অনুসরণে বলা যায় যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। কারণ ইহা বলপ্রয়োগের উপর ভিত্তিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা (a coercive social and political order)।[২] দ্বিতীয়ত, অনেকে মন্তব্য করেন যে সর্বহারার নায়কত্ব (dictatorship of the proletariat) কার্যক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের নায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং ইহার তাৎপর্য হইল দলের কতিপয় প্রভাবশীল নেতাদের নায়কত্ব। সুতরাং এখানে কোন গণতন্ত্র কার্যকর হয় না এবং স্বাধীনতাও সংরক্ষিত হয় না। কারণ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক নায়কত্ব (bureaucratic dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর:

১ প্রাচীন অর্থে স্বাধীনতা হইল নিয়ন্ত্রণবিহীনতা, বর্তমান অর্থে অধিকারের অস্তিত্ব। অবশ্য অধিকারসমূহও নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে।

২ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক অংগাংগি। কারণ, সাম্যের তাৎপর্য হইল প্রয়োজনীয় অধিকারের সমবণ্টন এবং বৈষম্যের অনস্তিত্ব।

৩ স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

৪ স্বাধীনতার মূল শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা, (খ) স্বাভাবিক ও আইনগত স্বাধীনতা এবং (গ) সামাজিক ও আইনগত স্বাধীনতার মধ্যে।
আইনগত স্বাধীনতাকে আবার (ক) ব্যক্তি স্বাধীনতা হিসাবে দেখা যাইতে পারে।

৫. যে-সকল ব্যবস্থা দ্বারা আইনগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় তাহাদেরই বলে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—যথা (ক) সংবিধানে মৌলিক অধিকার ঘোষণা, (খ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) আইনের অনুশাসন, (ঘ) দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা, (ঙ) গণভোট ইত্যাদি এবং (চ) জনগণের সাহসিকতা।

৬. সাম্যের তাৎপর্য হইল সুযোগসুবিধার সমতা।

৭ মাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সাম্য বহুলাংশে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

৮. মার্ক্সীয় ধারণায় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিলাভের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাংক্ষা পূরণের সামর্থ্যকে।

---

১ Engels: *Anti-Duhring*

২. Milton Friedman: *Capitalism and Freedom*

অনুশীলনী

1. **Explain the concept of liberty.**

[স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা ব্যাখ্যা কর।] (২৮৮, ২৯০-৯২ পৃষ্ঠা)

2. **"Sovereignty and Liberty are not contradictory terms." Examine the statement.**

["স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা পরস্পরবিরোধী প্রতিশব্দ নহে।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।]

(২৮৮, ২৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

3. **Write a critical note on the relation between law and liberty.**

[আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখ।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

4. **"Liberty without law makes no sense." Explain.**

["আইন ব্যতীত স্বাধীনতা অন্তঃসারশূন্য।" ব্যাখ্যা কর।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

5. **Explain the concept of Liberty in Political Science. Does the restraint of Law mean the curtailment of Liberty ?**

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। আইনের নিয়ন্ত্রণ বলিতে কি স্বাধীনতার হ্রাস বুঝায় ?] (২৯০, ৯২, ২৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

6. **Explain the concept of 'liberty' in Political Science and point out safeguards of liberty in a modern State.**

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর এবং আধুনিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলির উল্লেখ কর।] (২৮৮, ২৯০-৯২ এবং ২৯৮-৩০১ পৃষ্ঠা)

7. **"Eternal vigilance is the price of liberty and those who are trained to that vigilance become conscious guardians of liberty." Explain the statement.**

["চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য এবং সেই সতর্কতার প্রবক্তা নাগরিকই স্বাধীনতার আত্মচেতনাসম্পন্ন রক্ষক হইতে পারে।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।] (২৯৮-৩০১ পৃষ্ঠা)

8. **Discuss the relation between liberty and equality.**

[স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (২৯০-৯২, ৩০২-০৩ পৃষ্ঠা)

9. **"The passion for equality makes vain the hope of freedom." Discuss.**

["সাম্যের জন্য আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে নির্মূল করে।" আলোচনা কর।]

(২৯০-৯২, ৩০২-০৪ পৃষ্ঠা)

10. **Analyse the nature of Liberty and Equality in any one of the following : (a) Liberal Democracy ; (b) Socialist System.**

[নিম্নলিখিত দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে যে-কোন একটিতে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর :

(ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র ; (খ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।] (৩০৮-০৯, ৩০৯-১১ পৃষ্ঠা)

11. **Briefly describe the nature of Liberty and Equality in different social systems.**

[বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (৩০৬-১২ পৃষ্ঠা)

12. **Write a note on the Marxist view of Liberty.**

[স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণার উপর একটি টীকা লিখ।] (৩১২-১৪ পৃষ্ঠা)

১৫ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
(ENDS AND FUNCTIONS OF THE STATE)

"The great expansion in recent times of functions of general welfare is tending more than anything else to foster new conceptions of the nature of the state." R. M MacIver

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে মতবিরোধের কারণ কি ?

২. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ?

৩. রাষ্ট্রের (ক) অপরিহার্য ও স্বেচ্ছাধীন কার্যের এবং (খ) অ-সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি কি ?

৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য কি কি ?

৫. সমাজতন্ত্রবাদের রূপ কি কি হইতে পারে ?

৬. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণতন্ত্রের সহিত সমাজ-কল্যাণের সম্পর্ক কি ?

৭. বলা হয়, "সমাজতন্ত্রবাদ ব্যতীত গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ।" ইহার তাৎপর্য কি ?

৮. রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ব্যাপারে বর্তমান গতি কোন দিকে ?

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (Ends of the State) : রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়া প্লেটোর সময় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এই মতবিরোধের কারণ হইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ।

ক। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবিরোধ : প্রথমে রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, জার্মান ও ইংরাজ আদর্শবাদিগণ, হিতবাদী দার্শনিকগণ (Utilitarian Philosophers), বিবর্তনবাদিগণ, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ (State Socialists), সমভোগবাদিগণ এবং মার্কসীয় ও ফ্যাসীবাদিগণ হয় রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সীমাহীন করিতে চাহিয়াছেন, না হয় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

অপরদিকে নৈরাজ্যবাদিগণ (Anarchists), মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ (Ecclesiastics), অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের বিপ্লবী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ, আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ, বহুত্ববাদিগণ প্রভৃতি সাধারণত ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া হয় রাষ্ট্রকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছেন, না-হয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি যথাসম্ভব সংকুচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

খ। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ: এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করিবার ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও দার্শনিকগণ একমত হইতে পারেন নাই। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতে, "সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব" (The State exists to promote good life)। আদর্শবাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের সার্থকতা আপনার মধ্যে নিহিত। বার্কের ধারণা কতকটা আদর্শবাদেরই মত। বার্কের তত্ত্বে রাষ্ট্র হইল ব্যক্তির প্রধান প্রধান স্বার্থের অভিব্যক্তি ও সংরক্ষক। অপরদিকে আবার খ্রীষ্টধর্ম-প্রতিষ্ঠান (The Church), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ প্রভৃতির মতে, রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান—মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। ইংরাজ দার্শনিক হবস্‌ও এই ধারণার সমর্থক। তাঁহার মতে, প্রকৃতিতে মানুষ স্বার্থপর—চরম স্বার্থপর। কিন্তু বুদ্ধিমান জীব বলিয়া সে বৃহত্তর অকল্যাণকে পরিহার করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রতর অকল্যাণকে মানিয়া লয়।[১] এই বৃহত্তর অকল্যাণের উৎস হইল ভীতি (fear)—অরাজকতার ভীতি। অতএব, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল শান্তিরক্ষা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টি-ভংগিতে, রাষ্ট্র শক্তিপ্রয়োগের অন্যতম বাস্তব প্রতিষ্ঠান। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইহার উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীসম্বন্ধ, শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বজায় রাখা।[২]

লক ও অ্যাডাম স্মিথ: রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত চরম মতবাদের মধ্যপন্থাও অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন—যেমন ইংরাজ দার্শনিক লক। লকের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। অ্যাডাম স্মিথ রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়াছেন: (ক) ব্যক্তিকে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা, (খ) সামাজিক অত্যাচার ও অন্যায় হইতে রক্ষা করা এবং (গ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে-সকল কার্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয় সেই কার্যগুলি সম্পাদন করা।

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন: ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনেও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দু ব্যবস্থাপক মনুর মতে, দুষ্টের দমন, প্রজাবর্গের পালন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য নির্বাহ করাই রাজার ধর্ম বা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।[৩] ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, দুষ্টের দমন বলিতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, প্রজাপালন বলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হয় এরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য নির্বাহ বলিতে তাহাদিগকে অত্যাচার ও অন্যায় হইতে রক্ষা করা বুঝায়।

---

১. Man's "reason leads him to accept State control and social life as a necessary evil to avoid greater evils." Mabbott: *The State and the Citizen*

২. "... when we say with Engels that the highest purpose of the state is the protection of private property, we are also saying that the state is an instrument of class domination". Paul M Sweezy

৩. "তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥" মনুসংহিতা ৭।১৩

জার্মান রাষ্ট্রদর্শন: জার্মান লেখকগণের মধ্যেও অনেকে রাষ্ট্রের অনেকটা এইরূপ ত্রিবিধ উদ্দেশ্য নির্দেশের পক্ষপাতী। অবশ্য ব্লুন্টস্‌লি বলেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ নয়, দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইল জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য জাতীয় শক্তি ও সম্ভাবনার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

উইলোবি ও গার্ণার: উইলোবির (Willoughby) মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চরম—এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা; মাধ্যমিক উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার পথ সুগম করা এবং চরম উদ্দেশ্য হইল সাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের বৃদ্ধি করা। অধ্যাপক গার্ণারও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে, রাষ্ট্র প্রথমত আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করিয়া ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিবে, দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মংগলের উর্ধ্বে উঠিয়া সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবে এবং চরম পর্যায়ে নিজেকে মানব-সভ্যতার উন্নয়নে নিয়োজিত করিয়া বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

ল্যাস্কি প্রভৃতির বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ: ল্যাস্কির ন্যায় আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ এইরূপ দার্শনিক তত্ত্বকে পরিহার করিয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্র হইল জনসাধারণের সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সম্ভব করিবার জন্য সংগঠন। ইহার কার্যাবলী মানুষের আচরণের ঐক্যসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পরীক্ষার সাফল্য অনুসারে এই সীমার সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটিবে। সুতরাং মানুষের সমগ্র কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্ভূত হয় নাই। ইহা সমাজজীবনের মূলসূত্র নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নহে।"[১]

উপসংহার—উদ্দেশ্যের আপেক্ষিকতা: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, চিরকাল ও সর্বজনের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের নির্দেশ করা যায় না। দেশ ও কালভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। তবুও সাধারণভাবে বলা যায়, আদর্শ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সামগ্রিক কল্যাণ-সাধন—কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের কল্যাণসাধন নয়। কিন্তু এইভাবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনার ফলে সমস্যার সমাধান না হইয়া সমস্যা জটিলতর আকারই ধারণ করে। প্রশ্ন উঠে যে, সমগ্র নাগরিক সম্প্রদায়ের প্রকৃত কল্যাণের পথ কি? কেই বা ইহা নির্ধারণ করিবে? ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে? কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণের সংগে অপরাপর রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের কল্যাণের সমন্বয়সাধন কিভাবে করা যাইবে? —ইত্যাদি।

১. "...the State ... does not set out to compass the whole range of human activity. It may set the keynote of the social order, but it is not identical with it."

গেটেল বলেন, সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ কি—সে-সম্বন্ধে মানুষ যেমন কখনও একমত হইতে পারে নাই তেমনি কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র ইহার উদ্দেশ্যসাধন—অর্থাৎ সামগ্রিক মংগলসাধন করিতে পারে সে-সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

বোধহয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে যেরূপ মতবিরোধ রহিয়াছে সেরূপ রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আর কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী—ঐতিহাসিক পরিক্রমা (Functions of the State—Historical Survey):

প্রাচীন গ্রীকগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়াই কল্পনা করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীস: গ্রীকদের নগর-রাষ্ট্র ছিল একাধারে নগর ও রাষ্ট্র। বার্কারের ভাষায়, ইহা ছিল নৈতিক সমাজ, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সুন্দর সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বার্ক যে রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়ের সমগ্র ব্যবসাবাণিজ্য, সমগ্র বিজ্ঞান, সমগ্র চারুকলা, সমগ্র সংগঠন এবং সমগ্র সার্থকতার চুক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা গ্রীক নগর-রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিয়াই অধিকাংশ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।[১]

প্রাচীন রোম: প্রাচীন রোমকরা গ্রীকদের এই ধারণা সামান্য পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করে। তাহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সামাজিক প্রথা ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হয় নাই। রোমে পারিবারিক স্বাধীনতার পরিমাণও ছিল অধিক। অবশ্য তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রশক্তির কোনপ্রকার লাঘব রোমক যুগে ঘটে নাই। রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া আনিয়াছিল মাত্র। ইহার ফলে কার্যত ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি হইয়াছিল প্রসারিত।

মধ্য যুগ: মধ্য যুগে খ্রীষ্টধর্মের সহিত সংঘাতের ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আরও সংকুচিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় 'আইন ও রাজনীতির সম্প্রদায়—ধর্ম ও উপাসনার নহে।'[২] তখন ব্যক্তি তাহার সত্তা রাষ্ট্রকে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করে এবং এই তত্ত্ব পরিস্ফুটিত হয় যে, ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করে। মধ্য যুগে আবার সামন্ততন্ত্র প্রবর্তিত থাকায় ব্যক্তি ভূমির মালিক হিসাবে সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার অগণিত ভূম্যধিকারীগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সরকারের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রূপ রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রকে বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়া আনে এবং জন্মগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে ধারণা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম: মধ্য যুগের পর ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতীয় রাজতন্ত্রের (National Monarchies) উদ্ভব, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র আবার বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় সকলের অভিভাবক। অভিভাবক রাষ্ট্রের (Paternal State) অধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু হয় এবং ফলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হইল, রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা। ইহা ফিজিওক্র্যাটদের (Physiocrats), অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনকারীদের

---

১. ৮০ পৃষ্ঠা দেখ।

২. The State became "a community of law and politics, no longer also of religion and worship"

(Free Traders) অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

উনিশ শতকের প্রথমভাগ হইতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিষময় ফলের জন্য সুরু হইল ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া। দেখা গেল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র কখনই সমাজ-জীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে শক্তি ও সংগতিসম্পন্ন লোক বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এবং দুর্বল শ্রমজীবী ক্রমশ-পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন হস্তক্ষেপের।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান: ক্রমশ ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ফলে কারখানা আইন, খনিসংক্রান্ত আইন, দোকানের কর্মচারী আইন প্রভৃতি পাস হয়। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগের অবসান ঘটে। বর্তমান যুগে দুইটি বিশ্ব যুদ্ধের পর রাষ্ট্র সমষ্টিবাদ ও নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। কতকগুলি রাষ্ট্র—যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশ পূর্ণাংগ সমষ্টিবাদে বিশ্বাসী। এই সকল দেশে উৎপাদন-উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন। অপরদিকে ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি আংশিক সমষ্টিবাদ—অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে ব্যবসায়, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি পাশাপাশিভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে।

মিশ্র অর্থনীতি: ইহাদের সমাজকল্যাণকর বা মিশ্র অর্থনীতি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রাষ্ট্রকার্যবৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ: (Reasons for Increased State Activity): দেখা গেল যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্য অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন বিশ্লেষণ করিয়া কারণগুলিকে পর্যায়ক্রমে দেখানো হইতেছে।

১। **শিল্পবিপ্লব**: প্রথমত, শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থায় এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় যে রাষ্ট্র পূর্বেকার ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারে না। শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার্থে, বেকার-সমস্যার সমাধানে, উৎপন্নের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উহাকে স্বাচ্ছন্দ্য-নীতি (*Laissez-Faire*) পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষপুটে পরিপুষ্ট হয় ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা। ক্রমে একচেটিয়া কারবার এবং ট্রাস্ট ও কার্টেলের (trusts and cartels) উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রকে ভোক্তা (consumer), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হইতে হয়।

তৃতীয়ত, উনিশ শতকে ভোটাধিকারের প্রসারের দরুণ শ্রমিক জগতে আলোড়ন ঘটিলে শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তখন শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার্থে রাষ্ট্রকার্যের পরিধি আরও প্রসার লাভ করে।

চতুর্থত, দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দেশে জাতীয় জীবন একরূপ সম্পূর্ণভাবেই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়া একরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায়। যুদ্ধোত্তর যুগেও নিয়ন্ত্রণাধিক্যের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ শোনা যায় না।

পঞ্চমত, একরূপ মস্তকে কলঙ্ক ধারণ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিদায় গ্রহণ করিলে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের (সমাজবাদের) বিভিন্ন রূপ সাধারণ লোকের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর না করিলে সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণ কখনই সাধিত হইতে পারে না। ফলে সর্বাংগীণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে এই কর্মসম্পাদনে অগ্রসর হইতে হয়।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of State Functions) : সামগ্রিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য হইলেও দেশ ও কালভেদে রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। কারণ, কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া, কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যসাধন করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে সকল রাষ্ট্র একমত নহে।

কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতভেদ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, স্বাচ্ছন্দ্য-নীতির (*Laissez-faire*) পথে সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে ; অপরদিকে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা হইল, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ব্যতীত সমষ্টিগত কল্যাণকে সর্বাধিক করিয়া তোলা যায় না। আবার সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র মনে করে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত মীমাংসা করিয়াই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে।

একটি শ্রেণীবিভাগ—অপরিহার্য ও ইচ্ছাধীন কার্যাবলী : তবুও যে-কোন রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে : এইরূপ প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) অপরিহার্য (Essential), এবং (খ) ইচ্ছাধীন (Optional) কার্যাবলীর মধ্যে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য হইল সেইগুলি যাহা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সম্পাদন করিতে হয়।[১] অপরপক্ষে সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত রাষ্ট্রকার্যসমূহকে 'ইচ্ছাধীন' বলিয়া অভিহিত করা হয়—অর্থাৎ এগুলি সম্পাদন না করিলেও সার্বভৌম শক্তির আধার হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে।

আর একটি শ্রেণীবিভাগ : রাষ্ট্রের সার্বভৌম ও আইনগত প্রকৃতি এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহার কার্যাবলী আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) যে-সকল কার্য রাষ্ট্রশক্তির সহিত সম্পর্কিত, (২) যে-সকল কার্য নাগরিক-অধিকারের সহিত সম্পর্কিত এবং (৩) যে-সকল কার্য সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি শ্রেণীর কার্যাবলীকে 'অপরিহার্য' এবং শেষোক্ত শ্রেণীর কার্যাবলীকে 'ইচ্ছাধীন' বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

(১) **রাষ্ট্রশক্তির সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী :** সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করে, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে, করধার্য করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা করে। এই সকল কার্য রাষ্ট্রকর্তৃত্বের (State Authority) নির্দেশক।

(২) **নাগরিক-অধিকারের সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী :** লকের মতে, ব্যক্তির কতকগুলি অধিকার-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল। বর্তমানেও এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, নাগরিকের কতকগুলি অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই সকল অধিকারের মধ্যে আছে লক-নির্দেশিত জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার (rights to life, liberty and estates); তদুপরি আছে

১. ৩৯০ পৃষ্ঠাও দেখ।

শিক্ষার অধিকারের ন্যায় সামাজিক অধিকার, ভোটাধিকারের ন্যায় রাজনৈতিক অধিকার, প্রভৃতি। অবশ্য লক স্বাভাবিক অধিকারের নির্দেশ করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সীমাবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, বর্তমানে কিন্তু অধিকার-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রকার্যের প্রসারসাধনের দাবি করা হয়। অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ যাহাতে সার্থক হইয়া উঠে তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হয়। বলা হয়, কোন্ রাষ্ট্র কি পরিমাণে অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে তাহাই তাহার উৎকর্ষের মানদণ্ড।[১]

(৩) সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী: সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত বা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যাবলীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (ক) অ-সমাজতান্ত্রিক (Non-socialistic) এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক (Socialistic)।

(ক) অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী: অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী হইল সেইগুলি যাহা ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত রাখিলে কাম্যভাবে সম্পাদিত হয় না। ফলে রাষ্ট্রকে এইগুলি সম্পাদন করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পথঘাট বন্দর-পোতাশ্রয় নির্মাণ, সেচকার্যের প্রসার, শিক্ষাবিস্তার, তথ্যানুসন্ধান ও জনগণনা, নূতন বনভূমির পত্তন (afforestation) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(খ) সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী: সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী হইল সেইগুলি যাহা বেসরকারী উদ্যোগাধীনে থাকিলে নানারূপ অন্যায়-অমংগল দেখা দেয়, অথবা যেগুলি রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনেই অধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় বলিয়া বিশ্বাস। রেলপথ বিমানপথ প্রভৃতি পরিচালনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তন, মূল শিল্পের সংগঠন, পূর্ণ নিয়োগাবস্থা (full employment) সৃষ্টির প্রচেষ্টা, বেকারাবস্থা বার্ধক্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার (social security) ব্যবস্থা, সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টনের (equitable distribution of wealth and opportunity) প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন প্রভৃতি এই সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর অন্তর্গত।

সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যের অস্পষ্ট সীমারেখা: স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অ-সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। এক দেশে যাহা সমাজতান্ত্রিক ধরনের কার্য বলিয়া স্বীকৃত, অপর এক দেশে তাহা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন সাধারণ বা অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনুরূপভাবে কালভেদেও সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্র কর্তৃক মাত্র রেলপথ পরিচালনা সমাজতান্ত্রিক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু আজ অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র পরিবহণ-ব্যবস্থার পরিচালনাকেও সমাজতান্ত্রিকতার সূচক বলিয়া গণ্য করা হয় না। মোটকথা, সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর দিকে প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

---

১. "Every state is known by the rights that it maintains." Laski

রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও এই ইচ্ছাধীন কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবিরোধ রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ফলে বিভিন্ন মতবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of State Functions and Purposes) : এই মতবাদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : (ক) নৈরাজ্যবাদ (Anarchism), (খ) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism), (গ) সমষ্টিবাদ (Collectivism) এবং (ঘ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Theory of State Regulation)। এই মতবাদ বা তত্ত্বগুলির প্রত্যেকটিতে প্রকারভেদ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয় সমষ্টিবাদে। বস্তুত, সমাজতন্ত্রবাদ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি মতবাদই সমষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া মূলত সমষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত। এখন মতবাদগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইতেছে।

নৈরাজ্যবাদ (Anarchism): নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান করিতে চান।[১] ইহাদের মতে, আধুনিক রাষ্ট্র দুর্নীতির আশ্রয়স্থল এবং নিষ্পেষণের যন্ত্রমাত্র। ইহা শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হয়। সুতরাং ইহার বিলোপসাধন দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎসাহ বা সম্ভাবনাকে মুক্ত করিতে হইবে। তখন রাষ্ট্রের স্থানাধিকার করিবে কতকগুলি সংঘ যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় যোগদান করিবে এবং স্বেচ্ছায় যাহাদের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

নৈরাজ্যবাদ উনিশ শতকের মতবাদ। এই সময় সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—এই দুইটি মতবাদই বিশেষ প্রবল ছিল। নৈরাজ্যবাদ উভয়ের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। ব্যক্তিগত আচরণ ও উদ্যোগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিলোপসাধন হইল নৈরাজ্যবাদের আদর্শ। ইহার মধ্যে প্রথমটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্রবাদ হইতে আহৃত।[২]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (The Individualistic Theory): ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দুইটি পর্যায় আছে : আঠার ও উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ইহাদের মধ্যে পুরাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইল প্রকৃতপক্ষে সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ।

---

১. "Anarchism is the doctrine that political authority, in any of its forms, is unnecessary and undesirable." Coker : *Recent Political Thohght*

২. এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কমিউনিস্ট বা সমভোগবাদীদের আদর্শ নৈরাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ মার্ক্স-এঙ্গেলস্ যে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির (withering away of the State) কথা বলিয়াছেন তাহা নৈরাজ্যবাদেরই দ্যোতক। *Ref* Coker : *Recent Political Thought* এবং C. Bettelheim in *Democracy in a World of Tensions*

ক। পুরাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : পুরাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অবাধ নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য-নীতি (*Laissez-faire*) নামেও অভিহিত। ইহার মূল বক্তব্য হইল, যে-সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ (that government is best which governs the least)। অর্থাৎ, ইহার আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা। জন স্টুয়ার্ট মিল এই আদর্শকে তাঁহার স্বাধীনতাসংক্রান্ত গ্রন্থে (*On Liberty*) এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন: আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই মানুষ অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং একমাত্র অপরের ক্ষতিসাধন হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যেই অন্যের উপর বলপ্রয়োগ করা যাইতে পারে—নিজ মংগলসাধনের জন্য নহে। "নিজের উপর, নিজ দেহ ও চিত্তের উপর মানুষ সার্বভৌম।"[১]

মিলের আত্মকেন্দ্রিক ও পরকেন্দ্রিক কার্যাদি : সুতরাং আত্মকেন্দ্রিক কার্যাদিকে (self-regarding activities)—অর্থাৎ যে কার্যাদির ফলাফল মাত্র ব্যক্তিকে স্পর্শ করে তাহাকে রাষ্ট্র কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত করিবে না। অপরদিকে পরকেন্দ্রিক কার্যাদি (other-regarding activities)—অর্থাৎ যাহার ফলাফল অপরকেও ভোগ করিতে হয়—রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। তবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ততদূর পর্যন্তই প্রযুক্ত হইবে যতদূর পর্যন্ত এই সকল কার্যের ফলে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়—তাহার অধিক নহে।

অতএব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ।

হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায়, ব্যক্তির একটিমাত্র অধিকার আছে—ইহা হইল অপর সকলের সহিত সমান স্বাধীনতার অধিকার এবং রাষ্ট্রের মাত্র একটি কর্তব্য আছে—ইহা হইল ব্যক্তির এই অধিকারকে সংরক্ষণের কর্তব্য[২] ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ বা একমাত্র কর্তব্যপালনের জন্য রাষ্ট্র মাত্র দুইটি কার্য সম্পাদন করিবে: (১) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা, এবং (২) ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা।

পুলিসী রাষ্ট্র : সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইল মাত্র রক্ষাকার্য এবং এইরূপ রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন : অবাধ নীতি বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নানাদিক দিয়া সমর্থন করা হইয়াছে।

১. "Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign."

২. "The individual has but one right, the right of equal freedom with everybody else, and the State has but one duty, the duty of protecting that right...."

১. **মনস্তত্ত্ব**: মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই তাহার নিজের ভালমন্দ সম্যকভাবে বুঝিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিসমূহের তাহাদের কল্যাণের সহায়ক কার্যাবলী যেভাবে সম্পাদন করিবে রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

২. **জীববিজ্ঞান**: জীববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা অযৌক্তিক। উপরন্তু, ইহা অন্যায়ও বটে। ইহাতে সমাজজীবনের ক্ষতি হয়। প্রাণীর মত সমাজের স্বাস্থ্যও কতকগুলি নিয়মপালনের উপর নির্ভর করে। এই নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম হইল যে, প্রত্যেক অংশ নিজ কার্য সম্পাদন করিবে মাত্র। রাষ্ট্রের কার্য হইল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকের (hindrance to hindrands) কার্য করা। ইহার উপরে রাষ্ট্র যদি আর কোন কার্য সম্পাদন করিতে যায় তবে তাহা দ্বারা সমাজের ক্ষতিসাধনই করে—সবল ও যোগ্য ব্যক্তিকে দলিত করিয়া রাষ্ট্র যদি দুর্বল অযোগ্যকে রক্ষা করে তবে সুষ্ঠু সমাজজীবন কখনই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৩. **অর্থনৈতিক তত্ত্ব**: অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করা হইয়াছে এইভাবে যে, ইহার ফলে যেরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হয়। সমাজের দিক দিয়া অর্থ-ব্যবস্থায় এই দুইটি দিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য নীতি অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে কাম্য।

৪. **অভিজ্ঞতা**: অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে জাতীয় জীবন অনেক সময় বিপর্যস্ত হইয়াছে। সরকারী নীতি বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনশীলতার ফল সকল সময় শুভময় হয় না। আবার সরকার বিভিন্ন নীতি লইয়া পরীক্ষা চালায়। ইহার ফলেও সাধারণ জীবন হইয়া উঠে ব্যতিব্যস্ত। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বলিতে বুঝায় আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিক পরিচালনা। ইহাতে সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়, কার্যও সুপরিচালিত হয় না।

বিরোধিতা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তিনটি প্রধান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত: (ক) প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভালমন্দ বুঝিবার সমান ক্ষমতা ও সমান দূরদৃষ্টি আছে, (খ) প্রত্যেকেই যাহা চায় তাহা পাইবার জন্য প্রত্যেকেরই অপর সকলের ন্যায় সমান ক্ষমতা ও সমান স্বাধীনতা আছে, এবং (গ) সকল ব্যক্তির অভাবপূরণের অর্থই হইল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কল্যাণসাধন। জোডের (C. E. M. Joad) মতে, এই তিনটি ধারণাই ভ্রান্ত। অবাধ প্রতিযোগিতা তখনই সুফল প্রসব করে যখন সকলেরই দরাদরির সমান ক্ষমতা থাকে। শ্রমিক নিয়োগকর্তার সহিত দরাদরি

করিয়া কখনই শ্রমের উচিত মূল্য আদায় করিতে পারে না। সুতরাং অবাধ নীতির অধীনে শ্রমিকদের দরাদরির স্বাধীনতা অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ স্বাধীনতাকে যুক্তি দিয়া, নীতি দিয়া, আদর্শ দিয়া কখনই সমর্থন করিতে পারা যায় না। অতএব, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নিয়োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিয়া প্রতিযোগিতাকে সুনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীকে সংখ্যালঘিষ্ঠ নিয়োগকর্তাদের কবল হইতে রক্ষা করা।

দ্বিতীয়ত, জোডের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় অন্ধভাবে অগ্রসর হয়। সুতরাং অনেক সময় এরূপ ফল দেখা যায় যাহা ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও পক্ষে মংগলজনক নহে। জোড ইহার একটি উদাহরণ দিয়াছেন। যদি কোন ব্যাংক সম্বন্ধে জনশ্রুতি রটিয়া যায় যে, ঐ ব্যাংক হইতে অনেকেই টাকাকড়ি তুলিয়া লইতেছে তখন অধিকাংশেই টাকাকড়ি তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং ফলে ব্যাংকটির পতন ঘনাইয়া আসে, যদিও ব্যক্তি বা সমাজ—কেহই চাহে না যে ব্যাংকটির পতন ঘটুক। এইরূপ অন্ধ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রের।

ব্যক্তির অজ্ঞতা ও স্বার্থপ্রণোদিত কাজকর্মের ত্রুটির প্রতিকার করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই মংগলসাধন করে।

সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের ধারণা যে, রাষ্ট্র অমংগলকর প্রতিষ্ঠান—তাহা ভুল। অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অমংগলকর হইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আছে।

তৃতীয়ত, জীববিজ্ঞানের যুক্তি যে মাত্র যোগ্যতমকেই বাঁচিবার অধিকার প্রদান করিয়াই সুষ্ঠু সমাজজীবন গঠন করা যাইতে পারে তাহারও বিরোধিতা করা হইয়াছে।

ক্রপটকিনের (Prince Kropotkin) অনুবর্তীদের মতে, কাম্য সমাজজীবন গঠনে 'পারস্পরিক সহায়তা' (mutual aid) সমভাবে কার্যকর।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনেই এই পারস্পরিক সহায়তা সম্ভব হইতে পারে।[১]

চতুর্থত, যে-অর্থনৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করা হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে যে-ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে তাহাতে প্রচুর ভোগ্যদ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিবর্তে মুনাফা-শিকারের প্রবণতাই প্রবল হইয়া উঠে। উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise) ইহার মূল্য বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হইলেও শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোটের (monopolies and combinations) উদ্ভবের

১. Kropotkin : *Mutual Aid, a Factor in Evolution.* অবশ্য ক্রপটকিনের পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক সহায়তায় কাম্য সমাজ-জীবন গঠন করা যাইতে পারে···See Santi L. Mukherji : *The Philosophy of Man-making*

ফলে ইহা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন হইয়া পড়ে। শুধু যে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি সরিয়া যাইতে বাধ্য হয় তাহাই নহে, বাজার খোলা (free entry) থাকিলেও নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। ফলে 'অবাধ প্রতিযোগিতা' হইয়া দাঁড়ায় অর্থহীন নীতি এবং ভোক্তা ও শ্রমিক উভয়ই শোষিত হইতে থাকে।

পঞ্চমত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি প্রথমে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় এবং পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে ঘনাইয়া আসে বিশ্ব-সমৃদ্ধির, বিশ্বশান্তির সংকট। আধুনিক ইতিহাসের সাক্ষ্য ইহাই। পরিশেষে, মন্দাবাজার, ব্যাপক বেকারাবস্থা—ইত্যাদির জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাই মূলত দায়ী। এই অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ঘটে অকাম্য দ্রব্যাদির অত্যুৎপাদন। এই অতিরিক্ত মাল কাটাইতে পারা যায় না বলিয়াই মন্দাবাজার ও নিয়োগহীনতার উদ্ভব ঘটে।

উপসংহার—রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গুণগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেয়, তাহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অত্যধিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (paternalism) এবং অত্যধিক রাষ্ট্রীয় সহায়তা (maternalism) কোনটাই কাম্য নহে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কিছুটা ভূমিকা যে রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

খ। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Modern Individualism): উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে সমষ্টিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হইতে থাকে। অপরদিকে আবার রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে উদ্ভূত নূতন দার্শনিক মতবাদ—আদর্শবাদও (বা ভাববাদ—Idealistic Theory) রাষ্ট্রকার্যবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।[1] উভয় কারণে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া পড়িলে বিপরীত দিক দিয়াও—অর্থাৎ রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। এই শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে অভিহিত।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া: আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (reaction against reaction) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[2]

ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে হয় রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বৃদ্ধি; আবার ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে হয় আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম।

১. ১৩৭-৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "The reaction against individualism has produced a reaction on its own turn." Joad

উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ : আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভবের উপরি-উক্ত কারণকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায় :

প্রথমত, আদর্শবাদের বিরোধিতা ক্রমশ প্রকাশ পাইতে থাকে। আদর্শবাদ অনুসারে রাষ্ট্র এক অতিমানবীয় সংস্থা। ইহার সার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত। ইহা মানুষের স্বাভাবিক অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন। ইহা কোন অন্যায় করিতে পারে না। সুতরাং অন্ধভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

আদর্শবাদের প্রভাবে সমাজজীবনের সমগ্র কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সংঘ ও ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র ব্যক্তির যথাসর্বস্ব দাবি করিতে থাকে, শান্তির সময়েও নিত্যনূতন আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংঘের জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। উপরন্তু, আদর্শবাদ যুদ্ধের পূজারী। স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, যুদ্ধপ্রবণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধ্বংসকারক রাষ্ট্রকে ব্যক্তি পূজা করিবে কেন? উহার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবে কোন্ যুক্তিতে?

দ্বিতীয়ত দেখা যায়, সমষ্টিগত জীবনে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইলেও ব্যক্তিগত জীবন হইতে রাষ্ট্র ক্রমশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ব্যক্তি একমাত্র রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কিত নহে, সে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্য দিয়াও নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং অভিমত হইল যে, একমাত্র রাষ্ট্রই ব্যক্তির আনুগত্য দাবি করিতে পারে না—অন্যান্য সংঘেরও অনুরূপ দাবি রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জনমত নামক নিষ্পেষণ-যন্ত্র হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এরূপ এক রাজনৈতিক মতবাদের যাহা (ক) আইনগত সার্বভৌমিকতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সমর্পণে বাধাপ্রদান করিবে এবং (খ) কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করিয়া ব্যক্তিকে জনতার (mob) হাত হইতে রক্ষা করিবে।

রাজনৈতিক সাহিত্যে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে অন্তত দু'খানি বিশেষভাবে উল্লেখ্য : (ক) নরম্যান এঞ্জেলের (Normal Angell) 'দি গ্রেট ইলিউশন' (*The Great Illusion*) এবং (খ) গ্রাহাম ওয়ালাসের (Graham Wallas) 'গ্রেট সোসাইটি' (*Great Society*)।

এঞ্জেলের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এইরূপ : মানুষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতেই সমচেতনা লাভ করে এবং এই সকল অর্থনৈতিক স্বার্থকে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইতে এবং রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করিতে দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তিকে প্রধানত নাগরিক হিসাবে দেখা এক বিরাট ভ্রান্তি (a great illusion)। মূলত ব্যক্তি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য এবং ফলে জাতীয় রাষ্ট্রকে—যাহা ব্যক্তিকে নাগরিক হিসাবেই

দেখে—এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্রকার্য হ্রাস পাইবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থ নৈতিক সহযোগিতা।

গ্রাহাম ওয়ালাস বলিতে চাহিয়াছেন, সমষ্টিবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সমষ্টিগত চেতনা (collective mind), কিন্তু বর্তমানের প্রতিনিধি-মূলক শাসন-ব্যবস্থা এই সমষ্টিগত চেতনার সৃষ্টি করিতে পারে না। বর্তমানে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে নির্বাচনে 'জনমতে'র প্রকৃত প্রতিফলন সম্ভব হয় না। উপরন্তু, নির্বাচনের পর ব্যবস্থাপক সভার উপর জনসাধারণের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সুতরাং ওয়ালাসের মত হইল, নির্বাচকমণ্ডলীকে পেশাগত ভিত্তিতে কয়েকটি সংঘে (groups) বিভক্ত করিতে হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ণভাবে এই সংঘসমূহের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইবে। নিম্নতর পরিষদ অবশ্য বর্তমানের মত ভৌগোলিক ভিত্তিতে হইতে পারে। এইভাবে ওয়ালাস ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপরি-উক্ত আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে উহার মূলত তিনটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে :

(ক) আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হেগেলীয় ও সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রের বিরোধী ;

(খ) ইহা সংঘস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ;

(গ) ইহা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী হিসাবে না দেখিয়া 'যুক্তসংঘ' (a federation of groups) হিসাবেই দেখে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আলোচনার সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে, এই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নহে—ইহা সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ।[১]

উপসংহার : উপসংহারে বলা যায়, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনেকাংশে বহুত্ববাদেরই (pluralism) প্রতিলিপি। যে যুগে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বিশেষ স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তির আনুগত্য লইয়া সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় সেই যুগেই এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হয়। বর্তমানে বিশেষ বিশেষ স্বার্থ ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্যে সম্বন্ধ একপ্রকার নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। সংঘসমূহের অস্তিত্ব ও কর্মক্ষেত্র স্বীকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্য রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরোধিতাও অতীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ফলে বহুত্ববাদের ন্যায় আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে।

সংঘ হিতবাদ (Group Utilitarianism) : আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের বা সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি রূপ হইল সংঘ হিতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, শিল্প ব্যবসায় ও পেশাগত বিভিন্ন সংঘই তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

---

১. "The new individualism differs from the old in regarding the group and not the individual as its unit for political purposes." Joad

এইভাবে নির্ধারিত স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, সংঘসমূহের স্বার্থ অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী বলিয়া রাষ্ট্রকে উহাদের সমন্বয়সাধনও করিতে হইবে। অতএব, ইহা স্বাতন্ত্র্যবাদের মত রাষ্ট্রের ঠিক নিষ্ক্রিয়তার নীতি নয়, ক্রিয়াশীলতারই নীতি।

সমষ্টিবাদ (Collectivism) সমষ্টিবাদ অনুসারে সমষ্টির কর্তৃত্বই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নহে। সুতরাং প্রয়োজনমত রাষ্ট্রকার্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে, ব্যক্তি-জীবনকে সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে।

সমষ্টিবাদ যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে (৩২৩ পৃষ্ঠা)। ইহাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) : সমাজতন্ত্রবাদ[১] একাধারে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও আন্দোলন। ইহা অন্যতম অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবেও গণ্য।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে চায়।

সমাজতন্ত্রবাদিগণও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের ধারণা যে, অবাধ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানেই এই স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা বলিতে সমাজতন্ত্রবাদিগণ যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা বুঝেন না বুঝেন দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্তি এবং সকলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধা।

স্বাচ্ছন্দ্য নীতির অধীনে অর্থ-ব্যবস্থা যে-ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম।

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রসূত ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নির্দেশে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজের পক্ষে অনেক বিষময় ফল পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, পুঁজিপতি একমাত্র মুনাফার লোভেই উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কিন্তু পুঁজিপতির মুনাফার অধিক এরূপ দ্রব্যাদিই উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যাদি পুঁজিপতিদের নির্দেশে বণ্টিত হয় বলিয়া তাহাদেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ফলে শ্রমিক শোষিত হয় এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তির কর্মশক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে। তৃতীয়ত, শ্রমিকের সম্মুখে

---

১. বাংলায় সমাজবাদও বলা হয়।

সর্বদাই সঞ্চরণ করে বেকারাবস্থা অনাহার ও অনাহারের ভয়। চতুর্থত, এই সকল কারণে শ্রম-সংঘর্ষও অতি স্বাভাবিক পরিণতি হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে উৎপাদনের উপাদানসমূহ হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধন করিয়া ব্যক্তিগত মুনাফার লোভ দূর করিলেই সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কাম্য অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অতএব, সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবিই সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি।[১]

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা; সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে অবশ্য শুধু কাম্য অর্থ ব্যবস্থাই বুঝায় না, কাম্য সমাজ-ব্যবস্থাও বুঝায়। এইরূপ সমাজ শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন এবং ইহাতে সকলেরই দায়িত্ব রহিয়াছে নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুসারে পরস্পরকে সহায়তা করিবার।

অতএব, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা সেবার মনোভাব (motive of service) দ্বারাই পরিচালিত হয়, মুনাফা আহরণের মনোভাব দ্বারা নয়।

কোল-নির্দেশিত সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য : ১৯৩৫ সালে কোল (G. D. H. Cole) সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে চারিটি অপরিহার্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্দেশ করিয়াছিলেন: (ক) শ্রেণীহীন বর্ণহীন সমাজের পারস্পরিক সৌভ্রাত্রের বন্ধন; (খ) এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান নাই; (গ) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা জনসাধারণের; এবং (ঘ) সকল নাগরিকের উপর নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুসারে ন্যস্ত দায়িত্ব।[২] ইহার বার বৎসর পরে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে—তিনি আরও কয়েকটি বিষয়কে সমাজতন্ত্রবাদের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য না করিয়া পারেন নাই। এই উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা (personal and political freedom), নৈতিক চেতনা (morality) এবং সত্য ও সুন্দরের পথে সমাজজীবনের অভিযান।[৩]

বিষয়টির সামান্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে, সাম্যের দাবি হইল সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে শ্রেণীহীন বর্ণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা তখনই সার্থক হইতে পারে যখন উহার সভ্যগণ সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া পরস্পরের সহিত সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি হইতে আসিয়া পড়ে সৌভ্রাত্র বা সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সাম্য ও সৌভ্রাত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতাও অপরিহার্য। আবার সমাজের সভ্যগণের নৈতিক চেতনা

১. "The demand for equality is the basis of Socialism." Lloyd

২. *The Simple Case for Socialism* (1935)

৩. *The Intelligent Man's Guide to the Post-War World* (1947)

ব্যতিরেকে সমাজ-ব্যবস্থায় কখনই সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাধীনতার নীতি প্রতিফলিত হইতে পারে না। পরিশেষে, যখনই ঐ নীতিগুলি সমাজজীবনে প্রতিফলিত হয় তখনই সংশ্লিষ্ট সমাজ সুরু করে সত্য ও সুন্দরের পথে অভিযান।

বর্তমানের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা হইল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশে উৎপাদনের উৎসসমূহ এইভাবে ব্যবহৃত হয় যাহাতে সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Forms of Socialism): সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলি সম্পর্কে সকলে একরূপ একমত হইলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃতি এবং উপলব্ধির পদ্ধতি সম্পর্কে সমর্থকগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে সমাজতন্ত্রবাদও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জোড (C. E. M. Joad) বলেন, "সমাজতন্ত্রকে এরূপ একটি টুপির সহিত তুলনা করা চলে যাহা সকলেই পরিধান করে বলিয়া গঠন হারাইয়া ফেলিয়াছে" (Socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it)।

প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমভোগবাদ (Communism) এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিতে চায়, অপরদিকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) এবং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) রাষ্ট্রকে রাখিয়া সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে চায়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই সমাজতন্ত্রকে দেখে। অপরদিকে সমভোগবাদ ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মূলত অর্থনৈতিক বিপ্লবই আনয়ন করা হয়। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দুইটি পদ্ধতির নির্দেশ করা হয়—বিবর্তন ও বিপ্লব। বিবর্তন-পদ্ধতির পক্ষপাতী হইল রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সমষ্টিবাদ[১] এবং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, অপরদিকে বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী হইল সমভোগবাদ এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ। নিম্নে সমাজতন্ত্রবাদের এই চারিটি রূপ: রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, সমভোগবাদ এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

ক। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism): রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে

১. 'সমষ্টিবাদ' শব্দটি সমষ্টিগত কর্তৃত্ব ছাড়াও সমাজতন্ত্রবাদের একটি বিশেষ রূপ—রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়।

আনিয়া সামাজিক সাম্য ও সর্বাধিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের এইরূপ প্রসার চায় না—চায় সমাজে ন্যায় এবং সাম্যভিত্তিক প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। অনেক সময় সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে এই রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদকেই নির্দেশ করিয়া ইহাকে একটি গতি—সাম্যের অভিমুখে গতি বলিয়া অভিহিত হয়।[১] রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদিগণের (Fabian Socialists) মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ: ফেবিয়ান মতবাদ অনুসারে ফেবিয়াস (Fabius) যেমন হ্যানিবলের (Hannibal) বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া ঠিক সময়মত আঘাত করিয়াছিলেন, সমাজতন্ত্রাকাংক্ষীকেও তেমনি ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া সময়মত আঘাত করিতে হইবে। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে না, ধীরে ধীরে বিবর্তন পদ্ধতিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া ইহা আনয়ন করিতে হইবে।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা নানাদিকে ত্রুটিপূর্ণ। ইহা বহুর বেদনায় রচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য মাত্র কয়েকজনকে ভোগ করিতে দেয়। ইহা জনসাধারণের সম্মুখে বর্তমান রাখিয়াছে আগামীকালের ভাবনা এবং তাহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে অর্থনৈতিক দাসত্ব বন্ধনে, ইহা সৃষ্টি করিয়াছে প্রাচুর্যের মাঝে কৃত্রিম অভাব-অনটনের

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি: অতএব, এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে উক্ত ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইয়া সুযোগের সাম্য (equality of opportunity) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল উৎপাদনের উপাদানসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। এই দিক দিয়া রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদকে 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তির প্রচেষ্টা' বলিয়া গণ্য করা যায়।[২] গণতন্ত্রের আদর্শ হইল ন্যায়—অর্থাৎ স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করা। এই পথে উদারনৈতিক গণতন্ত্র যাত্রা শুরু করে মাত্র স্বাধীনতাকে বা, আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে (personal liberties) লইয়া। কিন্তু সাম্যের সহিত অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিস্বাধীনতা রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সার্থক ও সম্পূর্ণ হইতেই পারে না। ফলে উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম-রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিয়াছে বটে, কিন্তু আর্থিক বৈষম্যের বিলোপসাধন, এমনকি পরিমাণহ্রাস করিতেও সমর্থ হয় নাই। সুতরাং এখন সম-অধিকার বা সাম্যকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

---

১. "Socialism ... is a tendency, not a body of dogmas." Lloyd : *Democracy and Its Rivals*

২. "Socialism ... proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Lloyd

যখন উহা সম্ভব হইবে তখনই সমাজ-ব্যবস্থা ন্যায়ের (justice) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গণতন্ত্র হইয়া উঠিবে সার্থক ও সম্পূর্ণ।

বলা হইয়াছে, ধীরে ধীরে বিবর্তন-পদ্ধতিতে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। প্রথমে অতি সামান্যভাবে আরম্ভ করা প্রয়োজন। ন্যূনতম মজুরি, বেকারাবস্থা, বার্ধক্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অধিকতর গতিশীল কর-পদ্ধতি, জনসেবামূলক কার্যাদি (public utility services) এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতি লইয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। তারপর অবশ্য সমস্ত জমি ও শিল্প-মূলধনের জাতীয়করণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে আবার বিরতিবিহীন প্রচারকার্যের মাধ্যমে সমাজকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া চলিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমেই এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করা ফেবিয়ানদের লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বজায় থাকে সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উৎপাদন ও বণ্টন কার্য পরিচালনা করিবার জন্য।

খ। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism): সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূল অধিকার করিয়া থাকিবে শিল্প-সংঘগুলি (Trade Guilds)। এই শিল্প সংঘ বর্তমান শ্রমিক-সংঘেরই (Trade Unions) পরিবর্তিত রূপ। প্রথমত, সকল শ্রেণীর শ্রমিকই—সাধারণ শ্রমিক, এঞ্জিনিয়ার, পরিচালক—শিল্প-সংঘের অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানের মত মাত্র সাধারণ শ্রমিক নহে। দ্বিতীয়ত, শিল্প-সংঘের উদ্দেশ্য হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, শ্রমিক-সংঘের মত মাত্র সুযোগসুবিধা আদায় করা নহে। সুতরাং শিল্প-সংঘ ও শ্রমিক-সংঘের মধ্যে পার্থক্য হইল গঠন ও উদ্দেশ্যগত। তবুও বর্তমানের শ্রমিক-সংঘগুলিই ভবিষ্যতের শিল্প-সংঘে পরিণত হইবে এবং এই শ্রমিক-সংঘগুলির মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।[১]

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দুইটি প্রধান ত্রুটি: বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদীরা অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীর সহিত একমত। কিন্তু ইহাদের মতে, এই সকল ত্রুটির মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটির প্রথমটি রাজনৈতিক এবং দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহারা বলেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকার (territorial constituency) ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কখনই প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে না। একজন ডাক্তার অপর একজন ডাক্তারের প্রতিনিধি হইতে পারেন, উকিল উকিলের হইতে পারেন, কৃষক কৃষকের হইতে পারে কিন্তু পেশাগত সম্পর্কবিহীন রাম শ্যামের প্রতিনিধি হইতে পারে না।

---

১. "The Trade Unions of today will become the Guilds of tomorrow," and "... the Trade Unions are the organizations by means of which the actual transition is to be accomplished." Joad

সুতরাং পেশার ভিত্তিতেই আইনসভাসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এইরূপ যখন করা হইবে তখনই আইনসভাসমূহ সার্থক হইয়া উঠিবে। কারণ, তখনই আইনসভাসমূহে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হইবে।

উপরন্তু, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন রাষ্ট্র অন্যতম সংঘ মাত্র—একমাত্র সংঘ নহে। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত করিয়া সংঘসমূহকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিতে হইবে।

অর্থনৈতিক দিক হইতে বলা হয় যে, বর্তমানের মজুরি-ব্যবস্থা (wage system) সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায্য।

শ্রমিক তাহার পরিশ্রমের পরিবর্তে কেবল মজুরি পাইবে ইহা কোনমতে সমর্থনীয় নহে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার ভারও দিতে হইবে।

সংঘমূলক সমাজের রূপ : পেশাগত ভিত্তিতে আইনসভা সংগঠিত হইলে এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিক শিল্পপরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে যে-সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে তাহার রূপ এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(ক) প্রত্যেক শিল্পে একটি করিয়া সংঘ থাকিবে : বস্ত্রশিল্প সংঘ, ইস্পাত শিল্প সংঘ ইত্যাদি। (খ) এই সকল সংঘ সমাজের হইয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পের পরিচালনা করিবে। (গ) প্রত্যেক ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে একটি করিয়া ভোক্তা পরিষদ (Consumers' Council) থাকিবে। এই সকল পরিষদ শিল্প-সংঘগুলির মধ্যে পরামর্শ দ্বারা ভোগ্যপণ্যের মূল্য, বণ্টন ইত্যাদি নির্ধারিত হইবে। (ঘ) পেশাগত ভিত্তিতে সংগঠিত আইনসভা প্রতিরক্ষা, করধার্য প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে। (ঙ) আঞ্চলিক সংস্থাগুলি আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

প্রধানত বিবর্তন-পদ্ধতিতেই এই প্রকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ; তবে একান্ত প্রয়োজন হইলে বিপ্লবের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপসংহার : সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে ইহার মূল্য রহিয়াছে। কিন্তু পেশাগত প্রতিনিধিত্বের উপর ইহা যে আস্থা স্থাপন করিয়াছে তাহা সমর্থিত হয় নাই। অন্যতম আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌গণ ইহাকে অলীক ও ভ্রান্ত নীতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহার ফলে সংঘর্ষ বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

এই কারণে ল্যাস্কির মতে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা-সমূহই কাম্য।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতির উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহা ভ্রান্ত। সুতরাং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য নাই বলিলেও চলে।

গ। যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism): যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদিগণ শ্রমিক-সংঘগুলির মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সংগ্রামের (direct economic action) পক্ষপাতী। ইহারা সমভোগবাদিগণের সহিত এ-বিষয়ে একমত যে, ধনতন্ত্রকে বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি প্রযুক্ত হয়। সুতরাং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, এই রাজনৈতিক সংগঠনের বিলোপসাধন করা প্রয়োজন।

নাশকতা: পন্থা হিসাবে তাঁহারা দেশের প্রধান প্রধান শিল্পে ধর্মঘট নাশকতামূলক কার্যকলাপ (sabotage) ইত্যাদির নির্দেশ করেন।

এই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইবে এবং রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবে।

রাষ্ট্রের অবসান ঘটিলে শ্রমিক-সংঘগুলি সমাজের সম্মতিক্রমে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবে। তাহার পর সমগ্র শ্রমিক-সংঘ মিলিয়া একটি শ্রমিক সমবায় (confederation of labour) গঠন করিবে এবং ইহা রেলপথ, ডাক বিভাগ, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্য সম্পাদন করিবে। এই শ্রমিক সমবায় ও আঞ্চলিক শ্রমিক-সংঘগুলি শ্রমিক ও দেশের জনসাধারণের অপরাংশের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে।

সংঘমূলক ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে পার্থক্য: সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের (Syndicalism) মধ্যে অনেকাংশে মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্যকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। পার্থক্যটি হইল যে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করিতে চায়, কিন্তু যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ চায় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি।

ঘ। সমভোগবাদ (Communism): সমভোগবাদ একান্তভাবে রাষ্ট্রের বিলোপসাধনে বিশ্বাসী। সমভোগবাদিগণের মতে, রাষ্ট্র শক্তিপ্রয়োগের বাস্তব প্রতিষ্ঠান—ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখাই উহার প্রধান কার্য। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিলে ক্রমশ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইবে। সুতরাং তখন ইহা বিলুপ্তও হইবে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক যুগের পরই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে না। ধনতন্ত্রের পর আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র আনয়ন করে সর্বহারার বিপ্লব (Proletarian Revolution)। সমাজতান্ত্রিক যুগে পূর্বেকার পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থভোগীর দল আবার নানারূপ কলাকৌশলে পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে চায়। ইহাদের বাধা দিবার জন্যই সমাজতান্ত্রিক যুগে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। তারপর সমাজতন্ত্রের অধীনে অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকিলে একদিন এরূপ অবস্থা আসিবে যাহাতে প্রত্যেক মানুষ তাহার সামর্থ্যমত কার্য করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজনমত

ভোগ্যদ্রব্যাদি পাইবে। সকলে তখন সর্বাধিক সামাজিক মংগলসাধনের জন্য আনন্দ সহকারেই কার্য করিবে—কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের মজুরি উপার্জনের জন্য নয়।

এইরূপে অবস্থায় রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় ইহা বিলুপ্ত হইবে (the State will *wither away*) এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে সমভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থা (communistic society) ।[1]

উপসংহার : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, সমাজতন্ত্রবাদের সকল রূপই 'রাষ্ট্রকর্তৃত্বে'র বৃদ্ধি সমর্থন করে না। বরং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ ছাড়া সমাজতন্ত্রবাদের অন্যান্য সমর্থক হয় রাষ্ট্রের বিলোপসাধন, না-হয় রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করিতে চান। তবে সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এই দিক দিয়া মিল রহিয়াছে যে, ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা কোনমতেই দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজের সর্বাংগীণ ও সর্বাধিক মংগলের জন্য ব্যক্তিকে হয় রাষ্ট্রের, না-হয় সমাজের কর্তৃত্বাধীনে আসিতেই হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র পশ্চাতে সরিয়া গেলে তাহার স্থান অধিকার করে সমাজ, এবং সমাজের কার্য পরিচালনার জন্য যে সংগঠন থাকিবে তাহার কর্মক্ষেত্র কোনমতে গণ্ডি দিয়া নির্ধারিত করা নয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদের মতে হয় রাষ্ট্রকে না-হয় অন্য কোন সামাজিক সংগঠনকে মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের কার্য করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল্য নির্ধারণ (An Estimate of Socialism) : সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে উদ্ভূত ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিক্রিয়া। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় দোষত্রুটি—বৈষম্য, দারিদ্র্য, নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতির যে বিলোপসাধন প্রয়োজন সে-বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত সকলে মোটামুটি একমত।

প্রতিপাদ্য বিষয় : সমাজতন্ত্রবাদ বলে : সুন্দর জীবন সম্ভব করিতে হইলে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে, দুর্বলকে সবলের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে স্থাপন করিতে হইবে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা (mutual aid or co-operation or fraternity)।

ইহা কি সম্ভব : অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচকেরা প্রধানত দুইটি প্রশ্ন করেন : (ক) ইহা কি সম্ভব? (খ) ইহা কি কাম্য? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে রাষ্ট্রের কার্য এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে যে, তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং এই শ্রেণীর সমালোচকের মতে, সমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রশক্তির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে অযৌক্তিক-

১. ১৪২-৪৪ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদের প্রসংগে ছাড়াও 'শাসন-ব্যবস্থা' গ্রন্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থায় সমভোগবাদ বা কমিউনিজম সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে।

ভাবে ধারণা পোষণ করেন। দ্বিতীয়ত বলা হয়, মানুষের প্রকৃতি-অনুশীলনে সমাজতন্ত্রবাদিগণ বিশেষ ভুল করিয়াছেন। মানুষ সমাজের জন্য আনন্দ সহকারে কাজ করিতে চায় না—ব্যক্তিগত মংগলের জন্যই চায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্লেটোর সমভোগবাদের (Communism) সমালোচনা করিতে গিয়া অ্যারিস্টটল বলিয়াছিলেন যে, ইহা অস্বাভাবিক, কারণ সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব সকলেরই বলিয়া এ-দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কাহারও নহে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃত্ব চাহিদা ও যোগানের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে না—এ-ধারণাও প্রচার করা হয়।

ইহা কি কাম্য: দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সমালোচকগণ সমাজতন্ত্রবাদের অন্যান্য দোষত্রুটির নির্দেশ করেন—যথা, রাষ্ট্র সর্বদাই মন্থর গতিতে ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্য করে; রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালনা বলিতে বুঝায় সরকার কর্তৃক পরিচালনা এবং সরকার সাধারণ মানুষ লইয়াই গঠিত হয়—ফলে রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে উৎকোচ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে; মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ কখনই শুভফল প্রসব করিতে পারে না; ইত্যাদি। আরও বলা হয়, সমাজতন্ত্রের অর্থ হইল দাসত্ব। সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।[১]

পরিশেষে, মার্কিন লেখক জেমস্ বার্ণহাম[২] এই অভিযোগ করিয়াছেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীহীন (classless) সমাজ-ব্যবস্থা নয়। ইহার অধীনে পুঁজিপতি শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী হইল পরিচালক-শ্রেণী (the managerial class)। পরিচালকবর্গের পারিশ্রমিক সাধারণ শ্রমিক হইতে অনেক অধিক এবং সমগ্র রাষ্ট্র ও অর্থ-ব্যবস্থা ইহাদের করতলগত থাকে। ফলে সমাজতন্ত্রের অধীনে ধীরে ধীরে, সমগ্র রাষ্ট্র ইহাদের সম্পত্তিতে (property) পরিণত হয়।

নূতন শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব: সুতরাং পুঁজিপতিগণের স্থলাধিকার করে এক নূতন শাসকগোষ্ঠী (a new ruling class)।

বার্ণহামের মতে, সোবিয়েত ইউনিয়ন পূর্ণাংগ পরিচালক শ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত সমাজের (managerial society) প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, কারণ পূর্ণাংগ পরিচালক শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল উৎপাদনের উপায়সমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং রাষ্ট্রের উপর পরিচালকশ্রেণীর কর্তৃত্ব (state ownership of the means of production and managerial control of the state)।

সমালোচনার উত্তর: সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত চিরাচরিত সমালোচনা পিগু (Prof. A. C. Pigou) প্রায় অনেক অর্থবিজ্ঞাবিদ্ গ্রহণ করেন

---

১. "Each member of the community as an individual would be a slave of the community as a whole." Spencer

২. J. Burnham: *The Managerial Revolution*

নাই। মানুষ মুনাফার লোভ ছাড়াও অন্যান্য কারণে আনন্দ সহকারে কর্মসম্পাদন করিতে পারে। খেলোয়াড়ের খেলায় অনেক সময়ই কোন মুনাফার লোভ থাকে না, কিন্তু সে তাহার কৃতিত্ব প্রদর্শনে কখনই বিশেষ কার্পণ্য করে না। তেমনি সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে যদি এই খেলোয়াড়ী মনোভাব (*sport motif*) জন্মগ্রহণ করে তবে ব্যক্তির পক্ষে সমাজের জন্য আনন্দ সহকারে কাজ না করিবার কোনই হেতু নাই। উপরন্তু, সমাজতন্ত্রবাদ কোনরূপ অপরিবর্তনীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়—প্রয়োজনবোধে ইহার পরিবর্তনসাধন করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সকল বিষয়ই যে একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালনভার সংঘের উপরও দেওয়া যাইতে পারে। সংঘের অধীনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের ক্ষেত্র থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিচালকশ্রেণীর উদ্ভব সম্বন্ধে অভিযোগের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ সোবিয়েত অর্থ-ব্যবস্থা বা উৎপাদনের উপায়সমূহকে মেহনতীশ্রেণীর এজেন্ট হিসাবে তাহাদের স্বার্থেই পরিচালিত করেন। সুতরাং বলা যায়, মেহনতীশ্রেণীই হইল প্রকৃত শাসকশ্রেণী। বস্তুত, সোবিয়েত ইউনিয়নে অন্যান্য শ্রেণী সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ায় শাসকশ্রেণী বলিয়া কোন ভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না।[১]

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণতন্ত্র ও সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (The Theory of State Regulation—the Welfare State): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পর যে যুগ সুরু হয় সংক্ষেপে তাহাকে সমষ্টিবাদের যুগ (age of collectivism) বলিয়া অভিহিত করা যায় (৩২০ পৃষ্ঠা)। বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সকলই অল্পবিস্তর সমষ্টিবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শেষ আশ্রয়স্থল বলিয়া গণ্য করা হয়, কিন্তু এই দেশও সমষ্টিবাদমূলক পরীক্ষাকে পরিহার করিতে পারে নাই। সুতরাং সমষ্টিবাদকে বিশ্বজনীন বলিয়া অভিহিত না করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু সমষ্টিবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের কোন অভিন্ন রূপ নির্দেশ করে না। অর্থাৎ, সমষ্টিবাদে বিশেষ পরিমাণভেদ রহিয়াছে এবং ফলে, এক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র অপর এক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র হইতে বিশেষ ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে।

পূর্ণ ও আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র: মোটামুটি দেখিতে গেলে, সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র দুই শ্রেণীর : (ক) পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র এবং (খ) আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র। পূর্ণ সমষ্টিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্বংসাবশেষও রাখিতে দিতে প্রস্তুত নয়। ইহা ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমষ্টিগত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে চায়।

---

১. সাম্প্রতিক কালে মার্ক্সবাদী লেখক সুইজি ও বেটেলহাইম অভিযোগ করিয়াছেন যে সোবিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে 'রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে'র (state bureaucracy) সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিচালকবৃন্দ একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। C. Paul M. Sweezy and Charles Bettelheim : *On the Transition to Socialism*

বর্তমানের এইরূপ সকল পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Socialist State) নামে অভিহিত এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialist View) নামে পরিচিত। অপরদিকে আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে বলা হয় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র।

সমাজ-কল্যাণের আদর্শ : বলা হয়, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি সমাজ-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই আদর্শের মূলকথা হইল যে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সকলের হিতসাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং ব্যক্তির কল্যাণসাধন ব্যতীত কার্য সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণের অন্য কোন লক্ষ্য থাকিবে না।[১] এই উদ্দেশ্যে কল্যাণবতী রাষ্ট্রকে বাজারের শক্তিকে (market forces) তিন দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে : (১) অভাব ও অনিশ্চয়তাকে দূর করিতে হইবে ; (২) আয় নিশ্চিত করিতে হইবে ; এবং (৩) সকল নাগরিকই যাহাতে উৎকৃষ্ট মানের সমাজ-কল্যাণমূলক সেবা পায় তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।[২] এই ত্রিবিধ কার্যসম্পাদনের জন্য সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

সামাজিক কল্যাণ মতবাদ : কিন্তু তথাকথিত সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইলেও উহারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, সমাজ-কল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে শিল্প-বাণিজ্য চলিতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া নিজেদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে। কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাদের ধারণাকে সামাজিক কল্যাণ মতবাদ (Social-welfare View) বলা হয়।

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্য : বলা যায়, বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রসমূহ সামাজিক কল্যাণ মতবাদকেই বিপুল সংখ্যাধিক্যে গ্রহণ করিয়া পথ চলিয়াছে ; এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সংখ্যায় অত্যল্প। সুতরাং সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলির কার্যাবলীর বর্ণনা হইল একরূপ আজিকার দিনের রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বর্ণনা। নিম্নে এই বর্ণনাই করা হইতেছে।

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of the Social Welfare States) : সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বিবর্তন পদ্ধতিতে

১. D. C. Marsh : *Future of the Welfare State*

২. "A welfare state is one in which organised power is deliberately used in an effort to modify the play of market forces in at least three directions, i.e., by guaranteeing income, by narrowing the extent of inequality and by ensuring that all citizens are offered the best standards of an agreed range of social services." Asha Briggs

প্রয়োজনমত ব্যক্তির গণ্ডির মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ-সাধন (the greatest good of the greatest number) করিতে চায়।

এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করিতে হয় :

(ক) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা : ইহাকেই যে-কোন সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা বলিতে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে আপদবিপদ হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করা এবং বহিরাক্রমণ হইতে সমগ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করা বুঝায়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন করে, বিচারের ব্যবস্থা করে, বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে, ইত্যাদি। রাষ্ট্রের এই সকল কার্যকে অপরিহার্য বলিয়া বর্ণনা করা যায়, কারণ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্রকে এই সকল কর্তব্য পালন করিতে হয়।

(খ) সম্পত্তিসংক্রান্ত কার্য : সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহে সকলকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হইলেও এই অধিকার কখনও অব্যাহত নহে। সামাজিক স্বার্থে সম্পত্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন করিয়া সেগুলিকে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

(গ) পরিবারসংক্রান্ত কার্য : পরিবার গঠনের অধিকার অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার। কিন্তু পারিবারিক জীবন যাহাতে সমাজ-কল্যাণের অনুগামী হয় রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র তাহাই করে। ইহা সামাজিক কল্যাণসাধনের জন্য পারিবারিক জীবনকে কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। দেখা যায় বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন-কানুন। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জনসংখ্যাবৃদ্ধির গতিরোধ করিবার জন্য পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) ব্যবস্থা করে। অপরদিকে আবার জনসংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিবাহে আর্থিক সাহায্য, সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাতা প্রভৃতি প্রদান করে।

(ঘ) অধিকার ও তৎসংক্রান্ত কার্য : রাষ্ট্র নাগরিকগণের প্রধানত রাজনৈতিক এবং কয়েক স্থলে সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া তাহা সংরক্ষণ ও কার্যকরকরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(ঙ) শিল্পবাণিজ্যসংক্রান্ত কার্য : শিল্পবাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। একদিন এই হস্তক্ষেপের প্রয়োজনেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্যনীতির (*Laissez-Faire*) অবসান ঘটিয়াছিল।

বর্তমানে রাষ্ট্রকে একই সংগে উৎপাদক, শ্রমিক, ভোক্তা (consumer) এবং বিনিয়োগকারীর (investor) স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বিশেষ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্র উৎপাদনের স্বার্থে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও 'অন্যান্য উপায়ে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা দূর করে, শ্রমিকসংক্রান্ত আইন (labour laws) পাস করিয়া

শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা ও শ্রমকল্যাণসাধন করে এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ব্যবসায় সংগঠন, ব্যাংক প্রভৃতির অন্তর্বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিয়া থাকে।

(চ) কৃষিসংক্রান্ত কার্য: কৃষি এখনও অধিকাংশ দেশের মূল শিল্প। এই মূল শিল্পের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে—যথা, কৃষককে মহাজন ও জমিদারের কবল হইতে নানাভাবে রক্ষা করে, তাহারা স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করে, কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিতে সচেষ্ট থাকে, জলসেচের বন্দোবস্ত করে, কৃষিসংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, ইত্যাদি।

(ছ) বণ্টনসংক্রান্ত কার্য: উৎপন্নের সামাজিক বণ্টনও (distribution) রাষ্ট্রের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যাহাতে দেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে উহা উত্তরোত্তর সংকীর্ণ হইয়া আসে, যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি অধিকতর উৎপাদনে নিয়োজিত হয়, সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। রাষ্ট্র এই কার্য আংশিকভাবে মজুরি ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং আংশিকভাবে কর-পদ্ধতির (tax-system) দ্বারা সম্পাদন করে। বিভিন্ন গতিশীল কর নির্ধারণ করিয়া ধনীদের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে বার্ধক্য ভাতা, অসুস্থতা ভাতা, বেকারী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

(জ) অন্যান্য কার্য: সমাজের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রকে অন্যান্য নানাবিধ কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তদারক করা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা, দরিদ্র ও অসহায়কে সাহায্য দান, বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন (planned economic development) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া রাষ্ট্র এমন সকল কার্য সম্পাদন করে যাহা ব্যক্তির পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় বা যাহা বেসরকারী উদ্যোগের অধীনে সম্পাদিত হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ বিমানপথ, রেলপথ ডাক বিভাগ প্রভৃতির সরকারী পরিচালনা, জাতীয় মুদ্রা ও ঋণ (currency and credit) ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, আদমসুমারি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, এই সকল তথ্য সম্বন্ধে প্রচার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়। শুধু বিমানপথ রেলপথ নয়, অন্যান্য যানবাহনও জাতীয় মালিকানায় আনিয়া উহাদের পরিচালনা করিতে পারে; কতকগুলি বিশেষ শিল্প গঠন ও ইহাদের পরিচালনার দায়িত্ব একচেটিয়াভাবে নিজেই গ্রহণ করিতে পারে; জরুরী অবস্থায় সমগ্র আর্থিক কাঠামোটি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারে; ইত্যাদি।

ভারতের দৃষ্টান্ত: ভারতের উদাহরণ লইয়া সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) অনুসারে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিবে যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের

প্রতিষ্ঠা হয়। উপরন্তু, উৎপাদনের উপাদানসমূহ যাহাতে কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে রাষ্ট্রকে তাহাও দেখিতে হইবে।

মোটকথা, সংবিধান অনুসারে ভারত-রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

সমাজ-কল্যাণের এই ধারণাকে রূপদান করিবার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার একরূপ সকল দিককেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভূমি-সংস্কার, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য, পরিবার পরিকল্পনা, হিন্দু সংহিতা, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান, শিল্পবাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ও উহাদের নিয়ন্ত্রণ, নূতন নূতন গতিশীল প্রত্যক্ষ করধার্য, সামাজিক নিরাপত্তার (social security) ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণেরই সূচক।

বলা হয়, সমাজ-কল্যাণের পথ বাহিয়া ভারত সমাজতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবিরোধের উপসংহার: উপসংহারে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য মতবাদ ঠিক কোন্‌টি—চরম সমাজতন্ত্রবাদ না সামাজিক কল্যাণ মতবাদ? মধ্যপন্থা অবলম্বনকারিগণ বলেন, কোন্‌টি ঠিক, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত এখনই প্রকাশ করা উচিত নয়। এ-বিষয়ে বর্তমানে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র যে কতকাংশে সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় ইঁহাদের মতে, রাষ্ট্রকার্যের প্রকৃত মতবাদ হইবে একাধারে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ভিত্তিক।[১]

আধুনিক কালে অধিকাংশ রাষ্ট্র যে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে তাহার আলোচনা সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বেই করা হইয়াছে।

অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে সমাজ-কল্যাণকর কার্য ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সমাজতন্ত্র করা যায় কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।[২] রূপ বদলাইলেও সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র মূলত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুতরাং সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিয়াই যায়। অতএব, যে-পর্যন্ত না উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা সমাজের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে সে-পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা সম্ভবপর হইবে না, এবং রাষ্ট্রও শ্রেণী-রাষ্ট্র থাকিয়া যাইবে।

১. "... a true theory of the State must be socialistic and individualistic at once." M'Kechnie: *The State and the Individual*

২. "... it is wrong to think that predominantly bourgeois States have become socialist by reason of their intervention in certain social problems." D. N. Sen: *From Raj to Swaraj*

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়া মতবিরোধের কারণ হইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ।

২. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির মূলে আছে : (১) শিল্পবিপ্লব, (২) একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোট প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের দাবি, (৩) ভোটাধিকারের প্রসার, (৪) যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণাভ্যাস এবং (৫) সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার।

৩. (ক) রাষ্ট্রকে অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হয় সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য। অপরপক্ষে স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী সমাজ-কল্যাণের ধারণা-প্রসূত।

(খ) অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী হইল সেগুলি যাহা ব্যক্তির হস্তে রাখিলে কাম্যভাবে সম্পাদিত হয় না বলিয়া বিশ্বাস, এবং যে-সকল কার্যাবলী রাষ্ট্রের অধীনে অধিক দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয় তাহাদিগকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী।

৪. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য হইল যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই স্বাধীনতার সংরক্ষণ।

৫. সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান প্রধান রূপ হইল : (ক) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, (খ) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, (গ) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং (ঘ) সমভোগবাদ।

৬. সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিয়ন্ত্রণ করে—ইহাই হইল সমাজ-কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সম্পর্ক।

৭. গণতন্ত্র সুরু করে স্বাধীনতা লইয়া, কিন্তু সমাজকে সাম্যভিত্তিক না করিতে পারিলে এই স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ফলে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিণতির জন্য সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্য অপরিহার্য।

৮. রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের গতি হইল প্রসারের দিকে।

অনুশীলনী

1. What, in your opinion, should be the proper sphere of the State?

[তোমার মতে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কি হওয়া উচিত?]

[ইংগিত : রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়া বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে অবশ্য দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যথা, সমষ্টিবাদ (Collectivism) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)। সমষ্টিবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের কোন সীমা নির্ধারণ করা হইবে না—সমষ্টির কল্যাণে রাষ্ট্র ব্যক্তি-জীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করিবে। অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যাবলী হইবে সংখ্যায় ন্যূনতম—রক্ষামূলক মাত্র।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্র এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিয়া লইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণ করিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social-Welfare States) নামে অভিহিত। ইহারা সমষ্টি বা সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যতটা প্রয়োজন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ততটাই প্রসারিত করিয়াছে। মনে হয়, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি জনসাধারণের স্বার্থে বিস্তৃততর হওয়া উচিত।

এই প্রসংগে ম্যাকেক্‌নির (M'Keohnie) উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি একাধারে সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক ধারণা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।...এবং ৩৪০-৪৩ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the va'ue and limitations of individualism as a social and political theory.

[সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।]

(৩২৩-২৭ পৃষ্ঠা]

3. State and examine the doctrine of Individualism.

[মতবাদ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বর্ণনা দাও এবং আলোচনা কর।]

Or, Critically discuss the Individualistic Theory regarding the functions of the State.

[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পর্যালোচনা কর।]

Or, Explain philosophical foundation of Individualism.

[ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির ব্যাখ্যা কর।] (৩২৩-২৭ পৃষ্ঠা)

4. "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Discuss the statement.

["সমাজতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতবাদের বিরোধিতা করা অপেক্ষা উহাকে সম্পূর্ণ করিয়াই তুলিতে চায়।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৩৩০-৩৪ পৃষ্ঠা)

5. What is the meaning of Socialism ? Discuss the merits and defects of Socialism.

[সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ কি ? সমাজতন্ত্রবাদের গুণাগুণের পর্যালোচনা কর।]

(৩৩০-৩২, ৩৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা)

6. "Democracy is not complete without Socialism." Discuss.

["সমাজতন্ত্রবাদ ব্যতীত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নহে।" পর্যালোচনা কর।]

(উপরি-উক্ত ৪নং প্রশ্ন এবং ৩৩১-৩৪ পৃষ্ঠা)

7. Write notes on , *(a)* Anarchism , *(b)* Guild Socialism , and *(c)* Syndicalism.

[নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টীকা রচনা কর : (ক) নৈরাজ্যবাদ , (খ) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ ; এবং (গ) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ।] (৩২৩, ৩৩৪-৩৫, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

8. What is a Welfare State ? What are its functions ?

[সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝায় ? ইহার কার্যাবলী কি কি ?] (৩৩৯-৪৩ পৃষ্ঠা)

১৬ | মার্ক্সবাদ (MARXISM)

"Marxism is a general theory of the world in which we live, and of human society as a part of that world". Emile Burns

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. সংক্ষেপে মার্ক্সবাদকে কিভাবে বর্ণনা করা যায় ?

২. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সংক্ষেপে কি বলা যায় ?

৩. বস্তুবাদের মূল শিক্ষা কি কি ?

৪. দ্বন্দ্ববাদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি কি ?

৫ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলিতে কি বুঝায় ?

৬. ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সহিত মার্ক্সীয় দর্শনের সম্পর্ক কি ?

৭ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের তাৎপর্য কি ?

৮. শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা কি এবং কতদূর গ্রহণযোগ্য ?

৯. সংক্ষেপে মার্ক্সবাদী বিপ্লব-তত্ত্ব কি ?

১০. মার্ক্সবাদের বিকাশে লেনিনের অবদান কি এবং কতটা ?

মার্ক্সবাদ কি : মার্ক্সবাদ মানব-সমাজ ও মানবজীবন সম্পর্কিত এক বিজ্ঞানভিত্তিক মতাদর্শ। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সহায়তায় কার্ল মার্ক্স যে-মতাদর্শ প্রচার করেন তাহার মূলে ছিল সমাজ ও মানবজীবন সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি। মানব-মুক্তির প্রচেষ্টা, শোষণমুক্ত সমাজ-গঠনের ঘোষণাতেই হইল মার্ক্সবাদী মতাদর্শের প্রকাশ। শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজ-তন্ত্রবাদ, সর্বহারাশ্রেণীর ভূমিকা ও সমভোগবাদী সমাজ-গঠনের ধারণায় সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছে মার্ক্সবাদে। মানব-সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়, পরিবর্তনের ধারা, ভবিষ্যৎ সমাজের রূপরেখা প্রভৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানই মার্ক্সবাদের মূল লক্ষ্য।

মার্ক্সবাদ একধারে রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব। কেহ কেহ ইহাকে বিপ্লবী ভাবধারার প্রকাশ বলিয়াও চিহ্নিত করেন।

মার্ক্স-এঙ্গেলসের অনুবর্তিগণ : মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে ধারণার প্রকাশ ঘটান পরিবর্তিত অবস্থা ও কালের পটভূমিতে পরবর্তীকালে তাহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলেন লেনিন, স্তালিন ও মাও-জেদং। সুতরাং 'মার্ক্সবাদ' ধারণাটির সহিত মার্ক্স-এঙ্গেলসের তত্ত্ব ও শিক্ষা জড়িত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে লেনিন, স্তালিন ও মাও-জে-দং-এর বৈপ্লবিক উপলব্ধি ও প্রয়াস এই মতাদর্শের প্রকাশ ও জনপ্রিয়তায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism): স্তালিনের মতে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হইল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের বিশ্বদৃষ্টি (the world outlook)।[২] এই বিশ্বদৃষ্টি অনুসারে বস্তুময় জগৎই বাস্তব, ধ্যানধারণা বা ভাব হইল এই বস্তুময় জগতের প্রতিক্রিয়া (reflexes)। বলা হয়, প্রত্যেক দর্শনই বিশেষ শ্রেণী-ধারণার প্রকাশ। শোষকশ্রেণী মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার পথ ধরিয়া বিশেষ ভাব ও আদর্শের প্রচার করিয়া তাহার মাধ্যমে জগৎকে প্রত্যক্ষ করে; শোষিতশ্রেণী তথা শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন কিন্তু ভিন্ন। দাবি করা হয়, শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন সত্যনির্ভর, বাস্তবতাবর্জিত নহে।

শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টির তাৎপর্য: বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া বৈপ্লবিক শ্রেণীদৃষ্টিকে তুলিয়া ধরার মধ্যেই রহিয়াছে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টির তাৎপর্য। এই বিশ্বদৃষ্টি জগৎ, জীবন ও জগতে মানুষের স্থান কি তাহার বিচার করে। শ্রমিক-শ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টি, জগতে এই শ্রেণীর স্থান কি, ইহাদের ভূমিকা কি—মার্ক্সীয় দর্শন সাধারণভাবে তাহারই ব্যাখ্যা। ইহা শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের জানিতে এবং সচেতন করিতে সাহায্য করে। এই দর্শন কল্পনাশ্রয়ী নয়—বিজ্ঞানভিত্তিক। কিভাবে ধনতন্ত্রের ধ্বংসের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তাহারা বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে এবং এই ভূমিকা কোন্ বৈপ্লবিক তত্ত্বের অনুসরণে পালিত হয় তাহার বাস্তব ও বিজ্ঞানোচিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মার্ক্সীয়-লেনিনীয় বিশ্বদৃষ্টিতে। এই বিশ্বদৃষ্টি সত্যকে জানিয়া এবং বিপ্লবকে মূলধন করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতে প্রণোদিত করে।

জ্ঞানতত্ত্ব বা সত্য উদঘাটনের তত্ত্ব: দাবি হইল, মার্ক্সবাদী জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of Knowledge) সত্যকে জানার তত্ত্ব। মার্ক্সবাদীদের মতে, জ্ঞানের সংগে জগতের, বিষয়ের সংগে বিষয়ীর, কর্মের সংগে জ্ঞানের সম্পর্ক নিরূপণ না করিতে পারিলে সত্যকে নির্ণয় করা অসম্ভব। বলা হয়, মার্ক্সবাদের পূর্ব পর্যন্ত কোন দর্শন সত্য নির্ণয়ের এই সূত্রটি বুঝাইতে সমর্থ হয় নাই। হেগেলের ডায়ালেকটিককে (Dialectic) সমালোচনা করিয়া মার্ক্স বলিয়াছেন: হেগেল তাঁহার ডায়ালেকটিককে পায়ের বদলে মাথা দিয়া হাঁটাইতে চাহিয়াছিলেন। জড়-চৈতন্যের দ্বন্দ্বে হেগেল জড়ের স্থলে চৈতন্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মার্ক্সের বক্তব্য, তাঁহার ডায়ালেকটিক, যাহা স্বাভাবিক তাহারই সন্ধান দেয়—অর্থাৎ পা দিয়াই হাঁটে। মার্ক্স দাবি করেন, তাঁহার ডায়ালেকটিকে জড় তাহার প্রাপ্য প্রাধান্যের

---

১. স্মর্তব্য যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) কথাটি মার্ক্স কোথাও ব্যবহার করেন নাই। প্লেখানভ (Plekhanav) কথাটিকে প্রথম ব্যবহার করেন। লেনিন তাঁহার "What the Friends of the People are (1894)" নামক গ্রন্থ হইতে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিতে থাকেন। See John Lewis: *The Marxism of Marx*

২. "The world outlook of the Marxist-Leninist Party."—Stalin: *Dialectical and Historical Materialism*

স্বীকৃত পাইয়াছে।[১] অনেকে বলেন, মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যায় জড় শুধু তার হাঁটিবার অধিকারই পায় নাই, চিন্তা করিবার শক্তিও লাভ করিয়াছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণাকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়, ইহা একাধারে বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদ—অর্থাৎ, সমগ্র জগৎ বস্তুময় এবং চেতনা-নিরপেক্ষ (objective reality existing outside and independent of mind), কিন্তু জ্ঞানের অগম্য নয়। এই জ্ঞানই বলিয়া দেয় যে পৃথিবীর বস্তুসমূদয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত এবং গতিসম্পন্ন।

অতএব, মার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে (১) জগৎ জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত না হইলেও জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয়। (২) জ্ঞান মনোজগতের সৃষ্টি নয়, বাস্তব অবস্থার প্রকাশ। (৩) জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াটি দ্বান্দ্বিক ও উদ্দেশ্যমূলক।[২] (৪) চিন্তা সত্য-নির্ণয়ে সমর্থ কি না তাহা নির্ভর করে ব্যবহারিক অবস্থার উপর। মার্ক্সবাদীদের মতে, বাস্তব ও ব্যবহারিক জগতের প্রকাশ শ্রমে ও কর্মে—উৎপাদনে ও শ্রেণীসংগ্রামে।

জ্ঞানতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য : বিপ্লবের ব্যবহারই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী (Marxist-Leninist) জ্ঞানতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

মার্ক্সের মতে, সর্বহারাশ্রেণী তাহার বৈপ্লবিক চৈতন্য দ্বারা জ্ঞান ও জগতের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে সঠিক শিক্ষা লাভ করিবে। মার্ক্সের ভাষায়, এ-পর্যন্ত "দার্শনিকগণ জগৎকে ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, যদিও মূল কথাটি হইল জগতের পরিবর্তন সাধন করা।"[৩] মার্ক্সবাদী জ্ঞানতত্ত্বের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়—অবস্থাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন।

বস্তুবাদ : বস্তুবাদের মূল শিক্ষা তিনটি : (ক) জগৎ বস্তুময় (the world is by its very nature material.) এবং সমস্ত ধ্যানধারণা বস্তুগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য ; (খ) বস্তুই সত্য এবং ইহা ভাব (idea) হইতে পৃথক। ভাবজগৎ বস্তুজগতের অধীন ; (গ) জগৎ এবং ইহার নিয়মকানুন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব।

দ্বন্দ্ববাদ :[৪] দ্বন্দ্ববাদ পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর[৫] নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের পরিবর্তনের ধারাকে ব্যাখ্যা করে। দ্বন্দ্ববাদ ঘোষণা করে

---

১. "In Hegel Dialectic stands on its head ; Dialectical Materialism turned it right way up." Marx

২. I. D. Andreyev : *The Marxist Theory of Knowledge*

৩. "Uptil now philosophers have interpreted the world, the point though is to change it." *Theses on Feuerbach*

৪. মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ পরোক্ষভাবে প্রাচীন গ্রীস ও প্রত্যক্ষভাবে হেগেল হইতে প্রাপ্ত। প্রাচীন গ্রীস দার্শনিকগণ 'ডাইয়ালেগো' (Dialego) বা বাদপ্রতিবাদের মাধ্যমে সত্য বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া হেগেল দেখাইয়াছেন যে কিভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রগতি সম্ভব হয়।

৫. হেগেলের মতে কিন্তু বস্তু নয়। কারণ, হেগেল ছিলেন ভাববাদী এবং মার্ক্স বস্তুবাদী।

সকল বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব (contradictions) রহিয়াছে। এই দ্বন্দ্বই পরিবর্তনের মূল।

বস্তুর পরিমাণগত ক্রমপরিবর্তন হঠাৎ গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয় এবং নিম্ন স্তর হইতে উন্নত স্তরে পৌঁছায়।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা আছে, প্রত্যেক বস্তুরই অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে, উহার কোন দিক বিলুপ্ত হইতেছে, আবার অপর দিকে নূতনত্বের উদ্ভব হইতেছে। এই বিপরীতমুখী শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতেই—অর্থাৎ পুরাতন ও নূতনের সংঘাতের মধ্য দিয়া পৃথিবীর পরিবর্তনের ধারা চলিতে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ধনতন্ত্রে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়।

সংঘর্ষমূলক ও অসংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্ব বা অসংগতি : মার্ক্সীয়-লেনিনীয় তত্ত্বে দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্ব (antagonistic contradiction) এবং অসংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্ব (non antagonistic contradiction)—এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের বিভিন্নতা ইহাদের মধ্যে বিভেদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। যেমন, শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতির মধ্যে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া পুঁজিপতিদের হস্ত হইতে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব দূর হইতে পারে। যখন মানুষ দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হয় তখন সংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্বের ধারণাটি ক্রমশ অবলুপ্ত হইতে থাকে। অবশ্য এই পর্যায়ে নূতন এক ধরনের অসংগতি বা দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়। যেমন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সম হইলেও এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অসংগতি থাকিয়া যায়। ইহা হইল অসংগতি—অর্থাৎ সেই ধরনের অসংগতি যাহা সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের, অর্থ-ব্যবস্থার (উৎপাদন বিনিময় প্রভৃতি), উৎপাদনশক্তির উন্নয়ন-প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতিকে প্রতিবিম্বিত করে। জীবনযাত্রায় উদ্বেগ ও সমস্যার সৃষ্টি করিলেও এই ধরনের অসামঞ্জস্যের মধ্য দিয়াই অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি ঘটিতে থাকে। বলা হয়, মানব ও সমাজের উন্নয়ন দ্বন্দ্বের নীতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বন্দ্ববাদের প্রতিপাদ্য বিষয় : উপরি-উক্ত আলোচনায় ভিত্তিতে দ্বন্দ্ববাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি[১] নির্দেশ করা যায় :

প্রথমত, দ্বন্দ্ববাদ মনে করে যে বস্তুজগৎ অখণ্ড ও সুসংহত, প্রত্যেকটি বস্তু পরস্পর-নির্ভরশীল এবং একে অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Dialectics considers things as "connected with dependent on, and determind by, each other." Stalin)

১. Stalin : *Dialectical and Historical Materialism*

দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনড় বা অপরিবর্তনীয় নয়—ইহা বিবর্তনশীল। বস্তুর আবির্ভাব ও বিলুপ্তির প্রক্রিয়া একই সংগে ঘটিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচারে বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিকতা ছাড়া এই ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনশীলতারও বিবেচনা করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, বস্তুবাদ অনুসারে পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধারা আছে—পরিমাণগত পরিবর্তন (quantitative change) গুণগত পরিবর্তন (qualitative change) আনয়ন করে। বস্তুর বিভিন্ন অংশের পুনর্বিন্যাস, হ্রাস ও বৃদ্ধি হইল পরিমাণগত পরিবর্তন এবং গুণগত পরিবর্তন হইল পুরাতনের অবলুপ্তি ও নূতনের আবির্ভাব। গুণগত পরিবর্তন উল্লম্ফনের (Leap) আকারে দ্রুত সংঘটিত হয়। এই উল্লম্ফনকেই 'বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি সমাজকে উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যায়।

চতুর্থত, বস্তুবাদ পরস্পরবিরোধী শক্তি বা প্রবণতার ঐক্যের কথা ঘোষণা করে। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সমাজতন্ত্র জন্মলাভ করে—নূতন সমাজ-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism): মার্ক্সীয় তত্ত্ব বা দর্শনের ভিত্তি হইল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (Materialist Interpretation of History)।

সমাজ-জীবন ও উহার ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতির প্রয়োগকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়।[১]

অধিকাংশ পাঠকের কাছে ইতিহাস হইল ঘটনার বিবরণ—রাজরাজড়াদের কীর্তিকলাপ, যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা। অনেকে ইহার মধ্যে ঐশ্বরিক পরিকল্পনার ইংগিতও পান। কেহ কেহ আবার বলেন, ইতিহাস যুগধর্ম পরিচালিত—কোন কোন বিশেষ ও মহৎ ব্যক্তির সৃষ্টি। কার্ল মার্ক্স ইতিহাসকে এই ধরনের পণ্ডিতি বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার পটভূমিতে ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিপাদ্য বিষয়: মার্ক্সবাদ অনুসারে: (১) জনসাধারণই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়, ব্যক্তিবিশেষ নয়। (২) মার্ক্সবাদ ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা সমগ্র মানব-ইতিহাসের পশ্চাতে যে-সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রয়াস চালাইয়াছে। (৩) মার্ক্সবাদীদের মতে, যে-সকল নীতি মানুষের চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারা স্থান, কাল ও সমাজের প্রতিবিম্বন মাত্র। কোন বস্তুই যখন বিচ্ছিন্ন বা অসম্পর্কিত নয় তখন প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থাকে তাহার স্থান কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। যেমন, দাসপ্রথা বর্তমান সময়ে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও, প্রাচীনকালে উহা কিন্তু স্বাভাবিকই ছিল।

১. "Historical Materialism is the extension of the principles of dialectical materialism to the study of social life ..to the study of society and of its history." Stalin

(৪) মার্ক্সবাদীদের মতে, সকল বস্তুই যখন পরিবর্তনশীল তখন সমাজ-ব্যবস্থা উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। পৃথিবীর সকল বস্তুই দ্বন্দ্ব বা অসংগতির মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হয়। সুতরাং সমাজও তাহার আভ্যন্তরীণ অসংগতি বা দ্বন্দ্বের ফলে পরিবর্তিত হয়।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্বই সমাজ-বিকাশের প্রধান চালিকাশক্তি। (*'...the motor forces of history, i. e., the explanation of history is class struggle.'* Georges Politzer)

---

(৫) বস্তুময় জগৎই যদি ধ্যানধারণা ইত্যাদির উৎস হয় তবে সামাজিক ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের বৈষয়িক পরিবেশ বা অবস্থার (conditions of material life of society) দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক পরিবেশভিত্তিক ধ্যানধারণাও পরে সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে।

উৎপাদন-শক্তি : এখন প্রশ্ন, সমাজের রূপ ও উহার গতিনির্ধারণকারী বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান শক্তি (catalyst) হিসাবে কার্য করে? উত্তরে বলা হয়, কোন সমাজে মানুষ যেভাবে জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বণ্টন করে মূলত তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ঐ সমাজের প্রকৃতি কি হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদন-পদ্ধতির (mode of production) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রকারের ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠান।

উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক : উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক রহিয়াছে : (ক) উৎপাদন-শক্তি (The forces of production) এবং (খ) উৎপাদন-সম্পর্ক (Relations of production)।

উৎপাদন-শক্তি বলিতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং যন্ত্রপাতি-ব্যবহারকারী শ্রমিক ও তাহাদের দক্ষতাকে বুঝায়, আর প্রচলিত ধনসম্পত্তি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে-সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহাই হইল উৎপাদন-সম্পর্ক। যেমন, ধনতন্ত্রে প্রধানত এই সম্পর্ক হইল মূলধন-মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানাস্বত্ব ভোগ করে মূলধন-মালিক, কিন্তু শ্রমিকদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না। কোন বিশেষ সমাজে উৎপন্ন-দ্রব্য কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার প্রকৃতির উপর।

উৎপাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য : এখন উৎপাদন বা উৎপাদন-পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে :

(ক) উৎপাদন-পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত থাকে না। বস্তুত, ইহা সতত পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবিকাশশীল (Production is always in state of

change and development)। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার সকল দিকে পরিবর্তন আসে—সামাজিক ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক মতামত ও প্রতিষ্ঠান সকলই পরিবর্তিত হয়।

অতএব, সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস হইল উৎপাদন-পদ্ধতির—অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাস (The history of development of society is above all the history of the development of production.

এ-অবস্থায় সমাজ-বিকাশের সূত্র খুঁজিতে হইলে আমাদের উৎপাদন-বিকাশের সূত্রগুলি অনুধাবন করিতে হইবে।

(খ) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন-শক্তি—বিশেষ করিয়া উৎপাদনের যন্ত্রসমূহ (instruments of production)—অধিক পরিবর্তনশীল ও সম্প্রসারণশীল। সুতরাং প্রথমে এই উৎপাদন-শক্তি পরিবর্তিত হয় এবং পরে প্রতিফলিত হয় উহার সহিত সংগতিপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-শক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক প্রবর্তিত না হইলে দেখা দেয় উৎপাদন ও অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট। উভয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব তখন টানিয়া আনে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সামাজিক বিপ্লব। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে প্রকট অসংগতিই—উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা কিন্তু সামাজিক উৎপাদন-প্রণালী—অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের কারণ।

(গ) উৎপাদন বা উৎপাদন-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে নূতন উৎপাদন-শক্তি (the forces of production) ও উৎপাদন-সম্পর্ক (the relations of production) পূর্বতন ব্যবস্থার ধ্বংস হওয়ার পর সম্পর্কচ্যুতভাবে প্রসারলাভ করে না—পুরাতন ব্যবস্থার মধ্য হইতেই উহা উদ্ভূত হয়। এই নূতন উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে—অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা-প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়াই বিকাশলাভ করে। ইহার কারণও আছে। মানুষ যখন কর্মজগতে প্রবেশ করে তখন প্রচলিত উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ককে মানিয়া লইয়াই করে—ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি হইবে না-হইবে তাহা চিন্তা করে না। যেমন, মানুষ যখন প্রস্তর ব্যবহারের স্থলে ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার শিখিল তখন মানুষ চিন্তা করিতে পারে নাই যে ইহার ফলে একদিন দাস-সমাজ প্রবর্তিত হইবে। কিন্তু উৎপাদন-শক্তি ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হইলে নূতন উৎপাদন-শক্তির সহিত অবস্থিত উৎপাদন-সম্পর্কের বাধে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষই শ্রেণীদ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে।[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায় (Historical Materialism and Stages of Social Development): সমাজ-বিবর্তনের

[illegible] the common ownership of the means of production." Stalin

(৪) মার্ক্সবাদীদের মতে, সকল বস্তুই যখন পরিবর্তনশীল তখন সমাজ-ব্যবস্থা উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। পৃথিবীর সকল বস্তুই দ্বন্দ্ব বা অসংগতির মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হয়। সুতরাং সমাজও তাহার আভ্যন্তরীণ অসংগতি বা দ্বন্দ্বের ফলে পরিবর্তিত হয়।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্বই সমাজ-বিকাশের প্রধান চালিকাশক্তি। (*'...the motor forces of history, i. e., the explanation of history is class struggle.'* Georges Politzer)

(৫) বস্তুময় জগৎই যদি ধ্যানধারণা ইত্যাদির উৎস হয় তবে সামাজিক ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের বৈষয়িক পরিবেশ বা অবস্থার (conditions of material life of society) দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক পরিবেশভিত্তিক ধ্যানধারণাও পরে সামাজিক পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে।

উৎপাদন-শক্তি: এখন প্রশ্ন, সমাজের রূপ ও উহার গতিনির্ধারণকারী বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান শক্তি (catalyst) হিসাবে কার্য করে? উত্তরে বলা হয়, কোন সমাজে মানুষ যেভাবে জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বণ্টন করে মূলত তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় ঐ সমাজের প্রকৃতি কি হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদন-পদ্ধতির (mode of production) উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রকারের ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠান।

উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক: উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক রহিয়াছে: (ক) উৎপাদন-শক্তি (The forces of production) এবং (খ) উৎপাদন-সম্পর্ক (Relations of production)।

উৎপাদন-শক্তি বলিতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং যন্ত্রপাতি-ব্যবহারকারী শ্রমিক ও তাহাদের দক্ষতাকে বুঝায়, আর প্রচলিত ধনসম্পত্তি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে-সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহাই হইল উৎপাদন-সম্পর্ক। যেমন, ধনতন্ত্রে প্রধানত এই সম্পর্ক হইল মূলধন-মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক। *এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানাস্বত্ব ভোগ করে মূলধন-মালিক, কিন্তু শ্রমিকদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না।* কোন বিশেষ সমাজে উৎপন্ন-দ্রব্য কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার প্রকৃতির উপর।

উৎপাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য: এখন উৎপাদন বা উৎপাদন-পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে:

(ক) উৎপাদন-পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত থাকে না। বস্তুত, ইহা সতত পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবিকাশশীল (*Production is always in state of*

change and development)। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার সকল দিকে পরিবর্তন আসে—সামাজিক ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক মতামত ও প্রতিষ্ঠান সকলই পরিবর্তিত হয়।

অতএব, সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস হইল উৎপাদন-পদ্ধতির—অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাস (The history of development of society is above all the history of the development of production.

এ-অবস্থায় সমাজ-বিকাশের সূত্র খুঁজিতে হইলে আমাদের উৎপাদন-বিকাশের সূত্রগুলি অনুধাবন করিতে হইবে।

(খ) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন-শক্তি—বিশেষ করিয়া উৎপাদনের যন্ত্রসমূহ (instruments of production)—অধিক পরিবর্তনশীল ও সম্প্রসারণশীল। সুতরাং প্রথমে এই উৎপাদন-শক্তি পরিবর্তিত হয় এবং পরে প্রতিফলিত হয় উহার সহিত সংগতিপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-শক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক প্রবর্তিত না হইলে দেখা দেয় উৎপাদন ও অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট। উভয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব তখন টানিয়া আনে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সামাজিক বিপ্লব। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে প্রকট অসংগতিই—উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা কিন্তু সামাজিক উৎপাদন-প্রণালী—অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের কারণ।

(গ) উৎপাদন বা উৎপাদন-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে নূতন উৎপাদন-শক্তি (the forces of production) ও উৎপাদন-সম্পর্ক (the relations of production) পূর্বতন ব্যবস্থার ধ্বংস হওয়ার পর সম্পর্কচ্যুতভাবে প্রসারলাভ করে না—পুরাতন ব্যবস্থার মধ্য হইতেই উহা উদ্ভূত হয়। এই নূতন উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে—অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা-প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়াই বিকাশলাভ করে। ইহার কারণও আছে। মানুষ যখন কর্মজগতে প্রবেশ করে তখন প্রচলিত উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ককে মানিয়া লইয়াই করে—ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি হইবে না-হইবে তাহা চিন্তা করে না। যেমন, মানুষ যখন প্রস্তর ব্যবহারের স্থলে ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার শিখিল তখন মানুষ চিন্তা করিতে পারে নাই যে ইহার ফলে একদিন দাস-সমাজ প্রবর্তিত হইবে। কিন্তু উৎপাদন-শক্তি ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হইলে নূতন উৎপাদন-শক্তির সহিত অবস্থিত উৎপাদন-সম্পর্কের বাধে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষই শ্রেণীদ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে।[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায় (Historical Materialism and Stages of Social Development): সমাজ-বিবর্তনের

১. **"Labour in common led to the common ownership of the means of production, as well as of the fruits of production." Stalin**

গেয়া সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন সংক্ষেপে উহার পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে।

আদিম যুগে—সমবেত প্রচেষ্টায় খাদ্যাহরণের সময় সমাজ ছিল সমভোগী (communistic)—শ্রেণীশোষণের কোন সুযোগই ছিল না। শ্রমবিভাগ, কলাকৌশলের উন্নতি, পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে আদিম সমভোগী সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর পক্ষে অপরের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তাংশ (surplus) ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল এবং প্রবর্তিত হইল মানব-ইতিহাসে প্রথম শোষণমূলক ব্যবস্থা—দাস-সমাজ (Slave Society)। পরবর্তী শোষণমূলক সমাজ হইল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (Feudal Society), যে-ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুরা (feudel lords) ভূমিদাসদের (serfs) বেগার খাটাইয়া[1] পরিপুষ্টি লাভ করিত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পর ধনতান্ত্রিক সমাজ (Capitalist Society) মূলধন-মালিক ও শ্রমিক—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। আইনত স্বাধীন হইলেও শ্রমিকদের কার্যত শ্রমবিক্রয় ব্যতীত জীবিকার্জনের আর কোন উপায় রহিল না, আর শ্রমিকদের শোষণ করিয়া মূলধন-মালিকগণ মুনাফা ভোগ করিতে লাগিল।

উদ্বৃত্ত মূল্য ও ধনতান্ত্রিক শোষণ: মুনাফার কারণ হইল, নিঃস্ব শ্রমিকদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চাপে মজুরির পরিমাণ দাঁড়ায় জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তৎটুকুতে, কিন্তু মূলধনমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় (capitalistic mode of production) শ্রমিক তাহার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়তাকে ছাড়াইয়া অনেক বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়।

এইভাবে শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যমূল্য এবং শ্রমশক্তির বিক্রয়মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যে-উদ্বৃত্ত-মূল্যের (surplus value) সৃষ্টি হয় তাহা মূলধন-মালিকের আয়।

এখানে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তিশীল সকল সমাজের শোষণের (exploitation) মূল প্রকৃতি এক—মালিক কর্তৃক শ্রমিক বা 'প্রকৃত উৎপাদকের' (real producer) শোষণ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের (Socialist Society) অবস্থা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা সমগ্র সমাজের বলিয়া উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভোগদখলও সামাজিক।

শোষণমূলক সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব: অতএব, আদিম সমভোগী সমাজ হইতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত সকল সমাজই দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীতে বিভক্ত। কারণ, যখন এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে তাহার শ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগদখল করে তখন দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ না বাঁধিয়া পারে না। ইহা ব্যতীত পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন এক শ্রেণীর শোষকের সহিত অন্য শ্রেণীর

১. সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিদাসদের সামন্তপ্রভুদের জমিতে বেগার খাটিতে হইত।

শোষকেরও দ্বন্দ্ব থাকে। অবশ্য যেখানে শ্রেণীসম্পর্ক শোষণমূলক নয় সেখানে অসংগতি থাকিলেও আন্তঃশ্রেণী-সংঘর্ষ (intra-class conflict) থাকে না।

যাই হোক, দ্বন্দ্বশীল সমাজে শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লব সংঘটিত হইয়া থাকে।

অতএব, কোন সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী-সম্পর্কের ধরন নির্ভর করে ঐ সমাজের প্রকৃতির উপর। সমাজের প্রকৃতি আবার কি হইবে, না-হইবে তাহা আবার সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের উপর নির্ভরশীল। সমাজের উৎপাদন-শক্তি নিয়ত সম্প্রসারণশীল। ইহার সহিত সংগতিপূর্ণ উৎপাদন-সম্পর্ক প্রবর্তিত না হইলে উৎপাদন-শক্তির সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয় না। মাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেই এই সংগতিসাধন সম্ভব। কারণ, এই সমাজ-ব্যবস্থা শোষণহীন বলিয়া ইহাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বও অনুপস্থিত।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সমাজ-বিবর্তন: অবশ্য এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সমাজ বিবর্তিত হয়—পুরাতন শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত এবং নূতন প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর বিপ্লবের ফলে প্রবর্তিত হয় নূতন উৎপাদন-সম্পর্ক এবং বিকশিত হয় উৎপাদন-শক্তির সম্ভাবনা।[১]

ধনতন্ত্রের উদ্ভব: দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্য হইতে ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে ধনতন্ত্রের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে। পণ্যের বাজার ক্রমশ প্রসারলাভ করে, উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতি হয় এবং শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্বন্ধ বা সম্পত্তির সম্পর্ক প্রচলিত থাকায় এই নূতন উৎপাদন-শক্তির সম্ভাবনা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয় না।

কিছুদিন পরে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ও ভূমিদাসশ্রেণীর সমর্থনে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রবর্তিত হয় ধনতান্ত্রিক সমাজ। সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের স্থান অধিকার করে যথাক্রমে মালিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী, এবং ক্রমে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ সুরু হয়। ইহাই ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ক্রমশ ইহা প্রকট রূপ ধারণ করে। বৃহদায়তন শিল্পে সহস্র সহস্র শ্রমিকের সহযোগিতায় সামাজিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের সহিত উৎপন্ন দ্রব্যের মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত ভোগদখলের মধ্যে অসংগতির দরুন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। মুনাফার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত মূলধন-মালিকদের শোষণের ফলে সমাজের ক্রয়শক্তি সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পারে না। ফলে দেখা দেয় অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রভৃতি।

সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারাদের বিপ্লব: শেষ পর্যন্ত সর্বহারার দলের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় বিপ্লব এবং ধনতন্ত্রের উপর আসে চরম আঘাত। এই বিপ্লবকে সমাজ-

১. "At a certain stage of their development, material forces of production in society come into conflict with the existing relations of production...with the property relations...then begins an epoch of social revolution." Marx

তান্ত্রিক বা সর্বহারাদের বিপ্লব (Socialistic or Proletarian Revolution) আখ্যা দেওয়া হয়।

মার্ক্সবাদীদের মতে, এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল সকল প্রকার শোষণের অবসান করা এবং সামাজিক মালিকানা প্রবর্তন করিয়া কমিউনিস্ট বা সমভোগী সমাজের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই এইরূপ সমাজের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না—ইহার জন্য প্রয়োজন হয় প্রস্তুতি ও সংগঠনের, উৎপাদন-শক্তিকে বহুগুণে বর্ধিত করিবার এবং মানুষের নৈতিক ও মানসিক চিন্তাধারাকে উন্নত স্তরে লইয়া যাইবার।

ইতিহাস-তত্ত্বের মূল্যায়ন: কার্ল মার্ক্সের ইতিহাস-তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচকদের মতে, মানুষ ইতিহাসের দাস মাত্র—তাহার আয়ত্তের বাহিরে কোন এক নিগূঢ় শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য হইল যে জনগণের সক্রিয়, সচেষ্ট আন্দোলন দ্বারাই ইতিহাসের গতি-পরিবর্তন সম্ভব। তবে ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সম্যক ইতিহাস-জ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, কেহ কেহ বলেন, মার্ক্সবাদ ইতিহাসের আলোচনায় অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করে।[১] এই তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক ধ্যানধারণা, তত্ত্ব, রাজনৈতিক মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকলই সমাজের বৈষয়িক পরিবেশের (conditions of material life of society) দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এবং মানুষের সকল কার্যের মূলে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণের সন্ধান করিলে ভুল করা হইবে—অর্থনৈতিক এলাকা-বহির্ভূত (non-economic) বিষয়সমূহের প্রভাবও অনস্বীকার্য। অভিযোগ করা হয়, মার্ক্সের ইতিহাসতত্ত্বে মতবাদ ও ভাবাদর্শের (ideas and ideals) ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। অথচ লক্ষ্য করা যায়, বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের জন্যই মানুষ সংগ্রাম করিতে উৎসুক।

অবশ্য মার্ক্সের সমর্থনে একথা বলা যায়, যাহাকে তিনি অর্থনৈতিক ভিত্তি (economic base) বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক নহে।[২] ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একথা বলে না যে ইতিহাসে অন্যান্য শক্তির মূল্য নাই, বরং ইতিহাস পরস্পর-সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সমাবেশ—এই শিক্ষাই দেয়। ইহাদের মধ্যে অবশ্য অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব হইল প্রাথমিক ও যুগান্তকারী।[৩]

---

১. "It (the Marxian doctrine) exaggerates the influence of the economic factor out of proportion to its true size and significance" Lipson : *The Great Issues of Politics*

২. "Many factors that cannot clearly be considered 'economic' enter into what Marx seems to mean by 'mode of production' or 'economic base'." C. Wright Mills : *The Marxists*

৩. Milliband : *Marxism and Politics*

তৃতীয়ত, অনেকে মনে করেন মার্ক্সীয় ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। ইতিহাসে শ্রেণী-সহযোগিতার (class collaboration) উদাহরণ নাই একথা বলা চলে না। মার্ক্সবাদীরা অবশ্য ঘোষণা করেন, যে-মুহূর্তে শোষণের অবসান ঘটিবে সেই মুহূর্তেই শ্রেণী-শাসন ও সংগ্রামের প্রয়োজন থাকিবে না।

চতুর্থত, মার্ক্সীয় ইতিহাস-তত্ত্বে সাম্যবাদকে সমাজের গতির পরিণতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইতিহাসের গতি সম্পর্কে এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা লইয়াও প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা হয়, মার্ক্সবাদীরা বাস্তব অবস্থার বিচারে ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ইংগিত দিয়াছেন মাত্র, এবং কোন্ অবস্থায় এই সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই।

উপসংহার : মার্ক্সের ইতিহাস-চিন্তা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ এই ইতিহাসের প্রধান ও সক্রিয় শক্তি। এই ইতিহাস-চিন্তা সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে প্রতিফলিত করে। এই চিন্তা বিশ্বের মেহনতী মানুষকে সংগ্রামের শিক্ষা দেয়, অনুপ্রেরণা যোগায়, তাহার বিপ্লবী কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শোষণের প্রকৃতি—উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব (The Nature of Exploitation in Capitalist Society—Theory of Surplus Value) :

লেনিনের মতে, মার্ক্সীয় তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা সুগভীর, পূর্ণাংগ এবং বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ হইল তাঁহার অর্থ নৈতিক মতবাদ।[১] মার্ক্স স্বয়ং লিখিয়াছেন : "আধুনিক সমাজের—অর্থাৎ পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া সমাজের গতিধারার অর্থ নৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটন করাই আমার এই রচনার চূড়ান্ত লক্ষ্য।"[২]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের নিরীক্ষা—ইহাই হইল মার্ক্সবাদী অর্থনীতির মূল কথা।

ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই সমাজ-ব্যবস্থা কতটা শোষণমূলক তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা ন্যস্ত থাকে কতিপয় ব্যক্তির হাতে, যাহারা সহায়সম্বলহীন শ্রমজীবীদের শ্রমশক্তিকে (labour power) শোষণ করিয়া সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। শ্রমিক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছায় শ্রমশক্তি বিক্রয় করিলেও উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর তাহার কোন অধিকারই থাকে না। মূলধন-মালিক উৎপাদন-প্রসার (expansion of production)

---

১. "Marx's economic doctrine is the most profound, comprehensive and detailed confirmation and application of his theory." Lenin : *Karl Marx and His Teaching*

২. "It is the ultimate aim of this work to lay bare the economic law of motion of modern society." Marx : *Preface to Capital*

করিয়া চলিলেও শ্রমিক তাহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ও পারিবারিক ভরণপোষণের জন্য শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং পায় শুধুমাত্র মজুরি।

অতএব, পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ হইতে ধনতান্ত্রিক শোষণ ভিন্ন প্রকৃতির। ধনতন্ত্রে মূলধন-মালিক অপরের শ্রমের বিনিময়ে অর্জন করিয়া হয় ধনিক, আর শ্রমশক্তি রূপান্তরিত হয় অন্যতম পণ্যে।[১]

শ্রমের মূল্য : যে-কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় উহা উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ (amount of labour embodied in it) দ্বারা। কারণ, দ্রব্যটি শ্রমেরই ফল। শ্রমের মূল্যের পরিমাপ হইল উহার পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় (The value of labour is...measured by the amount of working time required for its reproduction.)। শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়িয়া তুলিতে যে-সময় লাগে তাহাই শ্রমের মূল্য। ধনতন্ত্রে কিন্তু ইহা নির্ধারিত হয় শ্রমিক কি অর্থমূল্য লাভ করিল তাহা দ্বারা—অর্থাৎ মজুরির মাপকাঠিতে।

শ্রমশক্তির মূল্য উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের (use-value) উপর নির্ভরশীল। এই ব্যবহার-মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শ্রমশক্তির মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমশক্তির ভূমিকা কি? বুর্জোয়া অর্থবিদ্যাবিদ্ (অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রভৃতি) মনে করিয়াছিলেন শ্রমিক মূলধন-মালিকের নিকট তাহার শ্রম বিক্রয় করে, শ্রমশক্তি নহে।[২] শ্রম বিক্রয়ের বিনিময়ে শ্রমিক মজুরি লাভ করে এবং মুনাফা হইল মূলধন-মালিকের ঝুঁকিবহন অথবা অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার।

মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে এই ধারণার সমালোচনা করিয়া বলা হয়, মূলধন-মালিক শ্রমিকের শ্রম নয়, শুধু শ্রমশক্তি ক্রয় করে। এবং মূলধন-মালিকই স্থির করে শ্রমিক কতটা শ্রমশক্তি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করিবে, কতটা সময় উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত থাকিবে, কি পরিমাণ মজুরি পাইবে, ইত্যাদি।

উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) : শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তি ব্যবহার করিয়া কাঁচামাল হইতে এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করে। পণ্যের মূল্যের মধ্যে কাঁচামালের মূল্য, জ্বালানির মূল্য, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণের মূল্যও ধরা হয়। এই সমস্ত মূল্যকে যোগ করিয়াই পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যটির এই সমস্ত মূল্য ছাড়াও শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তির দ্বারা এক নূতন মূল্য

---

১. "Under capitalism the role of labour power changes, for it, too, becomes a commodity." *An Outline of Social Development* (Progress Publishers, Moscow)

প্রত্যেক পণ্যের দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকে—ব্যবহার-মূল্য (use value) ও মূল্য (value)। শ্রমশক্তি পণ্য এই অর্থে যে ইহারও ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময় মূল্য—উভয়ই রহিয়াছে।

২. "The labourer sells his labour but remains his own property

সৃষ্টি করে (the new value created by the labour o f workers in the manufacture of the commodity), যাহা শ্রমশক্তির মূল্য (যাহা মূলধন-মালিক কর্তৃক দেয়) অপেক্ষা বেশী। বুর্জোয়া অর্থনীতিতে এই নূতন মূল্যের উপর কোন আলোকসম্পাত করা হয় নাই। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতেই এই বিষয়টিকে সর্বপ্রথম প্রকাশ করা হয়। মালিকশ্রেণীর মুনাফার উৎস কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্ক্সবাদিগণ শ্রম-উৎপন্ন এই নূতন মূল্যের কথা বলেন।

শ্রমশক্তি কর্তৃক সৃষ্ট এই নূতন মূল্য হইতে মজুরি বাদ দিলে যে অতিরিক্ত মূল্য মালিকরা ভোগ করে তাহাকেই উদ্বৃত্ত-মূল্য (surplus value) নামে অভিহিত করা হয়।

স্বরূপ ব্যাখ্যা : এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বরূপ কি? মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে বলা হয়, শ্রমিক কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিস এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করে এবং উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া দাম পায়। পণ্যটির বাজার-দাম কাঁচামাল ইত্যাদির দাম, ঘরবাড়ি কারখানা যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের (depreciation) ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় এবং শ্রমসৃষ্ট অতিরিক্ত নূতন মূল্য লইয়া স্থির হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রমশক্তির দ্বারা যে নূতন মূল্য সৃষ্ট হয় তাহা শ্রমশক্তির দাম হইতে অনেক বেশী। শ্রমশক্তির দাম হিসাবে শ্রমিককে যে মজুরি দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ শ্রমিক ও তাহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই, কিন্তু শ্রমিক তাহার শ্রমের দ্বারা যতটুকু মূল্য সৃষ্টি করে তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া যে দাম পাওয়া যায় তাহা মজুরির পরিমাণ হইতে অনেক বেশী। এই পার্থক্যই হইল উদ্বৃত্ত-মূল্য।[১]

অন্যভাবে বলা যায়, মজুরির জন্য যতটা সময় শ্রমিকের শ্রম করা প্রয়োজন তাহার অধিক সময় শ্রমিককে শ্রম করিতে হয় বলিয়াই মালিকশ্রেণীর এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ : ধরা যাক, কোন মালিকের সেলাই কলের কারখানায় ২০০ সেলাই কল উৎপাদনের জন্য মোট ৪০ হাজার টাকা দিয়া ১০,০০০ কেজি ধাতু কিনিতে হয়। যন্ত্রপাতি ও উহার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় হয় ৫০০ টাকা এবং ৫০ জন শ্রমিকের মজুরি বাবদ সে ব্যয় করে ৫০০ টাকা (১০ টাকা দৈনিক মজুরি হারে)। সুতরাং তাহার মোট ব্যয় হইল .

১. "The value which the worker produces over and above the value of labour power is called surplus value." J. Eaton : *Political Economy*

"The increase over the original value of the money that is put into circulation is called by Marx surplus value." Lenin : *Marx and His Teaching*

ধাতু ক্রয়জনিত ব্যয়	৪০,০০০ টাকা
যন্ত্রপাতি ও ইহার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়	৫০০ "
শ্রমিকের মজুরিবাবদ ব্যয়	৫০০ "
	৪১,০০০ টাকা

ধরা যাক, প্রতিটি সেলাই কলের বিক্রয়-মূল্য ২০৫ টাকা। এক্ষেত্রে মোট বিক্রয়-মূল্য ২০০ × ২০৫ টাকা = ৪১,০০০ টাকা হওয়ার দরুন মালিকের কোন মুনাফা হইবে না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিষয়টি অন্যরকম ঘটে। শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মিটাইয়া মালিক শ্রমিককে সারাদিনে আরও অধিক সময় শ্রম করিতে বাধ্য করে। ফলে শ্রমিক তাহার নির্দিষ্ট শ্রমশক্তির মূল্য ছাড়াও অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করে। ধরা যাক, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য ৪ ঘণ্টায় অর্জিত হয়, কিন্তু চুক্তি অনুসারে সে মালিকের কাছে ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ৮ ঘণ্টায় ৫০ জন শ্রমিক প্রায় দ্বিগুণ (৪০০টি সেলাই কল) উৎপাদন করিতে সমর্থ। এক্ষেত্রে তাহার ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিবে।

ধাতু ক্রয়জনিত ব্যয়	৮০,০০০ টাকা
যন্ত্রপাতি ও ইহার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়	১,০০০ "
শ্রমিকের মজুরিবাবদ ব্যয়	৫০০ "
	৮১,৫০০ "

আগের দামে ৪০০ সেলাই কল বিক্রয় করিয়া মালিক ৮২,০০০ টাকা পাইলেও তাহার মোট ব্যয় হয় ৮১,৫০০ টাকা। অতএব, সে ৫০০ টাকা অধিক মূল্য অর্জন করে। এই অতিরিক্ত মূল্যই উদ্বৃত্ত-মূল্য।

প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় ও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়: ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় মালিকের এই অনুপার্জিত আয়ের ব্যবস্থা থাকিয়াই যায়। শ্রমিকের শ্রমশক্তি শোষণ করিয়া সে এই আয় করে। ৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টা প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় (necessary labour time) এবং বাকী ৪ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় (surplus labour time)। শ্রমিক তাহার জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে প্রথম ৪ ঘণ্টা সময় নিয়োগ করে। অতিরিক্ত ৪ ঘণ্টা সে মূলধন-মালিকের মুনাফা অর্জনে ব্যয় করে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকার্যের মূল লক্ষ্য হইল মুনাকা অর্জন। মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে প্রয়াসী হয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি: শিল্প-বিপ্লবের পর, প্রযুক্তিবিদ্যায় অসাধারণ উন্নতির সংগে সংগে মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে কার্যকর করা হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতি আকর্ষণ মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ বাড়াইয়া তুলে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকটের মূলেও উৎপাদন-ব্যবস্থার এই প্রবণতা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

মূলধন-মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। প্রথমত, মজুরি না বাড়াইয়া দৈনিক শ্রমের সময় বাড়াইতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, শ্রমের সময় বা উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া মজুরি কমাইতে চেষ্টা করে। তৃতীয়ত, শ্রমিককে কঠোর শ্রম করিতে বাধ্য করিয়া অথবা উৎপাদনকৌশলের উন্নতিসাধন করিয়া ঘণ্টাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। মালিকশ্রেণী এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের কতকাংশ নিজের প্রয়োজন মিটাইতে ব্যয় করে আর বাকী অংশ মূলধনে পরিণত করিয়া ইহার সাহায্যে অধিক শ্রম নিয়োগ করিয়া আরও অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি ও ভোগ করে।

বিযুক্ত শ্রম (Alienated Labour) : এইভাবে শ্রমিক আপন শ্রমের মূল্য হইতে বঞ্চিত হয়—অর্থাৎ নিজের শ্রম হইতে বিযুক্ত (alienated) হইয়া পড়ে। এই বিযুক্ত শ্রমের দখল পায় পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের বিযুক্ত শ্রম পুঁজিপতির সম্পদকে বাড়াইয়া তুলে।

উৎপাদন ব্যবস্থার উপর শ্রমিকের কোনো অধিকার না থাকায় উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতেই সে বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

মূল্যায়ন : অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে মার্ক্স ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির উপরই আলোকসম্পাত করিয়াছেন, উহার সুফলের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই। অতএব, অন্তত শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্ব এক মৌলিক ধারণাকে প্রকাশ করিয়াছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, বিযুক্তির (alienation) প্রশ্ন প্রভৃতির আলোচনায় মার্ক্স প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণের চরিত্র ও সংকটকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, কিভাবে ধনতান্ত্রিক শোষণ সামাজিক শোষণে পরিণত হয় তাহার পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এবং কিভাবে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া এই শোষণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়—মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্বে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণা (The Concept of Class and Class-Struggle) : রাজনীতির আলোচনায় 'দ্বন্দ্ব' (struggle) ধারণাটির ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। মার্ক্সীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হইল 'দ্বন্দ্ব'। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের মতে সমাজে দ্বন্দ্ব থাকিতেই পারে, তবে রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হইল কিভাবে যুক্তি ও শুভবুদ্ধির পথে, সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইয়া এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায় তাহার অনুসন্ধান।[১]

দ্বন্দ্বের চিরাচরিত দৃষ্টিভংগি : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য কিন্তু দ্বন্দ্বের উপস্থিতি ও সমাধান সম্পর্কিত বিষয়ের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা প্রদান (Politics

১. "The hidden assumption is that conflict does not, or need not, run very deep; that it can be 'managed' by the exercise of reason and good-will, and a readiness to compromise and agree" Millibamd

involves disagreements and the reconciliation of those disagreements.)। অর্থনৈতিক অপ্রাচুর্য, ধর্মীয় বিরোধ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত প্রভৃতি বিরোধের কারণ। নির্বাচন, আলাপ-আলোচনা, বিদ্রোহ, সাংবিধানিক ব্যবস্থা, চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure groups) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে ও প্রয়াসে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব।

মার্ক্সীয় ধারণা : মার্ক্সীয় রাজনীতিতে কিন্তু দ্বন্দ্বের ধারণাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাকে শুধুমাত্র 'সমস্যা' ও 'সমাধানে'র পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে চলিবে না—শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে।

শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের সামাধান কখনই বুঝাপড়া বা উভয় পক্ষের শুভ ইচ্ছার জাগরণে ঘটে না। শ্রেণীদ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে।[১] শ্রেণী-অধ্যুষিত সমাজে শাসকশ্রেণী বলপ্রয়োগ, প্রভাব বিস্তার অথবা কিছুটা সুবিধাদানের মাধ্যমে বিরোধ মিটাইতে পারে কিন্তু দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইতে পারে না। মার্ক্সবাদ বিশ্বাস করে সমাজ ঠিক ব্যক্তিসমূহের সমবায়ে নয়, ব্যক্তিসমূহের সম্পর্কের ভিত্তিতেই গঠিত। সমাজে যতদিন শোষণ অব্যাহত থাকিবে, ততদিন শ্রেণীগত মানসিকতার ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপস্থিতি থাকিয়া যাইবে। শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠাই শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতে পারে।

শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিষয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা প্রথম উপস্থাপিত হয় 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে (*Communist Manifesto*, 1848) এবং মার্ক্সের উত্তরসূরিদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে।

এ-পর্যন্ত সকল সমাজেরই ইতিহাস হইল 'শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'। "The history of all hitherto existing society is the history of class-struggles." Marx and Engles)।

য়া সমাজে এই শ্রেণীসংগ্রাম প্রবল হইয়া ক্রমশ দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে—বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত (সর্বহারা), এবং শ্রেণীদ্বয় সোজাসুজি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

শ্রেণী বলিতে কি বুঝায় : লেনিনের মতে, বিভিন্ন শ্রেণী হইল বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ যাহারা পরস্পর হইতে পৃথক। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহের সহিত উহাদের সম্পর্ক এবং সামাজিক সংগঠনে গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা—মূলত এই দুই দিক দিয়াই শ্রেণীবিভাগ স্থির করা হয়। অবশ্য সামাজিক সম্পদের অংশভোগ ও তাহা আয়ত্ত করার প্রকৃতিকেও মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।[২] লেনিনের দৃষ্টিতে উৎপাদনের উপকরণের সহিত সম্পর্কই শ্রেণীর প্রধান

১. It is not a matter of 'problems' to be 'solved' but "... to be ended by a total transformation of the conditions which give rise to it." Milliband

২. *Lenin : A Great Beginning*

সূচক—শাসকশ্রেণী হিসাবে বিশেষ সুবিধাভোগী কিছু লোক উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ভোগ করে, আবার কোন কোন শ্রেণী এই অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার কারণ: সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইল কেন? ইহার উত্তরে মার্ক্সবাদিগণ বলেন, আদিম কমিউন ব্যবস্থার ভাঙন, সামাজিক অসমতার সূত্রপাত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটায়। সমাজের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি উদ্বৃত্ত উৎপাদন, কালক্রমে যাহা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভাঙিয়া গিয়া উদ্ভূত হইল শ্রেণীবিভক্ত দাসসমাজ। দাসসমাজে প্রধান দুই শ্রেণী—দাস ও দাসপ্রভুদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত হইল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটে এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এখন সংঘর্ষ হইল মালিকশ্রেণী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে, যাহার ফলে প্রবাতত হয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে ভূদাসদের সংগ্রামের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর মালিকানা সমাজের বলিয়া শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় সংঘর্ষের স্থলে সহযোগিতার সম্পর্ক।

শ্রেণীসংগ্রামের তিনটি ধারা: মার্ক্সবাদী দর্শন অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম তিনটি প্রধান ধারায় বিকশিত হইয়া (১) অর্থনৈতিক, (২) রাজনৈতিক এবং (৩) ভাবাদর্শগত (ideological) সংগ্রামের রূপ ধারণ করে।[১] যেমন, ধনতন্ত্রের পর্যায়ে অর্থনৈতিক সংগ্রামে পুঁজিপতিগণ যে-কোন উপায়ে মুনাফা বাড়াইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে এবং শ্রমিকরা সংগ্রাম করে সুস্থ কাজের পরিবেশ ও অন্যান্য আর্থিক নিরাপত্তার জন্য।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম আপনা হইতেই রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়। পুঁজিপতিগণ শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়া আইনগত ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে। অন্যদিকে সর্বহারাশ্রেণী সংগ্রাম করে শোষকদের ক্ষমতাধীন রাজনৈতিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে—বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

সংগ্রামের তৃতীয় ধারাটি হইল ভাবাদর্শগত। বিভিন্ন শ্রেণী তাহাদের নীতিপদ্ধতি কর্মনীতি প্রতিপাদন করে ভাবাদর্শের সাহায্যে। বস্তুত, ইহা রাজনৈতিক সংগ্রামেরই দিক-নির্দেশক।

মার্ক্সবাদীদের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শ হইল বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুবাদী যাহা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শকে প্রকাশ করে, এবং এই সংগ্রাম হইল সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য। অপরপক্ষে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই সমর্থন করে।

১. "For the Marxist, the class struggle includes : (a) an economic struggle, (b) a political struggle, and (c) an ideological struggle." Georges Politzer : *Elementary Principles of Philosophy*.

শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য: রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব, চীন এবং অন্যান্য দেশের গণমুক্তি সংগ্রাম হইল বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, শোষণের অবলুপ্তি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রবর্তনের জন্য। এই সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল প্রলেতারীয় একনায়কত্ব।

প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রধান কথাই হইল বিভিন্ন শ্রেণীর সমতাসাধন নয়, শ্রেণীসমূহের বিলোপ।

ইহা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া—যাহা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও একটি গোটা ঐতিহাসিক পর্যায় ধরিয়া কাজ করে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব হইল: পুঁজিবাদ হইতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এবং শেষ পর্ব হইল সমভোগবাদী সমাজ (communistic society) গঠন। সমভোগবাদী সমাজে সকলে সামর্থ্যানুসারে কার্য বা সমাজসেবা করিবে এবং প্রয়োজনমত সমাজ হইতে প্রতিদান (ভোগ্য দ্রব্যাদি) পাইবে।

মূল্যায়ন: (ক) শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। 'সব ইতিহাসই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'—মার্ক্সবাদীদের এই বক্তব্য অতি সরল সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকাংশে শূন্যগর্ভ। কারণ, শ্রেণীর ধারণাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।[১] পরবর্তী কালে লেনিন অবশ্য ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[২]

(খ) ইতিহাসে শ্রেণী-সহযোগিতার দৃষ্টান্ত নাই—মার্ক্সবাদীদের এই বক্তব্যও অনেকে স্বীকার করেন না। শ্রেণী-সহযোগিতা ও শ্রেণী-সংঘাত সমবাস্তব, মার্ক্সবাদিগণ কিন্তু মাত্র শ্রেণী-সংঘাতকেই বাছিয়া লইয়াছেন। উপরন্তু, বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুর্দশার কথা অনেকেই স্বীকার করিতে রাজী নন।

(গ) ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্নটি লইয়া মার্ক্স ও এঙ্গেলস যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কতটা বাস্তবোচিত—সে-সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। শোষক ও শোষিত—সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ও পরস্পরবহির্ভূত ঐ দুই শ্রেণীতে সকল সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নাই। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বিন্যাস অত্যন্ত জটিল—মাত্র দুইটি শ্রেণী-সম্বলিত 'মার্ক্সীয় মডেলে' ইহার গতিপ্রকৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা অসম্ভব।[৩]

(ঘ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ করায় যাঁহারা নেতৃত্ব দিয়াছেন বা দিতেছেন তাঁহাদের শ্রেণী-চরিত্র কি? ইহাদের মধ্যে কতজন সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত? সুতরাং মিলিব্যাণ্ডের অনুসরণে বলা যায়: শুধুমাত্র সর্বহারার দল শ্রেণী-সচেতনতার শিক্ষা লাভ করে—মার্ক্সবাদীদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে এক অংশ

---

১. R. N. Carew Hunt: *Theory and Practice of Communism*

২. ৩৬১-৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

৩. "Marx ... is wrong in his static conception of classes. Classes are not fixed and rigidly maintained blocks. C. L. Wayper: *Political Thought*

যেমন প্রলেতারীয় চিন্তায় চালিত হইতে পারে, ঠিক তেমনি এরূপ উদাহরণও আছে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয়ের একটি অংশ বুর্জোয়া চিন্তা ও ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(ঙ) শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলোচনায় মার্ক্সীয় বক্তব্যের খণ্ডনে সমালোচকগণ আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন :

(১) মূলত অর্থনৈতিক এবং বিশেষত রাজনৈতিক দিক হইতেই কি শ্রেণীর ধারণা করা যুক্তিযুক্ত। অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের কি গুরুত্ব নাই ? অবশ্য মোটামুটি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, উৎপাদনের উদ্বৃত্তকে অসমানভাবে আত্মসাতের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন শ্রেণী।

(২) শ্রমিকশ্রেণী বলিতে যদি যাহারা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে সেই শ্রেণীকেই বুঝায়, তবে কারিগরি, বুদ্ধিজীবী, পরিচালক এবং অন্যান্য শ্রমজীবীদের কোন্ পর্যায়ভুক্ত করা যাইবে ? ধনিকশ্রেণী, পাতি-বুর্জোয়া (petit-bourgeois) প্রভৃতিদের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারিত হইবে কিভাবে ?[১]

(৩) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষিত শ্রেণী সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণা বর্তমান দিনের 'তৃতীয় বিশ্ব' (Third World) বা অন্যান্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কতটা গ্রহণযোগ্য ? যেখানে (যেমন, ভারত) শ্রমজীবীদের অধিকাংশ কৃষক সেখানে শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণাটিকে পৃথকভাবে বিচার না করিলে চলে কি ? সমাজতান্ত্রিক বিশ্বও আজ দ্বিধাবিভক্ত। এখানেও শ্রেণীদ্বন্দ্বের তাৎপর্য লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে।

(৪) শ্রেণীসংগ্রামের ধারণায় সর্বহারার আদর্শকে বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই শ্রেণীর ভাবাদর্শই সত্য এবং অন্যান্য ভাবাদর্শ মিথ্যা চৈতন্যের প্রকাশ —ইহা কিভাবে মানিয়া লওয়া যায় ?[২]

(৫) সকল প্রকার দ্বন্দ্বের পশ্চাতে কি ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরবিরোধী চাহিদা ও স্বার্থ কাজ করে না ? মার্ক্সবাদীরা এই মৌল বিষয়টিকে কি উপেক্ষা করেন নাই ?

শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণার মূল্যায়ন শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিষয়ে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা সমালোচনা ও প্রশংসা দুইই লাভ করিয়াছে। জোডের (C. E. M. Joad) মতে, 'শ্রেণীদ্বন্দ্ব' মার্ক্সীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান ধারণা। অনেকেই স্বীকার করেন যে, এই আলোচনা সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন সংকট সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমাজে বিপ্লবের অনিবার্যতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয় এবং ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করে।

শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণা মার্ক্সীয় সমাজদর্শনের চাবিকাঠি —একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১. Karl Popper : *The Open Society and Its Enemies*

২. Max Eastman : *Stalin's Russia and the Crisis of Socialism (1940)*

একথা অস্বীকার করা যায় না, সামগ্রিক উৎপাদন-সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়াই সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় এবং গড়িয়া উঠে মানুষের ভাবজগৎ। সুতরাং সত্য, ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে ধারণা নির্ধারিত হইবে ইহাদের শ্রেণীগত অবস্থানের উপর। যেখানেই মানুষের ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত, সেখানেই তাহার সিদ্ধান্ত শ্রেণীগতরূপ ধারণ করে। এ-বিষয়ে এঙ্গেলসের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : '...সমাজ যেমন এতকাল শ্রেণীদ্বন্দ্বের মারফত অগ্রসর হইয়াছে, নৈতিক চেতনাও তেমনি বরাবরই হইয়া আসিয়াছে শ্রেণীগত নীতিবোধ" (Anti-Duhring)।

মার্ক্সবাদের সার্থকতা : বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর ভাবাদর্শ হিসাবে মার্ক্সবাদ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও মানবমুক্তির দর্শনের সংযোগ ঘটানোতেই ইহার কৃতিত্ব। পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতের পরিণতি শ্রেণীসংগ্রাম। যে-অবস্থা শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীসংগ্রাম বজায় রাখে তাহার অবসান ঘটানোর চিন্তাতেই মার্ক্সবাদের সার্থকতা।

মার্ক্সবাদ ও বিপ্লবের তত্ত্ব (Marxism and Theory of Revolution) : বুর্জোয়া তাত্ত্বিকগণ বিপ্লব বলিতে বুঝেন, আভ্যন্তরীণ ঘটনা বা সংঘাতে দেশের সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার আকস্মিক ও হিংসাত্মক পরিবর্তন। মার্ক্সীয় দর্শনে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে বিপ্লবের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

মার্ক্সীয় সংজ্ঞা . বিপ্লব বলিতে মার্ক্সবাদীরা বুঝাইতে চাহেন কোন এক ঐতিহাসিক পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়, যাহার মাধ্যমে এক শাসক-শ্রেণীর পতন হইয়া এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, যে-শ্রেণী পুরাতন শ্রেণী অপেক্ষা উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রগতিশীল শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী।[১]

বুর্জোয়া ধারণার সংকীর্ণতা : মার্ক্সবাদীদের মতে, বুর্জোয়া রাজনীতিতে সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ না করিয়া বিপ্লবকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা রাষ্ট্র এবং তাহার কাঠামোগত ব্যবস্থা এবং অন্যান্য উপাদানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাতেই সমাপ্ত। শাসক ও শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্ব, উৎপাদন-ব্যবস্থা ও ইহার মালিকানা, ইতিহাসের গতিশীলতা প্রভৃতি বিষয়গুলির তাৎপর্য ইহা পরিস্ফুট করে না। ফলে বিপ্লব সম্পর্কে এই ধারণা স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ।

---

১. Revolution is "an historical process leading to and culminating in social transformation, wherein one ruling class is displaced by another, with the new class representing ... enhanced productive capacities and social progressive potentialities." Herbert Aptheker : *The Nature of Democracy, Freedom and Revolution*

মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে সামাজিক বিপ্লবের (social revolution) অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে অসংগতি ও দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হয়, যাহার উদ্দেশ্য হইল শোষিতশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে সংগঠিত সকল বিপ্লবের মাধ্যমে এক শোষকশ্রেণীর পরিবর্তে অন্য আর এক শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হয় এবং শোষণ কার্য নূতন রূপ গ্রহণ করে। যেমন, বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং এই ব্যবস্থায় শোষকশ্রেণী হইল বুর্জোয়া শ্রেণী। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলেই সমাজ একধাপ করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

মার্ক্সীয় ধারণার মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়: (১) বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পতন ঘটানো, (২) এই ব্যবস্থা যে-রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে তাহাকে ধ্বংস করা এবং (৩) শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণমুক্ত করা হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য। এই তিনটি উদ্দেশ্যকে কার্যকর করিবার অন্যতম হাতিয়ার হইল বিপ্লব। বিপ্লবকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এবং লেনিন, স্তালিন ও মাও জে-দং) স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া উহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মার্ক্সের পূর্বে অন্যান্য দার্শনিক জগৎসমাজের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু ইহার গতিপ্রকৃতি ও রূপান্তরের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। মার্ক্সের নিজের ভাষায়, এ-পর্যন্ত দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে জগৎসমাজের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আসল কথা হইল জগৎসমাজের রূপ পরিবর্তন করা ("The philosophers have only interpreted the world in various ways ; the point, though, is to change it.")।[১] এইখানেই রহিয়াছে মার্ক্সবাদের সার্থকতা। অর্থাৎ, মার্ক্সবাদের উৎকর্ষ হইল উদ্দেশ্যসাধনের দিক দিয়া।

মার্ক্সের পূর্বে ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্টগণ (The Utopian Socialists) সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করিলেও—নূতন ব্যবস্থার কল্পনা করিলেও, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথনির্দেশ করিতে পারেন নাই। মার্ক্স ও এঙ্গেলসই প্রথম সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, শ্রমিকশ্রেণীই হইতেছে সেই সামাজিক শক্তি যাহা সমাজে বিপ্লব ঘটাইয়া বহুবাঞ্ছিত রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষকে নূতন জীবনে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের সমগ্র ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু হইল শ্রেণীসংগ্রাম—শোষকের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম।[২]

বিপ্লবের কারণ: বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মার্ক্স বলেন, সামাজিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রহিয়াছে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে

১. Marx : *Theses On Feuerbach*

২. "The history of all hitherto existing society is the history of class struggle." Marx and Engels : *Manifesto of the Communist Party*

দ্বন্দ্ব (contradiction between means of production and the relations of productions)। উৎপাদনের উপকরণের অগ্রগতি উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। ইহা কিন্তু সহজে সম্পন্ন হয় না। উৎপাদন-শক্তির মালিকানা ক্রমশ প্রকৃত উৎপাদকশ্রেণী (the real producing class) বা শ্রমজীবিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতিপয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে উৎপাদন-শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদন-সম্পর্কের (relations of production) মধ্যে অসংগতি বাড়িতে থাকে। উৎপাদন-ব্যবস্থার অগ্রগতি ও পরিবর্তন সত্ত্বেও উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সহজে ঘটে না—শোষকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্ককেই বজায় রাখিতে চায়। উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানাস্বত্ব ভোগ করে মূলধন-মালিক, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমবিক্রয় ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। তাহারা উৎপাদন-পদ্ধতি হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন (alienated) হইয়া পড়ে।

ক্রমে কিন্তু শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়া যায় এবং ইহার পরিবর্তে গড়িয়া উঠে বৈপ্লবিক ঐক্য। সুতরাং বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেই তাহাদের কবর খুঁড়িবার লোক ডাকিয়া আনে।[১]

বিপ্লবের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল: বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রসংগে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য হইল, সকল সর্বহারাশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র কমিউনিস্ট দল। কারণ, মাত্র এই দলই বৈপ্লবিক মতবাদসম্পন্ন বলিয়া মেহনতী শ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রগামী সৈন্য হিসাবে কাজ করিতে পারে। দল বিপ্লবের পরেও আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

সর্বহারাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য: মার্ক্সবাদীরা ঘোষণা করেন, সর্বহারাদের বিপ্লবের আশু উদ্দেশ্য হইল শাসনক্ষমতা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়া।

ক। সমভোগী সমাজ প্রতিষ্ঠা: কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলিয়াছেন, সর্বহারাশ্রেণী তাহার রাজনৈতিক আধিপত্যকে ব্যবহার করিবে ক্রমশ বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত হইতে সমস্ত মূলধন ছিনাইয়া লইতে, রাষ্ট্রের হস্তে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে কেন্দ্রীভূত করিতে এবং উৎপাদন-শক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব বৃদ্ধি করিতে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যখন শ্রেণীসমূহ নিশ্চিহ্ন হইবে, উৎপাদনের উপর সমাজের সামগ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা হইল শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদমনের ক্ষমতা। শ্রেণীবিলুপ্তির দরুন এই ক্ষমতার বাহন রাষ্ট্রযন্ত্রও তাৎপর্যহীন হইয়া পড়িবে।

অতএব, শ্রেণীহীন সমভোগী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্র বলিয়া কিছু থাকিবে না—উহা বিলুপ্ত হইবে।

---

১. *Manifesto of the Communist Party*

খ। আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা : দ্বিতীয়ত, সর্বহারাদের বিপ্লব সর্বহারাদের আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করিবে—ম্যানিফেস্টোতে এই আশাই করা হইয়াছে। এই বিপ্লবের ফলে জাতি-সমস্যার সমাধান হইবে—অর্থাৎ এক জাতির শোষণ ও পীড়নের অবসান ঘটিবে। স্বভাবতই জাতিসমূহ তখন পরস্পরের সহিত হাত মিলাইয়া চলিবে। ইহাই ত আন্তর্জাতিকতা।

বিপ্লবের পন্থা : পন্থা হিসাবে বলপ্রয়োগেরই নির্দেশ করা হয়। এবং আহ্বান হইল : "শৃংখল ছাড়া সর্বহারাদের আর কিছু হারাইবার নাই। তাহাদিগকে একটি-মাত্র দুনিয়া জয় করিতে হইবে।" অতএব, 'সকল দেশের শ্রমিক এক হও।'[১]

দৃষ্টিকোণ : বুর্জোয়া তত্ত্বে বিপ্লবকে হিংসাত্মক বলিয়া প্রচার করিয়া বিপ্লব সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও ভীতির সৃষ্টির চেষ্টা করেন। অপরপক্ষে মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, বিপ্লবের সংগে হিংসা জড়িত থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। তাঁহারা বলেন, বলপ্রয়োগ হইতেছে একটি হাতিয়ার যাহার সাহায্যে সামাজিক আন্দোলন নিজের পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে চায় মাত্র। বিপ্লবের সংগে হিংসা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শাসকশ্রেণী হিংসাত্মক পন্থায় সর্বহারার সংগ্রামী চেতনা ও শক্তিকে দমন করিতে চায়। অর্থাৎ, শাসকশ্রেণীর হিংসার প্রতিক্রিয়ারূপেই সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবে বলপ্রয়োগ ও হিংসার প্রকাশ ঘটে।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক আদর্শের বিপরীত বলিয়া প্রচার করেন। মার্ক্সবাদীরা কিন্তু মনে করেন, ইতিহাসের পটভূমিতে বিচার করিলে এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করিলে দেখা যায়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও পদ্ধতি গণতন্ত্রের পরিবেশকে বিস্তৃত করে। বিপ্লব ষড়যন্ত্রমূলক কায নয়, প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টাই অগণতান্ত্রিক—ইহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, যে প্রচেষ্টা সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারকে দমন করিতে উদ্যত হয়।

মার্ক্সবাদীদের মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয়, মুষ্টিমেয়ের শাসনরক্ষা করিবার ইহা এক যন্ত্র মাত্র। সর্বহারার বিপ্লব এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনের বিরুদ্ধে। শোষণের অবসানকল্পে সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

মার্ক্সবাদীরা মনে করেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত তারতম্যের দিক হইতে অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, ইতিহাসে কোন অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণীশোষণ এবং উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইতে সমর্থ হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের অবসান, উৎপাদনের উপাদানের সামাজিকীকরণ এবং সর্বহারাশ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করার লক্ষ্যে ধাবিত। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতার সম্প্রসারণ ও শ্রেণী-

১. "The proleterians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite." *The Communist Manifesto*

স্বার্থের প্রসার ঘটে। এইরূপ রাষ্ট্রক্ষমতার ধ্বংসসাধনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরম লক্ষ্য। তৃতীয়ত, প্রতিবিপ্লবী (counter-revolutionary) চক্রান্তকে প্রতিহত করা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রস্তুত করার মধ্যেও রহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সার্থকতা।

সর্বশেষে বলা যাইতে পারে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রগতিশীল উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে কার্যকর করিবার এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। শ্রেণীদ্বন্দ্বহীন সমাজের প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বজনীন প্রসারে, মুষ্টিমেয়ের প্রাধান্যকে ধ্বংস করিয়া প্রগতিশীল গণসংস্কৃতির প্রচারে এবং নাগরিকের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করার মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সার্থকতা।[১]

লেনিন ও মার্ক্সবাদ (Lenin and Marxism): মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে লেনিনের অবদান কি? রাষ্ট্রনীতির ছাত্রছাত্রী ও গবেষক মহলে প্রশ্নটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মার্ক্সবাদ এখন শুধুমাত্র কার্ল মার্ক্সের রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন নয়, লেনিনের চিন্তা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, বাস্তবমুখী করিয়াছে এবং জনপ্রিয় করিয়াছে।

মার্ক্সবাদ এখন শুধু মার্ক্সের নামে পরিচিত নহে, ইহা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ (Marxism-Leninism) নামে অভিহিত।

মার্ক্সবাদের বিকাশে লেনিনের অবদানকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

ক। শিল্পে অনগ্রসর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব: লেনিন ছিলেন একাধারে বৈপ্লবিক সংগঠক এবং বাস্তবধর্মী রাষ্ট্রবিদ্ ও নেতা। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব হইল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের তত্ত্বকে রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। অন্যান্য মার্ক্সপন্থী বিশ্বাস করিতেন যে রাশিয়ার মত অনুন্নত দেশে প্রথম বিপ্লব হইবে ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া বিপ্লব (bourgeois revolution); ইহার পর শিল্পের প্রসারসাধন হইলে আসিবে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব (proletarian revolution)। এই দুই বিপ্লবের মধ্যে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবে এবং ঐ সময় সরকার পরিচালিত হইবে বুর্জোয়া বা মালিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। লেনিন কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি অস্বীকার করেন নাই যে, রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় প্রথমে বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক বিপ্লবই অনুষ্ঠিত হইবে তবে এই বিপ্লব পরিচালিত করিতে হইবে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং এই উদ্দেশ্যে 'সর্বহারা ও দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক নায়কতন্ত্র' (a revolutionary democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ইহা হইল তাঁহার কার্যক্রমের প্রকারভেদ।

১. এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী অনেক কমিউনিষ্ট আছেন যাহারা মনে করেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং পার্লামেন্টীয় পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। (See Milliband : *Marxism and Politics*)

এইভাবে শিল্পে অনুন্নত দেশ কিভাবে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করেন লেনিন।

খ। দলীয় সংগঠন : দলীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিন বলেন যে বৈপ্লবিক মতবাদ ভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্ভব নয় (Without a revolutionary theory can be no revolutionary movement) এবং বৈপ্লবিক মতবাদ সম্পন্ন দলই হইবে মেহনতীশ্রেণীর (working class) সংগ্রামের অগ্রগামী সৈন্য (The role of the vanguard can only be fulfilled by a party with an advanced theory)। এই দল হইবে আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং মাত্র সক্রিয় নিয়মানুবর্তী শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের লইয়া গঠিত। অন্যান্য নীতির মধ্যে দলের অন্যতম সাংগঠনিক নীতি হইবে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' (democratic centralism)—অর্থাৎ নিম্নতন দলীয় সংস্থা তদুপরি দলীয় সংস্থার অধীনে থাকিয়া কার্য করিবে। এই দলই বিপ্লবের পূর্বে ও পরে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতন করিয়া তুলিবে।

গ। সর্বহারাশ্রেণীর নায়কত্ব : বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের কি হইবে না হইবে, সে-সম্পর্কে লেনিন এঙ্গেলস ও মার্ক্সের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, বিপ্লবের পর ধনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইয়া সর্বহারাশ্রেণী এক নূতন রাষ্ট্রের প্রবর্তন করে। এই রাষ্ট্র হইল সর্বহারাশ্রেণীর নায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ (the dictatorship of the proletariat), এবং যে পর্যন্ত না কমিউনিস্ট সমাজ (communist society) গঠিত হইতেছে সে-পর্যন্ত অব্যাহতই থাকিয়া যায়।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি : অর্থাৎ, কমিউনিস্ট সমাজ গঠিত হইলে পর রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে (the state withers away)।

ঘ। সাম্রাজ্যবাদ : মার্ক্সীয় মতবাদের প্রসারে লেনিনের অপর প্রধান অবদান হইল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তত্ত্ব।

এই তত্ত্ব অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ হইল ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের বিশেষ স্তর (imperialism represents a special stage)—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদকে বলা হয় ধনতন্ত্রের শেষ পরিণতি বা সর্বোচ্চ পর্যায় (the highest stage of capitalism)।

এই পর্যায়ে ধনতন্ত্রের অসংগতিগুলি (contradictions of capitalism) বিশেষ প্রকট রূপ ধারণ করে, যাহার বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নলিখিত রূপ : (ক) উৎপাদন ও মূলধন পুঞ্জীভূত হইয়া মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়। (খ) ব্যাংক-মূলধন ও শিল্প-মূলধন মিশিয়া গিয়া (merging of bank capital with industrial capital) 'ফিনান্স মূলধনে'র (finance capital) সৃষ্টি হয়

এবং এই মূলধনের মুষ্টিমেয় ধনী মালিকগণ দেশের শিল্পের সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। (গ) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মূলধন রপ্তানির (export of capital) প্রাধান্য দেখা দেয়। (ঘ) বৃহৎ বৃহৎ আন্তর্জাতিক শিল্পজোটের সৃষ্টি হয় এবং ইহারা পৃথিবীর বাজার নিজেদের ভিতর বণ্টন করিয়া লয়। (ঙ) সমগ্র পৃথিবীই কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যায়।

এই সকলের ফলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে, কারণ কাঁচামাল, মূলধন লগ্নী, দ্রব্যাদি রপ্তানি ইত্যাদির জন্য বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বাজারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে মারামারি বাধিয়া যায়। এই অবস্থায় ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলন হইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বার্থে ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণকে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমজীবীদের সংগ্রামে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. মার্ক্সবাদ একাধারে রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব।

২. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হইল মার্ক্সবাদী বিশ্বদৃষ্টি যাহা অনুসারে বস্তুময় জগতই বাস্তব এবং আদর্শ ধ্যানধারণা ইত্যাদি এই বস্তুময় জগতের প্রতিক্রিয়া।

৩. বস্তুবাদের মূল শিক্ষা হইল (১) জগৎ বস্তুময়, (২) বস্তুই সত্য এবং (৩) জগৎ ও উহার নিয়মকানুন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব।

৪. দ্বন্দ্ববাদের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সকল বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। এই দ্বন্দ্বই সকল পরিবর্তনের মূল।

৫. সমাজজীবন ও উহার ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতির প্রয়োগকেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়।

৬ মানব-ইতিহাসের পশ্চাতে যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, মার্ক্সবাদ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা করে। এখানেই হইল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সহিত ইহার সম্পর্ক।

৭ অন্যান্যের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের মাধ্যমে মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্ব ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাখ্যা করিয়াছে।

৮. মার্ক্সবাদ অনুসারে এ-পর্যন্ত সকল সমাজেরই ইতিহাস হইল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হইলেও ইহা আংশিক সত্য মাত্র। শ্রেণীগত নীতিবোধও গুরুত্বপূর্ণ।

৯. মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিপ্লব হইল অন্যতম সামাজিক পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে সমাজ-পরিবর্তন ঘটিয়া নূতন সম্ভাবনাপূর্ণ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

১০. লেনিনের অবদান : (১) শিল্পে অনগ্রসর দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা নির্দেশে ; (২) দলীয় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপে এবং (৩) সাম্রাজ্য তত্ত্ব বিশ্লেষণে।

অনুশীলনী

1. **What, according to the Marxists, is the nature of dialectical materialism? Give in brief the main features of dialectics.**

[মার্ক্সবাদিগণের মতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রকৃতি কি ? দ্বন্দ্ববাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও।] (৩৪৭-৫০ পৃষ্ঠা)

2. **What is meant by historical materialism? Illustrate your answer."**

[ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলিতে কি বুঝায় ? উদাহরণের সাহায্যে উত্তর দাও।] (৩৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

3. **What is surplus value? How and why does it arise?**

[উদ্বৃত্ত-মূল্য কাহাকে বলে ? কিভাবে এবং কেন এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব ঘটে ?] (৩৫৭-৬০ পৃষ্ঠা)

4. **What is a class? What is the nature of class struggle in an exploiting society?**

[শ্রেণী বলিতে কি বুঝায় ? শোষণমূলক সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃতি কি ?] (৩৬১-৬৫ পৃষ্ঠা)

5. **What do the Marxists mean by Revolution? Discuss in brief the Marxist theory of Revolution.**

[বিপ্লব বলিতে মার্ক্সবাদীরা কি বুঝেন ? বিপ্লবের মার্ক্সবাদী তত্ত্বের আলোচনা সংক্ষেপে কর।] (৩৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা)

6. **Describe in brief Lenin's contribution to Marxism.**

[মার্ক্সবাদতত্ত্বে লেনিনের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (৩৬৯-৭১ পৃষ্ঠা)

7. **What is dialectics? Give a brief answer.**

[দ্বন্দ্ববাদ বলিতে কি বুঝায় ? সংক্ষেপে উত্তর দাও।] (৩৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা)

8. **What are the main laws of dialectics?**

[দ্বন্দ্ববাদের প্রধান সূত্রগুলি কি কি ?] (৩৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

9. **How does Marxism apply dialectics to history?**

[মার্ক্সবাদ কিভাবে দ্বন্দ্ববাদকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ?] (৩৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

10. **What are the general features of the mode of production?**

[উৎপাদন-পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?] (৩৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

11. **Class-struggle is both economic, political and ideological.—Explain,**

[শ্রেণীসংগ্রাম একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত।—ব্যাখ্যা কর।] (৩৬২-৬৫ পৃষ্ঠা

12. **Review your understanding of the Marxist theory of Revolution.**

[বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কি বুঝিয়াছ ব্যাখ্যা কর।] (৩৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা)

১৭ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ
(DEMOCRATIC SOCIALISM)

> *"Socialism, like all political systems, is a means. Its end is a democratic society, recognizing the dignity of human personality and the uniqueness of the individual."*
>
> Francis Williams

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে ?

২. ইহার অর্থ ও বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৩. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ কোন্ দেশে প্রসারলাভ করে ?

৪. এই মতবাদের বিশেষ উল্লেখ্য প্রবক্তা কে কে ?

৫. মতবাদটির সাধারণ ও অন্যান্য লক্ষ্য কি কি ?

৬. কিভাবে ইহার সমর্থন করা হয় ?

৭. ইহার মূল বিরোধিতার সূত্র কি ?

সতের শতকের ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে (পার্লামেন্টের মাধ্যমে) জনগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা রাজনীতিতে প্রগতিবাদের প্রথম অনুপ্রবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতার (popular sovereignty) ধারণাটি ধীরে ধীরে প্রাধান্যলাভ করিতে থাকে। এই ধারণা প্রচারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন জন লক (John Locke—১৬৩২-১৭০৪)।

বিশ শতকে আর একটি ধারণার প্রচারে বিভিন্ন ইংরাজ রাষ্ট্রবিদ্ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (Statesman and Political Thinkers) সোচ্চার হন, এবং ধারণাটি রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দ্রুত স্থানাধিকার করিয়া লয়। ধারণাটি হইল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism)।

অর্থ : যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হইল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন তাহাকেই বলা হয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ। গণতান্ত্রিক সমাজগঠন যদি কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হয়, সমাজতন্ত্রবাদ হইল সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। সমাজতন্ত্র বলিতে সাধারণত সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকে বুঝায় যাহা সমাজ-পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে কার্যকর হয়।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইল ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ : (ক) অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার স্থলে সহযোগিতার সৃষ্টি,

(খ) সমভাবে জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান এবং (গ) শ্রমের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সুঠাম পুরস্কারের বণ্টন-ব্যবস্থা।[১]

বৈশিষ্ট্য : বিশ্লেষণে ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায় : (ক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি(democratic process) কার্যকর করা। (খ) অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতিকে গুরুত্ব প্রদান করা, তবে প্রতিযোগিতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না-করা। (গ) সামাজিক মালিকানাধীনে অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা।

সমাজতন্ত্রবাদ ও হিংসাত্মক বিপ্লব : ইহা সহজেই অনুমেয় যে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ হিংসাত্মক বিপ্লব পরিহারের পক্ষপাতী। অথাৎ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতন্ত্রের দোষত্রুটিগুলি অপসারণ করিয়া সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত—ইহাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নির্দেশ। ইহাতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ব্যক্তি-স্বাধীনতাও সংরক্ষিত হয়।

ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রসারের কারণ : বলা হইয়াছে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের ক্রীড়াভূমি ছিল ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডে ঐ মতবাদের প্রসারলাভের পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণগুলির উল্লেখ করা হয় : (ক) শিল্প-বিপ্লব ইংল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়, যাহার ফলে সমাজতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ ও পুরোভাগে অবস্থিত পৌর শ্রমিকশ্রেণীর (urban working class) উদ্ভব ঘটে।

(খ) জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের (government based on consent) ধারণা ঐ দেশেই প্রথম প্রসারলাভ করে। রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারিতাকে সংকুচিত করিয়া সাধারণের সম্মতির উপর গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক—এই ধরনের চিন্তাধারা সতের শতকে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিজগতে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

(গ) ইংলণ্ডে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ (মার্ক্সবাদ) অথবা ফ্যাসীবাদ উভয় মতবাদের কোনটিই বিশেষ প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ব্রিটেনে একদিকে যেমন উদারনৈতিক চিন্তাধারা (Liberalism), ফেবিয়ান চিন্তাধারা (Fabian Thought) প্রভৃতির প্রসার ঘটে, অন্যদিকে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়া শ্রমিক দল (Labour Party) রাজনৈতিক রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হয়।

বিভিন্ন পথিকৃৎ : গ্রীণ (T. H. Green) এবং হবহাউসের (L. T. Hobhouse) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা ও দৃষ্টিভংগি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে। গ্রীণের মতে, ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। এইরূপ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে সমাজতন্ত্রের পথে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদিগণ বিবর্তন-পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। উৎপাদনের উপাদানসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক নীতি কার্যকর করা ছিল ইহাদের লক্ষ্য।

১. Norman Thomas : *Democratic Socialism*

ইতিমধ্যে ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া উঠে। শিল্প-সংঘ (Trade Guilds) এবং শ্রমিক সংঘ (Trade Unions) সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। পেশাগত ভিত্তিতে (on the basis of functional representation) আইনসভা সংগঠনের পক্ষে যুক্তি দেখানো হইতে থাকে। শ্রমিক সংঘগুলির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংগ্রামেরও সমর্থন করা হইতে থাকে। শ্রমিক দলের নেতা অ্যাটলি (Clement R. Attlee), ইংল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। সিডনি এবং বেট্রিস ওয়েবের (Sidney and Beatrice Webb) সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বাস্তব প্রকাশ ঘটে অ্যাটলির কর্মনীতিতে। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রকাশে অ্যাটলির অবদান অবিস্মরণীয়।

রবার্ট আওয়েন—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা: রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) ইংল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা বলিয়া খ্যাত। তিনি ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রের বিকাশে ঐ দেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। দেশের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা একদিকে যেমন প্রগতি ও পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইয়াছে অন্যদিকে তেমনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়াসকেও চূর্ণ করিয়াছে। আওয়েনের মতে, গণতান্ত্রিক পথ ও প্রতিষ্ঠানের প্রসারের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণ সম্ভব। ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রসারে টনি (R.H. Tawney), ল্যাস্কি (H J. Laski) প্রভৃতির ভূমিকাকেও লঘু করিয়া দেখা যায় না।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মৌল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ এমন এক ব্যবস্থা যাহা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এই দুই নীতির সামঞ্জস্যবিধান করে।

বলা হয়, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও নীতির মূল লক্ষ্য হইল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংযোগসাধন।[১]

ইতিহাস হইতে দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য সেই সকল দেশেই ঘটিয়াছে যে-সকল দেশ দৃঢ় গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী। যে-দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত সে-দেশে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী কার্যকর করা সুবিধাজনক।

কর্মসূচী: সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য· (১) অল্প-সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি ; (২) বৈষম্য দূরীকরণ ; (৩) সার্বিক শিক্ষার বিস্তার ; (৪) নারী বা পুরুষ, ধর্ম, বংশ বা জাতিগত বাধার কারণে বিভেদ দূরীকরণ, (৫) সমগ্র সমাজের স্বার্থে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও ইহার পুনর্বিন্যাস ; (৬) পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা, (৭) বেকার, বার্ধক্য ও পীড়িতাবস্থার

১. "The link between democracy and socialism is the most important single element in socialist thought and policy." William Ebenstein *Today's ISMS*

সামাজিক নিরাপত্তাবিধান ; (৮) পরিকল্পিতভাবে সহর ও নগরাঞ্চলের পুনর্গঠন ; (৯) বস্তি সংস্কার ও গৃহনির্মাণ ; (১০) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, এবং (১১) প্রতিযোগিতা, পুরস্কার ও মুনাফার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন।

সাধারণ লক্ষ্য: গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উপরি-উক্ত কর্মসূচীতে একটি সাধারণ লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায় : সমাজের রাজনীতি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের প্রসারসাধনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রকৃততর রূপদান করা।[১]

অন্যান্য লক্ষ্য: গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল নিম্নলিখিতগুলি :

(ক) জনগণের স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া: ইহার দরুনই ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের উপর সর্বধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং সহনশীলতা (tolerance), স্বাধীনতা (freedom) প্রভৃতি আদর্শের মূল্য (values) বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

(খ) ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার মর্যাদা: ডারবিন (E. F. M. Durbin) প্রমুখ চিন্তাবিদ্ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রসারে ব্রিটেনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। ব্রিটেনের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়া ডারবিন বলেন, যুক্তির পথ ধরিয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিকে কাজে লাগাইয়া, ঐক্যবোধের প্রেরণাকে পাথেয় করিয়া গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে কার্যকর করার মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[২] তিনি মনে করেন যে মার্ক্সীয় সর্বাত্মকবাদের (totalitarianism) মাধ্যমে নহে, গণতান্ত্রিক সমাজ অবলম্বন করিয়া ব্রিটেন তাহার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্যভিত্তিক সমাজ কিভাবে গঠন করা যায় তাহা সারা বিশ্বকে দেখাইয়া দিবে।

(গ) রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপেক্ষা মানবসত্তাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া.[৩] সমভোগবাদী ব্যবস্থা এবং ধনতন্ত্রে ব্যক্তির বিশেষ কোন প্রাধান্য নাই। ধনতন্ত্র যান্ত্রিক। উহা অর্থ-ব্যবস্থার নিকট মানুষকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বলে, যাহা সম্পূর্ণ অনৈতিক চিন্তাধারা। অপরদিকে সমভোগবাদ (communism) মানুষের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক স্বার্থ-সচেতনতার দিকে দৃষ্টি দেয়। সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু ব্যক্তিকে ধনতন্ত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক অবস্থার দাস হিসাবে চিহ্নিত করে না—সমভোগবাদের ন্যায় মাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি সচেতন করিয়া

---

১. "All these goals of democratic socialism have one thing in common, *to make democracy more real by broadening the application of democratic principles to the nonpolitical areas of society.*" Ebenstein

২. E. F. M. Durbin : *The Politics of Democratic Socialism* (1940)

৩. Francis Williams : *The Moral Case for Socialism*

তুলে না। সমাজতন্ত্রে লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করে। ইহা ব্যক্তির মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, নীতিগত উৎকর্ষ প্রভৃতির প্রতিও সুবিচার করে।

জওহরলাল নেহরু: ভারতেও জওহরলাল নেহরু গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিকল্প হিসাবে গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সমভোগবাদী তত্ত্ব হিংসায় বিশ্বাসী এবং ইহা মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি সুবিচার করিতে সমর্থ নহে। অন্যদিকে ধনতন্ত্র বৈষম্যের বীজ বপন করে। সমাজতন্ত্র এই উভয় তত্ত্বের কুপ্রভাব হইতে মুক্ত এবং সেইদিক হইতে ইহা একটি বিকল্প নীতি। এই নীতির মাধ্যমেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগির প্রসার ঘটানো সম্ভব গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে।[১]

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন: মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের উৎকর্ষ হইল নিম্নলিখিত রূপ বলিয়া দাবি করা হয়:

(১) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র একাধারে ধনতন্ত্র ও সমভোগবাদের ত্রুটি হইতে মুক্ত। ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মুনাফা, শ্রেণীশোষণ ও বিরোধ প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেয়। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা, ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে মুনাফার সুষ্ঠু বণ্টন, শ্রেণীশোষণ ও বিরোধের পরিবর্তে ঐক্য ও সংহতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। ইহা ধনতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাস করিয়া তোলে না। অন্যদিকে সমভোগবাদের ত্রুটিসমূহ—অর্থাৎ বিপ্লব, হিংসা, ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির প্রতি ঘৃণা—ইহাতে অনুপস্থিত। ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপের কথা বলে না—ইহা মনে করে না যে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তির বিভিন্ন বৃত্তির উৎকর্ষের প্রতি সুবিচার করে।

(২) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের পক্ষে একটি আদর্শ মতবাদ। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের কর্মসূচীসমূহ আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক পরিকল্পনার উপযোগী।

(৩) এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করে। ইহা একদিকে যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপযোগী ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করে অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তি-জীবনের উচ্ছৃংখলতা, অনাচার প্রভৃতিকে দমন করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকেও সমর্থন করে।

(৪) ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক দলের প্রসার, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এবং ফরাসী দেশে সমাজতন্ত্রী দলের ক্রমশ বর্ধিত প্রভাব ও সাফল্য এবং

১. Jawaharlal Nehru: *Democracy, Communism, Socialism and Capitalism* (1958)

অন্যান্য রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রী দলের গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদকে একটি 'রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' মতবাদে পরিণত করিয়াছে।

(৫) অর্থনৈতিক দিক হইতে অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নীতির—যেমন, সামাজিক ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির আদর্শ, পরিকল্পিত ও মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রসারসাধন করিয়াছে, যে-সকল নীতি অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক উপাদান হিসাবে কার্য করিয়াছে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধিতা: গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচক হইলেন মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ্‌গণ। মার্ক্সবাদিগণ ইহাকে কোন মতবাদের পর্যায়ে ফেলিতে রাজী নন। ইঁহাদের মতে, ইহা যে শুধু পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দেয় তাহাই নহে, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত আপস করিয়াছে, যাহা অবাস্তব।

মার্ক্সবাদিগণ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের সংশোধনবাদী এবং বিপ্লবের শত্রু বলিয়া গণ্য করেন।

যদিও পূর্বে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা এবং জাতীয়করণের কথা বলিতেন, বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যাইবে যে সমাজতন্ত্রবাদীরা জাতীয়করণের কথা ততটা বলেন না, যতটা বলেন সমবণ্টন-ব্যবস্থার কথা। অর্থাৎ, ইঁহারা এখন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকিয়াছেন এবং মৌখিক সাম্যের প্রচার করিয়া থাকেন। ফলে সমাজতন্ত্রবাদীরা পুঁজিবাদী সমাজের অবসান ঘটাইতে অসমর্থ। বিপ্লব ব্যতীত পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—অথচ এই বিপ্লবেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদীদের কোন আস্থা নাই।

আবার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, মার্ক্সবাদ কিন্তু সমাজতন্ত্রকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা (transitional stage) বলিয়াই মনে করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা এবং পূর্বতন পুঁজিবাদী শক্তিকে ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ—এই দুই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু পূর্ণ সমভোগী সমাজ (communistic society) গঠনের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌গণ এই মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যায় আস্থাশীল নন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে স্থায়ী ও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান মনে করেন এবং সমভোগবাদী সমাজে পৌঁছিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না।

মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ্‌গণ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে অবৈজ্ঞানিক, কল্পনাপ্রসূত মতবাদ বলিয়া চিহ্নিত করেন।

এই মতবাদের কল্পিত কর্মসূচীর মধ্যে বাস্তবতার অভাব লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের ঘোষিত কর্মসূচী ও উহার প্রয়োগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা

যায়। ইহার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা সম্পর্কেও অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।[১] অনেকে মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে না।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর .

১. যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হইল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন তাহাকেই বলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ।

২. ইহার তাৎপর্য হইল রাষ্ট্রকর্তৃক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈশিষ্ট্য হইল তিনটি: (১) সরকারী নিয়ন্ত্রণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন, (২) অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং (৩) সামাজিক মালিকানাধীনে অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা।

৩. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রসারলাভ করে ইংল্যাণ্ডে।

৪. মতবাদীটর প্রধান প্রধান প্রবক্তা হইলেন রবার্ট আওয়েন, গ্রীণ, হবহাউস, সিডনি ও বেট্রিস্, ওয়েব এবং জওহরলাল নেহরু।

৫. সাধারণ বা মৌল লক্ষ্য হইল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংহতি-সাধন এবং অন্যান্য লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ঐতিহ্য ও মানবসত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া।

৬. ইহা সমর্থন করা হয় সমভোগবাদের বিরোধিতায়, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থনে এবং অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়া।

৭ ইহার বিরোধিতার মূল সূত্র হইল যে ইহা অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রসূত।

অনুশীলনী

1. Write a note on Democratic Socialism, indicating its aims and merits.

[লক্ষ্য ও গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উপর একটি টীকা রচনা কর।]

(৩৭৩-৭৪, ৩৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

2. Write both a defence of and an attack on Democratic Socialism.

[গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন ও উহার উপর আক্রমণ লইয়া একটি ছোট নিবন্ধ রচনা কর।]

(৩৭৩-৭৪, ৩৭০-৭৯ পৃষ্ঠা)

---

১. "Socialists today find themselves bewildered and uncertain of the future." Ebenstein

১৮ রাষ্ট্র ও সর্বোদয় প্রসংগে গান্ধীজী
(GANDHIJI'S CONCEPT OF THE STATE AND SARVODAYA)

"I am a political idealist." Gandhi

"Gandhism is not a set of doctrines or dogmas, rules or regulations, injunctions or inhibitions, but it is a way of life. It indicates a new attitude or restates an old one towards life's issues and offers ancient solution for modern problems."
B. P. Sitaramyya

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১ মহাত্মা গান্ধীকে কি রাষ্ট্র-চিন্তাবিদ্ বলা চলে ?

২ তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তার উৎস কি ? এবং কোন্ কোন্ চিন্তাবিদ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ?

৩. গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার অভিনবত্ব কোথায় ?

৪ তাঁহার রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌল বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৫ সর্বোদয় বলিতে কি বুঝায়, এবং ইহার মূল নীতি কি কি ?

৬ গান্ধীজীর রাষ্ট্র ও সর্বোদয়ের ধারণা জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয় নাই কেন ?

৭ মার্ক্স ও গান্ধীজীর চিন্তা-ধারার মৌল পার্থক্য কোথায় ?

যে দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো অ্যারিস্টটল হেগেল রুশো বা মার্ক্সকে আমরা রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ হিসাবে চিহ্নিত করি, ঠিক সেই দৃষ্টিতে গান্ধীজীকে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ বলা সংগত নয়।

গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানত ধর্মচিন্তা ও নীতিজ্ঞান প্রসূত। তাঁহার ধর্মচিন্তা আবার গভীর মানবতাবোধ ও কর্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত [১]

গান্ধীজী মনে করিতেন, স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম এবং কর্মোদ্যোগেই রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির মূল্যায়ন করা উচিত এবং ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের সহিত রাজনীতিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানেই রাষ্ট্রচিন্তার সার্থকতা।

গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার উপর দেশবিদেশের চিন্তানায়কদের প্রভাব. গান্ধীজী ছিলেন পূর্ণমাত্রায় ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। তাঁহার ধারণা ছিল ধর্মীয় চিন্তা ও ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণই প্রকৃত মানবসেবা এবং দেশসেবা করিতে সমর্থ।[২] সমস্ত কিছুকেই ইহারা নীতিগতভাবে

১. Humanism is the key point of enduring element of his (Gandhi's) philosophy." B. Bhattacharyya . *Evolution of the Political Philosophy of Gandhi*

২. "His politics was based on religion and, conversely his programme of spiritual regeneration partook of a political character." Santi L. Mukherjee : *The Philosophy of Man making*. এই প্রসংগে গান্ধীজির নিজস্ব উক্তি হইল : ".. my devotion to Truth has drawn me into the field of politics, and ··· those who say that religion has nothing to do with politics do not know religion means." *Autobiography* (The Story of My Experiments with Truth)

বিচার করিতে পারিবেন এবং ইহারা জাতীয় স্বার্থবোধের দ্বারা পরিচালিত হইবেন। গীতা, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি দেশীয় ধর্মগ্রন্থগুলি তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও মনোনিবেশের সংগে পাঠ করেন এবং এই সকল ধর্মগ্রন্থ তাঁহার চিন্তাধারার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। 'অহিংসা', 'সত্যবাদিতা', 'ত্যাগ', 'পরমত-সহিষ্ণুতা' প্রভৃতি ধারণার উপর তাঁহার ছিল অবিচলিত আস্থা এবং এই ধারণাগুলিকে রাজনীতিতে প্রয়োগ করেন। শুধু দেশীয় ধর্মগ্রন্থের উপর গান্ধীজী আস্থাশীল ছিলেন তাহা নহে, বিদেশী ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকগণও তাঁহার ধর্মচিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মও তাঁহাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কনফিউসিয়াস (Confucius) ও লাও-সে (Lao-Tse) তাঁহার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেন। কনফিউসিয়াসের চিন্তাধারা, গান্ধীজীকে 'পারস্পরিক সম্বন্ধ' (principle of reciprocity) ও সহ-অবস্থানের নীতি (principle of co-existence) সম্পর্কে আকৃষ্ট করে।

থোরো ও রাস্‌কিন : চিন্তাবিদ্ ডেভিড থোরো (Thoreau), জন রাসকিন (Ruskin) প্রভৃতির অবদান গান্ধীজীর চিন্তাধারার উন্মেষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। থোরোর রাষ্ট্রদর্শন গান্ধীজীকে শিক্ষা দেয়—জনগণ ও জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ সৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইলে উহাদের সহিত সহযোগিতা কর এবং ইহারা কুপথের দিকে ধাবিত হইলে ইহাদের সহিত অসহযোগিতা কর।[১] রাস্‌কিনের শিক্ষা, গান্ধীজীকে কায়িক পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলে। আত্মনির্ভরশীলতা ও কায়িক পরিশ্রমের মূল্য গান্ধীজীর কর্মজীবনে উদ্ভাসিত হয়। টলস্টয় (Tolstoy) গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শকে অনুপ্রাণিত করেন। ধর্ম কলা অর্থনীতি রাজনীতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গান্ধীজী টলস্টয়ের ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা (Gandhi's Concept of the State) : গান্ধীজী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না। মানুষের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁহাকে রাজনীতিতে টানিয়া আনিয়াছিল। তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। সমাজ-সংস্কারের চিন্তাবোধ হইতেই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনেতার কর্তব্য কি হওয়া উচিত এ-সম্পর্কে তিনি নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করেন। গ্রাম-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন, গ্রামীণ শিল্পের প্রসার, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সংকীর্ণ জাতি-ব্যবস্থা ও বর্ণ-ব্যবস্থার (caste system) অবসান—প্রধানত এই বিষয়গুলির উপরই গান্ধীজী বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত—সে-সম্পর্কে গান্ধীজী সম্পূর্ণ নূতন ধারণার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন।

গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করিলে তাঁহার চিন্তাধারা যে মৌলিক একথা বলা যায় না। দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য রাষ্ট্র-চিন্তাবিদের প্রভাবও তাঁহার রাষ্ট্রদর্শনের উপর পড়িয়াছে।

১. "Maximum co-operation with all people and institutions which they lead toward good and non-co-operation when they promote evil." Thoreau

অভিনবত্ব: তাঁহার কৃতিত্ব পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়কে নূতনভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই নিহিত। ভারতবর্ষের রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোকে বিচার করিয়া দেখা হইলে গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার অভিনবত্বকে অবশ্য অস্বীকার করা যায় না।

গান্ধী-পূর্ব রাষ্ট্রচিন্তার ধারা: গান্ধীজীর পূর্বে যে-সমস্ত রাষ্ট্রচিন্তার ধারা প্রচলিত ছিল তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়:

(১) আদর্শবাদ (Idealism): এই মতবাদ রাষ্ট্রকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে—ঈশ্বরিক মতবাদ হইতে সুরু করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি তত্ত্বের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে কোন-না-কোনভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে।

(২) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism): শিল্প-বিপ্লব ও পুঁজিবাদী চিন্তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এই মতবাদের উদ্ভব। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলেও আর্থিক ও সামাজিক অসাম্য ও বিভেদ বাড়িয়াই চলে। ধনিকশ্রেণী নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগায়। সমাজতন্ত্রবাদ ইহারই স্বার্থক প্রতিবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যাপার নয়। সামাজিক ও সামগ্রিক স্বার্থে ইহা পরিচালিত হইবে, সামাজিক অন্যায় দূর করিতে হইবে, অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত—অবাধ অধিকার থাকিবে না। শ্রমিক ও সর্বহারাশ্রেণীও তাহাদের স্বার্থে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে কাজে লাগাইতে পারিবে।

(৩) মার্ক্সবাদ (Marxism): ইহা রাষ্ট্রকে অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করে। বিপ্লব চলাকালীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে একটি মতাদর্শ—কমিউনিস্ট মতাদর্শ—দ্বারা এবং একটি দলের অর্থাৎ কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে। এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় প্রতি-বিপ্লবীদের এবং বিরোধীদের দমন করিবার জন্য। বুর্জোয়া ও প্রতি-বিপ্লবীদের দমনকার্য সমাধা হইলে সাম্যবাদ (Socialism) প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গড়িয়া উঠিবে সমবায় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এক স্বাধীন সমাজ। ইহার পর সমভোগবাদ বা কমিউনিস্ট সমাজ (Communist Society) প্রতিষ্ঠিত হইলে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে না। রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটিবে (The State will wither away)।

(৪) নৈরাজ্যবাদ (Anarchism): নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রবিরোধী। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন-ব্যবস্থার প্রতি ইঁহাদের আস্থা নাই। সমাজস্থ সকলের সম্মতির ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা ইঁহারা বলেন। আইন, প্রথা প্রভৃতির বলে সমাজের একাংশের ইচ্ছা অপর অংশের ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয়—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইঁহারা শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন।

গান্ধীজীর ধারণার উৎস : আদর্শবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্ক্সবাদ—কোন রাষ্ট্রদর্শনই গান্ধীজীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রের উৎকর্ষ প্রমাণে সচেতন আদর্শবাদিগণের চিন্তাধারা তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারের চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হইলেও সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদী ধারণাকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই।

গান্ধীজীর নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ইহার বৈশিষ্ট্য : গান্ধীজীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভংগি নৈরাজ্যবাদী দর্শনকেই অধিক সমর্থন করে। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনকে গান্ধীজী শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তাকে কার্যকর করার পদ্ধতি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থানকালে গান্ধীজী থোরোর 'Essay on Civil Disobedience' গ্রন্থটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং থোরোর অনুসরণে তিনি বলেন, আমি মনে করি সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যাহা কম শাসন করে।[১] রাষ্ট্র ও তাহার সর্বময় কর্তৃত্বের বিষময় ফল সম্বন্ধে গান্ধীজী অবহিত ছিলেন। শাসনমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রসংগে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন :

(ক) রাষ্ট্র একটি ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান। ইহা ঘনীভূত ও সুসংগঠিত হিংসার প্রতিনিধি। রাষ্ট্র দণ্ডশক্তি-বলে বলীয়ান। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি ব্যক্তিত্বের বিনাশ-সাধন করে। সুতরাং ইহা অকল্যাণকর।[২]

(খ) রাষ্ট্র-কর্তৃত্ববিহীন সমাজ ব্যক্তির কর্মপ্রবণতা ও উদ্যোগের পক্ষে সুবিধাজনক। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অযথা ব্যক্তির উদ্যোগকে ধ্বংস করে এবং ব্যক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতনের দরজা উন্মুক্ত করে।

(গ) আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা হইল রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্র (Stateless Democracy)। এই গণতন্ত্রে প্রত্যেকেই শাসক। এখানে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে সর্বসাধারণের প্রয়োজনের ও কল্যাণের স্বার্থে। এখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকিবে না। রাষ্ট্র না থাকিলে ক্ষমতার প্রশ্নও উঠে না।[৩] তবে বাস্তব জীবনে এই আদর্শকে পূর্ণাংগভাবে রূপায়িত করা সম্ভব নয় বলিয়া রাষ্ট্রের কার্য যত কম হইবে মানুষের পক্ষে ততই মংগল।

(ঘ) এই সমাজ গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করিবে এবং এই সমাজের উদ্দেশ্য হইল সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। পূর্ণ স্বরাজই স্বাধীনতার পরিপূর্ণ রূপায়ণের পথ ; বিদেশী বা স্বদেশী যে সরকারই হউক না কেন, সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইবার অবিরাম প্রচেষ্টাই হইল স্বরাজ।

---

১. "That government is best which governs least."

২. *Hind Swaraj* যাহা *Sermon on the Sea* নামেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩. "In such a state (of enlightened *anarchy*) everyone is his own ruler. He rules himself in such a manner that he is never a hindrance to his neighbour. In the ideal state, therefore, there is no political power because there is no State :" Mahatma Gandhi in *Young India* (July 2, 1931)

(ঙ) গান্ধীজীর মতে, সমাজের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে না সত্য কিন্তু বিভিন্ন গণ-সংগঠন সমাজের প্রগতির স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবে। গণসংগঠনগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবে জনসাধারণ। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সম্পর্কে গান্ধীজী সন্দেহ প্রকাশ করিলেও যে-ক্ষেত্রে ইহার কার্যাবলী জনকল্যাণকর সে-ক্ষেত্রে তিনি ইহাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। গান্ধীজী বলেন, দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করিলে সমাজকল্যাণের পথই প্রশস্ত হয়। জনসাধারণই মূলে অবস্থান করে এবং রাষ্ট্র ইহার ফল মাত্র। মূলে মিষ্টতা থাকিলে ফল মিষ্ট হইতে বাধ্য ("People are the roots, the State is the fruit. If roots are sweet, the fruits are bound to be sweet.")।

(চ) সমাজকল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা গান্ধীজীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল: সামাজিক কল্যাণের আদর্শকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারত্ব দূরীকরণ, সামাজিক সংস্কারমূলক অন্যান্য কার্য গ্রহণ করা হয়। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে এই আদর্শকে রূপায়ণের চেষ্টা করা হইয়াছে। গান্ধীজী জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই ইহাকে স্বাগত জানাইতেন। সমাজ-উন্নয়ন প্রকল্প, পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে পারিলে গান্ধীজীর চিন্তাধারার সাফল্য প্রমাণিত হইবে—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(ছ) দেখা যায়, গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার মূলে কাজ করিয়াছে তাহার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা। অবশ্য একথাও ঠিক যে তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তা আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা দ্বারা পরিপুষ্ট।

দেশের জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা লইলেও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ প্রসারই ছিল তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তার লক্ষ্য। গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন, আমার জাতীয়তাবাবাদী চিন্তাধারা আন্তর্জাতিকবাদেরই প্রকাশ ("My nationalism is internationalism.[১])। তিনি শুধু ভারতের মুক্তি-আন্দোলনেই ব্রতী ছিলেন না, মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

সর্বোদয়ের ধারণা (The Concept of Sarbodaya): জন রাস্কিনের 'Unto this Last' গ্রন্থটির বক্তব্য গান্ধীজীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে এই গ্রন্থটি তিনি পাঠ করেন এবং ইহার মূল বিষয়গুলিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা যায় কি না তাহা লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করেন। পুস্তকটির মূল কথাগুলি তিনি গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ইহার নাম রাখেন সর্বোদয়।

১. জাতীয়তাবাদকে আর একস্থানে তিনি ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া উক্তি করিয়াছেন: Mine is not the religion of the prison house.

সর্বোদয় প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর জীবনদর্শন ও সমাজদর্শনের প্রতিফলন। সর্বোদয় একদিকে ধর্মীয় ও নীতিজ্ঞান অন্যদিকে গণতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদী ধারণা উভয়ের স্বার্থক সমন্বয় বলা যাইতে পারে।

সর্বোদয়ের মূল নীতি : গান্ধীজীর সর্বোদয়ের ধারণা নিম্নলিখিত নীতিগুলি দ্বারা প্রভাবিত :

(১) **জনসেবা ও জনসংযোগ** : জনগণের সেবা ও কল্যাণই পরম আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।[১] সত্যের পথ অনুসরণ (*Satyagraha*) করা এবং অহিংসার (*Ahimsa*) ধর্মকে কার্যকর করার মধ্যেই জনসেবার তাৎপর্য নিহিত। অহিংসার মাধ্যমেই অমংগলের স্থলে মংগল, অসত্যের স্থলে সৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যাগ্রহই হইল দুর্বল কিন্তু নৈতিক দিক হইতে সবল ব্যক্তিদের হস্তে অস্ত্র।[২]

(২) **কর্মযোগ** : গান্ধীজী ছিলেন কর্মযোগী। তিনি মনে করেন কর্মের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। ফললাভের আকাংক্ষা করিয়া কর্ম করিলে কর্মের প্রকৃত লক্ষ্যের বিচ্যুতি ঘটিবে। কর্ম হইবে নিষ্কাম। এই শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা হইতে।

(৩) **স্বরাজ (Swaraj)** : জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার পাইবে। রোগ বুভুক্ষা এবং দারিদ্র্য হইতে মুক্তিই হইল (freedom from disease, hunger and poverty) প্রকৃত স্বাধীনতা। শারীরিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। গান্ধীজীর মতে, ব্যক্তির আত্মিক ও বাহ্য স্বাধীনতাই হইল স্বরাজ। গান্ধীজীর ধারণায় ইংরাজ-প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া ইংরাজ বিতাড়নের প্রয়াস স্বরাজ নয়। স্বরাজ হইল শাসনমুক্তি। সত্য ও অহিংসার পথে স্বরাজ অর্জনের সাধনাই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস। জনসাধারণের মুক্তি ও গণসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

(৪) **শাসনমুক্ত সমাজ** : এই সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে যে শাসন-ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে জনগণকে মুক্ত করিতে হইবে। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকিলে ইহা বিশেষ শ্রেণীর করতলগত হইতে পারে এবং শ্রেণীস্বার্থে অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইলে বৈষম্য সৃষ্টি হইবে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে এবং শ্রেণীসংঘর্ষ অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। অনেকে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ এই সমস্যার সমাধান বলিয়া মনে করেন। গান্ধীজীর মতে, অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বাবলম্বী অর্থনীতি (self-supported economy)

১. "Gandhi lives for others. Society is Gandhi's temple, service is his sole form of worship, humanity is his single passion." Dr. Sitaramayya : *Gandhi and Gandhism*

২. "The starting point of Mahatma Gandhi's technique was that non-violence is the strength of the weak." Pyarelal : *Gandhian Outlook and Technique*

গড়িয়া তোলার মধ্যেই উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বার্থকতা। গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের প্রসার এই ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারে। উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। একচেটিয়া অধিকার বলিয়া কিছু থাকিবে না। ভোক্তা ও সমবায় সমিতির হাতেও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিকে কার্যকর করার কথাও গান্ধীজী বলেন। গ্রাম-স্বরাজ বা পঞ্চায়েতী রাজ গঠনের মধ্য দিয়া এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করিতে হইবে। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে কাজে লাগাইবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে আশা করিবে না। 'সাধ্য অনুযায়ী শ্রম ও প্রয়োজন অনুসারে প্রতিদান গ্রহণ' হইবে ব্যক্তির লক্ষ্য। সর্বোদয়ের অন্যান্য নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল: শাসনক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে দুর্নীতির অবসান, গ্রামদানের নীতি—অর্থাৎ ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দিয়া ব্যক্তি সচেতনভাবে সাধারণের স্বার্থে তাহার জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করিবে। সহরাঞ্চলেও কারখানা বা ব্যবসায় সবার স্বার্থে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে এগুলিকে সামগ্রিক মালিকানায় আনিতে হইবে।

জনশক্তি: জনশক্তির উপর গুরুত্বদানে গান্ধীজীর সর্বোদয়ের নীতির স্বার্থকতা। জনশক্তিই সামাজিক কুসংস্কারকে দূর করিতে পারে, জনশক্তিই বিকৃত সংস্কৃতির অপসারণ করিয়া সুস্থ ও ক্রিয়াশীল সংস্কৃতি জাগ্রত করিতে পারে। জনশক্তিই সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের চাবিকাঠি। সত্যাগ্রহ প্রেম মৈত্রী স্বাবলম্বন সহযোগিতা সংযম ও অহিংসার মাধ্যমেই জনশক্তি জাগ্রত হয়।

সর্বোদয় কার্যকরকরণের প্রচেষ্টা: গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের সরকার সম্পূর্ণ কার্যকর করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেস দল অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নীতি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে নাই। মূলত এই কারণেই গান্ধীজীর অনুসরণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ 'সর্বোদয় সমাজ' গঠনের আহ্বান করেন এবং এই সমাজ গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও শিক্ষাকে কার্যকর করিতে প্রয়াসী হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়ার্ধায় এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ আহ্বান করা হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজীর মৃত্যু হওয়াতে এই সমাবেশ হইতে পারে নাই। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কাকা কালেলকরের (Kaka Kalelkar) সভাপতিত্বে সর্বোদয় সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে এক অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং এই অধিবেশনেই সর্বোদয় সমাজের লক্ষ্যকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়। আচার্য বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয় সমাজের আদর্শকে বাস্তবায়িত করিতে অগ্রসর হন। রাষ্ট্রবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, শাসন-বিভাজন ও বিকেন্দ্রীকরণ, সামাজিক অর্থনৈতিক ও নৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত গ্রাম-স্বরাজ গঠন, আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী মানুষ সৃষ্টি, শোষণের অবসান প্রভৃতি লক্ষ্যের মধ্যেই সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার সাফল্য বর্তমান।

গান্ধীজীর রাষ্ট্র ও সর্বোদয়ের ধারণার সমালোচনা: আধুনিক ভারতে গান্ধীজীর বাণী ও চিন্তাধারা কেহ কেহ সমর্থন করিলেও তাঁহার রাষ্ট্র ও সর্বোদয়ের ধারণা বাস্তবে কতটা কার্যকর এ-সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। (ক) অনেকে বলেন, শাসনমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। ইহার স্বার্থকতা কল্পনা ও আদর্শের রাজ্যেই সীমাবদ্ধ। গান্ধীজী-পরিকল্পিত ধর্মরাজ্যের

নীতিগুলি—অর্থাৎ অহিংসা সত্যাগ্রহ ত্যাগ পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতা বা জনগণ কেহই কার্যক্ষেত্রে মানিয়া চলেন না। (খ) বর্তমান সমাজ শাসনমুক্ত সমাজ একথাও বলা চলে না। ভারতের রাজনীতি আজও প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় শাসনের নীতি, পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার নীতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনের নীতিতে অবিচল ও আস্থাশীল। (গ) গান্ধীজী রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির চরিত্রে উৎকর্ষসাধনের পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব কি না ইহা লইয়াও প্রশ্ন উঠে। (ঘ) আধুনিক শিল্পসমাজের পটভূমিতে গান্ধীজী-পরিকল্পিত গ্রামীণ অর্থনীতি প্রসার ও প্রয়োগের ধারণা এবং গ্রামীণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার নীতি কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা লইয়াও প্রশ্ন উঠে। অনেকের মতে, ভারতের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত উৎপাদনবৃদ্ধি ও জাতীয় আয়বৃদ্ধি। গান্ধীজীর অর্থনীতির প্রয়োগ সামগ্রিকভাবে এই লক্ষ্য দ্বারা ধাবিত নয়।

সর্বশেষে বলা যায়, গান্ধীজীর সর্বোদয়ের ধারণাও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয় নাই।

গান্ধীজী ও মার্ক্সের চিন্তাধারার তুলনা (Gandhism and Marxism) : অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীজীও মার্ক্সের মত রাষ্ট্রকর্তৃত্ববিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছেন। গান্ধীজী মনে করেন, রাষ্ট্র হিংসা ও শোষণের প্রতিষ্ঠান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু মার্ক্স ও গান্ধীজীর চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়।

(ক) মার্ক্সবাদ বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করে, গান্ধীবাদ ধর্মীয় চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির ব্যাখ্যা করে।

(খ) মার্ক্সবাদীরা শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের প্রয়োজনে সর্বহারার বিপ্লব, সুসংগঠিত কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব, সাম্যবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। মার্ক্সবাদিগণের মতে, বিপ্লব হিংসাত্মক পদ্ধতি ব্যতীত সম্ভব নয়।[১] অন্যদিকে গান্ধীজী ব্যক্তিত্বের পূর্ণপ্রকাশ, দলের অপ্রয়োজনীয়তা এবং অহিংস সংগ্রামের কথা বলেন।

(গ) মার্ক্সবাদিগণ মনে করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বার্থে একটি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত সংস্থা থাকা দরকার এবং অবশ্যই ইহার পরিচালন-পদ্ধতি হইবে গণতান্ত্রিক। গান্ধীজী এই ধারণা সমর্থন করেন না।

(ঘ) গান্ধীবাদীরা মার্ক্সবাদীদের এই মত বিশ্বাস করেন না যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবসান ঘটিলেই শোষণের অবসান ঘটিবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ব্যবস্থাপক-শ্রেণী ও আমলাতন্ত্র উৎপাদনকার্যে প্রবেশ না করিয়াও ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শোষণকার্য চালাইয়া যায়।

---

১. অবশ্য বর্তমানে অনেক মার্ক্সবাদী লেখক আছেন যাঁহাদের মতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

(ঙ) কেহ কেহ গান্ধীজীকে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া আখ্যা দেন কিন্তু গান্ধীজীর সমাজতন্ত্র গ্রামীণ সমাজতন্ত্র। গ্রামের সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করিবার নির্দেশ দেন।

যে-অর্থে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়—অর্থাৎ উৎপাদন-উপকরণের সামাজিক মালিকানার প্রসার—সমাজতন্ত্রের এই ধারণা গান্ধীজীর সমর্থন লাভ করে নাই।[১] অবশ্য সমাজতন্ত্রের অন্যান্য নীতিগুলি—অর্থাৎ সহযোগিতা, সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতিতে তিনি আস্থাশীল ছিলেন।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর

১. প্রচলিত অর্থে ও সংজ্ঞার দিক দিয়া গান্ধীজীকে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বলা চলে না।

২ তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান উৎস ধর্মচিন্তা ও নীতিজ্ঞান। এবং যাঁহাদের চিন্তাধারা দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন থোরো, রাসাকন, টলস্টয় ও লাও-সে।

৩. ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের সহিত রাজনীতিজ্ঞানের সামঞ্জস্যবিধানেই রহিয়াছে গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার সার্থকতা।

৪. গান্ধীজীর রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা একপ্রকার নৈরাজ্যবাদী কিন্তু স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার প্রকাশ।

৫. সর্বোদয় বলিতে বুঝায় সকলের কল্যাণ—ইহা ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র ও নীতিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদী ধারণার সমন্বয়। ইহার মূল নীতি হইল (১) জনসেবা ও জনসংযোগ, (২) কর্মযোগ, (৩) স্বরাজ, (৪) শাসনমুক্ত সমাজ এবং জনশক্তি।

৬ সর্বোদয়ের ধারণা জনপ্রিয় হয় নাই, কারণ অনেকেই ইহা বাস্তবসম্মত বলিয়া মনে করেন না।

৭ গান্ধী ও মার্ক্সের মধ্যে পার্থক্য হইল রাষ্ট্র সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগি ও রাজনীতির ব্যাখ্যা লইয়া। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেও উভয়ের ধারণা মেরুপ্রান্তিক বলা চলে।

অনুশীলনী

1. **Indicate the sources of Gandhi's political ideas.**
[গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার উৎসের বিবরণ দাও।] (৩৮০-৮১ পৃষ্ঠা)
2. **Analyse Gandhian concept of the State.**
[রাষ্ট্র সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর।] (৩৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)
3. **Critically discuss Gandhian concept of *Sarbodaya*.**
[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে গান্ধীজীর সর্বোদয়ের ধারণার পর্যালোচনা কর।] (৩৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)
4. **Give a brief comparison between the political ideas of Marx and of Gandhi.**
[সংক্ষেপে মার্ক্স ও গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধারণার মধ্যে তুলনা কর।] (৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)
5. **Analyse Gandhi's concept of Sarvodaya.**
[সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর।] (৩৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা)

১. **Rammonohar Lohia :** ***Marx, Gandhi and Socialism***

১৯ রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ (CLASSIFICATION OF POLITICAL SYSTEMS)

'The term 'political system' has become increasingly common in the titles of texts and monographs in the field of comparative politics. The older texts used such terms as 'government', 'nation' or 'state' to describe what we call political system."
Almond and Powell

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় ?

২. ইহার বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৩. চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনগুলি ?

৪. বর্তমানে স্বীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কয় শ্রেণীর এবং উহারা কি কি ?

৫. উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় ?

৬. কর্তৃত্বমূলক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় কি ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার আধুনিক দৃষ্টিভংগি ও ধ্যানধারণা : বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নূতন দৃষ্টিভংগির সূত্রপাত হয়। অতীতে 'সরকার' 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি ধারণাকে প্রধানত আইনগত দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করা হইত এবং সাংবিধানিক অর্থে এই সকল ধারণা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিবেচিত হইত। রাজনীতির আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগির প্রসারলাভ করার সংগে সংগে ধারণাগুলিকে ঠিক প্রাচীন বা ঐতিহ্যগত অর্থে বিচার করা হয় না। বর্তমানে অনেক লেখক রাষ্ট্র, সরকার প্রভৃতি ধারণার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধারণা ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে কতকগুলি সংকীর্ণ বা আনুষ্ঠানিক বিষয়কে বুঝায় না, সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যাদিই ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতীতে সরকারের শ্রেণীবিভক্তিকরণ একটি রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অ্যারিষ্টটল মন্টেস্কু, বোঁদাঁ প্রভৃতি রাষ্ট্রদার্শনিক শাসকের সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও ইহাদের গুণাগুণ বিচার করিয়াছিলেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি নামে সরকার বা শাসন-ব্যবস্থা চিহ্নিত হয়।

পরবর্তীকালে সাংবিধানিক দৃষ্টিভংগির প্রচলন হওয়াতে সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার, এককেন্দ্রিক সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রভৃতি সরকারের বিভিন্ন রূপ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের (Separation of Powers and Territorial Distribution of Powers)

ভিত্তিতে সরকারের এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কিন্তু সরকারের কোন শ্রেণীবিভাগই সন্তোষজনক হইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের নাম একই প্রকার হইলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইহাদের কার্যাদি বা ভূমিকা ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক বা আইনগত ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচার করা হইলে মাত্র আনুষ্ঠানিক সংবিধানগত দিকের পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হইবে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যাইবে না—ইহাই অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিমত।[১] ইহারা আরও বলেন, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হইবে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সকল প্রকার রাজনৈতিক অবস্থা ও কার্যাদি ব্যাখ্যা করে।

সুতরাং রাজনীতির সামগ্রিক রূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার (political systems) শ্রেণীবিভাগই সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়।[২]

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্থ: ডেভিড ইস্টনের (David Easton) অনুসরণে বলা যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইল সমাজের সেই সকল পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বা কর্তৃত্বসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ("Political system is that system of interaction of society in which... authoritative allocations are made.")।[৩] অ্যালমণ্ড ও পাওয়েলের মতে, নির্দিষ্ট সীমানা ও পরিবেশের মধ্যে কার্যকর পরস্পরনির্ভরশীল বিভিন্ন অংশই হইল ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রক্রিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত এই ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। (a system implies the interdependence of parts and a boundary of some kind between it and its environment.)।

সংক্ষেপে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থাকে যাহা দ্বারা স্বাধীন সমাজ একত্রীকরণ (integration), অভিযোজন (adaptation) প্রভৃতি কার্য বৈধভাবে সম্পাদন করিতে পারে।[৪]

অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল সর্বজনীনতাকে (universality) রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব, একই ধরনের কার্যাবলী, মিশ্র সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রায় সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনায় এই বিষয়গুলিই প্রাধান্য পায়

---

১. Alan R. Ball : *Modern Politics and Government*
২. *Ibid*
৩. David Easton : *The Political System*
৪. Almond and Powell : *Comparative Politics*

বিয়ার ও উলামের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইল এক সাংগঠনিক ব্যবস্থা : (১) যাহা সমাজে কতকগুলি কার্য সম্পাদন করে ; (২) যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে ; এবং (৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কতকগুলি লক্ষ্য (goals) বা উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করিয়া। বিয়ার ও উলাম বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি (political culture), স্বার্থ ও স্বার্থগোষ্ঠীর উপস্থিতি (presence of interest and interest groups), ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃতি (pattern of powers), সিদ্ধান্তের প্রকৃতি (pattern of policy) প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।[১]

চিরাচরিত চারিশ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা : অ্যালমণ্ড-উল্লিখিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :[২]

ক। ইংগ-মার্কিনী ব্যবস্থা (Anglo-American System) : বহুমুখী মূল্যবোধ, সমজাতীয় রাজনৈতিক লক্ষ্য ও সংস্কৃতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জনকল্যাণ, নিরাপত্তা-ব্যবস্থা প্রভৃতি এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। জনসাধারণের আনুগত্য, ক্ষমতা ও প্রভাবের বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর অবস্থান, সার্বিক ভোটাধিকার প্রভৃতিও এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খ। মহাদেশীয়-ইয়োরোপীয় ব্যবস্থা (Continental-European System) : সমজাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব এই ব্যবস্থায় লক্ষণীয়।

গ। প্রাক্-শিল্প বা আংশিক শিল্পোন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Pre-industrial or Partially Industrialized Political System) : মিশ্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ঘ। সর্বাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Totalitarian Political System) : গণ-সংগঠনের অনুপস্থিতি, সরকার নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা, কেন্দ্রীভূত শাসন প্রভৃতি এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

অ্যালমণ্ড ও পাওয়েলের শ্রেণীবিভাগ—সচল ও প্রাক্-সচল ব্যবস্থা : অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল তাঁহাদের 'তুলনামূলক রাজনীতি' নামক পুস্তকে রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহকে (ক) সচল আধুনিক ব্যবস্থা (mobilized modern systems) ও (খ) প্রাক্ সচল আধুনিক ব্যবস্থা (premobilized modern systems)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাক্-সচল আধুনিক ব্যবস্থা ঐতিহ্যসম্মত ও আধুনিক ভাব ও রীতির সমন্বয়সাধন করে।

ফাইনারের শ্রেণীবিভাগ : স্যামুয়েল এডওয়ার্ড ফাইনার 'The Man on Horseback' নামক গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাপকাঠিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা-

১. S. H. Beer and H. B. Ulam : *Patterns of Government*

২. G. A. Almond : *Comparative Political Systems in Journal of Politics, Vol. XVIII, 1956*

সমূহকে (ক) পরিণত (matured), (খ) উন্নত (developed), (গ) নিম্নপর্যায় (low) এবং (ঘ) পরিলঘিষ্ঠ (minimal)—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত, এখানে সংস্কৃতি পরিণত ও জনমত সুসংগঠিত। ফ্রান্স জাপান ও সোবিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত—এই সকল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নত ধরনের সংস্কৃতি, জনমতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তুরস্ক আর্জেন্টিনা স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত নয়, সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব এই ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। মেক্সিকো হাইতি কংগো প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিলঘিষ্ঠ প্রকৃতির এবং চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত।

দ্যুভারজারের শ্রেণীবিভাগ: মরিস দ্যুভারজার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে (ক) বহুত্ববাদী (pluralist) এবং (খ) অখণ্ড (monolithic)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। বহুত্ববাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভক্ত থাকে—রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী ও জনমত প্রাধান্য পায়। সুতরাং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে স্বীকার করা হয়।

অপরদিকে অখণ্ড ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃত্ব থাকে কেন্দ্রীভূত এবং জনমত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে কার্যকর হয়।[১]

অ্যালান বল: অ্যালন বল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে (ক) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System), (খ) সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian System) এবং (গ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic System)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর উপস্থিতি, অব্যাহত নাগরিক অধিকার, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটেন ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থার উদাহরণ। সর্বাত্মক ব্যবস্থা একটিমাত্র দলের ও মতাদর্শের প্রাধান্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যাদির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রিত প্রচার ও জনসংযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সর্বাত্মক ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে সোবিয়েত ইউনিয়ন চীন ভিয়েৎনাম কিউবা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়।[২] স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের উপর সীমানির্দেশ করা হয়, নাগরিক অধিকার সীমিত থাকে, শক্তির দ্বারা শাসকবর্গ আনুগত্য লাভের প্রচেষ্টা চালান, বিচার-ব্যবস্থা ও প্রচার-ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সৌদি আরব নাইজিরিয়া প্রভৃতি এই ব্যবস্থার উদাহরণ।

বর্তমানে স্বীকৃত তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা: যাই হোক, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে: ক। উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System);

---

১. Maurice Duverger: *Idea of Politics*

২. এই সকল দেশকে সমাজতান্ত্রিক (socialist) ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন।

খ। কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Authoritarian or Autocratic System); গ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Socialist System)।

ক। উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা: উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপ। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই কোন-না-কোন অর্থে এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়াছে। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেলজিয়াম প্রভৃতি রাষ্ট্র এই ব্যবস্থার সহিত প্রায় এক শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া পরিচিত। ইস্‌রায়েল ও আইরিশ সাধারণতন্ত্রে এই ব্যবস্থা নূতন হইলেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। জার্মানী ইতালী জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের অতীত অভিজ্ঞতা ভিন্ন হইলেও বর্তমানে উদার-গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র—যেমন ভারত শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি এই ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা চালাইতেছে।

উৎস: উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানত রুশোর ভাববাদী রাষ্ট্রদর্শন, বেন্থাম মিল প্রভৃতির হিতবাদী দর্শন (Utilitarian Theory), জন স্টুয়ার্ট মিল, স্পেনসার প্রভৃতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগি দ্বারা প্রভাবিত। বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Democratic Socialism) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপায়ণে সাহায্য করিয়াছে।

ভিত্তি: যে-সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহা হইল এইরূপ: (ক) এই ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা সাধারণত যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাহাদের সকলকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে—(১) জনমত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা এবং জনগণের নিকট শাসকদের দায়িত্বশীলতা। (২) জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন মতামতের অর্থে জনমত। (৩) তত্ত্বগতভাবে জনমতভিত্তিক ও সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার হইলেও কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

(খ) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে সীমিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।[১] সীমিত এই অর্থে যে ইহাতে সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত অধিকার থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কতিপয় ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থেরই প্রতিফলন হইয়া দাঁড়ায়। বৈচিত্র্য বা বহুমুখিতাকে সমর্থন করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা বিশেষ মত বা পথের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক বলিয়া ইহা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ-স্বার্থকে উপেক্ষা করে। পরিশেষে, শ্রেণীবিভক্ত বলিয়া প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্র কার্য করে বলিয়া অভিযোগ করা হয় এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে ইহাতে অর্থনৈতিক সাম্য নাই।

বৈশিষ্ট্য: উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়:

১. "Liberal democracy is a qualified democracy." Finer

(১) **দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা :** গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও প্রতিনিধিসভার উপস্থিতির দরুন উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। জন স্টুয়ার্ট মিলের অনুসরণে বলা যায়, এই ব্যবস্থায় সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে। অবাধ ভোটাধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের সার্থকতার সর্ত।

বলা হয়, উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের রাজনৈতিক কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। ইহারা জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা ও সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট থাকিবেন বলিয়াই আশা করা হয়। সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের (Bureaucray) ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(২) **একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব :** উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ইহারা ক্ষমতার লড়াইয়ে অবাধে অংশগ্রহণ করিতে পারে। বলা হয় ইহার ফলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়।

(৩) **স্বার্থগোষ্ঠী ও অন্যান্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব :** উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে—বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৪) **নাগরিক অধিকারের সংরক্ষণ :** উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি পায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ এই ব্যবস্থায় কাম্য বিবেচিত হয় না। অপরপক্ষে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে সরকারের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। অবশ্য সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ায় নাগরিকদের অধিকার, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকার, আনুষ্ঠানিক বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

(৫) **নিরপেক্ষ বিচারালয়ের অস্তিত্ব :** উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার এবং সুসংগঠিত ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপযোগিতা স্বীকৃত। বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি, কার্যকাল প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিচারকার্যের স্বাধীনতাকে কার্যকর করা হয়। এক্ষেত্রেও অভিযোগ করা হয় যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিচার-ব্যবস্থা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে কায করিয়া থাকে।

(৬) **গণ-সংযোগ ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ :** সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণ তাহার মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। জনগণ সরকারের সমালোচনা করার অধিকারও ভোগ করে। গণ-সংযোগের মাধ্যমগুলির উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে বলা হয়, একচেটিয়া অধিকার না থাকিলেও এইগুলির উপর ধনিকশ্রেণীর ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অধিক এবং ঐ শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।[১]

---

১. H. J. Laski : *Human Rights (A UNESCO Symposium)*

সমালোচনা: উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা প্রসংগে বলা হয়, যে-সমস্ত বিষয়ের উপর এই ব্যবস্থা নির্ভরশীল সর্বক্ষেত্রে তাহা সঠিকভাবে কার্যকর হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের শাসন মুষ্টিমেয়ের শাসনে পরিণত হয় এবং অগণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় আবার আমলাতন্ত্রই অগণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে প্রশ্রয় দিয়া জনগণের স্বার্থ বিপন্ন করে।

উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবার গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকটি অবহেলিত—অর্থনৈতিক লক্ষ্য, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে এই ব্যবস্থা বিশেষ কিছু উল্লেখ করে না।[১] অবশ্য অর্থ-ব্যবস্থা মোটামুটি ধনতান্ত্রিক প্রকৃতিরই হয় এবং শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে থাকে দুই প্রধান শ্রেণী—মালিক ও শ্রমিক। যদিও আর্থিক ক্ষমতাবলে ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও ব্যক্তিগত মুনাফা ভোগ—এই দুইয়ের মধ্যে দেখা যায় অসংগতি ও সংঘর্ষ। এই অবস্থায় জনসাধারণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা সম্যকভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে না। বলা হয়, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপরি-উক্ত অসংগতির অবসান ঘটিতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমানভাবে সাধিত হইতে পারে। তবুও কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে ক্রমশ অধিকমাত্রায় স্বাধীনতা ও সুবিধা আদায় করিবার সুযোগ পায়। বস্তুত, উদার গণতন্ত্রে সংকট ও গণ-আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্র জনকল্যাণকর কার্যের দিকে ক্রমবর্ধমান হারে দৃষ্টি দিতেছে।

খ। কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা: 'কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা' বর্ণনাটি মোটেই সুস্পষ্ট নহে। ব্যাপক দৃষ্টিকোণ হইতে স্বৈরতন্ত্র (autocracy), স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা (despotism), নায়কতন্ত্র (dictatorship), সর্বাত্মক শাসন-ব্যবস্থা (totalitarianism) এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে (socialist system) কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।[২] এখানে আমরা স্বৈরতন্ত্রের অর্থেই কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা করিব। এই ব্যবস্থায় হেগেলের চরম আদর্শবাদী রাষ্ট্রচিন্তা, ফিকটে ও নীৎসের যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রদর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। ইহা ক্ষমতা বা শক্তিকেই সুশাসনের পথ বলিয়া মনে করে। যদিও লেখকদের মধ্যে মত পার্থক্য রহিয়াছে তবুও মোটামুটিভাবে এই ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া নিম্নলিখিতগুলিকে নির্দেশ করা যায়।[৩]

(১) নাগরিক অধিকার ও সামাজিক কার্যকলাপের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বিরুদ্ধ মতামতকে কঠোরভাবে দমন।

---

১. এই প্রসংগে গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২. N. C. Roy, J. Dasgupta and J. K. Roy : *Principles of Political Science*

৩. Miliband : *Marxism and Politics*; and Alan R. Ball : *Modern Politics and Government*

(২) সুনির্দিষ্ট ও সুশৃংখলিত মতাদর্শের প্রাধান্য না থাকিলেও জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান। (অবশ্য ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল।)

(৩) আদালত ও গণসংযোগ ব্যবস্থার উপর শাসন-কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

(৪) দমনমূলক শাসননীতির প্রয়োগ এবং যুদ্ধবাদকে প্রশ্রয়দান ও শান্তির প্রতি ঘৃণার মনোভাব (ফ্যাসীবাদী ও নাৎসীবাদী ব্যবস্থায় ইহা প্রসার লাভ করে)।

(৫) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—উভয়কেই অস্বীকার।

সর্বাত্মক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের সমর্থন করিয়া ইহা ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ইচ্ছা প্রভৃতিকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করে। অন্যদিকে ইহা সম্প্রদায়ের বিশেষ ইচ্ছার স্বার্থে সাধারণের ইচ্ছাকে বলি দেয়। শাসন-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও ধ্যানধারণাই প্রতিফলিত হয়। নির্বাচিত আইনসভার জনমত জনপ্রতিনিধিত্ব, সাংবধানিক ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তে নেতৃপূজা, কর্তৃত্বের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ প্রভৃতিকে ইহা সমর্থন করে।

(৬) **স্বল্পস্থায়িত্ব:** কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ও ক্ষমতার প্রাধান্য শাসন-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধের সূচনা করে। জনসাধারণ এবং শাসন-কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। সামরিক অভ্যুত্থান, গোষ্ঠীগত শাসন প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বিশেষ উন্নত স্তরে পৌঁছায় না।

মূল্যায়ন: কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী মনে করা হইলেও এই ব্যবস্থার কিছু কিছু গুণ স্বীকৃত। ইহা সংকটকালীন অবস্থার উপযোগী।

যে-ক্ষেত্রে সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে অথচ নূতন কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে-ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থার কাজ করে।

অবশ্য বর্তমানে এই ব্যবস্থাকে কোনভাবেই সমর্থন করা হয় না।[১] কারণ, ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতার হন্তারক ও প্রতিক্রিয়াশীল।

গ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নহেন। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদিগণ (Fabian Socialists) বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া সামাজিক সাম্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চান। এই উদ্দেশ্যে ইহারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের (Guild Socialists) সমর্থকগণের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হইবে অর্থনৈতিক সংঘসমূহকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা। এই উদ্দেশ্যে পেশাগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্র (Syndicalism) প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলে এবং এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের বিলোপসাধন করিতে চায়।

১. এই বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য নায়কতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ প্রভৃতির আলোচনা দেখ।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ : বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক (Scientific Socialism) ব্যবস্থার সার্থক প্রবক্তা হইলেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস। ইঁহারা মনে করেন, পূর্ণ সমভোগবাদী সমাজের (communistic society) প্রাথমিক পর্যায় হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থের বিলোপসাধন করিয়া সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংসের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিবে এবং রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হইবে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকে তাহার কার্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে বেতন বা মজুরী পাইবে। এই ব্যবস্থার প্রসারে ক্রমশ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিবে এবং কমিউনিস্ট সমাজ প্রবর্তিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

সোবিয়েত ইউনিয়ন চীন ভিয়েৎনাম যুগোশ্লাভিয়া পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত।

বৈশিষ্ট্য : সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নবর্ণিত রূপ :

(১) উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানায় অবসান এবং সামাজিক মালিকানা প্রবর্তন ;

(২) ব্যক্তির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ;

(৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিলোপসাধন এবং সমষ্টিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা ;

(৪) শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রকে কাজে লাগানো, শ্রেণীহীন সমাজগঠন, অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক শোষণের অবলুপ্তি ;

(৫) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—আইন, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিচার ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োগ করা ;

(৬) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ও সমভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাবিত হওয়া ;

(৭) একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ (কমিউনিস্ট মতাদর্শ) ও রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য, দলের নেতৃত্বে ও মতাদর্শের প্রয়োগে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমনের উদ্দেশ্যে দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ;

(৮) বিভিন্ন গণ-সংগঠনের অস্তিত্ব ও সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে ইহাদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও কার্যকরী ভূমিকা ;

(৯) সোবিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কার্যকর করা হয়, জাতীয় অংগ রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অধিকার—এমনকি রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়, জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিও স্বীকৃত হয়

(১০) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকার্যের প্রসার, সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা, নিয়ম-শৃংখলার স্বার্থে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন, সরকার ও জনগণের শাসনকার্যে

সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিগণের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১১) এই ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে স্বীকার করে না।

অনেক লেখক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন বাস্তবে এই ব্যবস্থা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও ইহা সফল ব্যবস্থা হইয়া উঠিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়া অন্যান্য দিককে অবহেলা করে; মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করে না।

অনেকে মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুঁজিপতিশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া এক নূতন পরিচালক শ্রেণীর সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই শ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে।[১]

ইহা গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা নহে। সমাজতন্ত্রে অনুসৃত পদ্ধতি লইয়াও মতবিরোধ দেখা যাইতেছে।

তিনটি গতি: আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রথমত, ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গঠন করার কথা ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে লোকায়ত করিয়া (secularise) তুলিয়াছে। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থা শোষিত জনগণের আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিচিত। উদার-গণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থার তুলনায় ইহার জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে অবশ্য এই ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান।[২]

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর:

১ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেই সকল পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যবস্থাকে বুঝায় যাহার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বা কর্তৃত্বের সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

২. ইহার বৈশিষ্ট্য হইল সর্বজনীনতা, রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব, একই ধরনের কার্যাবলীও মিশ্র সংস্কৃতি।

৩. চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইল (১) ইংগ-মার্কিন ব্যবস্থা, (২) মহাদেশীয় ইয়োরোপীয় ব্যবস্থা, (৩) প্রাক্-শিল্প বা আংশিক শিল্পোন্নত ব্যবস্থা, (৪) সর্বাত্মক ব্যবস্থা।

৪. বর্তমানে স্বীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তিন শ্রেণীর: (ক) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, (খ) কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (গ) সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা।

১. Paul M. Sweezy and Bettelheim: *On the Transition to Socialism*, p. 81
২. L. Kolakowski: *Main Currents of Marxism*

৫. উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিতে তিনটি বিষয় বুঝায় : (ক) জনমত-ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা, (খ) স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন জনমত এবং (গ) কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

৬. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কর্তৃত্বমূলক হইলেও সাধারণত কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা বলিতে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করা হয়।

অনুশীলনী

1. What are Political Systems? How have they been classified?

[রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে উহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে?]

(৩৯০-৯৩ পৃষ্ঠা)

2. Write notes on any *two* of the following :

(*a*) Liberal Democratic System, (*b*) Authoritarian System and (*c*) Socialist System.

[যে কোন দুইটি বিষয়ের উপর টীকা রচনা কর :

(ক) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, (খ) কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা, (গ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।]

(৩৯৩-৯৫, ৩৯৫-৯৬, ৩৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা)

২০ একককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (UNITARY AND FELERAL GOVERNMENTS)

> *"Federalism is always a stage on the road to country."*
> A. V. Dicey
>
> *"Men who have once tasted power will not surrender at without conflict."*
> H. J. Laski

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি কি?

২ এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার কিভাবে বর্ণনা করা যায়?

৩. যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা কিরূপ হইতে পারে?

৪ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিভাবে?

৫ এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি?

৬ এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ দেশের উপযোগী?

৭. কোন্ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সমর্থনীয়?

৮. আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রসমূহের গতি কোন্ দিকে?

৯. যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য কোন্ কোন্ সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন?

১০ যুক্তরাষ্ট্র (Federation) এবং রাষ্ট্র-সমবায়ের (confederation) মধ্যে পার্থক্য কি?

ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন।

আঞ্চলিক ক্ষমতা-বণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা-বণ্টন বর্তমানে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাকে ইহাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলিয়াও অভিহিত করা যায়। দেখা যায়, অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রত্যেক বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে একটি জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার রহিয়াছে।

আঞ্চলিক ক্ষমতা-বণ্টনের কারণ: রাষ্ট্রের বৃহদায়তনই এইরূপ ক্ষমতা-বণ্টনের একমাত্র কারণ নহে। অন্যান্য কারণ হইল বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের অস্তিত্ব, স্বায়ত্তশাসনের আকাংক্ষা, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার, ইত্যাদি। বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া আঞ্চলিক সরকারের পক্ষেই সম্ভব হয়। ইহাতে একাধারে ব্যয় ও সময় সংক্ষেপ হয়। উপরন্তু, এই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের স্বায়ত্তশাসনের আকাংক্ষাও পূর্ণ হয়। এই বিভিন্ন কারণের ফল দাঁড়াইয়াছে সরকারী

আঞ্চলিক ক্ষমতা-বণ্টনের দুইটি পদ্ধতি : প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে শাসন-ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন ঘটিতে পারে। (ক) প্রথম পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং জাতীয় সরকার নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ করে। এইরূপ ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র দ্বারাই জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ সৃষ্ট হয় এবং ইহার দ্বারাই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত (distribution) হয়।

প্রথম পদ্ধতি অনুসৃত হইলে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইলে ইহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government) : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহ সৃষ্টি এবং উহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার অন্যভাবে এই প্রাধান্য প্রয়োগ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা আঞ্চলিক সরকারসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, উহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে—এমনকি উহাদের অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের এইরূপ সর্বতোমুখী প্রকাশের জন্য স্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন : সংবিধান অনুসারে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার ও একটিমাত্র আইনসভা আছে। কোন কোন রাষ্ট্রে অবশ্য আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহাদের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার সকল প্রকার কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা হইল কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভা।[১]

এই কারণে ডাইসি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে "একই কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা আইনগত সর্বপ্রধান কর্তৃত্বের স্বাভাবিক ব্যবহার" (The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ : ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই দুই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ লইয়া এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বুঝানো যাইতে পারে। ব্রিটেনে যে-সকল আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় সরকার আছে তাহাদের অনেকগুলি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিলেও তাহাদের সকলই পার্লামেন্টের আইন দ্বারা স্বীকৃত; কতকগুলি আবার এই পদ্ধতিতেই সৃষ্ট। এই সকল আঞ্চলিক সরকার বহু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিলেও সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ও

১. "The essence of a unitary State is that the power of the Central Government is unrestricted, for the constitution ... does not admit any other law-making body than the central one."

নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।[১] পার্লামেন্ট চরম কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া ইহা যে-কোন সময়ে স্থানীয় সরকারগুলির পুনর্গঠন এবং উহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে; উহাদের বিলোপসাধনও করিতে পারে। অগ (F. A. Ogg) বলেন, ব্রিটেনে স্থানীয় সরকারসমূহের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ গভীর ও ব্যাপক। ফ্রান্সের সম্পর্কে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণই স্থানীয় সরকারসমূহের পরিচালনার মূলসূত্র। সেখানে সকল স্থানীয় সরকারই আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of the Interior) সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত যে সরকারের কেন্দ্রীভূত রূপ উপলব্ধি করিতে বিশ্লেষণের মোটেই প্রয়োজন হয় না। অগের ভাষায় বলিতে পারা যায়, ফ্রান্সে "প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র সরকার আছে এবং ইহা হইল কেন্দ্রীয় সরকার।"

গুণ: (১) সমগ্র দেশব্যাপী নীতি, আইন ও শাসনকার্য পরিচালনায় অখণ্ডতা হইল এককেন্দ্রিক সরকারের প্রধান গুণ। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় একই আইন দুইবার প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না, বিভিন্ন সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও নাই। একটিমাত্র সরকারের প্রাধান্য থাকায় শাসনযন্ত্র জটিল ও বিরাট হইয়া উঠে না। ফলে ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনাও কম থাকে।

(২) নীতি, আইন ও শাসনকার্য পরিচালনায় অখণ্ডতা থাকায় এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষে এবং সংকটজনক সময়ে এই দৃঢ়তা বিশেষভাবে উপযোগী।

(৩) আরও বলা যায়, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সুপরিবর্তনীয়। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনমত বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকার গঠন করিতে পারে, তাহাদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিতে পারে, অর্পিত ক্ষমতা আবার ফিরাইয়া লইতে পারে, আঞ্চলিক সরকারসমূহের অস্তিত্বের অবসানও ঘটাইতে পারে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা উহার উৎকর্ষের নির্দেশক।

ত্রুটি: (১) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা তত্ত্বগতভাবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল থাকে। এই তত্ত্বাবধান ও নির্ভরশীলতার জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফলে জাতীয় জীবনও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

(২) একদিক দিয়া এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সুশাসনের অন্তরায় হিসাবেও গণ্য করা যায়। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ অনেক ক্ষেত্রে

১. "Local governments ... are creatures of the central government and act as its administrative agents." Ferguson and McHenry: *The American System of Government*

প্রতি পদে আঞ্চলিক সরকারসমূহের শাসনকার্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সকল আঞ্চলিক সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে সমস্যাগুলির সমাধান আঞ্চলিক স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইতে পারে।

উপসংহার: কোন শাসন-ব্যবস্থাই সকল অবস্থায় উপযোগী নহে, কিন্তু প্রত্যেক শাসন-ব্যবস্থাই কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থায় উপযোগী। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ এক ক্ষেত্রের উপযোগী হইতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মতে, ইহা ভৌগোলিক ও জাতিগত (ethnic) ঐক্যসমন্বিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই ইহা সেখানেও সফল হইতে পারে।

কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, সুশাসনই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার শেষ কথা নহে, স্বায়ত্তশাসনও অন্যতম গণতান্ত্রিক আদর্শ। ইহাকে প্রধানত গণতান্ত্রিক আদর্শ হিসাবেও গণ্য করা চলে। সুতরাং উপযোগিতার কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা গেলেও গণতান্ত্রিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ হইতে সর্বব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। এইজন্যই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকেই সকল ক্ষেত্রে কাম্য বলিয়া মনে করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government):

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের প্রাধান্যের পরিবর্তে লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। এই লিখিত সংবিধানই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বা আংগিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যেই ক্ষমতার বণ্টন (distribution) করিয়া দেয়।

ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টিত হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের কেহ কাহারও অধীনে থাকে না।[১] উভয়ে নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিয়া পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে।[২]

সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের মত আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও মৌলিক ক্ষমতা; ইহার কোনরূপ পরিবর্তনসাধন বা হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমে সংবিধানের পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

---

১. "In a Federal Constitution the powers of government are divided between a *government for the whole country* and *governments for parts of the country* in such a way that each government is legally independent within its own sphere." K. C. Wheare: *Modern Constitutions*

২. "By the federal principle I mean the method of dividing powers so that general and regional governments are each, within a sphere, *co-ordinate* and *independent*." K. C. Wheare: *Federal Government*

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিরূপে ? (How does a Federation come into being ?) : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা উভয়ই বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।

অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব : স্ট্রং-এর মতে, ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্রসমূহ দুইটি পদ্ধতিতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে দেখা যায়। প্রথম পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি (integration by absorption) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই পদ্ধতিতে হয় যুদ্ধের ফলে বিজিত রাষ্ট্র বিজেতা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, না-হয় পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ভাব এইরূপ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। এই পদ্ধতিতে বর্তমানের সকল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি : দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ফলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে উদ্ভব হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের। এই পদ্ধতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি (federal method) বলা যায়। স্ট্রং ইহাকে একীভূত হওয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি (integration by federation) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ডাইসির অনুসরণে ব্যাখ্যা : অধ্যাপক ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির বর্ণনা করা যাইতে পারে। ডাইসির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি অবস্থার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয় : (ক) পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইবে ; (খ) এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিবে, কিন্তু মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না।[১]

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য ডাইসি-প্রদত্ত উপরি-উক্ত সর্ত দুইটির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম প্রয়োজনীয় অবস্থা হইল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য। ভৌগোলিক সান্নিধ্য ব্যতিরেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য সাধিত হইতে পারে না এবং জাতীয় ঐক্যসাধন না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবও ঘটে না। দ্বিতীয়ত, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়গত এরূপ ঐক্য থাকিবে যে, তাহাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইবে। তৃতীয়ত, জাতীয় ভাবের জন্যই তাহারা জাতীয় ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হইবে—অর্থাৎ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে বিশেষভাবে আকাংক্ষিত হইবে। চতুর্থত, পরস্পরের সহিত মিলনের আকাংক্ষা করিলেও তাহারা মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না—অর্থাৎ মিলিত হওয়ার পরও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাহিবে।

১. "They must desire union but no unity."

এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নবগঠিত জাতীয় রাষ্ট্রে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই প্রকার জাতীয় রাষ্ট্রই যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্যের আকাংক্ষা এবং আপন রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা—এই দুই মনোভাবের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসংগে তাই ডাইসি (Dicey) উক্তি করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইল জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সহিত অংগরাজ্যের অধিকারের সমন্বয়সাধনের রাজনৈতিক উপায়।[১]

এই সমন্বয়সাধনের পদ্ধতি হইল দুই প্রকার সরকারের মধ্যে সংবিধানের সাহায্যে ক্ষমতা-বন্টন করিয়া দেওয়া। যাহা সাধারণ বা জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়; আর যে-সকল বিষয় অংগরাজ্যগুলির স্বার্থের সহিত অধিক জড়িত তাহা অংগরাজ্যগুলির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

হোয়ারার নির্দেশিত সর্ত: আধুনিক লেখকদের মধ্যে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক হোয়ারারও (Prof. K. C. Wheare) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুইটি সর্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন কতকগুলি রাষ্ট্র বা জনসম্প্রদায় কতিপয় বিষয় সম্পর্কে একই সাধারণ সরকারের অধীন সম্মিলিত হইতে চায় এবং অপরাপর বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র আংগিক সরকার সংগঠন করিতে চায় তখনই যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ, ইহারা মিলন চাহিলেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যাইতে চায় না।[২]

ক। মিলিত হইবার আকাংক্ষা: মিলনের প্রেরণা আসে বিভিন্ন উৎস হইতে। হোয়ারারের মতে, বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগের আকাংক্ষা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে কোন-না-কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক একই রাষ্ট্রের অধীনে মিলিত হইবার মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। ইহাদের সকলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে কার্য করিয়াছে।

খ। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার মনোভাব: অপরপক্ষে, কিভাবে মিলনের আকাংক্ষার সংগে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার মনোভাব সৃষ্ট হয় তাহারও একাধিক কারণ থাকিতে পারে। যেমন, আংগিক রাষ্ট্রগুলি যে-স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত নূতন অবস্থায় তাহার অধিকাংশই বজায় রাখিতে চাইতে পারে। আবার রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত থাকিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ব্যবধান স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে। পৃথক জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি

১. "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'state rights'." ... "It is a union without unity."

২. "Communities or States *must desire to be united*, but *not to be unitary*."

করিতে পারে। পৃথক জাতীয় মনোভাবও স্বতন্ত্র থাকিবার প্রেরণা যোগাইতে পারে। ভাষাগত, উদ্ভবগত ও ধর্মগত পার্থক্যের প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। সর্বশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্নতার জন্যও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হিকসের মতে, এই প্রকার স্বাতন্ত্র্যের মনোভাবের জন্যই জনসম্প্রদায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে।[১]

যুক্তরাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা : এই প্রসংগে অধ্যাপক হোয়ারার আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উপযোগী সকল বিষয় থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব না হইতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত নেতৃত্বের। সুতরাং সর্বশেষে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে কি না তাহা নির্ভর করিবে নেতৃত্বের প্রকৃতির উপর।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ও পরিণতি সম্বন্ধে ডাইসির ধারণার সমালোচনা : ডাইসি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য যে শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে কেন্দ্রাভিগামী (centripetal) শক্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করে। এইভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল। অধ্যাপিকা হিকস্ (Ursula K. Hicks) এরূপ পদ্ধতিতে উদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রসমূহকে 'একত্রীকরণের মাধ্যমে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র' (*federation by aggregation*) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, কেন্দ্রাভিগামী শক্তির পরিবর্তে কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তির কার্যের ফলেও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সুশাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী না হওয়ায় অথবা এইরূপ রাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রবল হওয়ায় এইরূপ রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের শাসন-পদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় পন্থাতেই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল—সংবিধান দ্বারা তৎকালীন প্রদেশগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার দ্বারাই কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন করা হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে নাইজেরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের গঠন এইভাবে করা হইয়াছে। হিকসের অনুসরণে এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্র 'বিভক্তীকরণ-পদ্ধতিতে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র' (*federations by disaggregation*) বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।

---

১. "Federal constitutions are adopted in preference to unitary constitutions because of divergence between the social, ethnic, religious or cultural outlook, or between the economic interests of peoples who would in other respects like to share their political life." Ursula K. Hicks

ডাইসি এইভাবে কেন্দ্রাভিগ শক্তির দ্বারা বা বিভক্তীকরণ-পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সহিত পরিচিত ছিলেন না। ফলে ইহার উল্লেখ করেন নাই। বরং যুক্তরাষ্ট্রকে 'এককেন্দ্রিকতার পথে অন্যতম পর্যায়' (a stage on the road to unity) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রই হইল পরিণতি ; যুক্তরাষ্ট্র ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র। যে-সকল রাষ্ট্র বর্তমানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে, পরে তাহারা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিবে—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু 'যখন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হইতেছে তখন আর যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিকতার পথে অন্যতম পর্যায় বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রের গতি এককেন্দ্রিকতার দিকে নহে ; ইহা ক্ষণস্থায়ী অবস্থাও নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই শতাব্দীতেও এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাতে পরিণত হয় নাই। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও এককেন্দ্রিক সরকার গঠিত হয় নাই।

যুক্তরাষ্ট্র ক্ষণস্থায়ী অবস্থা হইতে পারে না, কারণ মানুষ একবার ক্ষমতার আস্বাদ পাইলে সহজে উহা হস্তান্তরিত করিতে চাহে না।[১]

যুক্ত-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায় (Federation and Confederation): ইতিহাসের দিক দিয়া স্ট্রং রাষ্ট্রসমূহের মিলনের যে দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে। এই অন্যান্য পদ্ধতির অন্যতম হইল কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি। চুক্তির ফলে এক রাষ্ট্র-সমবায়ের (Confederation) উদ্ভব হইতে পারে।

রাষ্ট্র-সমবায়ের হল-প্রদত্ত সংজ্ঞা. অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্র-সমবায়ের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন : ইহা হইল 'বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে কতক পরিমাণে তাহাদের কার্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে সম্মত হইয়াছে এরূপ কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়।'[২] অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্র-সমবায় হইল সন্ধির ফলে উদ্ভূত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায় বা সংঘ। এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নূতন এক কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার হস্তে কিছু কিছু শাসনক্ষমতা অর্পণ করে। নব-সংগঠিত কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া। প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁহার নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশমত কেন্দ্রীয় সংগঠনে ভোটদান ইত্যাদি কার্য করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্র-সমবায়ের নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না : সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের আইনগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে বলিয়া রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের ফলে কোন নূতন রাষ্ট্রের

১ "... men who have once tasted power will not, without conflict, surrender it." Laski

২. "A confederation is a union of ... states which consent to forego *permanently* a part of their liberty for certain specific objects."

উদ্ভব হয় না। হল বলিয়াছেন, তাহারা তাহাদের কার্যের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে যে চিরকালের জন্য বিসর্জন দেয় তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্র-সমবায়ে সমবায়ভুক্ত থাকাকালীন কিছু পরিমাণে কার্যের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় মাত্র। যে-কোন রাষ্ট্র যে-কোন সময় রাষ্ট্র-সমবায় পরিত্যাগ করিতে পারে। ইহাতে আইন-সংগত প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিতে পারা যায় না। সমবায়ের বাহিরে আসিলেই তাহারা কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং তাঁহারা কার্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দেয় না, অস্থায়ীভাবে দেয় মাত্র।

রাষ্ট্র-সমবায়ের উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক রাষ্ট্র-সমবায় এবং সাম্প্রতিক কালের উত্তর এ্যাটলান্টিক সন্ধি-সমবায় (NATO), দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সন্ধি-সমবায় (SEATO) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার সমন্বিত দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রকেও রাষ্ট্র-সমবায় বলিয়া অভিহিত করা হয়; অনেকে আবার জাতিসংঘ (League of Nations) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (UN) ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকেও 'দুর্বল' রাষ্ট্র-সমবায় বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।[১]

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে তুলনা : যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র-সমবায়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে (ক) যুক্তরাষ্ট্রের ফলে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ের গঠনের ফলে কোন নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। (খ) রাষ্ট্র-সমবায়ে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয় জাতীয় ঐক্যসাধন বা সুশাসনের জন্য।

(গ) রাষ্ট্র-সমবায় চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয়; ইহা কোনরূপ আইনসংগত সংস্থা নহে। চুক্তির মর্যাদা রক্ষা হইবে কি না তাহা একরূপ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে বিভিন্ন সমবায়ী রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত—ইহা আইনসংগত সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মর্যাদা অংগরাজ্যগুলির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নহে। সংবিধানই চরম আইন। কেন্দ্রীয় বা অংগরাজ্যগুলির কোন সরকার ইহাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারে না।

(ঘ) রাষ্ট্র-সমবায় কোন আইনসংগত সংস্থা নহে বলিয়া যে-কোন সমবায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে যে-কোন সময় ইহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা সম্পূর্ণ আইনানুমোদিত। কিন্তু একমাত্র সোবিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অংগরাজ্যের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা আইনানুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, অংগরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিবার কোন অধিকার নাই।

১. "A weak federation is often called a confederation .... Some look upon the League of Nations and the United Nations as weak confederations." Ferguson and McHenry : *The American System of Government*

(৬) সমবায়ী রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র-সমবায় পরিত্যাগ করিবার অধিকার থাকায় রাষ্ট্র-সমবায় সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির এই অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় স্থায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of a Federation): যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হইবে :

(১) **শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা-বণ্টন :** আঞ্চলিক ক্ষমতা-বণ্টনের ভিত্তিতে এক-কেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র দেশের সরকার বা কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য বা দেশের অংশগুলির সরকারের মধ্যে ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারাই বণ্টিত হয়।

ক্ষমতার আদি বণ্টন : এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করে বলিয়া সংবিধান দ্বারা শাসনক্ষমতার এইরূপ বণ্টনকে মূল বা আদি বণ্টন (original distribution) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(২) **সংবিধানের প্রাধান্য :** যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল সংবিধানের প্রাধান্য। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভাই সার্বভৌম ; ইহারই প্রাধান্য শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। কেন্দ্রীয় বা কোন অংগরাজ্যের আইনসভা ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বণ্টন এবং উভয় প্রকার সরকারের কার্যসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যদি ক্ষমতা-বণ্টন বা কার্যসীমার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় তবে শাসনতন্ত্র-নির্দিষ্ট বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসারেই উহা সম্পাদন করা হয়। সাধারণত এই পরিবর্তন-পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলি উভয়েরই আইনসভা অংশগ্রহণ করে। এককভাবে কেন্দ্র কোন পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না।

সংবিধানের প্রাধান্যের তিনটি মূলসূত্র : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যের তিনটি প্রধান সূত্রের সন্ধান দেওয়া যাইতে পারে : (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত হইবে। লিখিত না হইলে উহাতে অনির্দিষ্টতা থাকিয়া যাইবে। অনির্দিষ্ট সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অনুকূল নহে। একরূপ সান্ধর ভিত্তিতেই রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। সংবিধান হইল এই সন্ধিপত্র। ইহা নির্দিষ্ট হইবে এবং এই কারণেই হইবে লিখিত। (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে। সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে আইনসভা ইহার পরিবর্তনসাধন করিতে পারিবে না—সংবিধান পরিবর্তনের জন্য এক বিশেষ জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। উপরন্তু বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রকৃতি সন্ধিপত্রের ন্যায় বলিয়া অন্তত সংবিধানের ক্ষমতা-বণ্টনসংক্রান্ত অংশের পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি উভয়েরই সম্মতি থাকা প্রয়োজন।

অধ্যাপক হোয়্যারের (Prof. K. C. Wheare) মতে, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বলিতে এককভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার সংবিধান পরিবর্তনের এই অক্ষমতাই বুঝায়।[১]

(গ) যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক আইনসভাই অ-সার্বভৌম আইনসভা (non-sovereign law-making body), কারণ প্রাধান্যের সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র সংবিধানে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই চরম এবং প্রত্যেক সরকার সংবিধানকে মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়া বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বা অন্য প্রকার মতবিরোধের উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যাখ্যার ভার 'সাধারণত' ন্যস্ত করা হয় একটি নিরপেক্ষ আদালতের উপর।[২] এই আদালতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) বলে। ইহার কার্য হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ইহার স্বরূপ বজায় রাখা। এইজন্য ইহাকে 'শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক' (interpreter and guardian of the constitution) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ব্যাখ্যা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহ মানিয়া লইয়া থাকে।

দ্বৈত-যুক্তরাষ্ট্র ও সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অভিন্ন আকৃতির নহে, ইহাতে বিশেষ প্রকারভেদ (variation) লক্ষ্য করা যায়। প্রকারভেদের কারণ হইল ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতিতে পার্থক্য, সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতিতে পার্থক্য এবং সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তার তারতম্য। ইহা ছাড়া বর্তমানে 'দ্বৈত-যুক্তরাষ্ট্র' (dualistic federalism) এবং 'সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রে'র (co-operative federalism) মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। দ্বৈত-যুক্তরাষ্ট্র বলিতে বুঝায় আগেকার দিনের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা। বর্তমান উত্তরোত্তর বর্ধমান রাষ্ট্রকার্যের দিনে অংগরাজ্যগুলি তাহাদের অ-পর্যাপ্ত রাজস্ব লইয়া আর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিতেছে না। ফলে তাহারা ক্রমশই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে এবং স্বাভাবিকভাবে তাহাদিগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের সহিত অধীনতামূলক সহযোগিতা করিতে হইতেছে। ফলে যে প্রকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে বলা হয় সহযোগিতামূলক বা সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র। বলা যায়, বর্তমান গতি হইল সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।[৩]

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণ: শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত। (১) নিজ নিজ সত্তা বিসর্জন না দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যাহাতে পরস্পরের

১. "Supremacy of the constitution implies that central legislature's unilateral power to amend it is either negligible or non-existent."

২. 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, কারণ সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধানের ব্যাখ্যার চরম ভার আদালতের উপর ন্যস্ত নহে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাই এই কার্য করিয়া থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ঐ একই প্রকারের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কেন্দ্রীয় আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আদালতের নাই; উহা ন্যস্ত করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম নামক সংস্থার হস্তে।

৩. "Everywhere, in varying degrees, the old 'dualistic' federalism has given way to 'co-operative' federalism." F. G. Carnell in *Federalism and Economic Growth*

সহিত মিলিত হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

গেটেল বলেন, একমাত্র প্রতিনিধিত্ব ছাড়া গণতন্ত্রকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর কার্যকর করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ন্যায় আর কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই।

---

২) মিলনই শক্তির প্রতীক—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সাধারণ সত্যটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়াও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শক্তিসঞ্চয়—এই দুই রাজনৈতিক প্রকৃতি বা আকাংক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধিত হইয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

(৩) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ প্রশস্ত হইবার আরও কারণ হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেকগুলি শাসনযন্ত্র থাকায় বহুসংখ্যক লোক শাসন-কার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, ফলে সাধারণ লোকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া উঠে। কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় বিশেষীকরণের (specialisation) ফলে শাসনকার্যের উৎকর্ষও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় সংহতিসাধন করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। একই জাতীয় জনসমাজের (Nationality) অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একই জাতিতে (Nation) পরিণত হইতে পারে। গিলক্রিস্টের মতে, এরূপ ঘটিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী পূর্বতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদার লাঘব হয়, বরং মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটিয়াই থাকে। "ভার্জিনিয়া বা টেক্সাসের ন্যায় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া থাকা অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এক বৃহৎ জাতির সভ্যপদভুক্ত হওয়া অনেক বেশী মর্যাদার পরিচায়ক।"

(৫) লর্ড ব্রাইস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি গুণের নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রাইস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা লইয়া এরূপভাবে পরীক্ষা চালানো যায়, যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র দেশব্যাপী করা বিশেষ বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এরূপ বিশেষভাবে করা যাইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সম্ভবপর নহে।

উপসংহার : ইতিমধ্যেই উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম গুণের পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, বর্তমান যুগের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রই প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন শেষ হইয়াছে, অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাংক্ষা সক্রিয় রাজনৈতিক

শক্তি হিসাবে দিন দিন পরিব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকের মতে, একেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কারণ একমাত্র এই শাসন-ব্যবস্থাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া শক্তিশালী হইবার সুযোগ প্রদান করে।

ত্রুটি : যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিতেই কতকগুলি এরূপ বিশেষ দুর্বলতা রহিয়াছে যাহার জন্য উপরি-উক্ত উৎকর্ষ সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় না। (ক) তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল। এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সরল ও নির্দিষ্ট। সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় শাসনকার্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতা-বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি উভয়েরই শাসনকার্যে বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক সন্ধি, সর্তাদি পালন ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদি পালন সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু অংগরাজ্যগুলি সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করিয়া সন্ধি ইত্যাদি পালনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। ইহাতে জাতির আন্তর্জাতিক মর্যাদার লাঘব ঘটে। অপরদিকে আবার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অংগ-রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদবিসংবাদ এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে যে, জাতির আভ্যন্তরীণ শক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার হানি না ঘটিয়া পারে না।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, জটিল ও মন্থরগতি বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। একটির পরিবর্তে বহু শাসনযন্ত্র থাকায় ব্যয়বাহুল্য দেখা দেয় এবং ক্ষমতা-বণ্টনের জন্য সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা জটিল ও মন্থরগতি হইয়া পড়ে।[১] শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারও কঠিন হইয়া পড়ে।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয় যে, ইহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে একই বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরস্পর বিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে বিভিন্ন অংগরাজ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন বিশেষ কঠিন কার্য হইয়া পড়ে এবং নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগের আশংকা সর্বদা বিদ্যমান থাকে—এমনকি বিদ্রোহের অভ্যুত্থানও ঘটিতে পারে।

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ হইল দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, অথচ বর্তমান দিনের গতিশীল সমাজে সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তাই বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান শুধু যে প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে তাহাই নহে, ইহা বিপজ্জনক বটে।

১. "It (federalism) is financially expensive, since there is much duplication of administrative machinery and procedure." Herman Finer

সংবিধান-অনুমোদিত পদ্ধতিতে সংবিধানের সংশোধনে অসমর্থ হইলে কোন অংগরাজ্য, কোন স্বার্থ বা কোন রাজনৈতিক দল বিদ্রোহের সূচনা করিতে পারে। এই বিদ্রোহ পরিশেষে বিশেষ গুরুতর গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এইজন্য গেটেল বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ (Centralising Tendencies in Modern Federations and Prospects of Federalism): দেখা গিয়াছে, সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রই আজিকার দিনের গতি (৪১০ পৃষ্ঠা)। ফলে বর্তমানে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও মর্যাদা অতি দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। তুলনায় আংগিক সরকারগুলি ক্রমশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িতেছে। ফলে সন্দেহ দানা বাঁধিতেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

কেন্দ্রিকতার সম্প্রসারণের কারণ: কেন্দ্রিকতার সম্প্রসারণের পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল যুদ্ধ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, আর্থিক সংকট, বৃহৎ শিল্প ও বৃহদায়তনে উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যাদির প্রসার।

(১) যুদ্ধ: বর্তমান যুগের সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের সমস্ত অর্থবল, জনবল ও আর্থিক সম্পদকে দ্রুতগতিতে নিয়োজিত করিতে হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের ভীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় অন্যতম শত্রু। লিপ্‌সনের (L. Lipson) ভাষায় বলা যায়, গত যুদ্ধের ফলে ক্ষতবিক্ষত এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ে ভীত-শংকিত পৃথিবীর বর্তমান বিশৃংখলাপূর্ণ রাষ্ট্রনীতির সহিত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অসংগতিপূর্ণ।"[১]

(২) আর্থিক সংকট: আর্থিক সংকটের ফলেও ব্যাপক বেকারাবস্থা, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি সমস্যার উদ্ভব হয় যাহার সমাধান করা আঞ্চলিক সরকারগুলির শক্তি ও সামর্থ্যের বাহিরে। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রণী হইতে হয় এবং অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়।

(৩) শিল্প ও পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন: পরিবহণ-ব্যবস্থার দ্রুতোন্নতি এবং বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিতে সহায়তা

১. "... dispersion of powers is incompatible with the troubled politics of a world that is scarred by past wars and scared of new ones." L. Lipson: *The Great Issues of Politics*

করিয়াছে। বহু শিল্পই এখন আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র দেশব্যাপী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়াছে এবং বহু অর্থনৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৪) **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা**: বর্তমান সময়ে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের নীতিও কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁককে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় সকল দেশেই এই মতবাদ স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে যে, রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিবে—অন্তত জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। সুতরাং শিক্ষার বিস্তার, চিকিৎসার ব্যবস্থা, পীড়িতাবস্থায়, বার্ধক্যে ও অসহায় অবস্থায় সাহায্যপ্রদান প্রভৃতি ধরনের কার্য আজ রাষ্ট্রকে করিতে হয়। এই সকল জনকল্যাণকর কার্য ব্যয়বহুল এবং আঞ্চলিক সরকারের আর্থিক সংগতির বাহিরে। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায় এবং ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও প্রসারিত হয়

(৫) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা**: এই জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের দর্শন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বর্তমান দিনের পরিকল্পনা-প্রবণতা। লোকে আজ বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে যে, পরিকল্পনা ব্যতীত জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়—অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ (economic growth) সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য বা বিভেদ সংরক্ষণ করিয়া সমাজ-জীবনের ঐক্যের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অল্পবিস্তর দুর্বল থাকিতে বাধ্য করে বলিয়া উহা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণের পরিপন্থী।[১] সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অন্তত স্বল্পোন্নত দেশগুলির (under-developed countries) উপযোগী নয়।

বামপন্থী লেখকদের দৃষ্টিকোণ. বামপন্থী লেখকদের মতে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইয়াছে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমপরিণতির ফলে। ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে মূলধন মুষ্টিমেয়ের হস্তে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জীভূত হইয়াছে এবং প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বৃহদাকারের একচেটিয়া কারবার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এইসব একচেটিয়া ব্যবসায় মাত্র দেশের সর্বত্রই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে নাই, অন্যান্য দেশেও আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করিতেছে। দেশের অভ্যন্তরেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাপক বেকারাবস্থা, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি সমস্যা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল বলিয়া অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। তাই তাহারা চায় ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অবসান। এই অবস্থায় ধনতন্ত্রের পক্ষে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা অপরিহার্য। রাষ্ট্র একদিকে যেমন

১. "...federal states and welfare states do not go well together. National economic planning demands centralisation, which precisely what federalism seeks to prevent." *Federalism and Economic Growth*

বহির্বাজারে পণ্য বিক্রয় সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করে, অপরদিকে তেমনি বলপ্রয়োগ এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কিছু কিছু সুযোগসুবিধা প্রদান করিয়া জনসাধারণের আন্দোলনকে দমন করিতে চায়।

সুতরাং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আকার বজায় থাকিলেও স্বরূপ বজায় থাকে না—আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অংগরাজ্যের অধিকার (State Rights) কেন্দ্রিকতার প্রবল শক্তির চাপে নিঃশেষ হইয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ : যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে একপ্রকার কেন্দ্রীয় শক্তির বৃদ্ধি দেখিয়া অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কোনপ্রকার ভবিষ্যৎ নাই। অপরদিকে অধ্যাপক হোয়ারার প্রমুখ লেখক যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা নৈরাশ্যজনক অভিমত প্রকাশ করেন না। ইঁহারা বলেন, যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি সম্প্রসারিত হইয়াছে তেমনি আবার যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির গুরুত্ব, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাংক্ষাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।[১] ইহা ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগত, উদ্ভব বা বংশগত ও ধর্মগত বিভিন্নতা এবং স্বতন্ত্র সরকার হিসাবে পৃথক সত্তা সংরক্ষণের আকাংক্ষা এখনও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিতে সহায়তা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুইবেক প্রদেশ (Quebec), পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে এতই সচেতন যে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাহে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাম্য কি না : পরিশেষে দেখা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় কাম্য কি না? ইহার উত্তরে বলা যায়, বর্তমানে যে-সকল জটিল ও পরস্পর-সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাদের সমাধান শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব, কতকগুলি ক্ষেত্রে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু আবার বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের (Nationalities) আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির বিকাশের স্বাধীনতা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগসুবিধা সংরক্ষিত করিতে হইবে। ঐক্যের সহিত বিভিন্নতার সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। একমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তিশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইহা সম্ভব। সুতরাং এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থাই কাম্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সফলতার সর্ত : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কাম্য হইলেও ইহার সাফল্য বিশেষভাবে সর্তাধীন। বলা হইয়াছে যে, মাত্র এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থাই

১. "... there has been a strong increase in the sense of importance, in the self-consciousness and self-assertiveness of the regional governments. K. C. Wheare : *Federal Government*

ঐক্যের সহিত বিভিন্নতার সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারে। ইহার জন্য, কিন্তু প্রয়োজন হইল সামাজিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তি প্রস্তুত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীলতা (flexibility) আসিবে; ফলে উহা সময়ের সহিত সংগতিসাধনে সমর্থ হইয়া সফলতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

রাজনৈতিক আদর্শসমূহের উপলব্ধি ও সমন্বয়সাধন: রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে যুক্তরাষ্ট্রের সফলতা অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সহযোগিতা—এই চারিটি আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি ও সার্থক সমন্বয়সাধনের উপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এই তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল যে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর, প্রত্যেক অঞ্চলেরই স্বাধীনভাবে সম্প্রসারণের অধিকার আছে; কিন্তু একক সম্প্রসারণ সম্ভব নয় বলিয়া প্রয়োজন হইল পারস্পরিক সহযোগিতার (fraternity)। সহযোগিতা তখনই পাওয়া যায়—যখন কোন ব্যবস্থা সাম্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক কাম্য সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন হইল সাম্যের নীতিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। সকল অঞ্চল, সকল অংগরাজ্য যখন উপলব্ধি করিতে পারিবে কেন্দ্রের আচরণে কোনরূপ বৈষম্য নাই, তাহাদের সকলেরই সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত সমানাধিকার আছে—তখন তাহারা সহযোগিতার মনোভাব লইয়াই অগ্রসর হইবে। ফলে তখন আর যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে না।

বিকেন্দ্রীকরণ—প্রকৃতি ও সমস্যা (Decentralisation—Nature and Problems): গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে মাত্র এককেন্দ্রিক সরকারের নহে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরও প্রবল ঝোঁক হইল কেন্দ্রিকতার দিকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগ্রহী হইলেও, বাস্তবে দেখা যায় যে এই রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করিতেই উৎসাহী। ইহার ফলে আঞ্চলিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, স্থানীয় সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার পায় না, সর্বোপরি বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি অবহেলিত হয়।

বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কোন একটি বিশেষ পথ বা নীতি দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজ তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ইহা কতটা সহযোগিতা ও সমন্বয়ের নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার উপর নির্ভর করে। স্থানীয় ভিত্তিতে ক্ষমতা বিভাজন, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সমস্যা সম্পর্কে জনগণের প্রত্যক্ষ সচেতনতা প্রভৃতির মাধ্যমেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়িয়া উঠিতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য: বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য স্থানীয় স্তরে শাসনকার্যের ব্যবস্থা, স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, স্থানীয় সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই ব্যবস্থার উদ্ভব।

অর্থ ও তাৎপর্য: বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ ও তাৎপর্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: বিকেন্দ্রীকরণ হইল: (১) এমন এক পদ্ধতি যাহা দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভক্ত। (২) ইহা এমন এক ব্যবস্থা যাহা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের—অর্থাৎ শাসনকার্যে স্থানীয় ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের—পথ প্রশস্ত করে। ইহা এমন এক তত্ত্ব যাহা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিপরীত পন্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করে। জন স্টুয়ার্ট মিল, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, লিপসন প্রমুখ চিন্তাবিদ বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও ইহার সমস্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ: এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় শাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা পৃথকভাবে দেখা দেয়। এক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, জাতীয় সরকার নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টি করিয়া ইহাদের হস্তে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে। এইরূপ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) বলিয়া অভিহিত। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা থাকিলেও আঞ্চলিক সরকারসমূহের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এই বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সরকারের ইচ্ছা ও বোধের দ্বারা পরিচালিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ: যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে বা শাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা ভিন্নভাবে দেখা দেয়। সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক তথা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রপ্রবণতা (কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ) দ্বারা চিহ্নিত। স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রীকরণের প্রতিবাদ হিসাবেই দেখা দেয়।

বিকেন্দ্রীকরণ অতি-কেন্দ্রীকরণের কুফল বা বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে শাসন-ব্যবস্থাকে মুক্ত করে।

বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা: বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: (ক) রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর প্রকৃতি এক নহে। কতকগুলি সমস্যা জাতীয় সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হয় এবং জাতীয় সরকার এই সমস্যাগুলি সমাধানে ব্রতী হইতে পারে। স্থানীয় স্তরের সমস্যাগুলি বিচিত্র ধরনের এবং জটিল বলিয়া এই সমস্যাগুলিকে বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থার (decentralised body) হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যতটা থাকে কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের ততটা থাকে না।

শাসনকার্যের সফলতার জন্যই স্থানীয় সমস্যাগুলির সহিত স্থানীয় অধিবাসী ও সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট করা উচিত।

(খ) জাতীয় সরকার জাতীয় সমস্যার গুরুভারে জর্জরিত থাকার ফলে তাহাদের পক্ষে স্থানীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। ইহার ফলে শুধু বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হয় না, জাতীয় স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং জাতীয় সরকারের কর্মভার লঘু করার প্রয়োজনেও বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

কেন্দ্র এবং স্থানীয় সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজনেও এই কর্মবিভাগ (Division of Functions) সুবিধাজনক।

(গ) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হস্তে থাকে। নাগরিক চেতনা, শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্যতা প্রভৃতি গুণ জনগণের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় যদি না ইহাদের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে-সমস্ত স্থানীয় সংস্থা গড়িয়া উঠে সেগুলিকে নাগরিকতার 'শিক্ষাকেন্দ্র' বলিলে অত্যুক্তি হয় না প্রকৃতপক্ষে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিক গুণের উৎকর্ষবৃদ্ধির সহায়ক।

মিলের যুক্তি : জন স্টুয়ার্ট মিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি অবতারণা করেন বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে সেই সমস্ত যুক্তিই কার্যকর। স্থানীয় সমস্যার সমাধানে, শাসন ব্যবস্থার সুপরিচালনার প্রয়োজনে এবং নাগরিক গুণের উন্মেষে শাসন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এক উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।[1]

ল্যাস্কির যুক্তি অধ্যাপক ল্যাস্কিও বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেন। ল্যাস্কির মতে, (ক) বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা সমষ্টিগত দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে ("It creates a corporate sense of responsibility. It is a training in self-government.")। এই ব্যবস্থা তাহাদেরই হাতে ক্ষমতা অর্পণের কথা বলে যাহারা শাসনকার্যের ফলাফলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। স্থানীয় সমস্যাবলী ইহাদেরই স্পর্শ করে, স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ইহারাই অধিক সচেতন।[2]

(খ) বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জনগণ দ্বারা শাসনের অন্যতম সত্ত। সকল ক্ষমতা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া স্থানীয় সমস্যা ও প্রশ্ন স্থানীয় সংস্থা দ্বারাই বিবেচিত হওয়া উচিত। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ উহার অপব্যবহারের পথ প্রশস্ত করা। বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিয়া জনগণের অধিকার ও দায়িত্ববোধকে প্রসারিত করে।

(গ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ ক্ষমতাকে সৃষ্টিধর্মী করিয়া তোলা। ইহার তাৎপর্য ক্ষমতার ব্যবহার ও সীমা সম্পর্কে শাসন-কর্তৃপক্ষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ইহা পারস্পরিক পরামর্শ, সহযোগিতা, উদ্যোগ প্রভৃতির পথে শাসন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। শাসনক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষানিরীক্ষা, নীতি-নির্ধারণের

১. *Representative Government*

২. *A Grammar of Politics*

ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতার নিদর্শন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পথেই ইহা সম্ভব।

(ঘ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, দুর্নীতি ও অন্যান্য বিপদ হইতে শাসন-ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থা শাসনকার্যের সাফল্যের জন্য জনগণের সদা-সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টির প্রকাশ ঘটায়।

(ঙ) পরিশেষে, ল্যাস্কি বিকেন্দ্রীকরণের শিক্ষাগত মূল্যকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টির পটভূমিকায় এই ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।[১]

বিকেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Decentralisation): বিকেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। রাজনৈতিক স্তরে বিকেন্দ্রীকরণ বলিতে বুঝায় সরকারের নূতন বিভাগ ও সংস্থা সৃষ্টি করিয়া ইহাদের হাতে নির্দিষ্ট কতকগুলি দায়িত্ব অর্পণ।

ভৌগোলিক (geographical), কর্মগত (functional) এবং অন্যান্যভাবে শাসনক্ষমতা বণ্টনের নীতিকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ।

আঞ্চলিক সমস্যা ও সুবিধা, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কার্যপরিচালনায় বিশেষ অভিজ্ঞতা, বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বিশেষীকৃত (specialised) সংস্থা সৃষ্টি বিকেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন পন্থা।

বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত সমস্যা (Problems of Decentralisation): বিকেন্দ্রীকরণের বহুবিধ সমস্যা আছে। (১) কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে কোন বিষয় পরিচালিত হইলে সমস্যাবলীর প্রতি যেমন একদৃষ্টি রাখা যায় এবং সমাধানের একটি সুষ্ঠু উপায় বাহির করা সম্ভব হয়, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সমস্যাবলীর সমাধান এত সহজে করা সম্ভব হয়। বিকেন্দ্রীকরণ বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়। স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় সমস্যাবলী বিচিত্র, জটিল ও ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে। খুব সহজে সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হয় না।

(২) বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সমস্যা বৃহত্তর তথা জাতীয় সমস্যা অপেক্ষা প্রাধান্য পায়। জাতীয় সমস্যার সমাধানে যে ব্যাপক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাসনসংক্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক স্থানীয় সংস্থাগুলিতে সেই ধরনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব দেখা যায়। দক্ষ ও প্রকৃত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাসকের অভাব বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া তুলে। কার্যপরিচালনা ও নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ অসুবিধাজনক।

১. "Local government is educative in perhaps a higher degree, at least contingently, than any other part of government. ... there is no other way of bringing the mass of citizens into intimate contact with persons responsible for decisions." Laski

(৩) বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় দলাদলি, রাজনীতি প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেয়; দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ক্ষুদ্র স্বার্থ উন্নতি ও প্রসারকার্যের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এই ব্যবস্থায় আবেগ বা উত্তেজনার প্রাধান্য থাকে। স্বভাবতই স্থানীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যকিছু বড় হইয়া উঠিতে পারে না।

(৪) শুধুমাত্র প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য থাকিলেই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা সফল হয় না, সেই সংগে স্থানীয় সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিও বিবেচনা করা দরকার। আর্থিক স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে এই সমস্ত সংস্থার পক্ষে কাজ চালানো সম্ভবপর হয় না।

(৫) বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়, তাহা সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন, গঠন-পদ্ধতির দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সুষ্ঠু যোগাযোগের বা সমন্বয়ের অভাব এবং অন্যান্য দুর্বলতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে পংগু করিয়া তুলে।

(৬) সর্বশেষে বলা যায়, বিকেন্দ্রীকরণের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হইল স্থানীয় সরকারের সীমানা নির্ধারণের সমস্যা।[১] বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জনকল্যাণের আদর্শ, ভৌগোলিক সমস্যাসমূহ, যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি, সর্বোপরি জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকারের সীমানা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অনেক গ্রাম ও সহরের সীমানা যতই সংকুচিত হইতেছে; সমস্যাসমূহ ততই আর স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না, সমস্যাবলী জাতীয় রূপ পাইতেছে। সুতরাং মূল সমস্যা হইল স্থানীয় ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সংগতি রাখা, উভয়ের উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন। স্থানীয় সরকারসমূহের নিকট পরিচালনভার অর্পণ করিয়াই বিকেন্দ্রীকরণের সাফল্য নিশ্চিত করা যায় না। কিভাবে স্থানীয় উদ্যোগের সহিত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয়সাধন করা যায় তাহার উপায় স্থির করার উপরই নির্ভর করে বিকেন্দ্রীকরণের সাফল্য।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ: সোবিয়েত শাসনতন্ত্র বা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (Democratic Centralisation) নীতিগ্রহণের মাধ্যমে একাধারে জাতীয় স্বার্থ ও স্থানীয় উদ্যোগের সার্থক সমন্বয় করা হইয়াছে। এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হইল মূল সমস্যাগুলির সম্পর্কে, সমগ্র দেশের পরিকল্পনার পরিচালনা প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রিকতা থাকিবে। কারণ, ইহা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তোলা যায় না। অপরদিকে অঞ্চলগুলির সক্রিয় উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য ও কৃষ্টির প্রসারসাধন সম্ভব নয়।[২]

১. "No problem in local government is more difficult than the delimitation of the areas of local government." Laski : *A Grammar of Politics*

২. A. Y. Vishinsky : *The Law of the Soviet State*

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লক্ষ্য হইল জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এই দুই দেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এত বেশী (কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে) যে স্থানীয় সরকারগুলির কোন প্রাধান্য নাই বলিলেই চলে—স্থানীয় সংস্থাগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের নীতি ও নিয়ম অনুসারেই কাজ করে।[১]

পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক হোয়ারার এই কেন্দ্রীকরণের কারণ হিসাবে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধারণার বিকাশ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণের মতে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের কেন্দ্রীকরণের মূলে শুধুমাত্র এই সমস্ত কারণই কাজ করে না, কোন বিশেষ স্বার্থ ও শক্তির প্রাধান্য বজায় রাখাই এই সমস্ত রাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণের কারণ। বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি এই সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও অলীক বলিয়া প্রমাণিত হয়। একচেটিয়া কারবারী মুনাফালাভকারীদের স্বার্থ রক্ষা করাই এই সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য।[২]

অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি ও লক্ষ্যকে কাজে লাগানো, নিপীড়িত জনগণের—কৃষক, শ্রমিক ও সংগ্রামী মানুষের—ঐক্যবোধকে সুপরিচালনা করা, শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির বিনাশসাধন করা এবং সর্বোপরি গণচেতনাকে জাতীয় চেতনার পথে পরিচালিত করা। কেন্দ্রিকতার সংগে সংগে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তাও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকৃত। তাৎপর্য হইল কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সুষ্ঠু সহাবস্থান। রাষ্ট্র-পরিচালনার সংস্থাগুলি গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, নিম্নতন সংস্থাগুলির উর্ধ্বতন-সংস্থার নিকট দায়িত্বশীলতা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উদ্যোগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, কেন্দ্র এবং স্থানীয় সরকারগুলির সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্য—এই সকল বিষয়ই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তাৎপর্যকে প্রকাশ করে। জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সমানাধিকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি আস্থার প্রকাশ।

ভারতে বিকেন্দ্রীকরণ: ভারতে বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থা রাখিয়া এখানে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলা হইয়াছে। রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক

১. Leonard Schapiro : *The Government and Politics of the Soviet Union*

২. D. N. Sen : *From Raj to Swaraj*

নীতিতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গঠনের কথা বলা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের (৪০ অনুচ্ছেদ)। পৌর অঞ্চলে পৌরসভা (Corporation), পৌর প্রতিষ্ঠান (Municipality) প্রভৃতির মাধ্যমে শাসন-পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ও কর্মপ্রণালীর ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। অগণতান্ত্রিক শাসন-পরিচালনা, দুর্নীতি, ক্ষমতার রাজনীতি, আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের অভাব, অতিরিক্ত সরকারী হস্তক্ষেপ স্বায়ত্তশাসনের তথা বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়াছে। কেন্দ্র ও স্থানীয় সমস্তাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব ও দক্ষতার মধ্যে কেন্দ্র ও স্থানীয় সরকারগুলির বিপুল পার্থক্য, স্থানীয় সংস্থাগুলির অতিরিক্ত কেন্দ্র-মুখাপেক্ষী মনোভাবও ভারতে সার্থক বিকেন্দ্রীকরণের ব্যর্থতার কারণ।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. সরকারী ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের প্রকৃতিই এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি।

২. সংবিধান অনুসারে সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকারের অস্তিত্বই এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সূচক।

৩. যুক্তরাষ্ট্র একরূপ দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা। ইহাতে সমগ্র দেশে দুই ধরনের সরকার থাকে: (ক) একটি সমগ্র দেশের সরকার, (খ) দেশের বিভিন্ন অংশের জন্য কয়েকটি আঞ্চলিক সরকার।

৪. যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব কেন্দ্রাভিগামী বা কেন্দ্রাতিগ শক্তির ফলে হইতে পারে। অর্থাৎ, পাশাপাশি কয়েকটি রাষ্ট্র মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্র গড়িতে পারে, অথবা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য তিনটি: (ক) সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, (খ) সংবিধানের প্রাধান্য এবং (গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

৬. এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্যসমন্বিত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী।

৭. যেখানে জাতিগত ও কৃষ্টিগত বিভিন্নতা, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব অথচ রাষ্ট্রকে বৃহৎ ও শক্তিশালী করিবার ইচ্ছা বর্তমান সেখানে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনীয়।

৮. আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের গতি হইল শক্তিশালী কেন্দ্রের দিকে।

৯. যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের সর্ত হইল সার্থকভাবে ঐক্যের সহিত বিভিন্নতার সামঞ্জস্যবিধান। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল অর্থনৈতিক সাম্য ও শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা।

১০. যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, রাষ্ট্র-সমবায়ের ফলে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্রই থাকিয়াই যায়।

অনুশীলনী

1. Distinguish between Federal Government and Unitary Government Point out the advantages and disadvantages of the Federal form of Government.

[যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাগুণ কি কি ?] (৪০১-০২, ৪০৩, ৪০৯-১০ এবং ৪১০-১৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the chief features of Federation. Under what conditions is Federation necessary and desirable ?

[যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ও কাম্য ?] (৪০৩, ৪০৯-১০ এবং ৪১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the nature and characteristics of a Federation.

[যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।] (৪০৩, ৪০৯-১০ পৃষ্ঠা)

4. "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state right." Explain the nature of federation in the light of the above statement.

["যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতেছে জাতীয় ঐক্যের সহিত অংগরাজ্যের অধিকারের সমন্বয়সাধনের একটি রাজনৈতিক কৌশল।" উপরি-উক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।] (৪০১, ৪০৩-০৭ পৃষ্ঠা)

5. Discuss in brief the main reasons behind the centralising tendencies in modern federations.

[আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলির পর্যালোচনা কর।] (৪১৩-১৫ পৃষ্ঠা)

6. What are the conditions for the success of a Federal form of Government ? How far do they exist in India ?

[যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের সর্তাবলী কি কি ? ভারতে উহাদের অস্তিত্ব কতদূর লক্ষ্য করা যায়।]

[ইংগিত : বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর গণতন্ত্র প্রবর্তন করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, জাতীয় ভাব, মিলনের স্পৃহা অথচ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা—এই কয়টি অবস্থার অস্তিত্ব থাকিলেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিয়া অধ্যাপক হোয়ায়ার বলিয়াছেন, কতকগুলি রাষ্ট্র বা জনসম্প্রদায় যখন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সাধারণ সরকারের অধীন সংগঠিত করিতে চায় এবং অপরাপর বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র আংশিক সরকার গঠন করিতে চায় তখনই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেও সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন হইল উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধনের। ইহা ছাড়া সময়ের সহিত সংগতিসাধনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তনশীল করিয়া তোলাও প্রয়োজন। এই দুই কারণেই প্রয়োজন হইল সামাজিক সম্পর্ককে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। রাজনৈতিক দিক হইতে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য (ক) অধিকার, (খ) স্বাধীনতা, (গ) সাম্য ও (ঘ) সহযোগিতা—এই চারিটি আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি ও সার্থক সমন্বয়সাধনের উপর নির্ভরশীল। কারণ, এই কয়টি সর্ত পূরিত হইলে তবেই বিভিন্ন অংগরাজ্য সহযোগিতার মনোভাব লইয়া জাতীয় স্বার্থসাধনের পথে চলিতে পারে। অন্যথায় তাহারা সংকীর্ণ আঞ্চলিক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হইয়া সেইমতই কার্য করিবে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সফলতার সকল সর্তই বিদ্যমান বলা চলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ভাষাভাষী ও স্বার্থসম্পন্ন হইলেও ভারতবাসী একজাতি। কিন্তু অধিকার স্বাধীনতা প্রভৃতি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ করিয়া সাম্যের আদর্শ সুপরিস্ফুট না হওয়ায় জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থসমূহের পূর্ণ সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় নাই। এইজন্যই সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে জাতীয় সংহতিসাধনের (national integration)। সুষ্ঠুভাবে এই সংহতিসাধন সম্ভব না হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা বলা কঠিন। ... এবং ৪১৫-১৭, ৪২১-২২ পৃষ্ঠা]

7. Discuss the problems of decentralisation in a federation.

[যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা আলোচনা কর।] (৪১৭-২০ পৃষ্ঠা)

২১ পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (PARLIAMENTARY AND PRESIDENTIAL GOVERNMENTS)

> *"The executive is either responsible to Parliament (i.e., the legislature) which has the power to remove it should it lose the confidence of that body, or it is subject to some more remote check, as, for example, by means of a periodical presidential election."* Strong

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য কি কি?

২. এরূপ সরকারকে পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) কেন বলা হয়? 'মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত' বর্ণনাটিরই বা তাৎপর্য কি?

৩. রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য কি কি?

৪. পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) সরকারের সাফল্যের সর্তাবলী কি কি?

৫. পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) সরকারে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কি অপরিহার্য?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ অনুসারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার-সমূহকে (ক) পার্লামেন্টীয় (বা সংসদীয়) ও (খ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পার্লামেন্টীয় সরকারে তত্ত্বগতভাবে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে তত্ত্বগতভাবে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বিদ্যমান থাকে।

পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government): ব্যাপক অর্থে পার্লামেন্টীয় সরকার (Parliamentary Form of Government) বলিতে পার্লামেন্ট বা জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার অস্তিত্ব, কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে উহা দ্বারা বুঝায় সেই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা যাহা ব্রিটেনে উদ্ভূত হইয়া অল্পবিস্তর সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।[১]

বৈশিষ্ট্য: এই সংকীর্ণ বা আধুনিক অর্থে পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়। (১) প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় আইনত যাঁহার হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে এবং যাঁহার নামে

১. Barker: *Essays on Government*

শাসনকার্য পরিচালিত হয় কার্যক্ষেত্রে। তিনি ক্ষমতার ব্যবহার বা শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। তিনি নামে মাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী। এইজন্য তাঁহাকে নামসর্বস্ব শাসক (Titular Head) বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head) বলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। পরামর্শের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা তাঁহার একরূপ নাই বলিলেই চলে। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী (Monarch), ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি হইলেন এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদের সকলেই রাষ্ট্রপ্রধান (Head of the State), কিন্তু সরকারের মধ্যে প্রধান নহেন।

ইহাদের সকলেই "জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না।"[১] ইহাদের পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নাই; সুতরাং দায়িত্বও নাই।

(২) দায়িত্ব রহিয়াছে প্রকৃত শাসকবর্গের বা মন্ত্রিগণের এবং এই দায়িত্ব হইল ব্যবস্থা বিভাগের নিকট। বস্তুত, নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য পার্লামেন্টীয় সরকারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইলেও ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতাই এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দায়িত্বশীল সরকার: এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

(৩) ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্ব হইল যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility)। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে সরকারী নীতি ও কার্য পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। এইজন্য এই দায়িত্বকে মন্ত্রিবর্গের না বলিয়া 'মন্ত্রি-পরিষদে'র বলিয়া অভিহিত করা উচিত। বর্তমানে ব্যবস্থা বিভাগ বা আইনসভার নিকট মন্ত্রি পরিষদের দায়িত্বশীলতা বলিতে দ্বি-কক্ষসমন্বিত আইনসভার নিম্নতর বা জনপ্রিয় কক্ষের নিকটই দায়িত্বশীলতা বুঝায়। জনপ্রিয় কক্ষের আস্থা হারাইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হইবার পূর্বেই মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। জনপ্রিয় কক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারী বিলের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা মন্ত্রি-পরিষদের দায়িত্বকে কার্যকর করিতে সচেষ্ট হয়—অর্থাৎ এই সকল পদ্ধতির সাহায্যে সর্বদা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে।

পার্লামেন্টীয় সরকার কেন বলা হয়: পার্লামেন্ট বা আইনসভার প্রাধান্য এইভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া ইহাকে পার্লামেন্টীয় (বা সংসদীয়) শাসন-ব্যবস্থা বলে।

(৪) অপরদিকে আবার প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্য হইতেই মনোনীত হন বলিয়া মন্ত্রি-পরিষদও আইনসভাকে অনবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রিগণই সরকারের পক্ষ হইতে বিল, প্রস্তাব প্রভৃতি

[১] They are "the symbols of nations, but they do not rule the nations."

উত্থাপন করেন, ব্যয়ের জন্ত অর্থমঞ্জুর দাবি করেন, ইত্যাদি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি বলিয়া আইনসভা তাঁহাদের এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে মতের বিশেষ পার্থক্য থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীর আইনসভায় জনপ্রিয় কক্ষকে ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতাও থাকে। প্রধান মন্ত্রীর এই ক্ষমতা শাসন বিভাগ—অর্থাৎ মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ততম প্রধান উপায় হিসাবে গণ্য হয়।

ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে উপরি-বর্ণিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলভিত্তি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, পার্লামেণ্টীয় সরকারে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে প্রয়োগ করা হয় না।

দলীয় ব্যবস্থা ও পার্লামেণ্টীয় সরকার: বলা হইয়াছে, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদও আইনসভাকে 'অল্পবিস্তর' নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ নির্ভর করে দলীয় ব্যবস্থার (party system) উপর। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে—যেখানে দ্বিদল-ব্যবস্থা (bi-party system) প্রবর্তিত আছে সেখানে এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ব্যাপক। ভারতের ন্যায় দেশে যেখানে বিশেষ একটিমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকে সেখানেও এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে কার্যকর করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে বহুদল-ব্যবস্থা (multi-party system) থাকে সেখানে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না। ফলে নিয়ন্ত্রণও কার্যকর হয় না বলিলেই চলে।

(৫) জেনিংস (Jennings) ম্যারিয়ট (Marriot) প্রভৃতি লেখক পার্লামেন্টীয় সরকারের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করিয়াছেন। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব এবং বিরোধী দলের অস্তিত্ব। মন্ত্রি-পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে কার্য করে এবং যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে।

(৬) বিরোধী দলের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জেনিংসের ভাষায় বলা যায় ইহা 'পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য অংগ।'[১] এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ না থাকায় বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতার পথে প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

গুণ: পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে, (১) ইহা ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। সরকারের এই দুই বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে তবেই শাসন সুশাসন হইয়া উঠিতে পারে।

---

১. "Opposition is not just a nuisance to be tolerated, but is a definite and essential part of the constitution." *Parliament*

(২) এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসকবর্গ, আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন বলিয়া গণতন্ত্র বা সাধারণের শাসনের স্বরূপ বজায় রাখা সম্ভব হয়। আইনসভার প্রতিনিধিগণ সর্বদা জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করেন। শাসকবর্গকেও জনপ্রতিনিধিদের মতামত অনুসারেই চলিতে হয়। উভয়ের মধ্যে গভীর মতানৈক্য ঘটিলে আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণের মতামত গ্রহণ করিতে হয়।

এইভাবে জনগণ কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ একরূপ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে বলা চলে।

(৩) সময়ের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা এই প্রকার সরকারের আর একটি গুণ। বেজট (Bagehot) এই গুণের বর্ণনা বিশেষভাবে করিয়াছেন। কোন মন্ত্রি-পরিষদ নির্দিষ্টকালের জন্য কার্যভার গ্রহণ করিলেও যে-কোন সময় ইহার স্থলে অপর এক মন্ত্রি-পরিষদকে অধিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তনও যে-কোন সময় করা যাইতে পারে। অনেক সময় এইরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অনেকের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিলকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহজ ও সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রধান শাসকের এইরূপ পরিবর্তন আইনসংগত পদ্ধতিতে কোনরূপেই করা যাইত না। ফলে জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারিত।

(ক) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার অপেক্ষা পার্লামেন্টীয় সরকারে অধিকতর রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ রহিয়াছে। দলীয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না। দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় এবং যে-কোন সময় নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকায় সর্বদাই দলীয় প্রচারকার্য চলিতে থাকে। ইহাতে জনসাধারণ শাসনসংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হয় এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে।

(খ) পরিশেষে বলা যায়, কোন দেশ রাজতন্ত্রকে বজায় রাখিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে সেই দেশের পক্ষে পার্লামেন্টীয় সরকারই প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা।

ত্রুটি: (১) সাধারণভাবে মার্কিন দেশবাসীদের নিকট পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে দায়িত্বহীন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অভাবে এক বিভাগের নিকট অন্য এক বিভাগের দায়িত্বশীলতা মূল্যহীন কল্পনা মাত্র।

(২) বলা হয় যে, আইনসভার সদস্যপদ মন্ত্রিগণের শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্নের সৃষ্টি করে। সিজ্‌উইককে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী যদি আইনসভায় পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেই ব্যস্ত থাকেন, তবে পররাষ্ট্র দপ্তর পরিচালনা করিবার সময় কখন পাইবেন?

(৩) সরকারের পরিবর্তনশীলতাকে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে নির্দেশ করা হয়। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত সরকারী নীতি এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সরকারের স্থায়িত্ব। কিন্তু স্থায়িত্ব পার্লামেন্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য নহে। সুতরাং এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সুশাসনও নিয়ম না হইয়া ব্যতিক্রম হইয়া উঠিতে পারে।

(৪) দক্ষতার দিক দিয়াও পার্লমেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা করা হইয়াছে। মন্ত্রি-পরিষদ জননেতাদের লইয়া গঠিত হয়। জননেতৃবৃন্দ জনগণের মনোহরণে পটু হইতে পারেন, কিন্তু শাসনকার্যে যে দক্ষ হইবেন ইহার কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। বরং নির্বাচকগণকে লইয়া তাঁহাদের সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া—নিত্যনিয়ত নির্বাচন-কেন্দ্রের তদারক (nursing the constituency) করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শাসনকার্যে অপটু হইবার সম্ভাবনাই অধিক রহিয়াছে।

(৫) বহুশাসক লইয়া গঠিত মন্ত্রি-পরিষদের শাসন বিপদকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে বিশেষ উপযোগী নয় বলিয়াই অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ মন্ত্রি-পরিষদ দেশকে এরূপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে এই অভিযোগ বর্তমানে একরূপ গুরুত্বহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(৬) পার্লামেন্টীয় সরকারের দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার আশংকা সর্বদা রহিয়াছে বলিয়াও অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরোধিতা এই শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি। বর্তমানে দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা এরূপ কঠোরভাবে অনুসৃত হয় যে, প্রতিনিধিবর্গের পক্ষে দলীয় নীতি ও কার্যকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলে মন্ত্রি-পরিষদের সম্মুখে স্বৈরাচারিতার প্রশস্ত পথ পড়িয়া থাকে।

নয়া স্বৈরাচার: লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) ইহাকে 'নয়া স্বৈরাচার' (New Despotism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অভিযোগের প্রত্যুত্তর: কয়েক ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে পার্লামেন্টীয় সরকারের সমালোচনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবুও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের দিক হইতে পার্লামেন্টীয় সরকারের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত কোন নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও ভিত্তিহীন। সরকারী নীতি হইল সমাজ-ব্যবস্থা ও জনগণের ধ্যানধারণার প্রতিফলন। সমাজ-ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণা অপরিবর্তিত থাকিলে যে দলই শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন, সরকারী নীতি অপরিবর্তিত থাকিবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্রিটেনের পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি দীর্ঘকাল

অনুসৃত বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির সন্ধান সহজেই করা যাইতে পারে। বিপদকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে পার্লামেন্টীয় সরকারের অক্ষমতার অভিযোগ যে মূল্যহীন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Form of Government): রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে।

বৈশিষ্ট্য: (১) উক্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণই রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। (২) ব্যবস্থা বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি ও শাসন বিভাগের কর্তা। নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসকের পদ বলিয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে কিছু নাই। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কিন্তু মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তাঁহার সহকর্মী নহেন। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না; আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়িত্বশীলও নহেন। তাঁহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট। তত্ত্ব অনুসারে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই শাসনক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকা আইনসভার আস্থার উপর নির্ভর করে না। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে সংবিধানভংগ (violation of the constitution) অথবা দুর্নীতিমূলক কার্য ছাড়া অন্য কোন কারণে পদচ্যুত করা যায় না। (৩) প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হইল জনসাধারণের নিকট। কিন্তু পুনর্নির্বাচন অবধি এই দায়িত্ব কার্যকর করিবার কোন উপায় নাই।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ অন্তত তত্ত্বগতভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে পারে না; আইন প্রণয়ন নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্যোগের উপর। রাষ্ট্রপতি অনুরোধ-প্রস্তাব (message) প্রেরণ করিতে পারেন মাত্র। অনুরোধ রক্ষিত না হইলে তাঁহার কিছু করিবার নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিতেও এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

গুণ: রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ও পার্লামেন্টীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দুই বিপরীত রূপ বলিয়া অভিহিত করা চলে। সুতরাং পার্লামেন্টীয় সরকারে যে দুর্বলতাগুলি পরিলক্ষিত হয় তাহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে দেখা যায় না। (১) পরিবর্তনশীলতা পার্লামেন্টীয় সরকারের অন্যতম দুর্বলতা কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এই দুর্বলতা হইতে মুক্ত। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি গুণের নির্দেশ করা হয়—

যথা, অনুসৃত নীতি ও কার্যধারার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে; শাসকবর্গ নির্বাচনী প্রচারকার্য চালানো অপেক্ষা শাসনকার্যের প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে পারেন; দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত নীতি ও কর্মধারার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাড়ে; ইত্যাদি।

(২) মার্কিনীদের অধিকাংশের মতে, এই ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ, কারণ ইহাতে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা একরূপ নাই বলিলেই হয়। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে উভয় বিভাগই পরস্পরের দ্বারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে।

(৩) বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া এই ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ কার্যকর। রাষ্ট্রপতির কোন সহকর্মী নাই; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং তিনি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য করিতে পারেন পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

(৪) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সমর্থকগণ আরও বলেন, যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহু দল ও বিভিন্ন স্বার্থ আছে সেই দেশের পক্ষে ইহাই হইল প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। বহু দল থাকিলে কোন নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না, ফলে শাসনযন্ত্রও দুর্বল হইয়া পড়ে।

ত্রুটি: অপরদিকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ত্রুটি বা দুর্বলতাগুলিও বিশেষ প্রকট। পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা যে যে দিক দিয়া সমর্থিত হইতে পারে ঠিক সেই সেই দিকেই নিহিত রহিয়াছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের দুর্বলতা।

(১) পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এইরূপ সংঘর্ষের উদাহরণ বহু সংখ্যায় রহিয়াছে। সুতরাং মার্কিন দেশবাসীরা যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এই দুই বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে করে, তাহা ভুল। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া কুশাসনের আশংকাও রহিয়াছে।

(২) এই শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা অধিক মাত্রায় বর্তমান। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল নহেন; তাঁহার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট। কিন্তু এই দায়িত্ব কার্যকর করার কোন উপায় নাই। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংবিধান-বিরোধী বা নীতি-বিগর্হিত কোন কার্য না করিয়াও রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণভাবে স্বৈরাচারিতার পথে চলিতে পারেন। ইহাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবার কোন উপায় নাই।

এইজন্য ইয়োরোপীয়দের নিকট এই শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়।

(৩) পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় একমাত্র মন্ত্রি-পরিষদই আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এই কার্যের জন্ত আইনসভা কমিটিতে সংগঠিত হয়। এক একটি কমিটি এক এক প্রকার আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করে।

সুতরাং আইন প্রণয়নের দায়িত্বও বিভক্ত হইয়া যায়। দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই কারণে ল্যাস্কি বলিয়াছেন: পার্লামেন্টীয় সরকারের অন্তত একটি গুণ আছে যে, ইহাতে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় মোটেই কঠিন হয় না।[১]

(৪) এইরূপ কমিটি-ব্যবস্থায় দ্বারা আইন প্রণয়নের আর একটি ত্রুটি হইল যে, ইহাতে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক এবং বিশেষ বিশেষ স্বার্থের দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(৫) পরিশেষে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ অপর দুই বিভাগের উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার ব্যাখ্যার ভার বিচার বিভাগের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ইহা সকল ব্যাখ্যা নিজের অনুকূলে করিয়া ধীরে ধীরে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপই ঘটিয়াছে। বিচার বিভাগের এই প্রাধান্য সুশাসনের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

পার্লামেণ্টীয় (সংসদীয়) সরকারের সফলতার সর্তাবলী: বর্তমানে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রতি আগ্রহ বিশেষ একটা দেখা যায় না। তাই নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহ পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করিতেছে। তবে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে পার্লামেন্টীয় সরকার সকল ক্ষেত্রেই কাম্য। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার সফলতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(ক) ইহার মধ্যে প্রথমটি হইল বিরোধী দলের অস্তিত্ব। বলা যায়, বিরোধী দল পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় অপরিহার্য অংগ।[২] বিরোধী দল না থাকিলে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুন সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে, মাত্র দলীয় স্বার্থসাধনেই নিয়োজিত থাকতে পারে।

(খ) আবার মাত্র বিরোধী দল হইলেই চলিবে না। বিরোধী দলকে সুগঠিতও হইতে হইবে। সুগঠিত না হইলে সুসংবদ্ধভাবে সরকারের সমালোচনা ও স্বৈরাচারিতার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না।

(গ) বিরোধী দল যাহাতে সুগঠিত হইতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন হইল সরকারী দলের মধ্যে ঐক্য। ফলে পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতার জন্ত মোটামুটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থার (by-party system) প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ডে

১. Laski: *American Presidency*

২. ৪২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ হইল দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা থাকার সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই সুসংগঠিত। যেখানে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে সেখানে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না এবং সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করা ছাড়া উপায় থাকে না। সম্মিলিত সরকার দুর্বল হইতে বাধ্য। অপরদিকে বিরোধী দলও যদি সম্মিলিত দল হয় তবে উহাও সার্থক হইতে পারে না।

(ঘ) পরিশেষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মধ্যে জনসমর্থনের পার্থক্য খুব বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ আজ যাহা বিরোধী দল কাল তাহাকে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতে পারে। বিরোধী দলের জনসমর্থন যদি এত কম হয় যে উহার পক্ষে কখনই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তবে মাত্র সমালোচনা দ্বারা উহা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দলকে সংযত রাখিতে পারিবে না।

উপসংহার—জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পার্লামেণ্টীয় সরকারের কাম্যতা : পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) সরকারের সফলতা এইভাবে সর্তাধীন হইলেও আজিকার দিনের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে ইহাই রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার অপেক্ষা কাম্য বিবেচিত হয়। কারণ, এই জনকল্যাণ সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে যে সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল তাহা পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের নহে। এইজন্য নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে সংসদীয় সরকারের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. মন্ত্রি পরিষদ-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল (১) নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসনের মধ্যে পার্থক্য। (২) প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। (৩) এই দায়িত্ব যৌথ দায়িত্ব। (৪) মন্ত্রি-পরিষদও আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। (৫) প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব। (৬) বিরোধী দলের অস্তিত্ব।

২ পার্লামেণ্ট বা সংসদের প্রাধান্যের জন্যই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার বলা হয়, কারণ মন্ত্রি-পরিষদই কার্যক্ষেত্রে শাসন করিয়া থাকে।

৩. রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য প্রধানত দুইটি : (ক) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, (খ) নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসনের মধ্যে পার্থক্যের অনস্তিত্ব।

৪. সংসদীয় সরকারের সাফল্যের সর্তাবলী হইল (ক) সুসংগঠিত বিরোধী দল, (খ) দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বুঝাপড়া।

৫. সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য না হইলেও কাম্য সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

1. What are the essential features of the Cabinet (or Parliamentary) form of Government ? What are the different methods by which Parliament controls the Executive in such a form of Government ?

[মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত (বা পার্লামেন্টীয়) সরকারের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য কি কি ? এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট কিভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ?]

[ইংগিত : নিম্নলিখিতগুলি হইল পার্লামেন্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য : (১) নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য ; (২) মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতা ; (৩) দায়িত্বশীলতার যৌথ প্রকৃতি ; এবং (৪) ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহা ছাড়াও (৫) প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব ; এবং (৬) বিরোধী দলের অস্তিত্বকে আরও দুইটি লক্ষণ হিসাবে নির্দেশ করা যায়।

মন্ত্রি-পরিষদ—অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল বলিয়া নিয়ন্ত্রিত থাকে। অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারী বিলের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি দ্বারা আইনসভা শাসন বিভাগকে (মন্ত্রি-পরিষদকে) নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ... এবং ৪২৪-২৬ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between Parliamentary and Presidential Governments. What are the elements of strength and weakness of Parliamentary Government ?

[মন্ত্রি-পরিষদ (পার্লামেন্টীয়) এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের গুণাগুণ কি কি ? (৪২৪-২৬ এবং ৪২৬-২৯ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the characteristics of Cabinet Government and the essential conditions for its success.

[মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য এবং সফলতার সর্ত সম্বন্ধে আলোচনা কর।]
(৪২৪-২৬ এবং ৪৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

4. Explain the meaning of Parliamentary Democracy. What are the conditions of its success ?

[সংসদীয় (পার্লামেন্টীয়) গণতন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা কর। কি কি অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে ?] (৪২৪-২৬, ৪৩১-৩২ পৃষ্ঠা]

২২ | শাসনতন্ত্র
(CONSTITUTIONS)

> *"What a Constitution says is one thing, and what actually happens in practice may be quite another. We must take account of this possible difference in considering the form and worth of Constitutions."* K. C. Wheare

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. শাসনতন্ত্র (সংবিধান) বলিতে কি বুঝায় ?

২. কোন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছিলেন যে ব্রিটেনের কোন সংবিধান নাই, এবং কেন বলিয়াছিলেন ?

৩. শাসনতন্ত্র বা সংবিধানসমূহকে লিখিত ও অলিখিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা কতদূর যুক্তিসংগত ?

৪. কোন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসরণে শাসনতন্ত্র বা সংবিধানসমূহকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ?

৫. সংবিধান (শাসনতন্ত্র) লিখিত হইলেই কি দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে ?

৬. কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়া থাকে ?

৭. সুশাসনতন্ত্রের জন্য কোন্ কোন্ উপাদান নির্দেশ করা হয় ?

শাসনতন্ত্রের (সংবিধানের) অর্থ (Meaning of Constitution) : যে প্রকারের প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন, তাহার কাজকর্ম সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কি হইবে, সদস্যদের কি অধিকার থাকিবে, ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মকানুন থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র হইল মানুষের আচরণকে কোন নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই তাহার গঠন কি হইবে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হইবে, কিভাবে সরকারী কাজকর্ম পরিচালিত হইবে এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিসমূহের ও সরকারের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে। এই নিয়মকানুনগুলিকেই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলিয়া অভিহিত করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে শাসনতন্ত্রের (Constitution) সংজ্ঞা সম্পর্কে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

দুই অর্থ : সাধারণত 'শাসনতন্ত্র' বা 'সংবিধান' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

(ক) কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুনকে বুঝাইবার জন্য 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১] এই সমস্ত নিয়মকানুনের মধ্যে আদালতগ্রাহ্য আইন ও আচারব্যবহার রীতিনীতি উভয়ই স্থান পায়। আচারব্যবহার, রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক আইন বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও উহাদিগকে সংবিধানের অংগীভূত করা হয় এই কারণে যে, ঠিক আইনের মতই ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিতে হইলে শুধু আইনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই যথেষ্ট নয়, আইনকে ঘিরিয়া যে-সমস্ত রীতিনীতি গড়িয়া উঠে এবং যাহা অনেক ক্ষেত্রে আইনের অর্থকে কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন।

(খ) অধিকাংশ দেশে কিন্তু শাসনতন্ত্র শব্দটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অর্থে 'শাসনতন্ত্র' বা 'সংবিধান' বলিতে বুঝায় সেই লিপিবদ্ধ মৌলিক আইনকে যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি মৌলিক নীতি নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়।

অনেকে আবার ইহাকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনটি সাধারণ আইন হইতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন—অর্থাৎ সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সহজসাধ্য হওয়া উচিত নয়।

ব্রিটেন সম্পর্কে টকভিল : টকভিলের (Alexis De Tocquevile) মত যে-সকল লেখক শাসনতন্ত্র বা সংবিধানকে এই সংকীর্ণ অর্থে বুঝেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্র নাই, কারণ উহা অলিখিত এবং সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন নয়। পার্লামেন্ট যখন ইচ্ছা তখন সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে সমর্থ।

'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা : 'শাসনতন্ত্র' শব্দের উপরি-উক্ত দুইটি অর্থের প্রচলন থাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা খুবই থাকে। এইজন্য কোন্ প্রসংগে এবং কোন্ অর্থে 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হইতেছে সেই সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলিতে হইবে। তারও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে-সমস্ত দেশে 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয় সেই সমস্ত দেশেরও শাসন-ব্যবস্থা বুঝিতে হইলে শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত রীতিনীতি, সাধারণ আইন, শাসনতন্ত্রের আদালত-প্রদত্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ দেশের সংবিধানের ধারা তন্ন তন্ন করিলেও রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট, রাজনৈতিক দল, কংগ্রেসের কমিটি ইত্যাদির কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না।

১. K. C. Wheare : *Modern Constitutions*

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলিকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ আইনের আকারে সংকলিত করিবার তাৎপর্য বা কারণ কি? সাধারণত বিপ্লব বা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর বিপ্লবী বা সংগ্রামকারীরা নিজেদের ধ্যানধারণা ও আদর্শ অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে চায়। আবার একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া নূতন শাসন-ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়াসী হইতে পারে, অথবা কোন দেশে যুদ্ধের ফলে পূর্বতন শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ায় তাহা নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ নূতন শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলিকে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করেন এবং অধিকাংশ সময় আবার সরকারকে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন করা হয়।

শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন হইতে অধিকতর মর্যাদা দানের কারণ: এইভাবে শাসনতন্ত্র বা সংবিধানকে অধিকতর মর্যাদা দান করিবার নানা কারণ থাকিতে পারে। সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, শাসনতন্ত্রকে যখন তখন পরিবর্তন করা সমীচীন নয়; অথবা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন; অথবা কতকগুলি নাগরিক-অধিকার শাসন বিভাগ বা ব্যবস্থা বিভাগের হাত হইতে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম থাকিলে তাহাদের সংরক্ষিত করা অথবা যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Constitutions): শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে (ক) লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (সংবিধান)—এই দুই প্রকার প্রকারভেদই সুপ্রচলিত।

ক। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র (Written and Unwritten Constitutions): যেখানে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলিকে এক বা কতিপয় দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে সেখানে সংবিধানকে লিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অপরপক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্রের দ্বারা বুঝানো হয় যে, শাসনসংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলিকে লিপিবদ্ধ বা দলিলভুক্ত করা হয় নাই এবং উহা প্রধানত প্রথা, আচারব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। বলা হয় যে, অলিখিত শাসনতন্ত্র প্রথার ভিত্তিতে বিবর্তিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত: অলিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের এবং লিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়।

সমালোচনা—অবৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ: ক্ষেত্রবিশেষে এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন থাকিলেও লিখিত এবং অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে সমস্ত শাসনতন্ত্রকে বিভক্ত করা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া বিবেচিত হয় না, কারণ ইহার ফলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, তথাকথিত অলিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত নিয়মকানুনের কোন অস্তিত্ব নাই এবং লিখিত শাসনতন্ত্রে অলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির কোন ভূমিকা নাই। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যাহা লিখিত ও বিধিবদ্ধ। অধিকারের বিল, উত্তরাধিকার আইন, জনপ্রতিনিধি আইন, পার্লামেন্ট আইন প্রভৃতি ব্রিটিশ সংবিধানের লিখিতাংশ। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এখানেও অনেক অলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি এরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে শুধু লিখিত সংবিধান হইতে ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা করা সম্ভব নহে। দলীয় ব্যবস্থা, কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা ইত্যাদি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না যদি-না সমস্ত লিখিত ও অলিখিত শাসনতান্ত্রিক আইনকানুন এবং রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

এই প্রসংগে লর্ড ব্রাইস বলেন: লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা, রীতিনীতি প্রভৃতি দ্বারা এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে যে, কিছুদিন পরে শুধু লিখিত নিয়মকানুন হইতে উহার স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।[১]

দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রকে লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার ফলে আবার এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি মূলনীতি সংবলিত সংবিধান নামে পরিচিত বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া আর কোন শাসনতান্ত্রিক আইন থাকিতে পারে না। এইজন্যই অনেকে এইরূপ মতপ্রকাশ করেন যে, ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্রই নাই। ব্রিটেনে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রণীত বিধিবদ্ধ মৌলিক আইন না থাকিলেও, বিভিন্ন সময়ে রচিত সংবিধানসংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ আইনই আছে। ইহা ব্যতীত যে-সকল দেশে শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ আইনের আকারে রচিত হইয়াছে সেখানেও বহু বিষয় সাধারণ আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যেমন, সংবিধান হয়ত আইনসভার গঠন এবং নির্বাচনসংক্রান্ত সাধারণ নিয়মগুলি

১. "Written constitutions are developed by interpretations, fringed with decisions and enlarged by customs so that after a time the letter of the text does not convey the full effect."

নির্দিষ্ট করিয়া দিল, কিন্তু নির্বাচনসংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সাধারণ আইন করিয়া নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

তৃতীয়ত, লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্যের মধ্যে আর একটি ইংগিত থাকিতে পারে যে, আইন বিধিবদ্ধ ছাড়া হইতে পারে না এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা অলিখিত এবং অনির্দিষ্ট, যাহা মনে করাও যুক্তিযুক্ত নহে। অনেক আইন আছে যাহা সম্পূর্ণ প্রথাগত এবং অলিখিত। আবার অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আছে যাহা লিখিত এবং আইন অপেক্ষা কোন অংশে কম স্পষ্ট নয়।

স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রশ্ন: অনেক সময় বলা হয় যে, লিখিত শাসনতন্ত্র অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে অধিকতর সমর্থ। এ-যুক্তির অবশ্য খুব সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। জার্মেনীর পূর্বতন শাসনতন্ত্র (ওয়েমার সংবিধান) লিখিত ছিল কিন্তু তাহা জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আসল কথা হইল, শাসনতন্ত্র লিখিতই হউক আর অলিখিতই হউক, সমস্তই নির্ভর করে সমাজের গতি ও প্রকৃতির উপর। বৈষম্যমূলক সমাজে শাসনতন্ত্রের গতি ও প্রকৃতি পক্ষপাতদুষ্ট না হইয়া পারে না।

খ। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Rigid Constitutions): উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণীবিভাগ হইল শাসনতন্ত্রসমূহকে সংশোধন-পদ্ধতির প্রকারভেদে সুপরিবর্তনীয় (Flexible) এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা। এই শ্রেণীবিভাগের জন্য আমরা লর্ড ব্রাইসের নিকট ঋণী।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে: যে শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা অতি সহজে পরিবর্তন করিতে সমর্থ তাহাকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible Constitution) আখ্যা দেওয়া হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বেলায় সংশোধন ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য নাই।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে: অপরপক্ষে যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না এবং পরিবর্তনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়।

স্পষ্টতই দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বেলায় সংবিধান এবং সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইন হইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হয় এবং উহার পরিবর্তন বিষয়ে সাধারণ আইনসভার উপর বাধানিষেধ বর্তমান্ থাকে।

দৃষ্টান্ত: সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্লামেন্ট যে প্রণালীতে সাধারণ আইন পাস করে

ঠিক সেই প্রণালীতেই আবার শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত আইন পাস করিতে সমর্থ। অপরপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কথা বলা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা, কংগ্রেস (Congress), যে ভাবে সাধারণ আইন পাস করিতে সমর্থ সেইভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে সমর্থ নহে। শাসনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করে কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা রাষ্ট্রসমূহের আইনসভার অনধিক দুই-তৃতীয়াংশের অনুরোধে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক জাতীয় সভা (National Convention)। এইভাবে প্রস্তাবিত সংশোধন যখন রাষ্ট্রসমূহের তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করে তখনই উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

স্মর্তব্য—লিখিত হইলেই দুষ্পরিবর্তনীয় হয় না: এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই যে উহা দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে এমন কোন কথা নাই।

যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত কিন্তু উহা সুপরিবর্তনীয়, কারণ সাধারণ আইনসভা উহাকে সহজেই পরিবর্তন করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত কোন্ শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয়, এ-প্রশ্নের বিচার মাত্র শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা যায় না। কার্যক্ষেত্রে কি ঘটিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।[১] কোন সংবিধানকে যদি বারবার পরিবর্তিত করা হয় তাহা হইলে উহাকে সুপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিতে হইবে; অপরপক্ষে যে-সংবিধান কদাচিৎ পরিবর্তিত হয় তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইবে কি না, তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি: দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংশোধন বা পরিবর্তনে মোটামুটি চারিটি পদ্ধতি অনুসৃত হইতে দেখা যায়: (ক) প্রথমত, সাধারণ আইনসভা সংশোধন করিতে সমর্থ হইলেও উহাকে কতকগুলি সর্ত মানিয়া চলিতে হয়—যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে ঐ উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া আবশ্যক। আমাদের ভারতীয় সংবিধানেও অনেক বিষয় আছে যাহার সংশোধন পার্লামেন্টের প্রত্যেক কক্ষের উপস্থিত ও ভোটে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইলে সম্পাদিত হইতে পারে। (খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করিতে হইলে গণভোটের দ্বারা

১. "The flexibility or rigidity of a constitution can best be tested pragmatically." H. L. McBain: *Constitution in the Encyclopaedia of the Social Sciences*

সাধারণের অনুমোদন লওয়া প্রয়োজন। যেমন, সুইজারল্যাণ্ডে সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে হইলে তাহা গণভোটে অংশগ্রহণকারী অধিক সংখ্যক নাগরিক এবং অধিক সংখ্যক ক্যাণ্টন কর্তৃক গৃহীত হওয়া আবশ্যক। (গ) তৃতীয় পদ্ধতি সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের বেলায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সংশোধনকার্য সম্পাদনে যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক রাজ্যগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য অংগরাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের এবং সুইজারল্যাণ্ডে অধিক সংখ্যক ক্যাণ্টনের অনুমোদন থাকা আবশ্যক। ভারতীয় সংবিধানে অনেক বিষয় আছে—যেমন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি, ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা-বণ্টন ইত্যাদি—যাহাদের পরিবর্তনের জন্য রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলের অন্তত অর্ধেকের অনুমোদন প্রয়োজন। (ঘ) চতুর্থ পদ্ধতি অনুসারে সংশোধনকার্য এক বিশেষ সভা (a special convention) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রগুলির দুই-তৃতীয়াংশের অনুরোধে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত সভা আনয়ন করিতে পারে। আবার সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রগুলির তিন-চতুর্থাংশের আহূত সভা দ্বারা সমর্থিত হইয়া আইনসিদ্ধ হইতে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতি বাধ্যতামূলক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সভার ব্যবস্থা আছে।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Flexible and Rigid Constitutions)—সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ: (১) সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ সম্পর্কে বলা হয় যে, এইরূপ সংবিধান পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সহজে তাল রাখিয়া চলিতে পারে। সময়ের পরিবর্তনের ফলে নূতন ধ্যানধারণা ও সমস্যা দেখা দেয় এবং উহার সংগে সংগে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইতে পারে। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা খুব সহজসাধ্য।[১] (২) আরও বলা হয় যে, জনসাধারণের মধ্যে যখন কোন পরিবর্তনের সপক্ষে আন্দোলন বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তখন শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তিত করিয়া জনসাধারণের আন্দোলনকে সহজেই প্রশমিত করা সম্ভব।

দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের সময় এবং সংকটকালীন অবস্থায় এইরূপ শাসনতন্ত্রকে বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া মনে করা হয়।

ত্রুটি: অপরদিকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সমালোচনাও করা হইয়া থাকে। (১) বলা হয়, ইহার প্রধান ত্রুটি হইল স্থিতিশীলতার অভাব। পরিবর্তন অতি সহজসাধ্য বলিয়া এইরূপ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়ে এবং

১. "They can be stretched or bent so as to meet emergencies without breaking their framework." Bryce

কারণে-অকারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইয়া থাকে সাময়িক উন্মাদনার বশে বহু কল্যাণকর নিয়মকানুন ও প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটাইবার আশংকা সব সময়ই বর্তমান থাকে। (২) মৌলিক আইন হিসাবে সাধারণ আইন হইতে এইরূপ শাসনতন্ত্রের পৃথক মর্যাদা না থাকায় উহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও আকর্ষিত হয় না। (৩) আবার মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের পক্ষে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অনুপযোগী বলিয়াও সমালোচিত হইয়াছে।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ: যে সমস্ত ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র ত্রুটিবিহীন এবং যে-সমস্ত ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। (১) দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা স্থিতিশীল, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। সাময়িক উন্মাদনা বা গণ-আন্দোলনের ফলে অথবা সাধারণ আইনসভার খেয়ালখুশি অনুযায়ী ইহা যখন তখন পরিবর্তিত হয় না। (২) মৌল আইন হিসাবেও ইহা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং (৩) ইহা দ্বারা মৌল অধিকারসমূহ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

(৪) যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয় সেখানে অংগরাজ্যসমূহের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার পক্ষে এইরূপ শাসনতন্ত্রকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়।

ত্রুটি অপরপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়া থাকে। ১) বলা হয়, কোন কল্যাণকর সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া তাহা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সহিত এইরূপ শাসনতন্ত্র সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। এইজন্য সংকটকালীন অবস্থায় শাসনতন্ত্রকে ভংগ করিবার, বিপ্লব আনয়ন করিবার প্রবণতা দেখা যায়।

মেকলেকে (Macaulay) উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, "বিপ্লবের প্রধান কারণ হইল যে জাতি যখন অগ্রসর হয় সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে" (The great cause of revolutions lies in this that while nations more onward, constitutions stand still)।

অবশ্য এই সমস্ত ত্রুটির মাত্রা নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সংশোধনকার্য কত বেশী কষ্টকর তাহার উপর। (২) আবার মার্কিন দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রে আদালত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকার এবং শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে; কিন্তু বিচারকগণ যে শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিভংগি রক্ষণশীল হইতে বাধ্য। ফলে তাঁহারা সংবিধানের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া এবং আইনসভার কাজে বাধার সৃষ্টি করিয়া সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেন।

উপসংহার—সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা: সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত দোষক্রটি অপসারণের উদ্দেশ্যে ল্যাস্কির (Laski) মত অনেক লেখক এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ল্যাস্কির অভিমত হইল, শাসনতন্ত্র ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের মত অতটা সুপরিবর্তনীয় হওয়া উচিত নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অতটা দুষ্পরিবর্তনীয়ও হওয়া কাম্য নয়।

তাঁহার মতে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনসাপেক্ষ হওয়া উচিত।

আমাদের এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কোন দেশের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য কি কষ্টসাধ্য তাহা কেবল নির্ধারিত আইনগত সংশোধন-পদ্ধতির সরলতা বা জটিলতার উপর নির্ভর করে না। উহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে যে শ্রেণীর লোক সমাজজীবনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশীল তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।

শাসনতন্ত্রের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ (Development and Expansion of Constitutions): লিখিত হোক আর অলিখিত হোক, সুপরিবর্তনীয় হোক আর দুষ্পরিবর্তনীয় হোক—কোন শাসনতন্ত্রই চূড়ান্ত ও চিরন্তন নহে। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে শাসনতন্ত্রেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিতে বাধ্য। লর্ড ব্রুহামের (Lord Brougham) ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, উপযোগী হইতে হইলে শাসনতন্ত্রের পক্ষে সম্প্রসারণশীল হইতে হইবে।

এই প্রকারের আর একটি সুপ্রচলিত উক্তি হইল. "সকল জীবন্ত রাজনৈতিক সংবিধানই বিবর্তনশীল" (Living political constitutions must be Darwinian in structure and in practice.—Woodrow Wilson)।

সম্প্রসারণের তিনটি পদ্ধতি: লিখিত শাসনতন্ত্রের বিবর্তন ও সম্প্রসারণ প্রধানত তিনটি উপায়ে ঘটিয়া থাকে: (ক) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা, (খ) বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা এবং (গ) আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সংশোধন দ্বারা।

ক। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা (Customs, Usages and Conventions): যে-কোন সংবিধান বিশ্লেষণ করিলেই ইহাতে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে—এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দুষ্পরিবর্তনীয় ও লিখিত শাসনতন্ত্রেও রীতিনীতি ও প্রথার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। এই শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের ক্যাবিনেট সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্যাবিনেটের যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এই ক্যাবিনেট, ইহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী—সমস্তই গড়িয়া উঠিয়াছে প্রথাগত রীতিনীতির ভিত্তিতে। সেইরূপ আবার প্রথাগত

রীতিনীতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, কংগ্রেসের সম্মতিপ্রাপ্তির পূর্বেই যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা, ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অন্যান্য সুপ্রতিষ্ঠিত সংবিধানের পর্যালোচনা করিলে ঐ একই সত্য প্রকাশিত হইবে যে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা পুরাতন শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই অংগের হানি ঘটাইলে শাসনতন্ত্র কার্যকর করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

খ। বিচারালয়ের ব্যাখ্যা (Judicial Interpretation): বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা লিখিত শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ বহুবিধ। প্রথমত, যতই সতর্কতার সহিত রচিত হউক না কেন, প্রত্যেক লিখিত শাসনতন্ত্রে কিছু-না-কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমষ্টি থাকিবেই। ফলে এই দ্ব্যর্থবোধকতা দূর করিয়া শাসনতন্ত্রের ধারাগুলির সুস্পষ্ট অর্থদানের ভার বিচারালয়ের উপর পড়ে। দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে। সুতরাং সম্পূর্ণ করিয়া তোলার ভার পড়ে বিচারালয়ের উপর। ফলে শাসনতন্ত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্রের প্রণেতৃবর্গের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে। এক্ষেত্রেও বিচারালয়ের ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। বিচারপতি-গণ যে শুধু মতদ্বৈধতার বিচার করিয়া এক বা অন্য মতের সপক্ষে রায় দেন তাহা নহে; তাঁহারা অনেক সময় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব নূতন মতও প্রচার করেন। ফলে শাসনতন্ত্র অনেক সময় অভাবিতভাবে সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুসারে 'স্থলবাহিনী'র (Land-Forces) উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের মতে, 'স্থলবাহিনী' বলিতে শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী—তিন রক্ষিবাহিনীই বুঝিয়াছিলেন। ফলে মার্কিন দেশে সম্পূর্ণভাবে সামরিক বাহিনীর উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা হইতেই আরও অসংখ্য উদাহরণ লইয়া দেখানো যাইতে পারে যে, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা কিভাবে শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া থাকে।

গ। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন (Constitutional Amendment): প্রত্যেক লিখিত শাসনতন্ত্রে ইহার পরিবর্তনের পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ থাকে। এই আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তনের পদ্ধতিই হইল শাসনতন্ত্র সম্প্রসারণের সর্বপ্রধান উৎস। গতিই জীবন, গতির বৈকল্যই মৃত্যু। কোন জাতি, কোন সমাজ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে ইহা গতিশীল হইবেই। গতিশীল জাতি, গতিশীল সমাজের পক্ষে স্থিতিশীল শাসনতন্ত্র কোনমতে উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইবে; ইহার পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে—পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইহার সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে।

সুশাসনতন্ত্রের উপাদান (Requisites of a Good Constitution): অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়—সুশাসনতন্ত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? এ-বিষয়ে ঐক্যমতের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে শাসনতন্ত্রের ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। ইহা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সুশাসনতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(ক) সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা: শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে; শাসনতন্ত্রের ভাষায় কোনপ্রকার অস্পষ্টতা থাকিবে না এবং উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধের বিশেষ অবকাশ থাকিবে না।

অন্যথায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য লইয়া অনবরত বিবাদবিসংবাদ লাগিয়া থাকিবে। এইজন্যই বলা হয় যে, স্পষ্টভাবে লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইনকানুন অলিখিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা (customs and usages) অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

(খ) ব্যাপকতা কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারের: শাসনতন্ত্রের একদিকে যেমন ব্যাপকতা বা প্রসারতা (comprehensiveness) থাকা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার ইহার পক্ষে যথাসম্ভব স্বল্লায়তনবিশিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত (short) হওয়া প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকিবে। কিন্তু উহা রাজনৈতিক সংগঠনের অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির মধ্যে যাইবে না, যাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যাহা অপরিহার্য তাহাই মাত্র সান্নিবিষ্ট করিবে।

যে-ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র সর্ববিষয়ে খুঁটিনাটির মধ্যে যায় সে-ক্ষেত্রে সংবিধান মাত্র বৃহদায়তনবিশিষ্ট হয় না, অকাম্যভাবে জটিলতারও সৃষ্টি করে এবং বিবাদবিসংবাদের পথ প্রশস্ত করে। আইনসভার উদ্যোগ এবং দায়িত্বও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। জটিলতার জন্য জনসাধারণও শাসনতন্ত্রকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত বিস্তৃত শাসনতন্ত্র দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলে। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য উহাকে অনবরত সংশোধন করিতে হয় অথবা বহুবিধ রীতিনীতি বা প্রথা প্রবর্তিত করিতে হয় অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের অর্থের পরিবর্তন করিতে হয়।

সুতরাং সংবিধান যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হইবে এবং উহা রাজনৈতিক কাঠামোর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে।[১]

ম্যাকলুচ বনাম মেরীল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিচারক জন মার্শাল (John Marshall) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

---

১. "One essential characteristic of the ideally best form of Constitution is that it *should be as short as possible*" K. C. Wheare

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান: অবশ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পক্ষে যতটা সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পক্ষে ততটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র ক্ষমতা-বণ্টন করিয়া দিতে হয় এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের উপর বাধানিষেধ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়।

(গ) **মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ**: সুশাসনতন্ত্রের আলোচনা প্রসংগে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা হয়: ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিখিত সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন কি না? এ-সম্পর্কেও যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। একশ্রেণীর চিন্তাবিদের মতে, অধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংবিধানভুক্ত করা প্রয়োজন। ল্যাস্কির অভিমত হইল, অধিকার শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে শাসন বিভাগ অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইলে জনসাধারণ সহজেই সরকারের বিরুদ্ধে আইনভংগের অভিযোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া জনসাধারণও তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। অবশ্য অধিকার সংরক্ষিত হইবে কি না তাহা নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতি এবং জনসাধারণের সাহসিকতার উপর। অপরদিকে অধ্যাপক হোয়ারার (Prof. K. C. Wheare) প্রমুখ লেখক অধিকারকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ পক্ষপাতী নন। ইঁহারা বলেন, অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে তাহার সংগে বাধানিষেধের উল্লেখ করিতে হয়। ইহাদের ফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকারের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। এ-অবস্থায় অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া সাধারণ আইনের দ্বারাই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত করাই উচিত।[১] তবে বর্তমান সময়ে প্রায় সকল দেশের শাসনতন্ত্রেই কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) **সংশোধনের ব্যবস্থা**: শাসনতন্ত্রকে নির্দিষ্ট আইনসংগত পদ্ধতিতে সংশোধন করিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা না করা হইলে বলপূর্বক বা বিপ্লবের সাহায্যে পরিবর্তন করিবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। সংশোধন সম্পর্কে বলা হয় যে, উহা অত্যন্ত সহজসাধ্য অথবা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কোনটিই হইবে না। সংশোধন অত্যন্ত সহজসাধ্য হইলে সাময়িক উত্তেজনার বশে আইনসভা অকারণভাবে শাসনতন্ত্রের যখন তখন পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পাইবে। অপরপক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না।

১. "The ideal Constitution ... would contain few or no declaration of rights, though the ideal system of law would define and guarantee many rights." K. C. Wheare

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. সংক্ষেপে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলিতে বুঝায় সরকারের গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সমষ্টিকে।

২. টকভিল। কারণ, ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত এবং সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়।

৩. লিখিত ও অলিখিত বলিয়া শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে, কারণ কোন সংবিধান সম্পূর্ণ লিখিত বা সম্পূর্ণ অলিখিত হয় না।

৪. লর্ড ব্রাইসের অনুসরণে।

৫. না। দৃষ্টান্ত : নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান। উহা লিখিত কিন্তু সুপরিবর্তনীয়।

৬. তিন পদ্ধতিতে সংবিধানের সম্প্রসারণ ঘটিয়া থাকে : (ক) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা, (খ) বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা, (গ) আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন দ্বারা।

৭. সুশাসনতন্ত্রের উপাদান হইল (ক) সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা, (খ) ব্যাপকতা কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারের, (গ) মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ এবং (ঘ) সংশোধনের সংবিধানগত ব্যবস্থা।

অনুশীলনী

1. What do you understard by a constitution. Explain fully.

[শাসনতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।] (৪৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between rigid and flexible constitutions. What are the merits and defects of rigid constitution ?

[দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের (সংবিধানের) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ কি কি ?] (৪৩৮-৩৯, ৪৪০-৪১ পৃষ্ঠা)

3. Which of the two types of Constitutions—Rigid and Flexible—would you prefer ? Give reasons for your answer.

[সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে পছন্দ কর ? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।] (৪৪০-৪২ পৃষ্ঠা)

4. What are the different ways of development and expansion of constitutions ?

[শাসনতন্ত্র (সংবিধান) বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন ধারা (পদ্ধতি) কি কি ?] (৪৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

5. Write a note on the contents and qualities of a good constitution.

[সুশাসনতন্ত্রের উপাদানের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৪৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)

২৩ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(DIFFERENT ORGANS OF GOVERNMENT)

"Since the time of Aristotle, it has been generally agreed that political power is divisible into three broad categories. There is, first the legislative power. There is, secondly, the executive power. There is, thirdly, the judicial power. It may be admitted that these categories are of art and not of nature." Laski

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. আইনসভা দ্বিপরিষদ না একপরিষদসম্পন্ন হইবে ?

২. সাম্প্রতিককালে কিভাবে আইনসভার মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে ?

৩. এক ব্যক্তিবিশিষ্ট ও একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগ কাহাকে বলে ?

৪. আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় কেন ?

৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা কোথায় এবং সর্ত কি কি ?

গণতন্ত্রে ব্যবস্থা বিভাগে অধিক মর্যাদা : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদে সরকারের তিনটি বিভাগকে সমক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থা বিভাগকে অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া ধরা হয়। কারণ : ব্যবস্থা বিভাগের কার্য অপর দুই বিভাগের কার্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার বা আইনভংগের জন্য শাস্তিপ্রদান করিবার পূর্বে প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। ব্যবস্থা বিভাগই আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগের কার্য অপর দুই বিভাগের কার্যের পূর্ববর্তী। কার্য পূর্ববর্তী বলিয়া ব্যবস্থা বিভাগ অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া গণ্য। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে।

ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature) : বলা হইয়াছে, গণতন্ত্রে ব্যবস্থা বিভাগই অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত। এই উক্তি হইতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যবস্থা বিভাগ শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর কর্তৃত্বসম্পন্ন নহে।

অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের প্রাধান্য : বস্তুত, রাজতন্ত্রের অধীন, নায়কতন্ত্রের অধীন, আমলাতন্ত্রের অধীন ব্যবস্থা বিভাগের স্থান শাসন বিভাগের ঊর্ধ্বে

নির্দিষ্ট হয় না, বরং শাসন বিভাগই ব্যবস্থা বিভাগের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। জারের অধীন রাশিয়ায় ব্যবস্থাপক সভা মর্যাদায় শাসন-কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়া কিছুই ছিল না। বর্তমানেও বহু ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা ঐ মর্যাদাই ভোগ করে। হিটলার ও মুসোলিনীর ন্যায় নায়ক (Dictator) ব্যবস্থা বিভাগকে একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। মুসোলিনী বলিয়াছিলেন, "পার্লামেণ্ট একটি ক্রীড়নক মাত্র, কিন্তু এই ক্রীড়নককে লোকে পছন্দ করে" (Parliament is a plaything, but a plaything that people like to have)। সুতরাং পার্লামেণ্টের মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিয়া তিনি উহার সর্বক্ষমতা অপহরণ করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী: দেখা গেল, ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদায় গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে। একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কথা ধরিলেও সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগ মর্যাদা ও ক্ষমতা-সম্পন্ন নহে। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের উপর ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশিত। ইহার কারণ, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে অস্বীকার করে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মূলভিত্তিই হইল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ। অতএব, ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সকল দেশে এক এবং অভিন্ন নহে। ফলে কার্যাবলীও অভিন্ন হইতে পারে না। অভিন্ন না হইলেও অন্তত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে একরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই সকল মৌল কার্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল।

(১) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য। বর্তমানে ব্যবস্থাপক সভা-প্রণীত আইনই আইনের প্রধান উৎস। আইন প্রণয়নের অন্যান্য পদ্ধতি ধীরে ধীরে এই উৎসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। আজকার দিনের ব্যবস্থাপক সভা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সংগতি বজায় রাখিবার জন্য প্রথাগত আইনের সংশোধন করে, প্রয়োজন হইলে ইহার বিলোপসাধন করে এবং ইহার স্থানে নূতন আইন প্রবর্তন করে।

(২) আলোচনামূলক কার্য: আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়—প্রকৃত আইন প্রণয়ন ও আলোচনা। যদিও ইহারা একই কার্য-পদ্ধতির দুইটি অংশ, তবুও অনেকের মতে ইহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। প্রকৃত আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য হইল সুদক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কার্য। জনসাধারণের সাধারণ প্রতিনিধিগণ ঠিকমত এই কার্য সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ লেখকের মত, এই কার্যের ভার কয়েকজন সুদক্ষ ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্র কমিটির উপর ন্যস্ত করা উচিত।

গুরুত্ব: প্রকৃত আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য কমিটির মাধ্যমে সম্পাদন করা হইলেও আলোচনামূলক কার্য ন্যস্ত থাকিবে সমগ্র ব্যবস্থাপক সভার উপর। তাহা না

হইলে ব্যবস্থাপক সভা-প্রণীত আইনে সকলের মত প্রতিফলিত হইবে না। প্রত্যেকের ধ্যানধারণা তাহার পারিপার্শ্বিকের আপেক্ষিক হয়। আইনের প্রয়োজনীয়তা, রূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্র কমিটির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে সমগ্র দেশের চিন্তা ও মতামত আইনে প্রতিফলিত হইবে না। তখন আইন হইবে ক্ষুদ্রতম গণ্ডির ধ্যান-ধারণার প্রতিবিম্ব। এইজন্য প্রয়োজন সকল স্বার্থ, সকল শ্রেণীর পক্ষে আইন প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণের। সুতরাং আলোচনাকার্য হইবে সমগ্র ব্যবস্থাপক সভার, মাত্র কমিটির নহে।

(৩) অর্থসংক্রান্ত কার্য: বর্তমানে জনশাসনের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে, জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি ব্যতীত কোন করধার্য বা ব্যয়বরাদ্দ করা উচিত নহে। অতীতে জনসাধারণকে এই অধিকার আদায় করিবার জন্য বিশেষ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বর্তমানে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকল সভ্য দেশে জাতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করা ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থা বিভাগের এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এত ব্যাপক যে, ইহার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না। ব্যবস্থাপক সভার হস্তে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ হইল যে যুদ্ধে বিরাট অর্থব্যয় হয় এবং যেখানে অর্থব্যয়ের প্রশ্ন রহিয়াছে সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক সভা জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে বলিয়া ইহা সমগ্রভাবে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক নীতিও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(৪) শাসনসংক্রান্ত কার্য: তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে শাসনকার্য পরিচালনা ব্যবস্থা বিভাগের কার্য নহে। তবুও দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগ শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার কমিটির মাধ্যমে নানা প্রকার শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও ব্যবস্থাপক সভা শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চতর পরিষদ সিনেটের (Senate) হস্তে শাসনসংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। সিনেট মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত পরামর্শক্রমে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধি সম্পাদন করিলে তাহা সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য দ্বারা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হইলে কার্যকর হয় না।

(৫) বিচারসংক্রান্ত কার্য: ব্যবস্থাপক সভা অনেক ক্ষেত্রে বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। নির্বাচনসংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা, নিজ সভ্যগণের আচরণের বিচার, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চ পদাধিকারীর কার্যাকার্যের বিচার বা ইম্‌পিচমেন্ট প্রভৃতি এই সকল বিচারসংক্রান্ত কার্যের অন্তর্ভুক্ত। অনেক রাষ্ট্রে আবার ব্যবস্থাপক সভার উচ্চতর কক্ষ চূড়ান্ত আপিল বিচারের আদালত হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডে লর্ড সভা হইল দেশে উদ্ভূত সকল মামলার আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত।

(৬) **সংবিধানসংক্রান্ত কার্য :** সংবিধানের কার্য বলিতে সংবিধানের পরিবর্তন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার কার্য বুঝায়। অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিক ভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। ভারত এই সকল রাষ্ট্রের অন্যতম।[১]

সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত : ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সংবিধানের ব্যাখ্যার আলোচনায় সুইজারল্যাণ্ডের কথাই সর্বাগ্রে এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডে জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের নাই।

উপসংহার—ব্যবস্থা বিভাগের অবনতি : তত্ত্বের দিক দিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থা বিভাগ অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও এবং বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিলেও বর্তমান দিনের কর্মমুখর রাষ্ট্রে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আইনসভার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাকে আইনসভার অবনতি (decline of legislature) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আইনসভার এই অবনতি শাসন ব্যবস্থা বা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন (Organisation of the Legislature) :

বর্তমানে অধিকাংশ সভ্য রাষ্ট্রেরই ব্যবস্থাপক সভার দুইটি অংশ আছে : প্রথম বা নিম্নতর পরিষদ এবং দ্বিতীয় বা উচ্চতর পরিষদ।

এইরূপ ব্যবস্থাকে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা (Bicameralism) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভা একটিমাত্র পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে সেই ব্যবস্থাকে একপরিষদ ব্যবস্থা (Unicameralism) বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিষদের গঠন : ব্যবস্থাপক সভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন হইলে প্রথম বা নিম্নতর পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে জনপ্রিয় পরিষদ বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিষদ ইংল্যাণ্ডের মত শুধু অভিজাতদের লইয়া ,অথবা ক্যানাডার মত মনোনীত ধনী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত আংগিক রাজ্যগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া অথবা অন্যভাবেও গঠিত হইতে পারে।[২]

দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা (Arguments for and against Bicameralism) : বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যে-দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে তাহার কারণ মোটামুটি ত্রিবিধ : (ক) সংক্ষেপে

---

১. অবশ্য সম্প্রতি (১৯৮০) ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছে যে সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য পার্লামেন্ট পরিবর্তন করিতে পারে না।

২. এই প্রসংগে, 'প্রথম পরিষদ' ও 'দ্বিতীয় পরিষদ' কথা দুইটির ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ সকল দেশে এই কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যেমন, নেদারল্যাণ্ডস্ ও সুইডেনের মত দেশে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নতর পরিষদকে বলা হয় দ্বিতীয় পরিষদ এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত উচ্চতর পরিষদকে বলা হয় প্রথম পরিষদ।

বলিতে গেলে, অধিকাংশ রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডকে অনুসরণ করিয়া দ্বিপরিষদের প্রবর্তন করে ; (খ) যুক্তরাষ্ট্রগুলি আমেরিকাকে অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় পরিষদের মাধ্যমে জাতীয় ও অংগরাজ্যগুলির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ; (গ) কতকগুলি আবার একপরিষদ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা করিয়া পরে দ্বিপরিষদের সমর্থনকারী হইয়া দাঁড়ায়। এই তিনটি কারণে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার দিকে একসময় এরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় যে, মনে করা হইত ব্যবস্থাপক সভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন হইবেই। এইরূপ আইনসভার সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

সপক্ষে যুক্তি : (ক) দুইটি পরিষদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিলে তবেই সুচিন্তিতভাবে জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। একপরিষদ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি বিষয় পুংখানুপুংখভাবে আলোচিত হইতে পারে না। এই কারণে ইহাতে সর্বদাই অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণীত হইবার আশংকা রহিয়াছে। এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে আকস্মিক আইনও পাস করিতে পারে। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত এমনকি বিপর্যস্ত হইবার আশংকাও রহিয়াছে। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ না-ঘটাই সম্ভব। প্রথম পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পরিষদ ধীরভাবে ইহার বিচার করে। ইহার ফলে বিলটির দোষটি ধরা পড়ে এবং বিচারে যে কালক্ষেপ হয় তাহাতে অনেক সময় প্রথম পরিষদের ক্ষণিকের আবেগ অন্তর্হিত হয়। তখন প্রথম পরিষদ বিলটি সম্বন্ধে পুনরায় চিন্তা করিতে পারে। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

(খ) আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে তবেই সাধারণের ইচ্ছার (General Will) যথার্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। আইনসভা যদি একপরিষদসম্পন্ন হয় এবং যদি ইহার সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত হন তবে ইহার কার্যকাল অতিক্রম করিবার পূর্বেই জনমতের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িতে পারে কিন্তু আইনসভার দুইটি পরিষদ বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হইলে এরূপ আশংকা থাকে না। ইহাতে তখন প্রবহমান জনমত সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে।

(গ) দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে পরবর্তী যুক্তি হইল, ইহা নাগরিকগণকে একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, সকল আইনসভারই স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি থাকে। আইনসভা যদি একপরিষদসম্পন্ন হয় তবে ইহার স্বৈরাচারী ও আদর্শভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিশেষ পরিমাণে বর্তমান থাকে। এইজন্য আইনসভাকে দুইটি পরিষদে বিভক্ত করিয়া পরিষদ দুইটিকে সমান ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। সমক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ দুইটির প্রত্যেকে অপরের স্বৈরাচারিতাকে সংযত রাখিতে পারে।[১]

১. "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of another house of equal authority." Bryce

বর্তমান যুগে লর্ড ব্রাইসের যুক্তিটি বিশেষ মানিয়া লওয়া হয় না। দেখা যায়, যাহারা দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার পক্ষপাতী তাঁহাদের প্রায় কেহই দ্বিতীয় পরিষদকে জনপ্রিয় পরিষদের ন্যায় সমক্ষমতাসম্পন্ন করিবার পক্ষপাতী নহেন।

(ঘ) দ্বিতীয় পরিষদ যে শুধু নাগরিকগণকে একপরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে তাহাই নহে, ইহা শাসন বিভাগকেও একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে—এরূপ যুক্তিও অনেক সময় প্রদর্শন করা হয়। বলা হয়, শাসন বিভাগ যদি দেখে যে, প্রথম পরিষদ খেয়ালখুশিমত কার্য করিয়া সুশাসনের বিঘ্ন ঘটাইতেছে তখন ইহা দ্বিতীয় পরিষদের নিকট আবেদন করিয়া প্রথম পরিষদের স্বৈরাচার ও খামখেয়াল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

দ্বিপরিষদের সপক্ষে এই যুক্তিরও বিশেষ সারবত্তা নাই, কারণ দ্বিপরিষদ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম পরিষদকে সংশোধন বা তিরস্কার করিবার ক্ষমতা দ্বিতীয় পরিষদের থাকে না। উপরন্তু, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ একমাত্র নিম্নতর পরিষদের নিকটই যৌথভাবে দায়িত্বশীল। সুতরাং শাসন বিভাগের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পরিষদের নিকট অভিযোগের প্রশ্নই উঠে না।

(ঙ) দ্বিপরিষদ ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সহজেই সম্ভবপর হয়। প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, রাজনীতিতে উৎসাহী ও অভিজ্ঞ এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন না। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে সহজেই আইনসভায় তাঁহাদের স্থান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা থাকিলে আবার অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় পরিষদে সকল শ্রেণী, স্বার্থ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে। এরূপ ঘটিলে আইনসভা সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ফলে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন হইয়া দাঁড়ায়।

(চ) দ্বিপরিষদ ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে সংগঠিত দুইটি পরিষদ একে অপরের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া সুচিন্তিত কাম্য আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিতে পারে। দ্বিতীয় পরিষদের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ প্রথম পরিষদের উৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ সভ্যগণকে সংযত রাখিতে ও তাঁহাদের দোষত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন। প্রথম পরিষদও দ্বিতীয় পরিষদের রক্ষণশীলতা কতকাংশ দূর করিয়া আইনসভাকে বিশেষভাবে জনমতের অনুবর্তী করিয়া তুলিতে পারে। এইভাবে উভয় পরিষদের সম্মিলিত বিবেচনার ফলে সুচিন্তিত, প্রগতিমূলক, কাম্য আইন প্রণীত হইতে পারে।

(ছ) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় আইনসভার কার্যও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকাংশের ধারণায় আইনসভায় একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে সুষ্ঠুভাবে এই কার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রয়োজন দুইটি পরিষদের। অপেক্ষাকৃত অল্প বিতর্কমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিকে প্রথম পরিষদের পরিবর্তে দ্বিতীয় পরিষদে উত্থাপিত করা যাইতে পারে; দ্বিতীয় পরিষদ এইরূপ

বিলগুলির সম্যক আলোচনা করিয়া মতামতসহ নিম্নতর পরিষদে প্রেরণ করিলে তখন আর প্রথম পরিষদের পক্ষে এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। ইহা উচ্চতর পরিষদের মতামত গ্রহণ করিয়াই কার্যে অগ্রসর হইতে পারে। এইভাবে জনপ্রিয় পরিষদের যে সময়সংক্ষেপ হয় তাহা অধিকতর বিতর্কমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলির বিবেচনায় ব্যয় করা যাইতে পারে।

(জ) দ্বিতীয় পরিষদেও প্রত্যেক বিল সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে জনসাধারণ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে হয়ত বিতর্ক ও আলোচনায় ত্রুটি থাকিয়া যাইত। ফলে রাজনৈতিক শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হইত।

(ঝ) অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে দ্বিপরিষদত্ব সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি স্বার্থের সন্ধান পাওয়া যায়—জাতীয় (national) এবং আঞ্চলিক (regional)। এই দুই স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন দ্বিপরিষদত্বের। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত নিম্নতর পরিষদে থাকিবেন জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিগণ এবং অংগরাজ্যের স্বার্থ (states' rights) সংরক্ষণের জন্য থাকিবে প্রত্যেক অংগরাজ্যের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত দ্বিতীয় পরিষদ। ইহার ফলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত নিম্নতর পরিষদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত জনবিরল অংগরাজ্যসমূহের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে না, কারণ নিম্নতর পরিষদ ঐরূপ কার্যে অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় পরিষদ উহাতে বাধা দিবে। তবে দ্বিতীয় পরিষদের পক্ষে এই দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করিতে হইলে উহার ক্ষমতা প্রথম পরিষদের ক্ষমতার সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসংগে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে 'ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা' যে-সকল দেশে প্রবর্তিত থাকে সেই সকল দেশে প্রথম পরিষদকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে প্রবণতা দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিপরিষদত্ব সম্পর্কে ল্যাস্কি: অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার আদি বণ্টন, শাসনতন্ত্রের চরমতা এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণের পক্ষে পর্যাপ্ত। সুতরাং দ্বিতীয় পরিষদে অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব বা দ্বিতীয় পরিষদের ব্যবস্থা একরূপ অনাবশ্যক।[১]

বিপক্ষে যুক্তি: দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার বিপক্ষের যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হিসাবে আবে সিয়েস (Abbe's Sie'ye's) সুপরিচিত মন্তব্যটির উল্লেখ করা যাইতে

১. "... no safeguard necessary to the unit of a federation requires the *protective armour of a second chamber.*"

পারে : "দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রথম পরিষ… …ুসরণ করে তবে ইহা অনাবশ্যক ; যদি ইহা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে উহা অনিষ্টকর" (if the second chamber agrees with the first, it is superfluous ; if it disagrees, it is pernicious)। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, প্রথম পরিষদই জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক পরিষদ। দ্বিতীয় পরিষদ যদি জনপ্রিয় পরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করে তবে গণতন্ত্রের দিক দিয়া ইহা কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং ইহার বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় পরিষদের কার্য সমর্থন করিতেই থাকে তবে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া সময়ক্ষেপ ও অর্থব্যয় করা সম্পূর্ণ অহেতুক। অতএব, এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পরিষদের বিলোপসাধন করা উচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আবে সিয়েস মতে, দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও হিতবাদী (utilitarian) বেন্থামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রদর্শিত যুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(ক) বলা হয়, গণতন্ত্র দুই মুখে কথা বলিতে পারে না। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থা বিভাগের সম্পূর্ণ ঐক্য। সিয়ে বলিয়াছেন, আইন হইল জনসাধারণের ইচ্ছা মাত্র। জনসাধারণ একই বিষয়ে দুই প্রকারের মত বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং যে আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবে তাহা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধই হইবে—দুইটি পরিষদে বিভক্ত হইবে না।

ফ্রাঙ্কলিনের মতে, দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভা বিপরীতমুখী গতিসম্পন্ন অশ্ব ও অশ্বযানেরই মত।

(খ) আরও বলা হয়, একপরিষদ ব্যবস্থাতেই আইনসভার দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর। দুইটি পরিষদ থাকিলে দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে।[১]

দ্বিতীয় পরিষদও সকল সময় বিবেচনার সহিত কার্য করে না। ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে, বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য। বিরোধিতা করিতে করিতে ইহা অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে। ফলে ইহা অনেক সময় সুচিন্তিত কাম্য আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আবার বাধাপ্রাপ্তির ভয়ে নিম্নতর কক্ষ প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে না। দুই পরিষদ সমদক্ষতাসম্পন্ন হইলে এইরূপ বিপদের আর অন্ত থাকে না।

(গ) দ্বিতীয় পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হইয়া শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। গণতন্ত্রের দিক দিয়া ইহাও কোনমতে কাম্য নহে।

---

১. "There is probably more truth in the contention that bicameralism divides responsibility and hence dilutes and may even destroy it." Dimock and Dimock, *American Government in Action*

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের ভিত্তিতে দ্বিপরিষদের গঠনও দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর এক প্রবল যুক্তি।

আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হইবে—ইহাই অন্যতম মৌলিক গণতান্ত্রিক নিয়ম। কিন্তু দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভায় সাধারণত দেখা যায় যে দ্বিতীয় পরিষদ বিত্তশালী, রক্ষণশীল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান কোন ব্যক্তি আইনসভার এরূপ গঠন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না।

(ঙ) দ্বিতীয় পরিষদ যে জনপ্রিয় পরিষদের অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে—এ-যুক্তিরও বিরোধিতা করা হয়। বলা হয় যে বর্তমানে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন আইনই পাস করা হয় না। পরিষদে যখন কোন বিল সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে তখন ইহা লইয়া সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চে আলোচনা চলে। পরিষদের সভ্যগণ সংবাদপত্রে প্রতিফলিত জনমতের অনুবর্তী হইয়াই আইন প্রণয়নের পথে অগ্রসর হন। সুতরাং দ্বিতীয় পরিষদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক। ইহার জন্য যে অর্থব্যয় হয় তাহা অপব্যয় মাত্র এবং যে সময়ক্ষেপ হয় তাহা প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন বিলম্বিত করে মাত্র।

(চ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে বলা হয়, ইহার জন্য দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন নাই। শাসনতন্ত্রে নানাভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উপরন্তু, ফাইনারের মতে 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝায় স্বার্থান্বেষীর দল। স্বার্থান্বেষীর দল সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিষদের দাবি করে।

দ্বিতীয় পরিষদ, সংস্কারকার্যে মাত্র বিলম্ব ঘটাইয়াই কায়েমী স্বার্থসমূহের (vested interests) পৃষ্ঠপোষকতা করে।

(ছ) যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যগণ অংগরাজ্যসমূহের স্বার্থসংরক্ষণের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থসংরক্ষণেই সচেষ্ট থাকেন। দলীয় ভিত্তিতে যখন আইনসভার কার্য চলিতে থাকে তখন দ্বিতীয় পরিষদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে রূপ দিবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইতে বাধ্য।

উপসংহার: অনেক আধুনিক লেখক এই ধারণা পোষণ করেন যে, দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি বিশেষ অধ্যায় সূচিত করে মাত্র। অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে বুঝাপড়ার সমাপ্তি যে-পর্যন্ত ঘটে নাই সে-পর্যন্ত দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখিতেই হইবে। গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয় ঘটিলে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার বিলোপসাধন করাই যুক্তিযুক্ত।

অধ্যাপক ল্যাস্কি উক্তি করিয়াছেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন এককপরিষদ আইনসভাই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়।[১]

মার্কিন শাসনতন্ত্রবিদ ডিমক্‌ড (Dimock) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা এক অতীত যুগের ধারণার প্রকাশ। অতীতে ধারণা ছিল রাষ্ট্র বা সরকার হইল এক প্রয়োজনীয় কিন্তু অমংগলজনক প্রতিষ্ঠান (a necessary evil)। সুতরাং ইহাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার বশবর্তী হইয়াই আইনসভাকে দুই পরিষদে বিভক্ত করিয়া নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা করা হয়।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ও দ্বিপরিষদতত্ত্ব: বর্তমানে রাষ্ট্রকে কল্যাণব্রতী সংস্থা হিসাবেই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আইনসভাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া এবং সীমাবদ্ধ রাখিয়া সরকারের কার্যকলাপের ঐক্য, গতি ও অবিচ্ছিন্নতাকে ব্যাহত করার কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় পরিষদ থাকার ফলে আইনসভার কার্য ও দায়িত্ব পংগু হইতে বাধ্য।

বিপরীত ধারণা পোষণকারী লেখকগণ অবশ্য বলেন যে, দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায় নাই। ইহার বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে তাহা ইহার অগণতান্ত্রিক রূপের জন্যই। যদি দ্বিতীয় পরিষদকে গণতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া গঠন করা যায় তবে ইহা চিরকালই সংশোধন-কারী পরিষদ হিসাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারে।

আইনসভার মর্যাদাহ্রাস—সাম্প্রতিক গতি ও কার্য-পদ্ধতি (Decline of Legislatures—Recent Tendencies and Practices): সাম্প্রতিক কালের অন্যতম জিজ্ঞাস্য বিষয় হইল, বিভিন্ন দেশের আইনসভাগুলির মর্যাদাহ্রাস পাইয়াছে কি না? উত্তরে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই অভিমত প্রকাশ করেন যে বর্তমান দিনে আইনসভার অবনতি ঘটিয়াছে এবং আমলাতন্ত্র ও ক্যাবিনেটের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কি না এবং গ্রহণযোগ্য হইলে কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

আইনসভার মর্যাদাহ্রাস—বিভিন্ন দিক: আলোচনার প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে আইনসভার মর্যাদাহ্রাস বা অবনতি বলিতে (ক) আইনসভার ক্ষমতাহ্রাস (decline in powers), (খ) দক্ষতাহ্রাস (decline in efficiency), (গ) আইনসভার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাহ্রাস (decline in public esteem) ইত্যাদির যে-কোনটিকে বুঝাইতে পারে।

১. "The single chamber and magnicompetent legislative assembly seems … best to answer the needs of the modern State."

মর্যাদাহ্রাসের বিশ্লেষণ: বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই শাসন বিভাগের তুলনায় আইনসভার ক্ষমতা যে হ্রাস পাইয়াছে সে-সম্পর্কে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। শাসন বিভাগের এই ক্ষমতাবৃদ্ধি ও প্রাধান্যের মূলে রহিয়াছে বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক অবস্থার অনিশ্চয়তা, আর্থিক সংকট এবং কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের নীতি। পরিবর্তনশীল জগতে দ্রুত এবং দক্ষতার সহিত এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শাসন বিভাগের হস্তে ব্যাপক—অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীনও—ক্ষমতা ন্যস্ত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আইনসভা নীতি-নির্ধারণ করিতে পারে, কিন্তু নীতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্বভার বহন করিতে হয় শাসন বিভাগকে। ফলে জনসাধারণের কল্যাণ-অকল্যাণ মূলত এই শাসন বিভাগের উপরই নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণও বর্তমানে আইনসভার তুলনায় শাসন বিভাগকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে।

লিপসন: এই প্রসংগে মার্কিন লেখক লেস্‌লি লিপসনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, "যদি রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি হয় উহার কর্মপরিধি, তবে সরকারের উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠি হইল উহার শাসন বিভাগের কর্মচারীদের কাজকর্ম"। কারণ, রাষ্ট্রীয় নীতি সার্থক হইবে কি ব্যর্থ হইবে তাহা নির্ভর করে শাসনকার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর।[১]

আবার আইন প্রণয়ন আইনসভার ক্ষমতা হইলেও বর্তমানে অনেক বিষয়েই—এমনকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে সরিয়া গিয়াছে। দুই দিক দিয়া শাসন বিভাগকে এখন মৌল আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

প্রথমত, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ এবং আইনসভাকে পরিচালিত করে শাসন বিভাগ। এই উক্তি যে শুধু ব্রিটেনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহাই নহে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হইবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে সেখানেও ঐ একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, নিয়মকানুন (regulations), আদেশনির্দেশ (orders) প্রভৃতির মাধ্যমে শাসন বিভাগ সরাসরি আইন প্রবর্তন করিয়া থাকে। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে আইনসভার নিকট হইতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শাসন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

মর্যাদাহ্রাসের কারণ: এরূপ ঘটিবার একাধিক কারণও রহিয়াছে। কার্যের চাপ ও সময়ের অভাবের দরুন বর্তমানে আইনসভার পক্ষে সকল বিষয়ে বিস্তৃত আইন পাস করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া বর্তমান সমাজের সমস্যা একাধারে জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করার যোগ্যতা বা

---

১. "If the state is what its functions are, a government becomes what its functionaries do. It is the administrator who makes or mars the policy." L. Lipson : *The Great Issues of Politics*

ক্ষমতা আইনসভার থাকে না। ফলে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভা আইনের সাধারণ সূত্র বা নীতি ঠিক করিয়া দেয় এবং আদেশ-নির্দেশ, নিয়মকানুন, উপ-আইন (bye-laws) প্রভৃতির সাহায্যে আইনের খুঁটিনাটি পূরণ করার ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

(১) শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ : ইহাকেই বলা হয় অর্পিত ক্ষমতাবলে শাসন বিভাগের আইন প্রণয়নক্ষমতা (Delegated Legislation)। শাসন বিভাগের আইন প্রবর্তনের ক্রমবর্ধমান এই ক্ষমতা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে আইনসভা বর্তমানে আইন প্রণয়নের একমাত্র সংস্থা, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাও নয়—শাসন বিভাগ এখন আইন প্রণয়ন বিষয়ে একরূপ প্রধান অংশীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) দলীয় নিয়মানুবর্তিতার দরুন আইনসভার ক্ষমতাহ্রাস : অন্যান্যভাবেও আইনসভার মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। দলীয় ব্যবস্থা আইনসভার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয় ; অনেক সময় ইহাও বলা হয় যে শাসন বিভাগ বা আইনসভা উভয়ের কাহারও হস্তেই প্রকৃত ক্ষমতা নাই, কার্যত সকল ক্ষমতাই বর্তমানে হস্তান্তরিত হইয়াছে রাজনৈতিক দলের নিকট।[১] মোটকথা, দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়ন্ত্রণ বিভিন্নভাবে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রথমত, ইহার ফলে আইনসভার বিতর্ক নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে বা ম্যাথু আরনল্ডের (Mathew Arnold) ভাষায় 'অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক গোলযোগে' (sterile hubbub of politics) পরিণত হইয়াছে। কারণ, দলীয় নির্দেশ ও নিয়মানুবর্তিতা থাকায় বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে আইনসভায় ভোটের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত কি হইবে না-হইবে তাহা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে—বিতর্কের ফলে উহার কোন তারতম্য ঘটে না বলিয়া কেহই বিশেষ আইনসভায় তর্কবিতর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। দ্বিতীয়ত, দলীয় নিয়ন্ত্রণ থাকায় আইনসভার সদস্যদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু বলিবার বা করিবার সুযোগও থাকে না। ইহার দরুন আইনসভায় গুণীজ্ঞানী ও সমাজোৎসাহী ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলগুলিও প্রার্থী নির্বাচনের সময় স্বাধীনচেতা ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাদ দিতে চেষ্টা করে, কারণ তাহা না হইলে দলের অসুবিধা হয়।[২]

(৩) আইনসভার বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব : আবার বর্তমানে আইনসভা দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিচারবিবেচনায় একমাত্র বা কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া

১. "Executive and Legislature, Government and Parliament, are constitutional facades ; in reality the Party alone exercises power." M. Duverger

২. "The independence of members has suffered by the more stringent party discipline. The results are seen in the diminished deference accorded to Parliament, perhaps also in its slightly diminished attractiveness for able and public-spirited men." Lord Bryce

নাই। সংবাদপত্র ছাড়াও আকাশবাণী ও দূরদর্শন (television) এখন আইনসভার অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কার্য করিতেছে। একথাও বলা বোধ হয় ভুল হইবে না যে, আকাশবাণী ও দূরদর্শনের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা জনসাধারণের নিকট আইনসভার সদস্যদের বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় হইয়া থাকে। এদিক হইতেও আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে।

(৪) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা: আইনসভার অন্যতম প্রধান কার্য হইল বিতর্কাদির মাধ্যমে জনসাধারণের অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে এই কার্য সম্পাদনের মাধ্যম শুধু আইনসভাই নয়, ব্যবসায় শ্রম ও পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও (pressure groups) বটে। এই সকল সংগঠন বা গোষ্ঠী শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভার সদস্যদের মারফত অভিযোগ জ্ঞাপনের প্রয়োজন বোধ হয় না। এই অভিযোগও করা হয় যে, অনেক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়া যাওয়ার পর উহাকে আইনসভার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। আইনসভার সদস্যগণ উহার সমালোচনা বা সংশোধনের প্রচেষ্টা করিলে ঐ প্রচেষ্টাকে এই বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে, সরকার বহু বিচারবিবেচনা ও আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনসভার বিচারবিবেচনার স্বাধীনতা বর্তমানে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

অধস্তন বা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Subordinate or Delegated Legislation) : অধস্তন আইন বলিতে শাসন বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত বা অধস্তন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত আইনকে বুঝায়।

বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই শাসন বিভাগের হস্তে নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন এবং আদেশনির্দেশ প্রদানের প্রভূত ক্ষমতা (making of rules, orders and regulations) অর্পণ করা হয়। বহুদিন হইতেই শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা চলিয়া আসিলেও বর্তমানে ইহা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার মূলে আছে সমস্যার জটিলতা ও রাষ্ট্রকার্যের পরিধি বিস্তার। জটিল হইতে জটিলতর এবং সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনমত ও সময়মত বিস্তৃত আইন প্রণয়ন করা কোন আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না বলিয়া প্রত্যেক দেশেই আইনসভা শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অধ্যাপক বার্কার উক্তি করিয়াছেন যে, আঠার শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যদি হয় ব্যবস্থা বিভাগের সম্প্রসারণ তাহা হইলে বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল শাসন বিভাগের ক্ষমতার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি।[১]

অধস্তন বা শাসন বিভাগীয় আইন কাহাকে বলে: বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনসভা বিস্তৃতভাবে আইন পাস করে না, মাত্র সাধারণ নীতিগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া আইনের ফাঁক পূরণের ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয় শাসন বিভাগের হস্তে। শাসন বিভাগ আইনকে প্রয়োগ করিবার সময় বিস্তৃত নিয়মকানুন বা আদেশনির্দেশ রচনা করিয়া আইনের ফাঁক পূরণ করিয়া লয়। এই সকল নিয়মকানুন ও আদেশ-নির্দেশকে অধস্তন আইন (subordinate legislation) বা শাসন বিভাগীয় আইন (administrative legislation) বা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (delegated legislation) বা শাসনদপ্তর-প্রবর্তিত আইন (departmental legislation) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের কারণ (Reasons for Delegated Legislation): সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার ব্যাপক ক্ষমতা সমর্পণ করিবার বহু কারণ রহিয়াছে। (ক) সকল দেশেই রাষ্ট্রকার্যের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে আইনসভা সকল আইন বিস্তৃতভাবে প্রণয়ন করিবার সময় পায় না। ফলে উহা আইনের প্রধান নীতিগুলি স্থির করার পর খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মকানুন ও আদেশনির্দেশ রচনা করার ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

(খ) অনেক ক্ষেত্রেই আইনের বিষয়বস্তু জটিল ও প্রযুক্তিগত (technical)। যেমন, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি অথবা ঔষধপত্র প্রভৃতি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিবার।[২] এই পরামর্শ যাহাতে সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে শাসন বিভাগকে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

(গ) বর্তমান রাষ্ট্রের সমস্যাসমূহ দ্রুত পরিবর্তনশীল—নিত্যনূতন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়াই থাকে। রাষ্ট্র যে-সকল জনকল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহা কার্যকর করিতে হইলে শাসন বিভাগকে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা দিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, আইনসভা-প্রণীত আইনের বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান গতিশীল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। যাহাতে আইনসভা কর্তৃক রচিত আইন ক্ষেত্রোপযোগী হয় এবং যাহাতে উহার অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন হইল শাসন বিভাগকে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিয়মকানুন প্রবর্তন করিবার অধিকার দিবার।

---

১. "If the growth of the legislative organ ... was the notable feature of the eighteenth century, ... the growth of the executive organ, ... is the notable feature of the twentieth." Barker: *Principles of Social and Political Theory*

২. Finer: *The Theory and Practice of Modern Government*

(ঘ) পরিশেষে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে শাসন বিভাগের পক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যেমন, যুদ্ধ খাদ্যসংকট প্রভৃতি দেখা দিলে শাসন বিভাগকে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্যাপক নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে হয়। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেই দেখা যায় যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় আইনসভা শাসন বিভাগের হস্তে উপযুক্ত নিয়মকানুন প্রণয়নের অতি ব্যাপক ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া থাকে।[১]

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের নিয়ন্ত্রণ (Control of Delegated Legislation): দেখা গেল, মোটামুটি সকল দেশেই বর্তমানে শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। রাষ্ট্র যত বেশী সমাজ-কল্যাণকর কাজকর্ম নিজের হস্তে তুলিয়া লইতে থাকিবে এবং সমাজ-পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিবে শাসন বিভাগের এই ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

নয়া স্বৈরাচার: এই নীতি সম্পর্কে অনেক চিন্তাবিদ আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার ফলে শাসন বিভাগের স্বৈরাচারিতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেমন লর্ড হিউয়ার্ট তাঁহার 'নয়া স্বৈরাচার' (The New Despotism) গ্রন্থে শাসন বিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা ঠিক যে সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তাহা হইলেও দেখিতে হইবে শাসন বিভাগ যেন উহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিবার সুযোগ না পায়। সুতরাং শাসন বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের উপর যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

অর্পিত ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: এ-ব্যাপারে প্রায় সকল সভ্যদেশই কিছু না কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

ক। ইংল্যাণ্ড: (১) ইংল্যাণ্ডে প্রায় ক্ষেত্রেই শাসন বিভাগ কর্তৃক রচিত নিয়মকানুন পার্লামেন্টের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সম্মতি-সূচক প্রস্তাব পাস হইলে তবেই নিয়মকানুন কার্যকর হইতে পারে, আর পার্লামেন্ট প্রত্যাখ্যানমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ঐগুলি বাতিল হইয়া যায়। (২) ইহার উপর পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুনকে বিচারবিবেচনা করিবার জন্য এবং নিয়মকানুনের অকাম্য দিকের প্রতি সংশ্লিষ্ট কক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সিলেক্ট কমিটি (Select Committees) রহিয়াছে। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ অনুসারে পার্লামেন্ট অধস্তন আইনের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

(৩) শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুনের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিচারালয়েরও ভূমিকা রহিয়াছে। তবে ইংল্যাণ্ডে এই ভূমিকা কতকটা সীমাবদ্ধ। বিচারালয় শাসন বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মকানুন বিধি-বহির্ভূত (*ultra vires*) কিনা—অর্থাৎ মূল আইন কর্তৃক যে-ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অধিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা দেখিতে পারে; কিন্তু উপ-আইন (bye-laws) ব্যতীত অন্যান্য শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুনের যৌক্তিকতা (reasonableness) বিচার করিতে পারে না।

১. "In times of war ... It is usual for wide powers of law-making to be delegated to the executive by the legislature." K. C. Wheare: *Legislatures*

খ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভাগীয় নিয়মকানুনগুলিকে আইনসভার নিকট বিচারবিবেচনা বা অনুমোদনের জন্ম উপস্থিত করা হয় না, প্রধানত বিচারালয়ের মাধ্যমেই উহারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (১) নিয়মকানুনের কোনটি বিধি-বহির্ভূত কি না, আদালত মাত্র এই প্রশ্নেরই শুধু বিচার করিতে সমর্থ নয় উহার যৌক্তিকতাও (reasonableness) বিবেচনা করিতে পারে। (২) ইহা ব্যতীত আদালত দেখে যে সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন সংবিধানের ধারা লংঘন বা সংবিধান-সংরক্ষিত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে কি না। (৩) আবার যে মূল আইন দ্বারা শাসন বিভাগের হস্তে নিয়মকানুন রচনা করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সেই আইনটি সংবিধানকে লংঘন করিয়া থাকিলে ঐ আইনবলে রচিত শাসন বিভাগীয় প্রবর্তিত নিয়মকানুনও বাতিল হইয়া যায়। (৪) আদালতের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য উপায় হইল, যে-আইনের দ্বারা নিয়মকানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে সমর্পিত হয় সেই আইনকে সুস্পষ্টভাবে রচনা করা হয়, নিয়মকানুন প্রবর্তনের পূর্বে উহাকে জনসাধারণের অবগতির জন্ম প্রকাশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহের সহিত নিয়মকানুন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হয়।

গ। ভারত: ভারতীয় সংবিধানে অধস্তন আইনের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। সংবিধানের ১৩(৩)(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধি-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবর্তিত 'আদেশ' (order), 'উপ-আইন' (bye-law), 'নিয়ম' (rule), 'নিয়ন্ত্রণ' (regulation) প্রভৃতি আইনের পর্যায়ে পড়ে। এইভাবে আইনসভা নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা 'অধস্তন' হস্তে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেও সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হইল যে, আইনসভা তাহার 'আইন প্রণয়নের মূল ক্ষমতা' (essential powers of legislation) হস্তান্তরিত বা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এখন প্রশ্ন, 'আইন প্রণয়নের মূল ক্ষমতা' বলিতে ঠিক কি বুঝায়? সুপ্রীম কোর্টের ভাষায় ইহা হইল আইনের নীতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া (laying down the policy of the law)। অতএব, আইনসভা আইনের নীতি নির্ধারণ বা নীতি পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা অন্ম বিভাগের হস্তে সমর্পণ করিলে উহা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আইনের নীতি ঠিক করিয়া দেওয়া হইলে বিস্তৃত নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা সমর্পণের পথে কোন বাধা নাই।

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা: ভারতে শাসন বিভাগীয় এই নিয়মকানুন বা অধস্তন আইন নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় হইল: (১) পার্লামেন্টীয় নিয়ন্ত্রণ (Parliamentary Control), (২) বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ (Judicial Control) এবং (৩) প্রচার (Publicity)। (ক) শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুন পার্লামেন্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। (খ) ইহা ছাড়া যে-আইন দ্বারা শাসন বিভাগের হস্তে নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সেই আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইয়াছে কি না সে-সম্পর্কে বিচারবিবেচনা এবং লোকসভার নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্ম অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Subordinate Legislation) নামে লোকসভার একটি কমিটি রহিয়াছে।

(গ) বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিচারালয় বিচার করিতে পারে যে, (১) ক্ষমতা সমর্পণকারী মূল আইনটির শাসনতান্ত্রিক বৈধতা আছে কি না—অর্থাৎ, মূল আইনটি সংবিধানকে ভংগ করিয়াছে কি না। যে-ক্ষেত্রে মূল আইনটি অবৈধ হয় সে-ক্ষেত্রে ঐ আইন কর্তৃক প্রদত্ত অধস্তন আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও বাতিল হইয়া যায়। (২) ইহা ছাড়া শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুন সংবিধানের কোন বিধানকে ভংগ করিয়া থাকিলে বিচারালয় উহাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে। সংবিধান-বহির্ভূত কি না, তাহা বিচারের সময় অনেক বিষয় সম্পর্কে আদালত নিয়মকানুনের 'যৌক্তিকতা'ও (reasonableness) বিচার করিতে সমর্থ। (৩) সংবিধানভংগের প্রশ্ন ছাড়া আদালতকে দেখিতে হয়, নিয়মকানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা যে-আইন দ্বারা সমর্পিত হইয়াছে নিয়মকানুনগুলি সেই মূল আইনের সীমাকে লংঘন করিয়াছে কি না। সীমা লংঘন করিয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুনগুলিকে আদালত বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করে।

(খ) সুপ্রীম কোর্টের মতে আবার যেহেতু শাসন বিভাগীয় নিয়মকানুনগুলি সাধারণ আইনের মত প্রকাশ্যে প্রণীত হয় না, সেই হেতু উহাদের সম্যক প্রচারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নচেৎ, উহাদিগকে আইন বলিয়া গণ্য করা অযৌক্তিক হইবে।

শাসন বিভাগ (The Executive): ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন ও বিচারের সহিত সম্পর্কিত ছাড়া সরকারের অপর সকল কর্মচারীকেই লইয়া গঠিত হয়।

এইদিক দিয়া শাসন বিভাগ হইল "আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যকর করিবার জন্য সকল কর্মসচিব ও কর্মচারীর সমষ্টি।"

কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগকে বুঝানো হয় না। মাত্র প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive) ও প্রধান কর্মসচিবগণকে লইয়াই শাসন বিভাগ গঠিত বলিয়া ধরা হয়। শাসন বিভাগকে এইরূপ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবার সপক্ষে যুক্তি হইল যে, প্রধান কর্মকর্তা ও প্রধান কর্মসচিবগণই আইন অনুসারে নীতি নির্ধারণ করিয়া অধস্তন কর্মচারিগণের মাধ্যমে তাহা কার্যকর করেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য হইল নীতি-নির্ধারণ। অধস্তন কর্মচারীদের কার্য হইল নীতি প্রবর্তন। নীতি নির্ধারণই শাসন বিভাগের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কার্য। নীতি প্রবর্তনের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের শাসন বিভাগের অপর সকল কর্মচারী হইতে পৃথক করিয়া দেখা উচিত।

শ্রেণীবিভাগ: শাসন বিভাগকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়: যেমন, প্রকৃত ও নামসর্বস্ব শাসক (nominal and real executive), (খ) রাজনৈতিক ও স্থায়ী শাসক (political and parmanent executive), এবং (গ) এক ব্যক্তিবিশিষ্ট ও একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসক (single and prural executive) প্রভৃতি।

ক। প্রকৃত ও নামসর্বস্ব শাসক: প্রকৃত শাসক বলিতে বুঝায় তাহাদের যাহারা প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য ও শাসননীতি পরিচালনা বা নির্ধারিত করে। অপরদিকে যে শাসক নামেমাত্র শাসক তাহাকে বলা হয় নামসর্বস্ব শাসক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটেন ভারত প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যায়। এই সকল দেশে শীর্ষপ্রধান নামসর্বস্ব, প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেমন, ব্রিটেনের রাণী বা ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন নামসর্বস্ব শাসক, কারণ ইহারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে মন্ত্রি-পরিষদ। ব্রিটেনের রাণী বা ভারতের রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। সুতরাং মন্ত্রি-পরিষদই প্রকৃত শাসক।

খ। রাজনৈতিক ও স্থায়ী শাসক: রাজনৈতিক শাসকরা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত হন এবং প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার দায়িত্বশীল থাকেন। আইনসভার আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহা ছাড়া নির্বাচনে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলে ইহারা পদচ্যুত হন। যেমন, ভারত ও ব্রিটেনে মন্ত্রীরা আইনসভায় আস্থা হারাইলে অথবা নির্বাচনে উহাদের দল পরাজিত হইলে মন্ত্রিপদ হইতে অপসারিত হন। অপরপক্ষে স্থায়ী শাসকের দৃষ্টান্ত হইল সরকারী কর্মচারী বা আমলাগণ। ইহারা পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োজিত হন। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ীভাবে চাকরি করেন। রাজনৈতিক শাসকশ্রেণীর উত্থানপতনের ফলে ইহারা চাকরি হইতে অপসারিত হন না।

গ। এক এবং একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগ : এক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগ বলিতে বুঝায় সেইরূপ শাসন বিভাগ যেখানে চরম শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে।[১] অপরপক্ষে একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগে শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট সংস্থা ভোগ করিয়া থাকে।

এক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের দৃষ্টান্ত : এক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও শাসকপ্রধান। সমস্ত শাসনক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। উইলসনের ভাষায়, "সমগ্র জাতি তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছে এবং তাহারা সম্পূর্ণ সচেতন যে তাহাদের আর কোন মুখপাত্র নাই। শাসনকার্যে তাঁহার মতামতই জাতীয় মতামত। মার্কিন দেশবাসীরা চায় ঐক্যবদ্ধ শাসনকার্য; সুতরাং তাহারা কামনা করে একক নেতৃত্ব।" রাষ্ট্রপতির অবশ্য একটি ক্যাবিনেট রহিয়াছে কিন্তু ক্যাবিনেটের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী বা কেরানী মাত্র—সহকর্মী নন। ইঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রয়োজনমত রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নন। ইঁহাদের কোন যৌথ দায়িত্ব বা নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা নাই। সকল দায়িত্বই বহন করিতে হয় রাষ্ট্রপতিকে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগে সর্বময় কর্তা হইলেন রাষ্ট্রপতি।

চরম রাজতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদী বা নাৎসিবাদী নায়কতন্ত্রকেও এক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের দৃষ্টান্ত : একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (The Federal Conncil)। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যপালিকা শক্তি বা শাসনক্ষমতা কোন একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই। ন্যস্ত করা হইয়াছে,আইনসভা কর্তৃক মনোনীত এবং ৭জন সদস্য লইয়া গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নামক এক সংস্থার হস্তে। পরিষদের সদস্যগণ (Councellors) সমকর্তৃত্বসম্পন্ন। সদস্যগণের মধ্য হইতে এক

---

১. "In a single executive, the final control belongs to one individual. In a plural executive the control lies with two individuals or with a council of several." R. N. Gilchrist

এক বৎসরের জন্ত একজন করিয়া সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এই সভাপতির পদ আনুষ্ঠানিক ও আলংকারিক মাত্র।

সোবিয়েত ইউনিয়নেও একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের সন্ধান পাওয়া যায়।[১] সোবিয়েত রাষ্ট্রের শীর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আছে একের স্থলে একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম (The Pesidium)। ইহাকে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (a Collegium President) বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। সোবিয়েত প্রেসিডিয়ামের একজন সভাপতি আছেন কিন্তু কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কার্য ছাড়া তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। প্রেসিডিয়াম ছাড়া শাসনকার্য পরিচালনার জন্ত রহিয়াছে মন্ত্রি-পরিষদ। মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ নাকচ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের আছে।

এক ও একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট ব্যবস্থার সমন্বয়: ইংল্যাণ্ড বা ভারতের স্থায় দেশের পার্লামেন্টীয় বা ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা এক এবং একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের এক প্রকার সমন্বয়। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান হইলেন নিয়মতান্ত্রিক-নামমাত্র শাসক। তিনি মাত্র আনুষ্ঠানিক কতকগুলি কাজকর্ম করিয়া থাকেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা হইল মন্ত্রি-পরিষদ বা ক্যাবিনেটের হস্তে ন্যস্ত। ক্যাবিনেটই নীতি-নির্ধারণ করে এবং শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। মন্ত্রি-পরিষদ বা ক্যাবিনেট প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীকে লইয়া গঠিত।

তত্ত্ব ও বাস্তবে পার্থক্য: সুতরাং তত্ত্বগতভাবে বলিতে হয় যে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা হইল একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের (plural executive) দৃষ্টান্ত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেট একক শাসকের (single executive) মত কার্য করে।[২]

অধ্যাপক ফ্রেড্রিক (C. J. Friedrich) উক্তি করিয়াছেন যে ব্রিটেন, ডোমিনিয়ন-সমূহ, ফ্রান্সের মত দেশে একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগ ক্রমশ একক শাসক-নিয়ন্ত্রিত সরকারের দিকে ঝুঁকিতেছে।[৩]

ক্যাবিনেট যে একক শাসকের মত কার্য করে তাহা কতকগুলি বিষয় হইতে বুঝা যায়: (ক) প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রি-পরিষদ হইল একক সংস্থা। উহা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করে এবং যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল। (খ) মন্ত্রি-পরিষদ বা ক্যাবিনেটে প্রধান মন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রাধান্য বর্তমানে সকলেই স্বীকার করেন। তত্ত্বগতভাবে অন্যান্য মন্ত্রী তাঁহার সহকর্মী হইলেও তিনি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতই তিনি ইহাদের পদচ্যুত

১. A. Y. Vyshinsky: *The Law of the Soviet State*; and Carl J. Friedrich: *Comparative Government and Democracy*

২. "Technically, the cabinet is a plural executive with decision-making powers shared by the prime minister, the ministry and the cabinet. But in practice, it generally operates much like the single executive." Cord, Medeiros and Jones: *Political Science*

৩. Carl J. Friedrich: *Constitutional Government and Democracy*

করিতে সমর্থ। যদিও বলা হয়, ক্যাবিনেট যৌথভাবে সরকারী নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমানে প্রধান মন্ত্রীই সরকারী নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ক্যাবিনেটের উপর চাপাইয়া দেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বলা হয় যে বর্তমানে অন্যান্য মন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রীর 'এজেন্ট' (agents) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

নতুন আখ্যা 'প্রধান মন্ত্রী-শাসিত সরকার': এই কারণে অনেকের অভিমত হইল যে বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার মত শাসন-ব্যবস্থাকে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা না করিয়া প্রধান মন্ত্রী-শাসিত সরকার (Prime-Ministerial Government) বলিয়াই অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।[১]

মোটামুটিভাবে অনুরূপ মন্তব্য প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

এক এবং একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Single and Plural Executives): এক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়: **গুণ:** (১) এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সরকার শক্তিশালী হয় এবং দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা সম্ভব হয়। কারণ, একজন মাত্র ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় অযথা আলাপ-আলোচনার দ্বারা সময়ের অপচয় ঘটে না। (২) শাসন-ব্যবস্থায় ঐক্য ও লক্ষ্যমাত্রার স্থিরতা একক শাসকের আর একটি অন্যতম গুণ। (৩) ইহাতে শাসন-কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। (৪) শাসনকার্যের তথ্যাদির গোপনীয়তাও এই ব্যবস্থায় সুনিশ্চিত করা সহজ হয়।

ত্রুটি: এক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের কতকগুলি ত্রুটির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বলা হয় (১) একক শাসন-ব্যবস্থায় বিপদ হইল যে উহা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে এবং অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইতে পারে। (২) ইহা ছাড়া শাসন বিভাগ একাধিক ব্যক্তির হস্তে থাকিলে সরকারী নীতির উৎকর্ষ যে ভাবে নিশ্চিত হয় একক শাসকের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, কারণ একক শাসন বিভাগে সমষ্টিগতভাবে নীতি লইয়া বিচারবিবেচনায় অবকাশ বিশেষ থাকে না।

বহু ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের গুণ: অপরপক্ষে বহু ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের সপক্ষে বলা হয় যে (১) এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় বহু ব্যক্তি থাকায় শাসনক্ষমতার অপব্যবহার সহজে হয় না এবং সরকারী অত্যাচারের সম্ভাবনা কম থাকে। ফলে জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। (২) ইহা ব্যতীত ইহাতে সরকারী নীতি বা সিদ্ধান্ত এবং শাসনকার্য পরিচালনা উন্নত

---

১. "The post-war epoch has seen the final transformation of Cabinet Government into Prime-Ministerial Government." Crossman

ধরনের হয় এই কারণে যে বহু ব্যক্তির মতামত বিচারবিবেচনা করিয়া শাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়।

ত্রুটি : বহু ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগের যে ত্রুটিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাহা হইল এইরূপ : বলা হয় যে (১) এরূপ শাসন-ব্যবস্থা বহুজনবিশিষ্ট বলিয়া ইহা বিভক্ত এবং ঐ কারণেই উহা দুর্বল। (২) শাসন বিভাগের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করা কঠিন, কারণ উহা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত থাকে। (৩) ইহা শ্লথগতিসম্পন্ন এবং বিপজ্জনক বা জরুরী অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনে অপারগ হইতে পারে। (৪) শ্লথগতিসম্পন্ন বলিয়া ইহা সময়ের অপচয় ঘটায়। পরিশেষে (৫) যে-ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া জরুরী অবস্থায়—গোপনীয়তা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন সে-ক্ষেত্রে সরকারী কার্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি (Modes of Choice of Chief Executive) : প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (১) উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনয়ন, (২) নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়ন, (৩) ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা মনোনয়ন, এবং (৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনয়ন।

(ক) উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনয়ন : উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়ন রাজতন্ত্রের সহিতই জড়িত। রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে কর্মকর্তা রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং রাজাই হইলেন প্রধান কর্মকর্তা। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজা তত্ত্বগতভাবে এরূপ প্রধান কর্মকর্তা হইলেও কার্যত তিনি নামসর্বস্ব শাসনকর্তা (Nominal Executive) মাত্র।

(খ) নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়ন : নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান কর্মকর্তার মনোনয়ন দুই প্রকারের রূপ গ্রহণ করিতে পারে : (ক) প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচন এবং (খ) পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) দ্বারা নির্বাচন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচন হইল জনগণের সার্বভৌমিকতারই একটি প্রকাশ। জার্মেনীর ভূতপূর্ব ওয়েমার শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে এইভাবে নির্বাচিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির প্রধান কর্মকর্তাসমূহ ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলির স্থানীয় শাসকবর্গ এইভাবেই মনোনীত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা তত্ত্বের দিক দিয়া পরোক্ষ হইলেও দলীয় সংগঠনের ফলে কার্যত ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) আইনসভা দ্বারা মনোনয়ন : আইনসভা দ্বারা প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের ব্যবস্থা প্রথমে করা হয় ফ্রান্সে। ১৮৭৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জাতীয় আইনসভার দুই কক্ষের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (The Federal Council) যুক্তরাষ্ট্রীয়

আইনসভা দ্বারাই নির্বাচিত হয়। ভারতীয় সংবিধানও আইনসভার মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি হইল যে, শাসনকার্য পরিচালনার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সম্পর্কিত তাঁহাদের হস্তেই প্রধান শাসক মনোনয়নের ভার দেওয়া উচিত। অপরদিকে বলা হয়, এই ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের বিরোধী বলিয়া ইহা কাম্য নহে।

(ঘ) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনয়ন: যে-সকল প্রধান কর্মকর্তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (superior authority) দ্বারা মনোনীত হন তাঁহারা কখনই সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নহেন, কারণ সার্বভৌম রাষ্ট্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলিয়া কিছু নাই। ডোমিনিয়নগুলিকে (Dominions) সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, ব্রিটেনের রাজা বা রাণী দ্বারা ইহাদের গভর্ণর-জেনারেলের মনোনয়ন সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মনোনয়ন করিয়া থাকে ডোমিনিয়নের ক্যাবিনেট—রাজা বা রাণী সম্মতি প্রদান করেন মাত্র।

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive): রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্যও বিশেষ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে-সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা: পূর্বে মনে করা হইত যে রাষ্ট্রের কার্য হইল সংখ্যায় মাত্র দুইটি: আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা রাষ্ট্রের বহুবিধ কার্যের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র এবং ইহাকে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা না বলিয়া ব্যাপকতরভাবে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা (internal administration) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা বলিতে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা ছাড়াও অধস্তন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, রাষ্ট্রভৃত্যদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন পাস প্রভৃতি বুঝায়। যে দপ্তরের উপর আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বা আভ্যন্তরীণ দপ্তর (Department of the Interior) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

(২) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য: বর্তমানে পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্যকে শাসন বিভাগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য বলিয়া ধরা হয়। পরিবহণ, সংসরণ ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে—বর্তমানে কোন দেশই এককভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একটি করিয়া পররাষ্ট্র দপ্তর আছে এবং এই দপ্তরের সাহায্যে রাষ্ট্র পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করিয়া থাকে।

পররাষ্ট্র ব্যাপারে পরিচালনা বলিতে অপরাপর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ, অপরাপর রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা সাহায্যদান প্রভৃতি—সকলই বুঝায়। অনেক রাষ্ট্রে অবশ্য যুদ্ধ সন্ধি ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শাসন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত নাই। তবে এই সকল ব্যাপারে শাসন বিভাগেরও সম্মতি প্রয়োজন। সুইজারল্যাণ্ডে আবার ১৫ বৎসরের অধিককাল সন্ধিকে কার্যকর করিতে হইলে গণভোটের প্রয়োজন হয়।

তবুও সাধারণভাবে বলা যায়, যুদ্ধ সন্ধি ইত্যাদি পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার শাসন বিভাগেরই কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

---

(৩) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা : যুদ্ধ ঘোষণা অনেক সময় ব্যবস্থা বিভাগের সম্মতির উপর নির্ভর করিলেও যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি সেনানায়কগণকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করেন, সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনার দায়িত্বও বহন করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে তিনি সামরিক আইন জারি করিতে পারেন, সাধারণের মৌলিক অধিকার অস্থায়ীভাবে কাড়িয়া লইতে পারেন, সামরিক প্রয়োজনে সরকারের কর্তৃত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে পারেন। যে দপ্তরের মাধ্যমে সশস্ত্রবাহিনী ও সমরবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করা হয় তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বা যুদ্ধ দপ্তর (War Department) বলে।

(৪) অর্থসংক্রান্ত কার্য : সকল সরকারের পক্ষে বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থ যখন ব্যয় হয় তখন অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হয়। সরকারী ব্যয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয় করধার্য করিয়া, সেবামূলক কার্য সম্পাদন করিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে। অবশ্য ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত করধার্য বা ব্যয়বরাদ্দের ব্যবস্থা করা না গেলেও কার্যক্ষেত্রে করসংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। যে বিভাগের মাধ্যমে এই কার্য করা হইয়া থাকে তাহাকে অর্থ দপ্তর (Finance Department) বা রাজস্ব দপ্তর (Treasury) বলে। করসংগ্রহ ও ব্যয়বরাদ্দ করা ছাড়াও অর্থ দপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

(৫) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য : পার্লামেন্টীয় বা সংসদীয় সরকারের শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়ন কার্য পরিচালনাই করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়ন কার্যে কিছু কিছু অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই শাসন-কর্তৃপক্ষের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার, অধিবেশন স্থগিত রাখিবার এবং আইনসভার নিম্নতর কক্ষকে ভাঙিয়া দিবার অধিকার থাকে। অনেক রাষ্ট্রে আবার শাসন বিভাগীয়

প্রধানের আইনসভা কর্তৃক পাস করা বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা আছে।

অনেক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের জরুরী অবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারি করিবার ক্ষমতাও আছে।

অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন : এইভাবে আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করা ছাড়া বর্তমানে শাসন বিভাগ আইনসভা কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলেও বহুপ্রকার উপ-আইন (by-laws), নিয়মাবলী (regulations) প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেছে। এই প্রকার আইন প্রণয়নকে বলা হয় অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (delegated legislation)।[১]

(৬) বিচারসংক্রান্ত কার্য : অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের এইরূপ বিচারসংক্রান্ত কার্য সমর্থন করা হয় এই কারণে যে, বিচার বিভাগ সকল সময় আইনের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া রায় দেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারের ত্রুটি থাকিতে পারে। শাসন বিভাগ উপরি-উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করে মাত্র।

ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি ছাড়াও শাসন বিভাগ অন্যভাবে বিচারসংক্রান্ত কার্যে অংশ-গ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি শাসন বিভাগের নিকট আনয়ন করা যায়, অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হইলে শাসন বিভাগের নিকট আবেদন দ্বারা তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি। এই প্রকার বিচারসংক্রান্ত কার্যকে বলা হয় শাসন বিভাগীয় বিচার (administrative justice)। রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে শাসন বিভাগীয় বিচারের পরিমাণও দিন দিন ক্রমবর্ধমান আকার ধারণ করিতেছে।

(৭) অন্যান্য কার্য : বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শাসন বিভাগকেও অন্যান্য নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইতেছে। শিক্ষা বিভাগ ও ডাক বিভাগ পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ প্রভৃতি মামুলী কর্তব্য ছাড়াও রাষ্ট্র আজ নানাবিধ সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই সকল কার্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আজিকার জন-কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ উত্তরোত্তর জনকল্যাণের সহিত জড়াইয়া পড়িতেছে।

উপসংহার : লর্ড ব্রাইস লিখিয়াছেন, জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আদায় করিতে হইয়াছে বলিয়া বহুদিন পর্যন্ত লোকে শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু জনসাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই সন্দেহ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্তমানে অনেকে ব্যবস্থা বিভাগকে ক্ষমতা প্রদানের পরিবর্তে শাসন বিভাগের হস্তেই অধিক

১. ৪৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্ষমতা সমর্পণের পক্ষপাতী। দেখা গিয়াছে, শক্তিশালী ও কর্মকুশল শাসন-কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা বিভাগ অপেক্ষা অধিক জনকল্যাণসাধনে সমর্থ। গেটেল বলেন, মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শাসন বিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির পথেই রাজনীতি অগ্রসর হইবে।[১]

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)—অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition): রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'আমলাতন্ত্রে'র সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। অনেক সময়ই নিন্দাসূচক অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যখন আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কথা বলা হয় তখন সরকারী প্রশাসন বিভাগ ও আমলাদের ত্রুটির প্রতি ইংগিত করা হইয়া থাকে। এই নিন্দাসূচক অর্থে আমলাতন্ত্র শব্দটির দ্বারা সরকারী প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘসূত্রতা, নিরর্থক নিয়মকানুন ও ফাইলপত্রের মধ্যে আবদ্ধতা (red tapism), সৌজন্যবোধের অভাব প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই 'আমলাতন্ত্র' শব্দটিকে মূল্য-নিরপেক্ষ অর্থে (value-neutral sense) ব্যবহার করার পক্ষপাতী—ইঁহাদের মতে 'আমলাতন্ত্র' শব্দটির মধ্যে কোনপ্রকার নিন্দার ব্যঞ্জনা নাই। ইঁহারা আমলাতন্ত্র বলিতে সরকারী প্রশাসন-ব্যবস্থা (administration) এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে বুঝেন।[২] আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমলাতন্ত্রের আলোচনা করিব।[৩]

এখানে উল্লেখ্য যে আমলাতন্ত্র ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন—সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের লইয়াই গঠিত।

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য: আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল যে (ক) আমলাগণ বা সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশনির্দেশ অধস্তন পর্যায়ের কর্মচারীদের পালন করিতে হয়। (খ) সকল কর্মচারীর কর্তব্য ও ভূমিকা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে এবং ইঁহাদিগকে ধরাবাঁধা নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও কার্যাদির লিখিত ফাইল ও রেকর্ডপত্রাদি রাখার ব্যবস্থা থাকে। (গ) সরকারী কর্মচারিগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। (ঘ) ইঁহারা সরকারী চাকরিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইঁহাদের পদোন্নতি যোগ্যতা ও কার্যকালের (merit and seniority) উপর নির্ভর করে।

---

১. "It seems likely that the immediate future of political development will be marked by a further expansion of the powers of the executive ... ."

২. "Many political scientists and political sociologists use the term 'bureaucracy' as an approximate synonym for 'administration' and, 'civil service'." Austin Ranney

৩. মার্ক্সবাদী লেখকদের মতে আমলাতন্ত্র বলিতে বুঝায় সরকারী কর্মচারীদের শাসনাধিপত্য (officialdom)। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই আমলাদের মাধ্যমেই বুর্জোয়াশ্রেণী উহার স্বার্থসাধন করে এবং জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। Carew Hunt-এর *A Guide to Communist Jargon* বইটি দেখ।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব (Importance of Bureaucracy): আমলাতন্ত্র সকল শাসন-ব্যবস্থারই অপরিহার্য অংগ। তবে বর্তমান দিনে প্রশাসন ও প্রশাসকদের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। "উনিশ শতক পর্যন্ত রাষ্ট্রের কার্য সহজ সরল সীমাবদ্ধ এবং নেতিবাচক (negative) ছিল—রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা, সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত করা এবং দেশকে বহিরাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা। ফলে প্রশাসন বিভাগেরও বিশেষ গুরুত্ব ছিল না।

বর্তমানে রাষ্ট্র হইল সক্রিয় রাষ্ট্র। অল্পবিস্তর সকল রাষ্ট্রই আজ জনকল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পপ্রসারের ফলে নানাপ্রকারের সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের উপর ঐ সকল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব পড়িয়াছে। মোটকথা, বর্তমানে মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নাই যেখানে রাষ্ট্রকে হাত বাড়াইতে হইতেছে না।

আবার বর্তমানে রাষ্ট্রকার্য শুধু বহুসংখ্যকই নহে, জটিলতাপূর্ণও বটে। ইহাদিগের যোগ্য সম্পাদন করিতে হইলে প্রয়োজন হয় অভিজ্ঞ, শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ও কর্মকুশল প্রশাসকদের। ইঁহারাই আইনসভা প্রণীত আইনকানুন ও রাজনৈতিক শাসন-কর্তৃপক্ষ (political executive) কর্তৃক নির্ধারিত নীতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সফলকাম করিতে পারেন। সুতরাং আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ইহাই শুধু নয়। সরকারী আইনকানুন ও নীতির উৎকর্ষ এবং কার্যকারিতাও নির্ভর করে সরকারী আমলাদের উপর সরকার যখন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আইন-কানুন প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণে উদ্যোগী হয় তখন উহাকে পরামর্শের জন্য আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। কারণ, প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা (expertise and experience) আমলাদেরই থাকে। তাঁহারাই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়া ও উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিয়া সরকারকে আইন প্রণয়নে ও নীতি-নির্ধারণে সহায়তা করেন।

উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসকদের বিশেষ গুরুত্ব: ভারতের মত স্বল্পোন্নত উন্নতিকামী দেশে এই আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল দেশে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি সমস্যা বিশেষ প্রকট। পরিকল্পনা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া এই দেশগুলি দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন কর্মপন্থার মাধ্যমে সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের (modernisation) দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়াছে। এখন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন হয় কলাকৌশলগত জ্ঞান (technical expertise) ও কর্ম-নৈপুণ্য। রাজনৈতিক শাসকগণ বা রাজনৈতিক নেতাদের এই জ্ঞান থাকিবার কথা নয়। তাঁহারা সাধারণ নীতির সন্ধান দিতে পারিলেও অভিজ্ঞ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও কর্মকুশল

প্রশাসক বা সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের পক্ষে কর্মসূচী নির্ধারণ রূপায়ণ বা কার্যকর করা সম্ভব নয়। সুতরাং উন্নতকামী দেশগুলির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে একদিকে সরকারী প্রশাসকদের দক্ষতার ও সামর্থ্যের উপর, অপরদিকে তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উদ্যোগের উপর।[১] এই কারণেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রয়োজন হয় সুদক্ষ ও দায়িত্বশীল আমলাতন্ত্র সংগঠিত করার।

আমলাদের কার্যাবলী (Functions): আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব হইতেই উহার কার্যাবলীর ইংগিত পাওয়া যায়। এখন সরকারী আমলাদের প্রধান প্রধান কার্যের কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

১। **আইকানুন ও সরকারী নীতি বলবৎকরণ:** সরকারী আমলাদের প্রাথমিক কর্তব্য হইল আইনসভা প্রণীত আইনকানুন, রাজনৈতিক শাসন-কর্তৃপক্ষ—যেমন, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট, রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি—কর্তৃক নির্ধারিত নীতি এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করা। বস্তুত, আইনকানুন, নীতি এবং সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার এবং দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে সরকারী আমলারা।[২] কতদূর সরকারী নীতি বা আইনকানুন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইবে না-হইবে তাহা স্বভাবতই নির্ভর করে সরকারী আমলাতন্ত্রের দৃঢ়তা ও দক্ষতার (determination and skill) উপর। এই দৃঢ়তা বা দক্ষতার অভাবে সরকারী নীতি বা আইনকানুন যতই ভাল হউক না কেন উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৩] আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা, দীর্ঘসূত্রতা, নির্লিপ্ততা ও অনীহার দরুনই অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কর্মসূচী বা সিদ্ধান্তকে সময়মত ও সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া যে অভিযোগ শুনা যায় তাহা মোটেই ভিত্তিহীন নহে।

২। **পরামর্শদান:** বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী জটিলতাপূর্ণ। নির্বাচিত রাজনৈতিক শাসন-কর্তৃপক্ষ (political executive)—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিগণ—জনসাধারণের মধ্য হইতে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হন বলিয়া তাঁহাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। অথচ তাঁহাদের উপরই সরকারী নীতি-নির্ধারণের ভার রহিয়াছে। এই অবস্থায় রাজনৈতিক শাসকগণকে স্থায়ী অভিজ্ঞ ও কুশলী প্রশাসকগণের উপর পরামর্শের জন্য নির্ভর করিতে হয়। ইহারাই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয়

---

১. "In most developing nations, however, their (career administrators) role is crucial. ...Most of the expertise that these nations can mobilise belongs to their civil servants. Austin Ranney

২. "Only bureaucrats enforce laws, policies or decisions" G. A. Almond and G. B. Powell. Jr.

৩. "While elected officials may have far-reaching ambitions for new programs or policies, it is the determination and skill of the bureaucratic apparatus that ultimately determine whether these objectives will be realised." Nadel and Rourke

তথ্যাদি রাজনৈতিক শাসকদের নিকট উপস্থিত করেন। তথ্যাদি উপস্থিত করার সময় প্রস্তাবিত নীতিসমূহের গুণাগুণ সম্পর্কে মতামত দিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রীদের পক্ষে এই মতামতকে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং উচ্চ পর্যায়ের সরকারী প্রশাসকগণ সরকারী নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।[১] ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে প্রশাসকগণের ধ্যানধারণা ও মতাদর্শও তাঁহাদের পরামর্শে প্রতিফলিত হয়।[২]

আবার ভারতের ন্যায় ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকিতে হয়। আইনসভার সদস্যদের মন্ত্রীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নাদি করিবার অধিকার রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও মন্ত্রীরা প্রশাসকদের উপর নির্ভরশীল না হইয়া পারেন না। প্রশাসকগণই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের কি উত্তর হইবে না-হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন।

ইহা ছাড়া বর্তমানে অধিকাংশ আইনকানুনই শাসন বিভাগের উদ্যোগে রচিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও প্রশাসকগণ বিভিন্ন আইনের খসড়াদি রচনা করিয়া থাকেন।

৩। আইন-প্রণয়ন: ইহা ব্যতীত বর্তমান দিনে খুঁটিনাটি ও জটিলতাপূর্ণ বিষয়াদির সকল ব্যবস্থা আইনে বিধিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রত্যেক দেশেই আইনসভা শাসন বিভাগের হস্তে নিয়মকানুন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অধস্তন আইন: এই সকল নিয়মকানুন ও আদেশনির্দেশকে অধস্তন আইন (subordinate legislation) বা শাসন বিভাগীয় আইন (administrative legislation) বা অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (delegated legislation) বা শাসনদপ্তর প্রবর্তিত আইন (departmental legislation) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমান রাষ্ট্রে প্রশাসকদের ব্যাপক আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাও রহিয়াছে।

৪। বিচারকার্য: সাম্প্রতিক কালে প্রায় সকল দেশেই বহু বিবাদ-বিসংবাদের বিচার সাধারণ আদালতে হয় না, হয় প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে।[৩] এরূপ বিচারকার্যকে বলা হয় শাসন বিভাগীয় বিচার (administrative adjudication)।

১. "... in modern states, the higher ranks of the executive ... advise the policy-makers." S. E. Finer: *Comparative Government*

২. "Officials and administrators cannot divest themselves of all ideological clothing in the advice which they tender to their political masters ... ." Ralph Miliband

৩. "... a great deal of the adjudication by modern political systems is carried on not by independent courts, but by administrative agencies ... ." Almond and Powell, Jr.

এই শাসন বিভাগীয় বিচারকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া ধরা হয়।

৫। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থতা ও উহাদের স্বার্থের সমন্বয়সাধন : প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই বহুপ্রকারের স্বার্থগোষ্ঠী (interest groups) থাকে। যেমন, শ্রমিকদের ইউনিয়ন বা সংঘ, মালিক ও ব্যবসায়ীদের সংঘ, শিক্ষক সংঘ, চিকিৎসকদের সংঘ প্রভৃতি। এই সকল সংঘ বা স্বার্থগোষ্ঠীর অন্যতম লক্ষ্য হইল সরকারের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করিয়া রাজনৈতিক কাজকর্ম আইনকানুন ও সিদ্ধান্তকে নিজ স্বার্থের অনুকূলে লইয়া যাওয়া। স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ এ-বিষয়ে সচেতন যে বর্তমান রাষ্ট্রে প্রশাসন বিভাগ ও প্রশাসকগণের সরকারী নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সুতরাং স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বিভাগ বা প্রশাসকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং উহাদের দাবিদাওয়া পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বিভাগ বা প্রশাসকগণ এই বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সহিত আলাপ-আলোচনা, দরকষাকষি ও আপোষমীমাংসা করিয়া গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় ও সমন্বয়সাধন করিতে চেষ্টা করে।

এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ সুসংগঠিত এবং আর্থিক দিক দিয়া প্রতিপত্তিশীল সেই সকল স্বার্থগোষ্ঠীই অধিক সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হয়। যেমন, বৈষম্যমূলক সমাজে মালিকশ্রেণীর সংঘগুলি শ্রমিক সংঘগুলির তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয় ; সুতরাং ইহারা সরকারী সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীর উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

৬। সংবাদ ও তথ্যাদি আদানপ্রদান : প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসন বিভাগ সংবাদ ও তথ্যাদি আদানপ্রদান ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।[১] যেমন, সাংবাদিকগণ ও সংবাদপত্রসমূহ বিভিন্ন সমস্যা ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি ও সংবাদ সংগ্রহ করে প্রশাসন বিভাগের নিকট হইতে। জনসাধারণ, রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীসমূহও প্রশাসকগণ পরিবেশিত তথ্যাদি ও সংবাদের উপর নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক শাসন-কর্তৃপক্ষ এবং আইনসভা বিভিন্ন প্রশাসন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়াই সরকারী নীতি-নির্ধারণ ও আইনকানুন প্রণয়ন করিয়া থাকে।

৭। শাসনকার্যের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার চিরপরিবর্তনশীল। আজ এক রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর একদল শাসনভার গ্রহণ করিতেছে। আবার রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের ফলে এক শাসনগোষ্ঠীর পরিবর্তে অন্য শাসনগোষ্ঠী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতেছে।

১. ... "bureaucracies are of enormous importance in the performance of the *communication function* in political system." G. A. Almond and G. B. Powell. Jr.

সরকারের এই পরিবর্তন বা উত্থান-পতনের মধ্যে শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন সরকারী কর্মচারিগণ।

৮। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনসংক্রান্ত কার্য: আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (internal management functions) আমলাতন্ত্র বা প্রশাসন বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য।[১] ইহার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে প্রশাসন বিভাগের উপরি-উক্ত বাহ্যিক কার্যাদি পরিমিত ব্যয়ে যথাসম্ভব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয় এবং যাহাতে সরকার-নির্ধারিত নীতি ও সিদ্ধান্ত কার্যকরীভাবে প্রযুক্ত হয় তাহা সুনিশ্চিত করা।

সমন্বয়কার্য: আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বা কার্যের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। যেমন, প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কার্য হইল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারীদের কার্যের মধ্যে সমন্বয় (co-ordination) সাধন করা। এই সমন্বয় ব্যতীত প্রশাসন বিভাগ উহার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সমর্থ হয় না এবং শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। সকল বিভাগ ও সকল কর্মচারী দলবদ্ধভাবে সহযোগিতা করিয়া চলিলেই প্রশাসন বিভাগের কার্যাদি সুসম্পন্ন হইতে পারে। মিটিং, কনফারেন্স, আন্তঃবিভাগীয় কমিটি (inter-departmental committees), বিশেষ সমন্বয়সাধনকারী সংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমন্বয় কার্য সম্পাদিত হয়।

যোগাযোগ: সমন্বয়সাধন কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি কার্য হইল যোগাযোগ (communication) স্থাপনের কার্য। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে অধস্তন কর্মচারীদের দপ্তরের সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে হয় এবং উহাদের কর্তব্য কি সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে হয়। অপরদিকে আবার অধস্তন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষ যাহাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য ও সংবাদাদি জ্ঞাপন করিতে পারে তাঁহার ব্যবস্থাও করিতে হয়। বস্তুত, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরই প্রশাসন বিভাগের কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে।

ইহা ছাড়া রহিয়াছে সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের উপরই রাষ্ট্র ও প্রশাসন বিভাগের উৎকর্ষ নির্ভর করে। মার্কিন দার্শনিক জন ডিউই (John Dewey) উক্তি করিয়াছেন, সরকারী কর্মচারীদের প্রকৃতিই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।[২] সুতরাং সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, শিক্ষাপ্রদান, পদোন্নতি, কার্যের সর্তাদি প্রভৃতি সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রশাসন বিভাগকে করিতে হয় যাহাতে বিভিন্ন পদে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী নিয়োজিত হয়।

আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ (Control of Bureaucracy): বর্তমান রাষ্ট্র কর্মমুখর ও সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র। সুতরাং এইরূপ রাষ্ট্রের কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালনায়

---

১. "A final important function of bureaucracies is that of their own internal management." Alan R. Ball

২. *"The state is as its officials are."*

জন্ম প্রয়োজন হয় কুশলী আমলাদের। বস্তুতপক্ষে, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে উহাদের আমলাদের যোগ্যতা, উৎসাহ ও উদ্যোগের উপর। কিন্তু একদিকে সুযোগ্য আমলা যেমন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে অপরদিকে তেমনি আমলাদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন গুরুত্বলাভ করিয়াছে এই কারণে যে আমলারা যাহাতে জনগণের ইচ্ছা পূরণ করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা।[১]

আমলাতন্ত্রের ত্রুটি: আমলাতন্ত্রের কতকগুলি ত্রুটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত হইল দীর্ঘসূত্রতা, ফাইলপত্রের মধ্যে আবদ্ধতা (red tapism), সংরক্ষণশীলতা, দৃষ্টিভংগির সংকীর্ণতা, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, জনগণের সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধের অভাব, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি। এই সকল কারণেই আমলা-তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় যাহাতে জনকল্যাণ সর্বতোভাবে সাধিত হয়।

তিন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ: এই নিয়ন্ত্রণ তিন প্রকারের হইতে পারে: (১) আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, (২) রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) আইনগত বা বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ।[২]

১। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ: আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ। শাসন বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে কার্যাদির সমন্বয়সাধন, নিয়মানুবর্তিতা ও আমলাদের স্তরবিন্যাস। বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে যাহাতে সমন্বয় থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া আমলাদের মধ্যে নিয়মশৃংখলা যাহাতে বজায় থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা এবং উপরিস্তরে যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয় তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয় তাহার জন্ম আমলাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি পরিহার করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডে বেসামরিক রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকারী হইল 'সিভিল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট' (The Civil Service Department)। এই বিভাগ প্রধান মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ইহা আমলাদের ব্যবস্থাপনা, উহাদের ব্যয়ভার ইত্যাদির দায়িত্ব বহন করে।[৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির শাসন বিভাগীয় অফিসের (the Executive Office) অংগ ব্যবস্থাপনা ও বাজেট দপ্তর (The Office of Management and Budget) বিভিন্ন দপ্তরকে ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সে বাজেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থদপ্তর ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া ক্যাবিনেট দপ্তর (Cabinet Secretarial) বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়সাধন করে। অর্থদপ্তরও ব্যয়মঞ্জুরীর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পায়। পরিশেষে আছে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও আমলাদের সামাজিক দৃষ্টিভংগি।

১. Guy S. Claire: *Adminstrocracy*
২. Alan R. Ball: *Modern Government and Politics*
৩. *Britain 1979*

গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায় যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উচ্চ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে নিয়োজিত হন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষার প্রতি ইঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন হন না। এই কারণে অনেক লেখক প্রস্তাব করেন সকল প্রকার শ্রেণী হইতে রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ করা সমীচীন।[১]

তবে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষার মাধ্যমে আমলাদের দৃষ্টিভংগিকে উদার ও জনকল্যাণমুখী করা যাইতে পারে।

২। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ: রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে আইনসভা, সরকার, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী প্রভৃতি কর্তৃক আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস শাসন বিভাগীয় সংস্থাগুলিকে (administrative agencies) নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে আমলাদের নিয়োগ কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতি উভয় যুগ্মভাবে করিয়া থাকে। আবার রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ করেন। এই বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা উহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগ কংগ্রেসের নিকট দায়িত্বশীল না থাকিলেও বিভিন্ন বিভাগকে অর্থের জন্য কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির নিকট যাইতে হয় এবং তাহাদের ব্যয়ের দাবির সপক্ষে যুক্তি প্রদান করিতে হয়। সুতরাং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কংগ্রেস শাসকশ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ ভোগ করে। ইহা ছাড়া অনুসন্ধান কমিটি (investigation committees) নিয়োগ করিয়া আইনসভা শাসন বিভাগীয় দপ্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কিরিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ড ভারত প্রভৃতি দেশের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। আইন-সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সমালোচনা করা হয়। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের ত্রুটিবিচ্যুতি তুলিয়া ধরা হয়। সুতরাং প্রশাসকদের সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। আইনসভায় সরকারী গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee) এবং মহানিয়ন্ত্রক ও গণনাপরীক্ষক (the Comptroller and Auditor-General) বিভিন্ন বিভাগের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। স্বভাবতই বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসকদের সকল সময়ই শংকিত থাকিতে হয়। অপব্যয় দুর্নীতি অপচয় প্রভৃতি দোষত্রুটি কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন বা চীনে রাজনৈতিক দল শাসকদের উপর কড়া নজর রাখে। বিভিন্ন স্তরের শাসন বিভাগের সংগে সংগে আবার নজর রাখিবার জন্য দলীয় সংগঠন বা সংস্থা রহিয়াছে।[২] ফ্রান্সেও আইনসভার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্যতম উপায়।

১. Subramaniam : *Representative Bureaucracy*

২. "The Soviet Union attacks the problem mainly using the Communist Party as the watchdog of the state administrative apparatus right down to the level of village governments and individual factories and collective farms." Austin Ranney : *The Governing of Men*

৩। আইনগত বা বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ : এই আইনগত বা বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় যে সরকারী আমলারা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিলে, দুর্নীতি-পরায়ণ হইলে, ক্ষমতাবহির্ভূত কার্য করিলে এবং নাগরিকদের অধিকার ভংগ করিলে সাধারণ আদালতে ইহাদের অভিযুক্ত করা যায় এবং প্রতিবিধান পাওয়া যায়। কমিউনিস্ট জগতেও এইরূপ বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলিয়া ফ্রান্স ইতালি সুইডেন প্রভৃতি দেশে প্রশাসকদের অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্ম পৃথক আদালত রচিয়াছে। এই আদালতগুলিকে বলা হয় শাসন বিভাগীয় আদালত (administrative courts)। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, নাগরিকগণের অধিকার সুরক্ষিত করিতে শাসন বিভাগীয় আদালতগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে; নাগরিকরা স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে তাহাদের অভিযোগের প্রতিবিধান পাইতে সমর্থ হয়।

পার্লামেণ্টীয় কমিশনার : আমলাদের নিয়ন্ত্রণের আর একটি উপায় হইল অম্বাড্‌সম্যান (ombudsman) বা পার্লামেন্টীয় কমিশনার (parliamentary commissioner) নিয়োগ। সুইডেন নরওয়ে নিউজিল্যাণ্ড ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে এরূপ কমিশনার রহিয়াছে। অবশ্য বিভিন্ন দেশের কমিশনারগণের ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। তবে সকল দেশেই কমিশনারগণ আমলাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগের বিচার-বিবেচনা করিয়া থাকে।

প্রকিউরেটরের দপ্তর : সোবিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে বিভিন্ন শাসন বিভাগ আইনকানুন মান্য করিয়া চলিতেছে কি না তাহার দিকে কড়া নজর রাখে প্রকিউরেটরের দপ্তর (Procurator's Office)।

বিচার বিভাগ (The Judiciary):

সরকারের তৃতীয় অংগ হইল বিচার বিভাগ। ইহার প্রধান কার্য হইল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে তাহার মীমাংসা করিয়া ন্যায়বিচার করা।

বলা হয়, জনকল্যাণ জন-স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মানদণ্ড আর নাই।

হেনরী সিজউইকও (Henry Sidgwick) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।[১]

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের বিশ্বজনীন দাবি : প্রাচীনকালে বিচার ও শাসন কার্যের পৃথকীকরণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। চরম রাজতন্ত্রের অধীন উভয় কার্যই নৃপতি সম্পাদন করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থায় জনসাধারণের স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হওয়ায় ইহাকে 'স্বৈরাচারের নামান্তর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কারণে

১. "... In determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by law, is actually realised in its judicial administration. ..." Henry Sidgwick : *Elements of Politics*

বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা না হইলেও অধিকাংশ লোকই বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। ফলে অধিকাংশ দেশেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary): (১) বিচার বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের ব্যাখ্যা করা এবং আইনের প্রয়োগ করা। এখানে আইন বলিতে আইনসভা-প্রণীত আইন, লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইন, প্রথাগত আইন—সকলকেই বুঝানো হইতেছে। কিন্তু সকল সময় প্রচলিত আইনের সাহায্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হয় এবং এইরূপ আইনকে বিচারকগণ-প্রণীত আইন (judge-made laws) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

---

(২) আইনের সৃষ্টি: দেখা যাইতেছে, বিচারকগণ শুধু আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগই করেন না—আইনের সৃষ্টিও করিয়া থাকেন।

---

(৩) সাধারণত বিচার বিভাগই হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

(৪) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌল অধিকার সংরক্ষণের ভার আদালতের উপরই ন্যস্ত থাকে, এবং এই উদ্দেশ্যে আদালত বিভিন্ন প্রকার লেখ (writs) এবং নির্দেশ জারি করিয়া থাকে।

(৫) বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহাদিগকে ঠিক বিচার-কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কর্মচারী ও অভিভাবক নিয়োগ, লাইসেন্স প্রদান, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর কার্য করা, প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৬) অনেক দেশে বিচারালয় হইতে শাসন বিভাগ অথবা ব্যবস্থাপক সভা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। ভারত ও ইংল্যাণ্ডে বিচারালয় কর্তৃক শাসন বিভাগকে এইরূপ পরামর্শদানের ব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলেও কতকগুলি অংগরাজ্যে ইহা প্রবর্তিত রহিয়াছে।

বিচার বিভাগের সংগঠন ও স্বাধীনতা (Organisation and Independence of the Judiciary): পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারের জন্য বিচার বিভাগের সুসংগঠন ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। বিচার বিভাগের সুসংগঠন ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক উপাদান। অর্থাৎ, বিচার বিভাগের সুসংগঠনের উপরই উহার স্বাধীনতা নির্ভর করে এবং উহার স্বাধীনতার উপরই নির্ভর করে সুসংগঠন। অন্যভাবে বলা যায়, সুসংগঠিত না হইলে বিচার বিভাগ

স্বাধীন হইতে পারে না, আবার স্বাধীন না হইলে উহাকে সুসংগঠিত বলিয়াও ধরা হয় না।

নির্ধারক বিষয়: এই সুসংগঠন ও স্বাধীনতা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(ক) বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি: প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে বিচারকগণকে নিয়োগ করা যাইতে পারে—(১) সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন, (২) আইনসভা দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচন এবং (৩) শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ। (১) বিপ্লবের পর ফ্রান্সে কিছুদিন সরাসরি জনসাধারণ কর্তৃক নিয়োগ লইয়া পরীক্ষাকার্য চালানোর পর ইহাকে প্রত্যাহার করা হয়। ফ্রান্সের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি অংগরাজ্য ইহা গ্রহণ করে এবং আজও এই অংগরাজ্যগুলির কয়েকটিতে এই পদ্ধতি বর্তমান আছে। সুইজারল্যাণ্ডে অধস্তন আদালত-সমূহের জন্য বর্তমানে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও এই পদ্ধতি কতকাংশে অনুসরণ করা হয়। অভিযোগ করিয়া বলা হয় এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, জনসাধারণ অধিকাংশ সময় যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে পারে না। ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত এবং প্রচারকার্য দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া তাহারা এমন প্রার্থীদিগকে নির্বাচিত করে যাঁহাদের পক্ষে বিচারকার্যের উপযুক্ত না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। অধিকন্তু, যোগ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিতে চাহেন না। ফলে জনসাধারণ অযোগ্য ব্যক্তিগণকেই নির্বাচিত করিতে বাধ্য হয়।

এই পদ্ধতি সম্পর্কে ল্যাস্কি বলেন, "বিচারকগণের নিয়োগের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন হইল ব্যতিক্রমবিহীনভাবে নিকৃষ্ট।"[১]

(২) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উপর আস্থা না থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্য আইনসভা দ্বারা বিচারকগণের পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। বর্তমানেও ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি রাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকগণের নিয়োগ ব্যাপারে সুইজারল্যাণ্ডে প্রবর্তিত আছে। এই পদ্ধতিও বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ, কারণ ইহা বিচার বিভাগকে ব্যবস্থা বিভাগের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলে। নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় ভিত্তিতেই হইয়া থাকে বলিয়া ঠিক যোগ্য ব্যক্তিগণও নির্বাচিত হন না।

(৩) উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। ঊর্ধ্বতন বিচারকগণ সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা নিযুক্ত হইলেও এই সকল দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা অধস্তন বিচারকগণকে নিয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা ঊর্ধ্বতন বিচারকগণের নিয়োগের বেলাতেও অনেক সময় এইরূপ নিয়ম আছে যে, নিয়োগ সাধারণভাবে

১. "Of all methods of appointment, that of election by the people at large is without exception the worst."

বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই করা হইবে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের বিচারপতিগণের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এইরূপ পরামর্শ করিতে হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ ব্যাপারে সিনেটের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। ল্যাস্কির মতে, এইরূপ নিয়োগ কয়েকজন উর্ধ্বতন বিচারপতি লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুসারে হওয়া উচিত।

যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে আরও বিধিনিয়ম: নিয়োগ ব্যাপারে আরও কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বনের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, বিচার-ব্যবস্থার প্রতিটি অংগের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারপতির যোগ্যতা নির্দিষ্ট থাকা উচিত এবং শাসন বিভাগের কার্যে ব্যাপৃত কোন ব্যক্তিকে বিচারকপদে নিয়োগ করা অনুচিত। বিচারপতির যোগ্যতা নির্দিষ্ট না থাকিলেও শাসন বিভাগ অযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার সুযোগ পাইবে এবং শাসন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়োগের ফলে ন্যায়বিচার পদে পদে ব্যাহত হইবে।

আবার বিচারকদেরও কোন রাজনৈতিক পদে নিয়োগ করা সমীচীন নয়, কারণ তাহা হইলে বিচারকগণ ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পদের আশায় শাসন বিভাগের পক্ষে টানিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করিতে প্রলুব্ধ হইবেন।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিষয়গুলির উপর সম্যক গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কোন যোগ্যতা সংবিধানে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। ফলে রাষ্ট্রপতি সিনেটের সম্মতিক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন। এইভাবে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়। ভারতে অবসরপ্রাপ্ত বিচার-পতিগণকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য পদে নিয়োগের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। আইন কমিশন (Law Commision) ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছে।

(খ) **বিচারকগণের কার্যকাল:** বিচার-ব্যবস্থার সুসংগঠন ও স্বাধীনতার জন্য বিচারকগণের কার্যকাল তাহাদের নিয়োগ-পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং অক্ষমতা বা দুষ্কর্ম প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। গণতান্ত্রিক সূত্র ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-সকল রাজ্য বিচারকগণের জন্য স্বল্পস্থায়ী কার্যকালের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহারাও কার্যক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে পুনর্নির্বাচিত বা পুনর্নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছে। বস্তুত, বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা বিচারপতিগণের কার্যকালের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। যে-সকল বিচারপতি স্বল্পকালের জন্য নিযুক্ত হন তাঁহাদের পক্ষে পদের অপব্যবহার করা বিশেষভাবে সম্ভব। অতএব, সুসংগঠিত বিচার-ব্যবস্থায় বিচারকগণের পদ স্থায়ী হয়।

হ্যামিলটনের (Hamilton) মতে, বিচারপতিগণের পদের স্থায়িত্ব সাম্প্রতিক শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম উৎকর্ষের নিদর্শক। রাজতন্ত্রের অধীনে ইহা স্বৈরাচারের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ; প্রজাতন্ত্রে ইহা জনপ্রতিনিধিদের আতিশয্য ও অত্যাচার রোধ করে।[১]

(গ) বিচারপতিগণের পদচ্যুতি: স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলে একমাত্র দুষ্কর্ম বা অক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন কারণে বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইল দুষ্কর্ম বা অক্ষমতা বিচার করিবে কে? এই সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম হইল যে, এই ভার একাধিক ব্যক্তির হস্তে থাকা উচিত এবং ইহা বিশেষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটেনে কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাজা বা রাণীর হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু রাজা বা রাণী পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নিকট হইতে সম্মিলিত আবেদন না পাইলে পদচ্যুত করিতে পারেন না।

ইম্‌পিচমেণ্ট পদ্ধতি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ইম্‌পিচমেণ্ট'-পদ্ধতিতে বিচারকগণকে পদচ্যুত করা হয়। এই ইম্‌পিচমেণ্ট-পদ্ধতিতে কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষ জনপ্রতিনিধি সভা (House of Representatives) বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং এই অভিযোগের বিচার করে উচ্চতর কক্ষ সিনেট (Senate)। ভারতে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে তবে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দ্বারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

ইম্‌পিচমেণ্ট-পদ্ধতির অনুসরণে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত। যখন তখন অতি সামান্য ব্যাপারে ইম্‌পিচমেণ্ট-অভিযোগ আনয়ন করিলে বিচার বিভাগের স্থায়িত্ব (stability) নষ্ট হইবে। বিচারকগণ তখন আতংকগ্রস্ত হইয়াই থাকিবেন—পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারের মনোভাব আর গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ-পর্যন্ত একবার মাত্র ইম্‌পিচমেণ্ট-অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।[২]

(ঘ) বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা: পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, যোগ্য ব্যক্তিদের বিচারপতিপদে নিযুক্ত করা উচিত। সাধারণত প্রখ্যাত ব্যবহারজীবিগণের মধ্য হইতেই এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের সন্ধান করা হয়। আইনজীবিগণ যখন বিচারপতিপদে উন্নীত হন তখন তাঁহাদের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য দেখা উচিত, বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা যেন বিশেষ স্বল্প না হয়। দেখা গিয়াছে, স্বল্প-বেতনভোগী বিচারপতিগণ দুষ্কর্মের জন্য অধিকতর উন্মুখ থাকেন।

১. "In a monarchy, it is an excellent barrier to the despotism of the prince; in a republic it is no less excellent barrier to the encroachments and oppressions of the representative body."

২. ১৮০৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যামুয়েল চেসের (Samuel Chase) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

উপরন্তু, সমগ্র কার্যকালের মধ্যে বিচারপতিগণের বেতন ও তাহার পরিবর্তন করা উচিত নয়। এইজন্য ভারতীয় সংবিধানে এই বিষয়ে ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(ঙ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ: পরিশেষে, বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা নির্ভর করে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের উপর। একই ব্যক্তির হস্তে কোনমতে আইন প্রণয়ন এবং শাসনকার্য বা বিচারের ভার থাকা উচিত নয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে স্বতন্ত্রীকরণের মোহ ক্রমশ দূর হইলেও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করা হয়।[১] বিচার বিভাগের দিক দিয়া এই স্বাতন্ত্র্যকে আবার উহার সুসংগঠনের অন্যতম উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়।

উপসংহার: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার তাৎপর্য: এইভাবে বিচার বিভাগের সুসংগঠনের মাধ্যমে উহার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হইলে তবেই বিচারকগণ সমভাবে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে সমর্থ হন। স্যর অ্যালফ্রেড ডেনিং-এর (Sir Alfred Denning) ভাষায় বলা যায়, বিচারকগণ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিচারের মানদণ্ড সমভাবে ধরিয়া নির্ভীকভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।[২] ল্যাস্কি প্রমুখ লেখক বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আলোচনা প্রসংগে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমভাবে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতার তাৎপর্য বা মূল্য কতটুকু তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে উপরি-উক্ত সাংগঠনিক (organisational) ব্যবস্থাগুলির দিকে নজর দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে; কারণ মুখ্যত বিচারকগণ রাষ্ট্রের কর্মচারী এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকেই তাঁহাদের কার্যকর করিতে হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় আইনের মধ্যে। যখন ব্যক্তিদের মধ্যে অথবা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে আইনভংগের অভিযোগে বিবাদ বাধে তখন বিচারককে রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসাবে বিবাদের বিচার-মীমাংসা করিতে হয়। এই বিচার-মীমাংসা তাঁহাকে রাষ্ট্রের আইন অনুসারেই করিতে হয়। তাঁহার ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা আইনের গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না।

সুতরাং জনসাধারণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইবে কি না তাহা বিচার-ব্যবস্থার সংগঠন-সৃষ্ট স্বাধীনতার উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে সমাজ রাষ্ট্র ও আইনের প্রকৃতির উপর।

---

১. "... the independence of the judiciary ... is essential to freedom. In that sense, the doctrine of separation of powers enshrines a permanent truth." Laski

২. "Secure from any fear of removal, the judges ... do their duty fearlessly, holding the scales even, not only between man and man, but also between man and the State."

এই দিক দিয়া দেখিলে, মাত্র সাম্যভিত্তিক সমাজেই বিচার-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সুসংগঠিত ও নিরপেক্ষ হইতে পারে।[১]

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই একপরিষদসম্পন্ন আইনসভার পক্ষপাতী। ইঁহাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রেও দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রয়োজনীয়তা নাই।

২. আইনসভার মর্যাদাহ্রাসের বিভিন্ন দিক হইল দুইটি : (ক) আইনসভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের নির্দেশেই পরিচালিত হয়. (খ) আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাও আইনসভার কাছ হইতে শাসন বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

৩. সমগ্র শাসনক্ষমতা এক পদাধিকারীর হস্তে থাকিলে উহাকে ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগ এবং একাধিক পদাধিকারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিলে তাহাকে একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসন বিভাগ বলা হয়। প্রথমের দৃষ্টান্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয়ের সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ।

৪ আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়, কারণ আমলারা সহজেই বিভিন্ন দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়া জনকল্যাণ ব্যাহত করে।

৫. বিভাগ বিচারের স্বাধীনতার প্রয়োজন গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য।

অনুশীলনী

1. Describe the functions performed by the Legislature in a modern State.

[আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলীর আলোচনা কর।] (৪৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the problems of Bicameralism in modern democracies.

[বর্তমান দিনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিপরিষদ-ব্যবস্থার সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনা কর।] (৪৫০-৫৬ পৃষ্ঠা)

3. Examine the case for and against Bicameralism. Give examples.

[উদাহরণসহ দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলির আলোচনা কর।] (৪৫০-৫৬ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the case for and against a second chamber in the organisation of a federal legislature.

[যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সংগঠনে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলির আলোচনা কর।] (৪৫০-৫৬ পৃষ্ঠা)

5. Have the legislatures of modern States declined? If so, what are the reasons, which have caused them to decline?

[বর্তমান রাষ্ট্রের আইনসভাসমূহের অবনতি ঘটিয়াছে কি? যদি ঘটিয়া থাকে তবে কি কি কারণে উহা ঘটিয়াছে?] (৪৫৬-৫৯ পৃষ্ঠা)

১. "The Judiciary has no more been 'above' the conflicts of capitalist society than any other part of the state system." Ralph Millliband : *The State in Capitalist Society*

6. What is meant by delegated legislation ? Account for its growth in modern times. What are the safeguards against the abuse of power to legislate by delegation ?

[অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন কাহাকে বলে ? আধুনিক যুগে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন তাহার কারণ দেখাও। অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণগুলি কি ?]

(৪৫৯-৬৯ পৃষ্ঠা)

7. Write a short note on Single and Plural Executive.

[এক এবং একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসকসংস্থার উপর একটি টীকা লেখ।] (৪৬১-৬৬ পৃষ্ঠা)

8. Explain the role and functions of the Executive in a modern State.

[আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ভূমিকা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।] (৪৬৮-৭১ পৃষ্ঠা)

9. What is bureaucracy ? What is its importance in a modern State ?

[আমলাতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? বর্তমান রাষ্ট্রে ইহার গুরুত্ব কি ?] (৪৭১, ৪৭২-৭৩ পৃষ্ঠা

10. Discuss the role and functions of bureaucracy in modern States.

[বর্তমান রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব ও কার্যাদির আলোচনা কর।] (৪৭২-৭৩, ৪৭৩-৭৬ পৃষ্ঠা)

11. Describe in brief some of the methods of control of bureaucracy.

[আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি পদ্ধতির সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (৪৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the principles of organisation of Judiciary in modern States.

[আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে বিচার বিভাগের সংগঠনের নীতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

(৪৮০-৮৩, ৪৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

13. Write a short note on the independence of the Judiciary.

[বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।] (৪৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

২৪ গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্র
(DEMOCRACY AND DICTATORSHIP)

> *"Democracy is perhaps the most promiscuous word in the world of public affairs. She is everybody's mistress and yet somehow retains her magic even when her lover sees that her favours are being in his light, illicitly shared by many another."*
>
> Bernard Crick

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. গণতন্ত্র সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই কেন?

২. গণতন্ত্রের প্রধান রূপ কয়টি এবং কি কি?

৩. গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপাদান কি কি?

৪. উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝায়? ইহা কতদূর সমর্থনীয়?

৫. গণতন্ত্রের সফলতার সর্তাবলী কি কি?

৬. গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করা হয়?

৭. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝায়?

৮. গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য কি?

৯. নায়কতন্ত্র কি কোন দিক দিয়া সমর্থনীয়?

১০. নায়কতন্ত্রের মূল আংশিক রূপ কয়টি এবং কি কি?

গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্ভব এবং প্রসার (Origin and Development of the Ideal of Democracy):

গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। সুদূর অতীত হইতেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সংস্থাসমূহের আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন ভারত: প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে (মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি) অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ করার অধিকার স্বীকৃত ছিল। বেদের যুগে গণতান্ত্রিক সংস্থা 'সভা' 'সমিতি' প্রভৃতি রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিত। 'গণ' নামক সংস্থার মাধ্যমে নাগরিকগণও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিত। প্রাচীন গ্রামীণ সমাজে গ্রাম-সভা' 'পঞ্চায়েত' প্রভৃতির হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণের প্রবণতা দেখা যায়।

প্রাচীন গ্রীস: প্রাচীন ভারতের মত প্রাচীন গ্রীস ও রোমে গণতন্ত্রের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক ডেমোস (*Demos*) এবং ক্র্যাটিন (*Kratein*) শব্দ হইতে যথাক্রমে 'জনগণ' ও 'শাসন'—ধারণা দুইটি পরিচিতি লাভ করে। আইন-প্রণয়ন, সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ অপরাধীদের শাস্তিবিধান প্রভৃতির জন্য নাগরিকগণ এক জায়গায় সমবেত হইত। প্রাচীন গ্রীসে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এথেনীয় গণতন্ত্রের আদর্শ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। জনগণের মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় এথেনীয় রাজনীতিবিদ্ সোলোনের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনিই গণতান্ত্রিক আইনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন এবং শাসনক্ষমতার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার ন্যায়বিচার প্রভৃতির উল্লেখ করেন।

'বহুজনের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ' ধারণাটির প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌ পেরিক্লিস্‌ (Pericles)।

রোম : গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারে ষ্টোয়িক (Stoics) দার্শনিকগণের প্রভাব বড় কম নয়। ষ্টোয়িকরা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতিগত কারণেই মানুষের মধ্যে রহিয়াছে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও স্বাধীনতার চেতনা এবং আইন মানিয়া চলিবার দায়িত্ববোধ। 'রোমান আইন' গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে, বিশেষ করিয়া পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পরিবেশ উন্মুক্ত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। জাষ্টিনিয়ানের 'ডাইজেষ্ট' সুসংবদ্ধ আইন ও যুক্তিপূর্ণ মতবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

মধ্যযুগ : মধ্যযুগীয় ইয়োরোপে গণতন্ত্রের প্রসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল : (১) মহাসনদ (Magna Carta): ন্যায়বিচার লাভ করিবার জন্য তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজা জনের (King John) বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ এবং রাজার প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর দান। (২) ১২৬৫ সালে বিদ্রোহী সাইমন ডি মণ্টফোর্ট (Simon de Montfort) কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে প্রথম পার্লামেণ্ট আহ্বান। জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া এই পার্লামেণ্ট গঠিত হইয়াছিল। (৩) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ বিক্ষোভ ও গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution)—ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় চার্লসের পতন ও মৃত্যু। (৪) হেবিয়াস কর্পাস আইন (১৬৭৯), অধিকারসংক্রান্ত বিল (১৬৮৮) প্রভৃতি।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র : ফরাসী বিপ্লব : আঠার ও উনিশ শতকের ইয়োরোপ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে সহায়তা করে। স্বাধীনতা ও সুবিচারের জন্য মানুষের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 'ফরাসী বিপ্লবের' মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

রুশোর প্রভাব : রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের বিকাশে ফরাসী চিন্তানায়ক রুশোর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে গণতন্ত্রের গুণাবলী ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন। 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) ধারণাটির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে কার্যকর করার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র : উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পশ্চাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism), হিতবাদ (Utilitarianism), গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Democratic Socialism) প্রভৃতি রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জেমস মিল (James Mill), বেন্থাম (Bentham) প্রভৃতি হিতবাদী দার্শনিকগণের মতে, গণতন্ত্র সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির মংগলসাধন করিবে। শাসক-শাসিতের স্বার্থকে অভিন্ন করিয়া তোলার মধ্যেই ইহার সার্থকতা। জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), স্পেন্সার (Spencer) প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌ মনে করেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণই গণতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তির নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা প্রভৃতি গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। ফরাসী দার্শনিক টক্‌ভিল (Tocqueville), আমেরিকার রাষ্ট্রনেতা টমাস্‌ জেফারসন (Jefferson), আব্রাহাম লিংকন (Lincoln), ম্যাডিসন (Madison), রুজভেল্ট (Roosevelt) প্রভৃতির চিন্তাধারায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। বার্কার (Barker), গ্রীণ (Green), ল্যাস্কি (Laski) প্রভৃতি লেখক রাষ্ট্রচিন্তায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্বগত ভিত্তির প্রতি সমর্থন জানান। পরবর্তীকালে ল্যাস্কি মার্ক্সীয় তত্ত্বকে সমর্থন করেন।

ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের প্রভাব : ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসনতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রগতি ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন, আইনের অনুশাসনতত্ত্বের স্বীকৃতি গণতন্ত্রের প্রসারে বিশেষ

সাহায্য করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Declaration of Independence), অধিকারের সনদ (Bill of Rights) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করিয়াছে। ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্রে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি আছে। বিপ্লবের অব্যবহিত পর হইতে গণতন্ত্রের প্রতি এদেশের জনগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ (League of Nations) ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nation) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশ শতকে রাশিয়ার মহান্ অক্টোবর বিপ্লবের পর হইতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল উৎপাদন উপকরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা। সুতরাং উৎপাদন ও ভোগ উভয়ই সামাজিক। উপরন্তু, জনসাধারণ বাস্তবে রূপায়িত সমানাধিকারও ভোগ করে এবং জনসাধারণকে রাষ্ট্রকার্যের সহিত সংশ্লিষ্টও করা হয়। এইভাবে (সমাজতান্ত্রিক) গণতন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হয়।

গণতন্ত্র—অর্থ ও বিভিন্ন রূপ (Meaning and Forms of Democracy):

সাধারণত সরকারের বিভিন্ন রূপের আলোচনা প্রসংগেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। ইহা হইতে এই অনুমান করা কোনমতেই ঠিক হইবে না যে, গণতন্ত্র বলিতে শুধু সরকারের রূপ বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায়।

অধ্যাপক গিডিংস এবং হারন্‌শ (Hearnshaw) দেখাইয়াছেন যে, 'গণতন্ত্র' শব্দটি দ্বারা বিশেষ এক সমাজ-ব্যবস্থা, এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অথবা এক শাসন-ব্যবস্থা বুঝাইতে পারে। ইহার উপর বর্তমানে আমরা ইহার দ্বারা বিশেষ এক অর্থ-ব্যবস্থাও (economic system) বুঝাইয়া থাকি।

গণতন্ত্রের ধারণার অস্পষ্টতা : এইভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম ধারণা হিসাবে গণতন্ত্রও সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই।[১] উপরন্তু, যে-কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদে সংশ্লিষ্ট যুগের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়। 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে ধারণা প্রাচীন গ্রীস হইতে চলিয়া আসায় ইহাতে বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থার ছাপ পড়িয়াছে। এই কারণেও 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে ধারণা প্রাচীন গ্রীস হইতে চলিয়া আসায় ইহাতে বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থার ছাপ পড়িয়াছে। এই কারণেও 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে ধারণায় অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। ধারণার অস্পষ্টতা থাকায় 'গণতন্ত্রে'র বিভিন্ন রূপ বা শব্দটির বিভিন্ন অর্থ লইয়া সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের তিনটি রূপ : গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল সাম্য। সামাজিক গণতন্ত্রই হউক, রাজনৈতিক গণতন্ত্রই হউক আর অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই হউক—সকলই সাম্যভিত্তিক।

(ক) **গণতান্ত্রিক সমাজ :** সাম্য গণতন্ত্রের মূলভিত্তি বলিয়া সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান পাওয়া গেলে ইহাকে 'গণতান্ত্রিক সমাজ' (Democratic Society) আখ্যা দেওয়া হয়।

১. Democracy is "... the most elusive and ambiguous of all political terms." Mabbott : *The State and the Citizen*

বার্নসের (Delisle Barns) মতে, এইরূপ সমাজে সাধারণ জীবনযাত্রায় সকলেরই অবদান রহিয়াছে—সকলেই দায়িত্বশীলতার সহিত সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া সাধারণ জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলে। এইরূপ সমাজ বলপ্রয়োগকে সমর্থন করে না বা জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে কোনরূপ মর্যাদা দেয় না। সাধারণ জীবনযাত্রায় প্রত্যেকের অবদানকে সমান মূল্যবান উৎস হিসাবে গণ্য করিয়া এইরূপ সমাজ একমাত্র সাম্যকেই মর্যাদা দেয় এবং ফলে সাম্যভিত্তিক হইয়া সমাজ 'গণতান্ত্রিক' রূপ ধারণ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এইরূপ সমাজ গঠনের পক্ষে শুধু সাম্যই যথেষ্ট নয়, পর্যাপ্ত স্বাধীনতা বা অধিকারও প্রয়োজন। অর্থাৎ, সমানাধিকার হইলেই চলিবে না, অধিকারের সংখ্যাও পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

(খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র : সমগ্র সমাজজীবনের পরিবর্তে শুধু যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ইহাকে 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' (Democratic State) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

সংক্ষেপে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় সকলের সমান রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা এবং ইহার ফলে সাধারণের চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। রুশো 'গণতন্ত্র' শব্দটিকে এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, শাসন-ব্যবস্থার রূপ যাহাই হউক না কেন, সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছায় (General Will) প্রণীত আইন দ্বারা শাসিত হইলে যে-কোন রাষ্ট্রকে 'গণতান্ত্রিক' বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। রুশোকে সমর্থন করিয়া অধ্যাপক হারন্‌শ বলেন : 'গণতন্ত্র' বলিতে রাষ্ট্রেরই রূপ বুঝায় এবং 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' সরকারের যে-কোন প্রকার রূপের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১]

ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষণ হইল সাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। সাধারণে সার্বভৌম বলিয়া ইহা যে-কোন প্রকার সরকার সংগঠিত করিতে পারে। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাজতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক সরকারের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। রাষ্ট্রের রূপই সরকারের রূপের পরিচায়ক নহে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, জনসাধারণই সকল ক্ষমতার উৎস বলিয়া গণতন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ। কার্যক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা অবশ্য অন্য শ্রেণীর হস্তে থাকিতে পারে। তবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রেণী এই উৎস বা জনসাধারণ হইতে যে পরিমাণে বিচ্যুত হইবে উহা সেই পরিমাণেই দুর্বল হইয়া পড়িবে।[২] অতএব, তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল, যে-কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই শাসকবর্গের পক্ষে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপ বজায় রাখা উচিত।

গ। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া ইহাকে 'জনগণের শাসন' (Rule of the People) বলা যায়। কিন্তু ইহা যে 'জনগণের দ্বারা শাসন' হইবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। জনগণের দ্বারা শাসন (Rule by the People) বলিতে বুঝায় যে, জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

যদি জনগণ দ্বারা এইরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন প্রবর্তিত থাকে তবে ইহাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয়।

---

১. "... democracy as a form of State is consistent with any type of government."

২. "Whether the leadership ... be in the hands of those who monopolize learning, or wield the power of riches or arms, *the source of power is always the subject masses.* By so much as the class in power severs itself from this source by so much it is sure to become weak." Vivekananda

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত নাও থাকিতে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government): সরকারের বিভিন্ন রূপ বা শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে যে 'গণতন্ত্রে'র আলোচনা করা হয় প্রধানত তাহা হইল গণতান্ত্রিক সরকার।

লিংকন-প্রদত্ত সুপ্রচলিত সংজ্ঞা: গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণের দ্বারা শাসন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বলা হয় যে, শাসন জনগণের (of the people) এবং জনগণের দ্বারা (by the people) হওয়ায় ইহা জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্যই (for the people) শাসন। এই তিনটিকে মিলাইয়া রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম লিংকন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সুপ্রচলিত হইয়াছে। লিংকনের ভাষায় শাসন-ব্যবস্থা হইল, "জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন" ('government of the people, by the people, for the people')।

সংজ্ঞাটি লইয়া বর্তমানে বেশ কিছুটা মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম মতবিরোধ হইল 'জনগণের শাসন-ব্যবস্থা' ('government of the people')—এই অংশটির ব্যাখ্যা লইয়া। বলা হইয়াছে, এই অংশটি দ্বারা মাত্র সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্যকে (obedience) বুঝায়—অর্থাৎ জনগণ নিয়মিতভাবে সরকারের সিদ্ধান্তকে মান্য করিয়া চলে, মাত্র ইহাই বুঝানো হইয়াছে। অন্যান্যের মতে অবশ্য বাক্যাংশটির তাৎপর্য হইল দ্বিবিধ: (১) জনগণই সরকারের উৎস এবং (২) সরকারকে জনগণ হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না।[১]

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ: দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল 'জনগণ দ্বারা শাসন' ('government by the people')—এই অংশটির ব্যাখ্যা কি হইবে? প্রাচীন গ্রীকদের নিকট গণতন্ত্র ছিল বহুজন-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (multitude's rule)। সিলীর ন্যায় কতিপয় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, গণতন্ত্র হইল এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে সকলেরই একটি অংশ আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে ডাইসি বলিয়াছেন, গণতন্ত্র এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ শাসনকার্য পরিচালনা করে। ব্রাইসের ধারণায়, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়, কারণ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ভোটাধিকারের মাধ্যমে এবং সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া কোন বিশেষ মতাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনভার প্রাপ্ত হয়।

---

(১) **সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন:** সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণ' বলিতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং স্বতই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসন—সকলের দ্বারা নহে।

১. See Paul Sweezy's article in *'Democracy in a World of Tensions'* (A UNESCO symposium)

অন্য এক স্থানে লর্ড ব্রাইস স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্র হইল ভোটাধিকারী নাগরিকগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসন—অবশ্য ভোটাধিকারী নাগরিকগণকেও সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে হইবে।

(২) **জনমতভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা** : সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইন জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রণীত হয়। এইজন্য গণতন্ত্রকে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাও (government resting on public opinion) বলা হয়। রুশো অবশ্য ইহাকে সাধারণ জনমতের (public opinion) পরিবর্তে পূর্ণ অর্থে জনমত বা সাধারণের ইচ্ছার (General Will) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

(৩) **ঐক্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা** : গণতান্ত্রিক সরকারকে অনেক সময় 'সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার' (rule based on consent) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। সম্মতি বলিতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি বুঝায় না, সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতিও বুঝায়। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বসাধারণের মংগলার্থে পরিচালিত হয় বলিয়া এবং এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই সমালোচনা দ্বারা, জনমত-গঠন দ্বারা শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা থাকে বলিয়া সকলে একরূপ সম্মতি প্রদান করিয়া থাকে। সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সরকারও সর্বদা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে। সিজউইক বলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সর্বদা বলপ্রয়োগ করিলে সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের স্বরূপ বজায় থাকে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ মতামতকে শ্রদ্ধা করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিলে তবেই 'জনগণের দ্বারা সরকারে'র রূপ গ্রহণ করে। এইরূপ 'জনগণের দ্বারা সরকার'কে 'ঐক্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা' (government based on consensus) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যে বুঝাপড়ার মাধ্যমে ঐক্যমত দ্বারাই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এইজন্য বার্কার গণতন্ত্রকে 'আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে সরকার' (a system of government by discussion) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ, রাষ্ট্রজীবনে বিভিন্ন মতপোষণকারীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের দ্বারাই গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয়।

(৪) **সকলেরই সক্রিয় ভূমিকা** : অতএব, গণতান্ত্রিক শাসনে সকলেরই ভূমিকা রহিয়াছে। গণতন্ত্র সকলের সমান রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী বলিয়া ইহা কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারে না এবং এই অর্থে গণতান্ত্রিক শাসনকে সর্বসাধারণের দ্বারা (by the people) শাসন বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহাও

মনে রাখিতে হইবে যে, শাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার ব্যাপারেও জনগণের সক্রিয় অংশ থাকা প্রয়োজন।[১]

(৫) **রাজনৈতিক ধারণামাত্র নহে**: পরিশেষে, 'জনগণের জন্য শাসন' ('government for the people')—এই অংশটির অর্থ হইল যে গণতন্ত্র জনগণের কল্যাণসাধন করে। কিন্তু গণতন্ত্রকে মাত্র রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইলে—অর্থাৎ মাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করা হইলে কোন দেশ বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবার। সুতরাং টক্‌ভিল ডাইসি ব্রাইস প্রভৃতি লেখক গণতন্ত্রকে মাত্র রাজনৈতিক ধারণা বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

চারিটি নীতি: মাত্র শাসন-ব্যবস্থার অর্থে গণতান্ত্রিক সরকারের চারিটি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়: (১) জনগণের সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty), (২) রাজনৈতিক সাম্য (political equality), (৩) জনগণের সহিত পরামর্শ (popular consultation) এবং (৪) সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন (majority rule)।[২]

গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Democratic Government): লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি বিশ্লেষক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ দিয়াছেন—যে শাসন-ব্যবস্থাকে জনমত ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। ইহা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধও হইতে পারে।

ক। **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Pure or Direct Democracy)**: প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাতে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও করিত। এইভাবে নাগরিক সম্প্রদায় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হইত। নির্বাচন বা প্রতিনিধি-প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রেই এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র, জনসংখ্যা স্বল্প এবং সমস্যা সরল হইলে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে

---

১. Government 'should develop the most intense and widespread participation of the inhabitants in *preparing reaching* and *carrying out decisions*. Arne Naess and Stein Rokkan: *'Analytic Survey' in Democracy in a World of Tensions*

২. Democracy is *"a form of government organised in accordance with the principles of popular sovereignty, political equality, popular consultation, and majority rule."* Austin Ranney: *The Governing of Men*

-পারে। কিন্তু আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ ক্ষুদ্র নহে, ইহাদের সমস্যাও সরল নহে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। ফলে মাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যান্টন (Cantons) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকারে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

খ। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy): আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিনিধিমূলক। সুতরাং এই সকল গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র।

মিলের সংজ্ঞা: পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সুন্দরভাবে দিয়াছেন জন স্টুয়ার্ট মিল। মিল বলেন, ইহা হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যেখানে "সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে।"[১]

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচকদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া এবং পুনর্নির্বাচনের আশায় আইনসভায় জনমতের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন।

শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণও হয় প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণ দ্বারা নির্বাচিত হন, না-হয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে মনোনীত হন। সুতরাং তাঁহারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সচেষ্ট থাকেন।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের ত্রুটি: কিন্তু প্রতিনিধি যে সকল সময় জনমতের অনুকূলেই কার্য করিবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতবিরোধী কার্যও করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিয়া জনমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নির্বাচকগণের পক্ষে পুনর্নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এইজন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপাসক রুশো বলিয়াছিলেন যে নির্বাচনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে ইংরাজরা স্বাধীন নহে। অর্থাৎ, একবার নির্বাচন হইয়া গেলে পুনর্নির্বাচন অবধি তাহারা প্রতিনিধি-বর্গের শাসন মানিয়া লইতে বাধ্য।

ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা: প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য বর্তমানে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সাম্যভিত্তিক প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) আখ্যা দেওয়া হয়।

---

১. It is a form of Government where "... the whole people or some numerous portions of them, exercise the governing power through deputies periodically elected by themselves."

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) : সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন ও বাধানিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য হইতে রাজনৈতিক উদারনীতি বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র (political liberalism or liberal democracy) জন্মগ্রহণ করে। শিল্প-বিপ্লব, পণ্যের বাজারের সম্প্রসারণ ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে নবোদ্ভূত ব্যবসায়ীশ্রেণীর নেতৃত্বে সার্বিক মানবিক অধিকারের নামে এই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রবর্তিত হয় নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক গণতন্ত্র।

ইংল্যাণ্ডই ছিল রাজনৈতিক উদারনীতির প্রসূতিগার এবং নীতিটির রাষ্ট্রদর্শনে রূপান্তরে বিশেষ অবদান ছিল লক, বেন্থাম, অ্যাডাম স্মিথ এবং জন স্টুয়াট মিলের।

তবে উদারনৈতিক তত্ত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় আঠার শতকের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা (১৭৭৬) ও ফরাসী বিপ্লবকারীদের অধিকারের ঘোষণায় (১৭৯১)।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় (Declaration Independence) বলা হয় যে সকল মানুষই সমানাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে অধিকারের মধ্যে আছে জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সুখসন্ধানের (right to life, liberty and pursuit of happiness)—এই তিনটি শাশ্বত বা স্বাভাবিক অধিকার। ফরাসী বিপ্লবকারীদের অধিকারের ঘোষণায় (The Declaration of Rights) বলা হয়, মানুষের স্বাভাবিক ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন অধিকারের সংরক্ষণই রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং ঐ অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত হইল স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করিবার অধিকার।

আবার উভয় দেশের ঘোষণাতেই বলা হয় যে সরকার শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্য হইতে যে-উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে তাহা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় উনিশ শতকে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলনীতি : উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল (ক) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার এবং (খ) শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার (liberty, rights and government by consent)।

বলা হয়, সকল ব্যক্তির সুখসমৃদ্ধি সমভাবে বর্ধন করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। প্রত্যেক ব্যক্তিই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত (each individual is a rational being)। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হইলে তবেই সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

অ্যাডাম স্মিথ : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া অ্যাডাম স্মিথ উক্তি করেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যেন এক অদৃশ্য হস্ত

(an insivible hand) দ্বারা অর্থাৎ অকল্পিতভাবে সমাজের সর্বাধিক হিত সাধিত হয়।[১] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক তত্ত্বের আদর্শ হইল স্বাধীনতা ও সুশাসনের স্বার্থে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ইহা ছাড়া কতকগুলি মানবিক অধিকারও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হইতে সংরক্ষিত করিতে হইবে। এই অধিকারগুলির মধ্যে আছে সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার, চুক্তির স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন (the Rule of Law), ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, অনিয়ন্ত্রিত গতিবিধির অধিকার, প্রভৃতি।

মোটকথা, উদারনৈতিক তত্ত্বে রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারগুলি (political and civil rights) এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের (political democracy) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংকট : এই তত্ত্ব উনিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রসারলাভ করিলে উহার পর হইতে উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। বিশেষ করিয়া বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র হয় বিশেষ সংকটের সম্মুখীন। কারণ, অর্থনৈতিক সাম্য, অর্থ নৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ হওয়ায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র মাত্র রাজনৈতিক সজ্জায় সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক হইয়া দাঁড়ায়। তবুও কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্ব ও আদর্শ এবং গণতন্ত্রের রূপ হিসাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের গুরুত্ব ও মূল্য রহিয়াছে।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Defects of Liberal Democratic Government) : রাজনৈতিক পরোক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীর অভাব কখনও হয় নাই। উইলির (Malcolm M. Willey) মতে, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উপর লেখকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : (ক) অন্ধ সমর্থকগণ, (খ) ঘোরতর বিদ্বেষিগণ এবং (গ) মধ্যপন্থা অনুসরণকারিগণ। এই তিন শ্রেণীর লেখকগণের মতামতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া গণতন্ত্রের গুণাগুণ বর্ণনা করা এবং গণতন্ত্রের সফলতার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে।

গুণ : বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি প্রধান গুণের নির্দেশ করিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(১) **ভাব-বিনিময় :** প্রথমে তিনি অ্যারিষ্টটলের যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে একমাত্র গণতন্ত্রেই সকল বিষয়ের উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়। সংস্কৃতি ও চারুকলা বিচারের ক্ষেত্রে অ্যারিষ্টটল বলিয়াছিলেন : "কতক লোকে একটি বিশেষ দিক দেখিতে পায়, কতক লোকে আর একটি দিক দেখিতে পায়, কিন্তু সকলে মিলিয়া বিষয়টিকে সমগ্রভাবেই দেখিতে পায়।" বার্কার বলেন, এই উক্তি মাত্র

---

১. আডাম স্মিথের এই তত্ত্ব স্বাতন্ত্র্যনীতি—*laissez-faire*—নামে অভিহিত।

সংস্কৃতির বেলাতেই নহে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত, অ্যারিষ্টটলই ইহা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

শাসন বহুজনের হইলে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্বারা এমন সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় যাহা সাধারণভাবে গ্রাহ্য।

উপরন্তু, রাজনৈতিক সত্যের অবিষ্কার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় বহুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়। ফলে একমাত্র গণতন্ত্রেই স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় প্রভৃতি রাজনৈতিক আদর্শের উপলব্ধি সম্ভব হয়। দাবি করা হয়, অন্যান্য শাসন-ব্যবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রে ব্যাপকতরভাবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।[১] কারণ, গণতন্ত্রে সর্বশ্রেণীর লোক রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই কারণেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

(২) মানসিক উন্নতি: বার্কার গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণ নির্দেশ করিয়াছেন জন স্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করিয়া। মিল তাঁহার প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থাসংক্রান্ত গ্রন্থে[২] বলিয়াছেন যে, সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, জনসাধারণের মানসিক উন্নতিও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

জনসাধারণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিলে তবেই সুশাসনে শিক্ষিত হইতে পারে। একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব হয় বলিয়া গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৩) সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ: বার্কার গণতন্ত্রের যে প্রথম গুণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা গণতন্ত্রের সপক্ষে প্রদর্শিত বিভিন্ন যুক্তির সমন্বয় মাত্র। এই বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে প্রথম হইল বেন্থাম, জেমস মিল প্রভৃতি হিতবাদী (Utilitarians) প্রদর্শিত যুক্তি।

বেন্থামের মতে, সুশাসনের সমস্যা হইল শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিয়া সর্বাধিক সংখ্যার সর্বাধিক কল্যাণসাধনের সমস্যা। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল শাসিতকে শাসক করিয়া তোলা। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব হয় বলিয়া ইহাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা।

জেমস মিল ঐ একই কারণে গণতন্ত্রকে 'বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার' (grand discovery of modern times) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) সকল শ্রেণীর কল্যাণসাধন: হিতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নহে, বাস্তব জীবনে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন ও কার্যাবলী পরীক্ষা করিয়া টক্‌ভিল ঐ

১. "It (democracy) is the system best able to produce justice." Henry B. Mayo: *An Introduction to Democratic Theory.*

২. *Considerations on Representative Government*

একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "গণতন্ত্রের ন্যায় সমাজের সকল শ্রেণীর কল্যাণসাধনের উপযোগী আর কোন শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই" (No political form has hitherto been discovered which is equally favourable to the prosperity and development of *all the classes.*)। হার্বার্ট স্পেন্সারও এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

(৫) নৈতিক ভিত্তি: ইহা অন্যতম ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে-শ্রেণীর হস্তে থাকে সেই শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। সুতরাং ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "সাধারণের কল্যাণ যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে সাধারণের নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্যসাধনের অপরিহার্য সর্ত।" ইহাই হইল কান্ত-প্রদর্শিত গণতন্ত্রের সপক্ষে নৈতিক যুক্তি। কান্ত-ই (Kant) আদর্শবাদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই মতে, যে-সকল বিষয়ের প্রভাব বহুর উপর পড়ে সেই সকল বিষয় নির্ধারণের ভার সকলের উপর সমানভাবে থাকা উচিত।[১] অন্যথায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, রাজনৈতিক ন্যায় ব্যাহত হইবে। কারণ, সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ইহাই রাজনৈতিক ন্যায়। অতএব, মাত্র গণতান্ত্রিক সরকারই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে একমাত্র ইহাই সর্বসাধারণের আনুগত্যের দাবি করিতে পারে।[২]

(৬) দেশপ্রীতি ও দায়িত্ববোধ বর্ধন: বার্কারের নির্দেশিত গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণটি বিশ্লেষণ করিলেও গণতন্ত্রের সপক্ষে আরও যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বলা হয়, গণতন্ত্র সকলকে সমান মর্যাদা দান করিয়া সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয় ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

(৭) বিপ্লব-প্রবণতা হইতে মুক্তি: গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে আরও দাবি হইল যে ইহাতে মতামত ও স্বার্থের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা সম্ভব হয়, কারণ গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকারী নীতি ধার্য ও পরিচালনা করিয়া থাকে। আবার প্রয়োজনমত শাসক পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা বর্তমান গতিশীল সামাজিক অবস্থার সহিত সহজে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে। এই সকলের ফলে জনগণ বৈপ্লবিক পন্থা হইতে দূরে থাকিয়া আইনসংগত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ও সমাজজীবন গঠনে সচেষ্ট হয়, এবং ইহার ফলে রাজনৈতিক জীবনে আসে স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্নতা। ইহার মূল্যও কম নয়।

---

১. "... all men should count equally in determining actions by which many are affected."

২. "The authority of government ... such as I am willing to submit to ··· must have the sanction and consent of the governed." Thoreau

সমালোচনা : প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অসংগতি দৃষ্ট হইলেও তাহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব বলিয়াই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন।

চারি প্রকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা : উইলির (Malcolm M. Willey) মতে, এইরূপ অভিযোগগুলিকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : (ক) অপরিহার্যরূপে গণতন্ত্র হইল অজ্ঞ ও অক্ষমের শাসন এবং (খ) ক্ষণভংগুরতা হইল গণতন্ত্রের প্রকৃতি। ইহার উপর কতিপয় বিজ্ঞানগন্ধী লেখককে অনুসরণ করিয়া গণতন্ত্রকে (গ) অবৈজ্ঞানিক ধারণা (unscientific dogma) এবং (ঘ) গণতান্ত্রিক আদর্শকে সংকীর্ণ বলিয়াও সমালোচনা করা হয়।

(১) অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন : গণতন্ত্র যে অক্ষম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন এই অভিযোগ প্লেটোর সময় হইতে করিয়া আসা হইতেছে। সমালোচকগণের মতে, যে-কোন শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা বিশেষ জটিল হওয়ায় বর্তমান যুগ সম্বন্ধে এই ধারণা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু গণতন্ত্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। এইজন্য সমালোচকগণ গণতন্ত্রের মধ্যে অকর্মণ্যতার বীজ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ইহা 'অকর্মণ্যতার মন্ত্র' বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে।[১] লেকীর (Lecky) মতে, সরকার অজ্ঞতা না বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত হইবে—ইহাই মূল প্রশ্ন। ইহার মধ্যে অজ্ঞতা দ্বারা শাসনই যদি কাম্য হয় তবে অবশ্য গণতন্ত্রকে সমর্থন করা যাইতে পারে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, গণতন্ত্র হইল "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ব্যক্তির শাসন-ব্যবস্থা, কারণ এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক" (It is a government by 'the poorest, the most ignorant, the most incapable, who are necessarily the most numerous.')।

(২) রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা : গণতন্ত্র এই দিক দিয়াও অভিযুক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য লোকের শাসন বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে রক্ষণশীল। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন ধ্যানধারণা অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না। ফলে কাম্য সংস্কার সাধিত হইতে না পারায় প্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়।

(৩) নিম্নস্তরের নেতৃত্ব : নেতৃত্বের দিক দিয়াও গণতন্ত্রের ত্রুটি প্রদর্শন করা হইয়াছে। র‍্যাল্‌ফ্ অ্যাডামস্ ক্র্যাম (Ralph Adams Cram) ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে গণতান্ত্রিক নেতারা অন্য যে-কোন ব্যবস্থার নেতৃবর্গ হইতে নিম্নস্তরের। তাঁহার মতে, সাধারণে সকল সময়েই নেতার সন্ধান করিয়া বেড়ায়, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহারা নিম্নস্তরের নেতৃবর্গকেই নির্বাচিত করে।

---

১. Emile Faguet : *Cult of Incompetence*

(৪) স্বাধীনতার অলীকতা: গণতন্ত্রে যে-স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও, সমালোচকগণের মতে, ভুল। বলা হয় যে সাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার সম্বন্ধে ধারণার জন্য প্রয়োজন হইল চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতা যাহা সাধারণ লোকের নাই। তাহারা গতানুগতিক-ভাবে কোন নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করিয়া চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডি-বহির্ভূত সকল প্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হয়।

এই নিয়ন্ত্রণাধিক্যের জন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হয়।

(৫) দলপ্রথার কেন ত্রুটি: দলপ্রথা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অংগীভূত হওয়ার জন্যই দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় কাহারও জাতীয় মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি থাকে না। রাষ্ট্রনায়কগণ সাধারণের অর্থ অসংগত-ভাবে ব্যয় করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। সাধারণেও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখে। ফলে জাতীয় সমৃদ্ধির স্থান অধিকার করে দলগত বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা।

কোকারের সংক্ষিপ্তসার: অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্রের উপরি-উক্ত যে সমালোচনা কোকার তাহার সংক্ষিপ্তসার এইভাবে প্রদান করিয়াছেন: "... সরকারের সকল প্রকার রূপের মধ্যে গণতন্ত্র হইল সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ও অপচয়পূর্ণ, সর্বাপেক্ষা দলগত ও অসহিষ্ণু, প্রকৃত প্রগতির সর্বাপেক্ষা বিরোধী।"[১]

(৬) স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ: গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সমালোচকগণের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন স্যার হেনরী মেইন। তিনি গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে ক্ষণভংগুর। এই আলোচনার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই দেখা যায় যে, ক্ষণভংগুরতা জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহার আবির্ভাবের ফলে সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বই অধিকতর অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।" কারণ হিসাবে মেইন বলেন যে, গণতন্ত্রে বহু পরস্পরবিরোধী ধারণা পরস্পরের সহিত জড়িত থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষে শাসন-ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ফলে সরকারের ঘন ঘন উত্থান-পতন দেখিতে পাওয়া যায়।

১. "... of all forms of government, democracy is the most inefficient and extravagant the most factional and intolerant, the most hostile or indifferent to true progress."

(৭) নিম্নস্তরের সভ্যতা : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ফলেই সভ্যতা 'গতানুগতিক, সাধারণ ও স্থূল' (banal, mediocre and dull) হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বিজ্ঞানের দিক হইতে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে বলিয়াই সভ্যতার পশ্চাৎগতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বলেন, গণতন্ত্র সকলকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া বুদ্ধিমত্তার যে-সমভূমির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে উন্নত সভ্যতা জন্মিতে পারে না। এই দিক দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে প্রতিভার অপমৃত্যুই গণতন্ত্রের একমাত্র কুফল নহে; প্রতিভাকে স্থূল ও সাধারণ পর্যায়ে পরিণত করাও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।[১]

(৮) স্বৈরাচারিতা : আবার বলা হয়, সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতা হেতু নিজের ভালমন্দ বিচার করিতে অপারগ। এই অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে চলে স্বৈরাচারিতার কুশাসন এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিসমূহের অভীষ্টসাধনের রাজনীতি।

(৯) পুঁজিবাদের প্রশ্রয় ও আপৎকালীন অপারগতা : গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয় এবং বিপদকালীন অবস্থা অবলম্বনে বিশেষ সমর্থ নয়—বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে।

(১০) সংকীর্ণ আদর্শ : পরিশেষে, বলা হয় যে কোন অর্থেই সর্বসাধারণের দ্বারা শাসনের (rule by the people) স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়, কারণ কোন অবস্থাতেই শাসনকার্যের সহিত সকলকে সংশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে না।

সুতরাং গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় মাত্র নির্বাচকদের সরকার-পরিবর্তনের ক্ষমতা।

সকল শাসন-ব্যবস্থাতেই শাসিতেরা সরকার পরিবর্তন করিতে সমর্থ। অবশ্য গণতন্ত্রে এই পরিবর্তন-পদ্ধতি যে সহজ ও শান্তিপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা অতি সামান্য ব্যাপার। ফলে কার্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শও অতি সংকীর্ণ।

উপসংহার : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে-সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার ফল। কোন কোন লেখক গণতন্ত্রকে একরূপ সমাজ-ব্যবস্থা মনে করিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, আবার কেহ বা ইহাকে শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে দেখিয়াই আক্রমণ করিয়াছেন। যেখানে শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের সমালোচনা করা হইয়াছে সেখানে অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক হইয়াছে। লর্ড ব্রাইস দেখাইয়াছেন যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগের তিনটি : (১) আর্থিক স্বার্থসমূহের

---

১. "Democracy means worship of the mediocrity, and hatred of excellence', and here 'imitation is horizontal instead of vertical—not the superior man but the majority man becomes the ideal and the model." Nietzsche: *Thus Spake Zarathustra*

শাসন ও আইন প্রণয়নকে বিকৃত করিবার ক্ষমতা, (২) রাজনীতিকে সেবা হিসাবে গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায় হিসাবে গণ্য করা এবং (৩) অপচয়—যে-কোন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এবং সেপর ত্রুটিগুলিরও প্রতিবিধান সম্ভব। প্রতিবিধানের প্রশ্নে গণতন্ত্র সফল করিবার উপায় সংক্রান্ত প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। এখন এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে (Conditions of Success of Democracy): জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য তিনটি অবস্থার অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়: (১) জনগণের পক্ষে ইহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন; (২) ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদের পক্ষে কর্তব্যপালনে এবং অধিকার ব্যাহত হইলে অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইতে হইবে।

সর্তাবলী—(১) গণতান্ত্রিক জনগণ: মিলের এই তিনটি সর্ত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের গুণ বা লক্ষণের নির্দেশক মাত্র। উচ্চ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণই এরূপ গুণসমন্বিত হইতে পারে এবং এরূপ গুণসমন্বিত জনগণকে বার্ণসের ভাষায়, 'গণতান্ত্রিক জনগণ' (democratic people) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

অতএব, মিল-প্রদত্ত তিনটি সর্ত একসংগে মিলাইয়া বলা যায় যে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের।

যদি নাগরিকগণের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবেই জনগণ গণতান্ত্রিক হইয়া উঠিতে পারে। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যতম হইল তাহা গিডিংস যাহাকে 'শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতনতা' (consciousness of kind) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, কারণ ইহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতন্ত্র প্রসংগে শ্রেণী সম্বন্ধে চেতনা বলিতে বুঝায় সকলের সম্বন্ধে চেতনা, সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতা, সৌভ্রাত্রের অনুভূতি (a feeling of fraternity)।

গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে সহিষ্ণুতাও দাবি করে। কার্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে।

(২) গণতান্ত্রিক পরিবেশ: দেখা গেল, জনগণ গণতান্ত্রিক হইলে তবেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সফল হইতে পারে। এখন প্রশ্ন, জনগণকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় কিরূপে? ইহার জন্য প্রয়োজন এমন এক পরিবেশের যেখানে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং সাম্যের ভিত্তিতে এই সকল অধিকারের প্রতিষ্ঠা দ্বারা।

প্রয়োজনীয় অধিকার ভোগ করিয়া ব্যক্তি যদি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হইতে পারে তবেই সে গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

(৩) গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা: জনসাধারণের শাসনের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে অভিযোগ তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অসম্পূর্ণতার জন্যই। বর্তমান পরিবেশে সাধারণের পূর্ণ অধিকার—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকার—স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় না। বস্তুত, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সহিত সাম্প্রতিক যুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে 'অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র' (economic oligarchy) বা পুঁজিবাদ। ফলে স্বাধীনতা ও সাম্য একরূপ অলীক প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং দেখা দিয়াছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ হতাশা। তাই প্রথম প্রয়োজন হইল গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের (instruments of production) মালিকানা সমাজের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনায় সকলকে সমানাধিকার প্রদান করিতে হইবে—মানুষে-মানুষে সম্পর্ক পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নচেৎ, মাত্র রাজনৈতিক সাম্য বা রাজনৈতিক রূপ লইয়া গণতন্ত্র কোনমতেই বাঁচিতে পারিবে না। অন্যভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সফলতার অন্যতম সর্ত হইল অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা। ইহার জন্য গণতন্ত্রকে উহার উদারনৈতিক রূপ পরিবর্তন করিতে হইবে।

(৪) যোগ্য নেতৃত্ব: প্রখ্যাত লেখক সুম্পিটার (J. A. Schumpeter) গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাফল্যের জন্য আর একটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নেতৃবর্গকে সৎ, যুক্তিবাদী ও বিবেকসম্পন্ন ('honest, reasonable and conscientious') হইতে হইবে। এরূপ গুণসমন্বিত ব্যক্তির অভাব হইলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অগণতান্ত্রিক স্বার্থান্বেষীদের হস্তে চলিয়া যাইবে।[১]

(৫) দলীয় রাজনীতিকে সীমাবদ্ধকরণ: আবার সকল বিষয়কেই দলীয় রাজনীতির সহিত জড়াইয়া ফেলিলে গণতন্ত্র হোঁচট খাইতে বাধ্য। যেমন, খুঁটিনাটি ব্যাপারে সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা এবং ফলে জনকল্যাণ ব্যাহত না হইয়া পারে না। সুতরাং দলীয় রাজনীতির সীমারেখা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন থাকিতে হইবে।

(৬) সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা ও উদ্যমশীলতা: গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির সফলতার আর একটি সর্ত হইল যে সরকারী কর্মচারীদের সুদক্ষ ও উদ্যমশীল হইতে

১. Schumpeter: *Capitalism, Socialism and Democracy*

হইবে। কারণ, গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক নেতারা সরকারী ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন তাঁহাদের পক্ষে সরকারী কার্য পরিচলনার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা না থাকাই সম্ভব। এইজন্য বলা হয় যে গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে রাষ্ট্রকৃত্যকের উৎকর্ষের উপর। ইহা ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনের সুফল ফলিতে পারে না।

(৭) গণতন্ত্রে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা: গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বুঝাপড়ার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। সকলকেই মতামত প্রকাশের বা প্রচারের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ইহার এক নাম হইল 'পরমতসহিষ্ণুতা' (toleration) এবং অন্য নাম 'গণতান্ত্রিক আত্মসংযম' (democratic self-control)। ইহার ফলেই প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা (true political liberty) প্রবর্তিত থাকিয়া গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। দলের সমালোচনার অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।[1]

কিন্তু লোকে তখনই এরূপ সংযমের পথে চলিতে ইচ্ছা করে যখন সমাজ-ব্যবস্থার রূপ সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে কোন মৌলিক মতবিরোধ থাকে না। বর্তমানে একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতেই এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে। অতএব, পূর্বোল্লিখিত উপসংহারের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা যায় যে, মাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্র সফলতার সহিত কার্যকর হইতে পারে।[2]

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy): প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রকেই (Liberal Democracy) নির্দেশ করা হয়। ইহা উদারনৈতিক দর্শনেরই (Liberal Philosophy) প্রতিফলন।

উদারনৈতিক দর্শনের মূলকথা হইল (ক) একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অপরদিকে (খ) বিশেষ সুবিধার (special privileges) অনস্তিত্ব।

এই দুই নীতির অনুসরণে বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের অধিকার, আইনের চক্ষে সমানাধিকার, চুক্তির অধিকার, সমান ভোটাধিকার প্রভৃতি প্রদান করা হয়। উদারনৈতিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সকলেরই যদি এই সকল স্বাধীনতা বা অধিকার থাকে তবে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসমূহের সমন্বয়সাধন আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র মোটামুটি উদার-নৈতিক দর্শনের এই বিশ্বাসই বহন করিয়া আসিতেছে। এইজন্যই ইহাকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সংকটের কারণ: উদারনৈতিক গণতন্ত্র আজ সংকটের সম্মুখীন। কিছুদিন পূর্বেও ধারণা ছিল যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রই সমাজ-বিকাশের চরম রূপ। কিন্তু সম্প্রতি এই গণতন্ত্রকে সার্থক করার পথে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক দেখা দিয়াছে।

---

১. Ebenstein, *Today's Isms*

২. Schumpeter: *Capitalism, Socialism and Democracy*

(১) অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব: গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম সত হইল যে নাগরিকগণকে তাহাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকগণের এই সচেতনতার বা সতর্কতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।[১]

(২) সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতা: গণতন্ত্রের আর একটি বিপদ হইল যে সমাজের সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব। মূলে আছে শিক্ষার অভাব ও সমস্যাসমূহের জটিলতা। সাধারণ লোক এই সকল জটিল সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে না বা বুঝিতে চেষ্টা করে না। সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলসমূহ জনসাধারণের এই অজ্ঞতা ও নির্লিপ্ততার সুযোগ লইয়া তাহাদের বিপথে পরিচালনা করে।

(৩) অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অনস্তিত্ব: পরিশেষে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হইল অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র (economic oligarchy) এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ। গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে আশ্রয় না করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক গণতন্ত্র বাঁচিতে পারে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এই শর্ত একরূপ স্বীকার করিয়া লইলেও কার্যক্ষেত্রে এখনও ইহাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ফলে তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সহিত সর্বক্ষেত্রে এখনও জড়িত আছে পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা।[২]

পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা যতদিন সম্প্রসারণশীল ছিল ততদিন গণতন্ত্রের সম্মুখে অস্তিত্বের কোন সমস্যা উপস্থিত হয় নাই, কারণ অধিকতর মুনাফা হইতে জনসাধারণের উত্তরোত্তর দাবি সহজেই মিটানো যাইত। কিন্তু আজ পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা সংকোচনশীল হইয়াছে এবং ফলে জনসাধারণের দাবি পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং উদারনৈতিক গণতন্ত্রে দেখা দিয়াছে সংকট।

সংকট হইতে পরিত্রাণের পথ: এই সংকট হইতে পরিত্রাণের পথ কি? —এই প্রশ্নেই আজ সমগ্র গণতান্ত্রিক জগৎ মুখরিত। পথের সন্ধান যাঁহারা দিতে চান তাঁহাদের অনেকে নায়কতন্ত্রের দিকে নির্দেশ করেন, কারণ ইঁহাদের মতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি সম্ভব নয়। অনেকে আবার সমভোগী সমাজ (communistic society) প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রেরই বিলোপসাধন করিতে চান। অবশ্য ইঁহারাও পুঁজিবাদের বিলোপ ও সমভোগী সমাজ প্রবর্তনের অন্তর্বর্তীকালে একরূপ নায়কতন্ত্রের কল্পনা করেন। সর্বশেষে আছেন শাসনতান্ত্রিক ও বিবর্তনমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নূতন সমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাসী চিন্তাশীলগণ।

---

১. "Democracy is in danger of growing stale through the laziness of its members." Lloyd: *Democracy and Its Rivals*

২. গণতন্ত্রের সফলতাসংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনা দেখ।

এমতাবস্থায় মতবাদ-নিরপেক্ষ কাহারও পক্ষে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকারের বর্তমান রূপ কখনই চূড়ান্ত শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না, কারণ পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষকে কখনই অন্নসংস্থানের ভাবনা ও শোষণ হইতে মুক্ত করিতে বা তাহাদের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।[১]

প্রথম জীবনে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উগ্র সমর্থক জন স্টুয়ার্ট মিল জীবনের শেষদিকে ইহাই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছিলেন যে, কিভাবে কর্মের স্বাধীনতার সহিত উৎপাদনের উপকরণসমূহের যৌথ মালিকানা এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির সমভোগের ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করা যায়, তাহাই হইবে ভবিষ্যৎ দিনের সমস্যা।[২]

উদারনৈতিক গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণের ধারণা: মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণ গণতন্ত্র ধারণাটির সমর্থক হইলেও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ও ব্যবস্থার সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে যে-গণতন্ত্রের প্রচলন আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র। উদারনীতির আদর্শে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইলেও ইহা কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি ধারণার মূল্য তত্ত্বগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

মাত্র অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই কোন্ ব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক তাহা বুঝা যায়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষণ করে। শ্রেণীবিভেদ ও শ্রেণীশোষণ, পক্ষপাতদুষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, উৎপাদনের মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার প্রভৃতি কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উৎকর্ষ প্রমাণ করে না। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই অন্যায় আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং ইহাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে না। শ্রেণীশোষণ নয়, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই গণতন্ত্রের সাফল্য আনিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজের প্রগতি ও প্রসারে এক উল্লেখযোগ্য দিক্‌দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয়।

১. "Unless Democracy justifies the belief that it is a form of government under which men may live out their lives free from fear of want and oppression, unless it gives every man and woman the opportunity to realise freely whatever good there is in them, it will not survive." Lloyd : *Democracy and Its Rivals*

২. The social problem of the future will be "how to unite the greatest liberty of action with *a common ownership in the raw materials of the globe* and *an equal participation in the benefits of combined labour.*"

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র: সমাজতান্ত্রিক সমাজ গণতান্ত্রিকতার প্রসার ঘটায় বলিয়া দাবি করা হয়। গণতন্ত্র সমাজজীবনে বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয় এবং নূতন সম্পর্ক, আচারব্যবহার, ঐতিহ্য প্রভৃতির উন্মেষ ঘটায়।[১]

অর্থ: সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলিতে সেইরূপ গণতন্ত্রকেই বুঝান হয় যাহা এক নূতন ঐতিহাসিক ও উচ্চস্তরের গণ-সার্বভৌমিকতাকে প্রকাশ করে; সর্বহারার গণতন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া যাহা পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের বিনাশসাধন করে এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।[২]

তিনটি উদ্দেশ্য: রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব (Great Socialist October Revolution) এবং পরবর্তীকালে চীনের গণবিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উৎকর্ষ বিবেচিত হয়। এইরূপ গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন ও মাও জে-দং।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হইল ধনতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্র এবং সমভোগবাদী সমাজের রূপান্তরের এক অন্তর্বর্তীকালীন (transitional) ব্যবস্থা।

তিনটি উদ্দেশ্যের পারপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থাকে বিচার করা হয়: (ক) ইহা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এই গণতন্ত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থেই বিচার্য নহে, ইহা জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রকাশ ও প্রসার ঘটায়। (খ) এই গণতন্ত্র সমগ্র জনসাধারণের উপযোগী ব্যবস্থা। ইহা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। ইহা বিশেষ শ্রেণী বা স্বার্থের সংরক্ষণ করে না। (গ) ইহা শুধুমাত্র জনগণের অধিকারকে ব্যাখ্যা করে না, কি উপায়ে এই অধিকার সংরক্ষিত হইবে তাহারও ব্যবস্থা করে।

মূলনীতি: সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল নিম্নরূপ:

(১) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হইল শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থা একদিকে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর প্রাধান্যকে সূচিত করে অন্যদিকে পুঁজিপতি, জমিদার ও 'কুলাক' প্রভৃতি শোষকশ্রেণীর ধ্বংসসাধন করে। (২) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship of the Proletariat) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া সমগ্র জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

১. "Thorough-going democracy is the cardinal political characteristic of socialist society. Democracy permeates the diverse aspects of society's life, giving rise to new relations, habits, norms of behaviour and traditions." *Fundamentals of Marxism-Leninism* (Moscow)

২. "Socialist democracy is a new, higher historical type of sovereignty of the people, which grew out of the proletarian democracy of the period of transition from capitalism to socialism." *Ibid*

এই রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের দিকে প্রয়াসী হয় এবং রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত করে। (৩) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটায় এবং উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা স্থাপন করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বলিয়া কিছু থাকে না। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা হইল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-কার্যের সম্প্রসারণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। (৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার এবং বিজ্ঞান কলা-সাহিত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আদর্শ ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া তোলা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নীতি। (৫) নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতার প্রসার, পর্যাপ্ত অর্থ-নৈতিক সুযোগের সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যান্য লক্ষ্য।

শাসন-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি: সোবিয়েত ইউনিয়ন, গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন এবং ইয়োরোপের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে প্রতিফলিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল: (১) আইনসভার গঠন ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে গ্রহণ—যথা, আইনসভার সদস্যগণের বৈধ নির্বাচন, দুর্নীতি ইত্যাদি অভিযোগে ইহাদের অপসারণ, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, নারীর অধিকারের স্বীকৃতি, প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি। (২) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার (Democratic Centralism) নীতি অনুসরণ। ইহা একদিকে যেমন নাগরিক অধিকার, নাগরিকের উদ্যোগ প্রভৃতির ভিত্তিতে গঠিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নিয়মশৃংখলা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিকে সমর্থন জানায়। (৩) কমিউনিস্ট দল ও ইহার নেতৃত্বের স্বীকৃতি। ইহা জনগণের অগ্রগামী সংগ্রামী বাহিনী হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রসারে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়। (৪) জাতীয় মুক্তিবাহিনী ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্ব। প্রধানত ইহাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে ও ইহার সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। (৫) গণ-সংগঠনের ভূমিকা: জনগণকে লইয়া এই সংগঠনসমূহ গঠিত হইবে। সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যে এই সকল সংগঠকদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (৬) মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের গঠনে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সংবিধানের তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত ভিত্তি হইল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। সংবিধান জনসাধারণকে এই মতাদর্শ অনুশীলন ও ইহা প্রয়োগ করিতে নির্দেশ দেয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সামাজিক গণতান্ত্রিকতাবাদ নহে: সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনাকালে অনেকেই ইহাকে সামাজিক গণতান্ত্রিকতাবাদ

(Social-Democratism) ধারণাটির সহিত যুক্ত করেন। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত। সামাজিক গণতান্ত্রিকতাবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রী দল (Social-Democratic Party) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে এবং বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট দল ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রীতি-নীতির প্রতি আস্থাশীল নহে বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

বলা হয়, সামাজিক গণতন্ত্রীবাদীরা শ্রেণী-বিপ্লব ও ইহার সম্ভাবনাকে বিশেষ মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক নয় এবং ইহারা বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই তৎপর; অন্যদিকে কমিউনিস্ট দল বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতেই ইচ্ছুক এবং ইহার প্রয়োজনে তাহারা যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।[১] সামাজিক গণতন্ত্রী দল বিপ্লব অপেক্ষা সংস্কারসাধনের প্রতিই অধিক আস্থাশীল।

সামাজিক গণতান্ত্রিকতাবাদ ও মার্ক্সবাদের বিকৃতি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার পরবর্তীকালে অনেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক গণতন্ত্রী দলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সকল রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ এই সমস্ত রাষ্ট্রে কতটা হইয়াছে সে-সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। চীনের গণবিপ্লব ও সংবিধানে এবং অন্যান্য কোন কোন দেশে অবশ্য প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়ার রাজনীতিতে কাউটস্কি (Kautsky) এবং চীনের রাজনীতিতে চিয়াং কাই-শেকের ভূমিকা সম্পর্কে মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার রাজনীতিতে কাউটস্কির পরিচয় ছিল সামাজিক গণতন্ত্রী হিসাবে বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, গণ-স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্পর্কে কাউটস্কির ধারণা মার্ক্সবাদী-দৃষ্টিজ্ঞান বহির্ভূত বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সাফল্যের বিচারে সামাজিক গণতান্ত্রিকতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এই ধারণা দুইটি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। উভয়ের সঠিক পার্থক্য নির্দেশ করা না হইলে ভ্রান্তির অবকাশ থাকিতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিবেচনার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারে। বলা হয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণ অনেক সময় এই ভ্রান্তির সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বিকৃত ব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রচেষ্টা করেন।

নায়কতন্ত্র (Dictatorship): নায়কতন্ত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব সাত ও ছয় শতকে প্রাচীন গ্রীসে স্বৈরাচারতন্ত্রের মধ্যে ইহার ইংগিত

---

১. "The difference (between the Communists and the Social Democrats) is that the Social Democrats obstruct real revolutionary development,... to help re-establish the stability of the bourgeois state, while the Communists take advantage of every opportunity and of every means to overthrow or destroy the bourgeois state."

পাওয়া যায়। তবে 'নায়ক' বা 'ডিক্টেটর' শব্দটি রোমক শাসনতান্ত্রিক আইন (Roman Constitution Law) হইতে প্রাপ্ত।

অর্থ: কিন্তু বর্তমানে নায়কতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, শব্দটি রোমক যুগে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত না। বর্তমান ধারণা অনুসারে যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া অপ্রতিহত স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখনই উহাকে নায়কতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়।[১]

রোমক নায়কতন্ত্র: অপরদিকে প্রজাতন্ত্রী রোমে নায়কতন্ত্র বলিতে বুঝাইত সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত জরুরীকালীন শাসন-ব্যবস্থাকে (crisis government)। বহিরাক্রমণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব বা শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দেখা দিলে সাময়িকভাবে স্বাভাবিক শাসন-ব্যবস্থাকে স্থগিত রাখিয়া সেনানায়ক বা অনুরূপ কোন এক ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করা হইত। এইভাবে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রাচীন রোমে সাময়িকভাবে নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইত। তবে জরুরী অবস্থার অবসান হওয়ার সংগে সংগেই নায়কতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া স্বাভাবিক শাসন-ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনা হইত।

দলগত ভিত্তি: অনেকের মতে, নায়কতন্ত্র নায়কের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব অথবা দলগত কর্তৃত্ব—উভয় ভিত্তিতেই সংগঠিত হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে দেখিলে এরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল। নায়কতন্ত্র কখনই ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না—ইহা সকল সময়ই দলগত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়, যদিও বা দলের উপর নায়কের প্রভাবপ্রতিপত্তির তারতম্য থাকিতে পারে। ম্যাকআইভার বলেন: " ..কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই সর্বময় কর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে না.. যদি আপাতদৃষ্টিতে কোথাও একমাত্র চূড়ান্ত শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় তবে অপরিহার্যভাবে দেখা যাইবে যে, তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তি হইল এক সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সংযোগ, তিনি এই শ্রেণীর স্বার্থে এবং ইহার সহযোগিতাতেই শাসন করিয়া থাকেন।" প্রকৃতপক্ষে হিটলার ও মুসোলিনীও দলীয় নায়ক ছিলেন, তাঁহাদের কর্তৃত্বও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ছিল না।

নায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র—প্রকৃতিগত তুলনা (Dictatorship and Democracy—Comparison of their basic natures): তত্ত্বের দিক দিয়া নায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। নায়কতন্ত্রে মানুষে মানুষে সাম্য, আইনসভার প্রাধান্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাদের পরিবর্তে দেখা যায়, সুনিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘিষ্ঠ দ্বারা গঠিত একদলীয় শাসন, দলের উপর নায়ক বা নায়কবৃন্দের একরূপ আধিপত্য, সুকল্পিত পন্থায় জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত ও তরবারির নীতি অনুসরণ।

---

১. "By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power on the state, exercising it without restraint." Neuman: *The Democratic and the Authoritarian State*

সামগ্রিক রাষ্ট্র : নায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ও সর্বশক্তিরূপে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় সামগ্রিক (totalitarian) রাষ্ট্র।

মোটকথা, সর্বাত্মক নায়কতন্ত্রের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ নয়, ইহা সমাজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ইহা ছাড়া গণতন্ত্রে যেমন বিভিন্ন মতামতের স্থান রহিয়াছে, নায়কতন্ত্রে মাত্র একটি মতবাদকে স্বীকার করা হয়।[১]

নায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ (Reasons for the Rise of Dictatorship) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছিল যে এই যুদ্ধ হইল গণতন্ত্রের জন্য, পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার জন্য যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেখা গেল, গণতন্ত্রের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্ট হয় নাই, বরং গণতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে। মধ্য ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র এবং জার্মেনী ও ইতালী সরাসরি এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতার অভিযোগ : এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনৈতিক আদর্শ ও ধারণার জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইল। প্রশ্ন উঠিল, সামগ্রিক রাষ্ট্রের নীতির প্রতি মানুষের বিশ্বাসের কারণ কি? গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই যে প্রতিক্রিয়া ইহার মূলসূত্র কি? ইহার উৎস কোথায়? এবং গণতন্ত্রেরই বা ভবিষ্যৎ কি? বিভিন্ন উত্তর পাওয়া গেল বিভিন্ন মহল হইতে। তন্মধ্যে একটি উত্তর বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপে ইহা হইল গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যে গণতন্ত্র প্রায় দুই শতক ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা হইল রাজনৈতিক গণতন্ত্র। ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে 'অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র' (economic oligarchy)। সুতরাং ইহা স্থিতিশীল। ইহা মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না। ফলে রাজনৈতিক সাম্য আইনের অনুশাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে দেখা দিয়াছে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসন্তোষ এবং গণতন্ত্রের উৎকর্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস।[২] ফলে তাহারা আজ সমাজ-ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে চায়। ডক্টর গুচের (Gooch) মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে যখন এইরূপ মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে তখন উদ্ভব হয় নায়কতন্ত্রের।

গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ও অক্ষমতা নায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ : গুচের এই ধারণার সমর্থন মিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বর্তমান পরিস্থিতিতে। ফ্যাসীবাদী ইতালী, নাৎসীবাদী জার্মেনী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের ধ্বংসের পর আজও সামগ্রিক রাষ্ট্রের নীতি ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় নাই। অনেক দেশে আজও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যভাবে নায়কতন্ত্র রহিয়াছে। সুতরাং বলা যায়, গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বা নূতন সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নে অক্ষমতাই নায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ।

---

১. "... the plurality or viewpoints, the hallmark of the liberal-democratic state, is ... suppressed in favour of one single viewpoint. S. E. Finer : *Comparative Government*

২. বর্তমানে আবার বিশ্বজনীন মুদ্রাস্ফীতি (global inflation) এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে ব্যাঘাতের (growth recession) দরুন গণতন্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নব-প্রবর্তিত গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন হইল গণতান্ত্রিক পরিবেশের এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে যে-সকল দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয় সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা ঐতিহ্য কোনটাই ছিল না। ফলে ঐ সকল দেশের জনগণ নূতন শাসন-ব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা 'নূতন কিছু' চাহিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। এইরূপ অসন্তোষ ও আশাভঙ্গের অবস্থায় কোন ব্যক্তি বা দল যদি নির্দিষ্ট কার্যক্রম লইয়া উপস্থিত হয় তবে তাহার বা তাহাদের পক্ষে সহজেই নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ইতালী ও জার্মেনীতে এইরূপই ঘটিয়াছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এসিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এইরূপই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

নায়কতন্ত্রের তত্ত্বগত সমর্থন (Theoretical Justification of Dictatorship): শুধু যে বিশেষ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে হতাশাই নায়কতন্ত্রকে ডাকিয়া আনে তাহাই নহে, তত্ত্বের ক্ষেত্রেও নায়কতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায়।

নীটশের দর্শন: গণতন্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞা বা ঘৃণা এবং বীরপূজার মনোভাবই হইল এই তত্ত্বগত সমর্থনের সূত্র। উভয় দৃষ্টিভংগিরই সর্বাধিক প্রকাশের পরিচয় মিলে নীটশের (Friedrich Nietzsche) দর্শনে।

নীটশের মতে, শক্তিই আরাধ্য বস্তু এবং দুর্বলতাই একমাত্র ত্রুটি। সুতরাং যাহাই মানুষকে দুর্বল করিয়া তুলে তাহাই বর্জনীয়। গণতান্ত্রিক সাম্য মানুষকে নির্বীর্য করিয়া নারীতে পরিণত করে।[১] ফলে বৃহৎ কিছু সম্ভব হয় না। অতএব, গণতান্ত্রিক ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, জীববিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে যোগ্যতাকে জয়ী হইতে দাও—বীরপূজা কর।

নীটশের মতে, নেপোলিয়নই আদর্শ পুরুষ। তাঁহাকে হত্যাকারী হিসাবে না দেখিয়া কল্যাণকৃৎ হিসাবেই দেখা উচিত। নেপোলিয়ন-প্রদত্ত মৃত্যু ছিল সামরিক মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু, কিন্তু বর্তমান দিনের গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাধীন মৃত্যু হইল সংঘাত শোষণ ও নিষ্পেষণের কবলে ধীরে ধীরে মৃত্যু।[২]

অসাধারণ ব্যক্তির ধারণা: এইরূপ হীন মৃত্যুর কবল হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে হইলে ব্যবসায়ীদের দমন করিতে হইবে, দেখিতে হইবে তাহারা যেন রাষ্ট্রশক্তি দখল করিতে না পারে। একমাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই (Superman) এই লক্ষ্যসাধন করিতে সমর্থ। সুতরাং অসাধারণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর শাসনই প্রতিষ্ঠিত কর। এইরূপ শাসন যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই জীবন হইয়া উঠিবে মহান্—ঐশ্বর্যময়। মানুষ তখন আবার বাঁচার স্বাদ ফিরিয়া পাইবে।

১. " ... everybody comes to resemble everybody else, even the sexes approximate —the men become women and the women become men." *The Will to Power*

২. "Napoleon was not a butcher but a benefactor, he gave men death with military honours instead of death by economic attrition ... ." Will Durant from *Nietzsche's Beyond Good and Evil*

গুণাগুণ: নায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের যাহা ত্রুটি নায়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ নায়কতন্ত্রের তাহা ত্রুটি। সংক্ষেপে বলা যায়: নায়কতন্ত্রে উচ্ছৃংখল জনতার শাসনের পরিবর্তে সুযোগ্য নায়কের সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; ইহাতে দলীয় বিরোধ নাই; শাসনযন্ত্রও মন্থরগতি নহে এবং স্থায়িত্ব ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে আবার এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণে রাজনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাহত হয়; সমাজের সংহতি সাধিত হইতে পারে না; সাম্য ও স্বাধীনতা অস্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথ রুদ্ধ থাকে; যুদ্ধবাদের ফলে জীবন হইয়া উঠে যন্ত্রবৎ এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা পুঞ্জীভূত থাকে রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে। এককথায় নীটশের আহ্বান, "বিপদের সংগে আলিংগনাবদ্ধ হইয়া বাঁচার স্বাদ উপভোগ কর, বিসুবিয়াসের পাশেই নগরীর পত্তন কর, অজানা সমুদ্রে তোমার অর্ণবপোত প্রেরণ কর। যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেই অবস্থান কর"[১]—তাহাই হইয়া দাঁড়ায় নায়কতন্ত্রের অধীনে জীবনের অবস্থা। কিছু লোকের নিকট ইহাই কাম্য বিবেচিত হইলেও জনসাধারণের কাছে ইহা অসহ্য বলিয়াই মনে হয়। তাই তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায় সেই গণতান্ত্রিক রন্ধ্রপথ যাহার মধ্য দিয়া মুক্তির বায়ু আবার প্রবাহিত হইবে।

উপসংহার: চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডক্টর বেনেস (Dr. Benes) বলিয়াছেন যে, নায়কতন্ত্র জাতির রাজনৈতিক জীবনের একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা (a passing phase) মাত্র। গুচের মতেও ইহা একরূপ অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা। "যে সময় পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে অথচ নূতনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, নায়কতন্ত্র ঠিক সেই সময়কারই শাসন-ব্যবস্থা।"

নায়কতন্ত্র ক্ষণস্থায়ী নাও হইতে পারে: সাম্প্রতিক ইতিহাস হইতে ইহাই মনে হয় যে, এইরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল।

নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইলেও নায়কতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্যই নায়কতন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে, নায়কতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে একজনের শাসন হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা কোন বিশেষ দলীয় শাসন-ব্যবস্থা। এই রাজনৈতিক দল যদি জনসাধারণকে কোন নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে, নূতন আশার আলোক দেখাইতে পারে তবে ইহার পক্ষে ক্ষণস্থায়ী হইবার কোন কারণ নাই। এইরূপ নায়কতন্ত্র বাঁচার স্বাদের জন্য বিপদকে আলিংগন করে না, নূতন পথ প্রস্তুত করিবার জন্যই সকল আনুষংগিক

---

১. "Live dangerously. Erect your cities beside Vesuvius. Send out your ships to unexplored seas. Live in a state of war." *Thus Spake Zarathustra*

বিপদের সম্মুখীন হয়। সুতরাং নায়কতন্ত্রের প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রেই এক নহে, উহারও প্রকারভেদ আছে।

নায়কতন্ত্রের রূপ (Forms of Dictatorship) : আধুনিক নায়কতন্ত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) সামরিক নায়কতন্ত্র (Military Dictatorship), (খ) ফ্যাসীবাদী বা নাৎসীবাদী নায়কতন্ত্র (Fascist or Nazi Dictatorship), এবং (গ) সমভোগবাদী বা কমিউনিষ্ট নায়কতন্ত্র (Communist Dictatorship)।[১] সামরিক নায়কতন্ত্রে কোন সেনানায়ক সেনাবাহিনীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারের উপর আঘাত হানিয়া চরম শাসনক্ষমতা অধিকার করেন। দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা এসিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের অনেক দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক নায়কতন্ত্র প্রবর্তিত রহিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীতে ফ্যাসীবাদী নায়কতন্ত্র, জার্মেনীতে নাৎসীবাদী নায়কতন্ত্র এবং রাশিয়ায় সমভোগবাদী বা সর্বহারাদের নায়কতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ইহাদের মধ্যে নায়কতন্ত্রের প্রকৃত দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের আলোচনা করা হইতেছে।

ক। ফ্যাসীবাদ (Fascism) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীতে ফ্যাসীবাদের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা হইলেও রাষ্ট্রের তত্ত্ব হিসাবে ফ্যাসীবাদ কোন শৃংখলিত দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট দল দেশে তৎকালীন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্ম নানা উৎস হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন ধারণার সংমিশ্রণ করিয়া ফ্যাসীবাদ নামে মতবাদ প্রচার করে। সংমিশ্রিত করিলেও ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলে রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে ফ্যাসীবাদ মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বেও উঠিতে পারে নাই। তবুও ফ্যাসীবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতিপাদ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য : ফ্যাসীবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল নায়কতন্ত্রের মাধ্যমে জাতির গৌরব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা (to enhance the importance and power of the people by dictatorial means)। এইরূপ নায়কতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌম রূপ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংঘের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে, কিন্তু সর্বদাই জনসাধারণের সহিত সম্পর্কিত থাকিয়া তাহাদের ধ্যানধারণাকে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিবে এবং সর্বতোভাবে তাহাদের স্বার্থসাধন করিবে। মুসোলিনীর অধীনে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট দলই প্রথম এইরূপ নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয় বলিয়া এই প্রকার আন্দোলন ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন নামে অভিহিত এবং ঐ একই কারণে মুসোলিনীর রাজনৈতিক ধারণাই হইল ফ্যাসীবাদের মূলতত্ত্ব (thesis)।

চারিটি অস্বীকার : মুসোলিনীর মতে, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র চারিটি বিষয়কে অস্বীকার করে : (১) ইহা শান্তিবাদকে (Pacifism) অস্বীকার করে, (২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে, (৩) গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে এবং (৪) সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করে।

ফ্যাসীবাদ শান্তিবাদকে অস্বীকার করে, কারণ শান্তিবাদ যুদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। মুসোলিনীর ভাষায় বলা যায়, "স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেরূপ অপরিহার্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও সেইরূপ অপরিহার্য।" সুতরাং মুসোলিনীর মতে, আন্তর্জাতিক শান্তি হইল 'ভীরুর স্বপ্ন' এবং সাম্রাজ্যবাদ হইল 'জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম'।

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে, কারণ রাষ্ট্রের কর্তব্যই হইল শাসন করা, মাত্র ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করা নয়। ব্যক্তির জীবনযাত্রার ভার ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এই ভার

---

১. সামরিক, ফ্যাসীবাদী ও নাৎসীবাদী নায়কতন্ত্রকে দক্ষিণপন্থী নায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Right) এবং সমভোগবাদী বা কমিউনিষ্ট নায়কতন্ত্রকে বামপন্থী নায়কতন্ত্র (Dictatorship of *the Left*) *বলিয়া অভিহিত করা হয়।*

গ্রহণ করিবে সর্বাত্মক, সর্বশক্তিসম্পন্ন, সামগ্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকর্তৃক সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবে। যদি দেখা যায়, ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিরোধী তবে উহাদের খর্ব করিতে হইবে. প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসও করা যাইতে পারে।

বস্তুত, রাষ্ট্রের এই সর্বপ্রাধান্যই ফ্যাসীবাদের ভিত্তি।[১]

সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করিবার কারণ হইল, ফ্যাসীবাদ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণই সাধারণের স্বার্থের অধিকতর উপযোগী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন নয়।

ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রের উৎকর্ষে বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্র হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা কখনও 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) নয়। অনেক সময় সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসনও অধিকতর কাম্য হইতে পারে, কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন একমাত্র যাঁহারাই রাষ্ট্রকর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রযন্ত্র সুপরিচালিত হয়। সুতরাং শাসনভার এরূপ ব্যক্তিসমূহকেই দিতে হইবে। কার্লাইল বলিয়াছিলেন: প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসনকার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তির সন্ধান কর: তাঁহাকে কর্তৃত্ব ও শ্রদ্ধার উচ্চতম বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কর; তাঁহার পুজা কর।—তাহা হইলে সেই দেশে কাম্য ও সার্থক সরকারের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন নাই, পার্লামেন্টীয় বাগ্মিতাও নিরর্থক। ভোটদান, সংবিধান প্রণয়ন প্রভৃতি সবই অপ্রয়োজনীয়। এইরূপ রাষ্ট্রই কাম্য ও আদর্শ রাষ্ট্র।" ফ্যাসীবাদ কার্লাইলের এই উক্তির পূর্ণ প্রতিধ্বনি মাত্র।

গণতন্ত্রের অস্বীকার এবং নেতৃপূজা (hero worship) ফ্যাসীবাদের (নাৎসীবাদেরও) অংগীভূত।

ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতালী মুসোলিনীকে পূজা করিতে থাকে এবং অতীত রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হয়। একদিন মুসোলিনী-পূজার সমাপ্তি ঘটিল, কিন্তু রোমের অতীত গৌরব ফিরিয়া আসিল না।

আন্দোলন তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন উহার মধ্যে থাকে কোন ভাবাদর্শ (ideology) যাহা জনগণকে বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করে। বলা হয়, এইরূপ ভাবাদর্শের অভাবই ছিল ফ্যাসীবাদের পতনের কারণ।

খ। নাৎসীবাদ (Nazism): ফ্যাসীবাদে যদিও কিছু রাজনৈতিক তত্ত্ব থাকিয়া থাকে তবে নাৎসীবাদে কিছুই নাই বলা চলে। অপরদিকে কিন্তু ফ্যাসীবাদে কোন জোরালো রাজনৈতিক ভাবাদর্শ (effective political ideology) দানা বাঁধিতে না পারিলেও নাৎসীবাদে বাঁধিয়াছিল। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির ঐতিহ্যগত জাতীয়তাবাদের প্রকাশ হিসাবে নাৎসীবাদ জন্মগ্রহণ করিলেও উহা গড়িয়া উঠিয়াছিল জাতিতত্ত্বের (racism) ভিত্তিতে। এই ভাবাদর্শকে যিনি রূপদান করেন তিনি হইলেন এডলফ্ হিটলার। ইতিহাসে তাঁহার উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা ও ভূমিকা যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে লিখিত থাকিবে।

প্রভুজাতির তত্ত্ব: যে জাতিতত্ত্বকে বা প্রভুজাতির তত্ত্বকে (theory of the master race) হিটলার বিপ্লবের মন্ত্রে অভিষিক্ত করেন, তাহা অবশ্য তাঁহার সৃষ্টি নয়। উহা ছিল আঠার শতক হইতে জার্মান ঐতিহ্যেরই অংগীভূত। হিটলার এই ঐতিহ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে সচল ও সক্রিয় করিয়া তুলেন। তখন জার্মানরা জাতিকে স্তবস্তুতি করিতে শুরু করে এবং ইহাকে এক অতিমানবীয় সংস্থা হিসাবে গণ্য করিতে থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে শিখে যে, জাতি বা সম্প্রদায় (Volk) হইল কাঁচামাল যাহা হইতে জার্মান-রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে। যাহাতে এই জাতি শক্তিশালী হইতে পারে

১. "Primacy of the state is the basis of Fascism" Lloyd

তাহার জন্ত সকল ব্যক্তি ও সংঘকে রাষ্ট্রপাদমূলে তাহাদের সকল স্বার্থ ও সত্তা বিসর্জন দিতে হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র হইবে সর্বতোভাবে সর্বাত্মক ও সর্বশক্তিসম্পন্ন হেগেলীয় রাষ্ট্র।[১] ইহার অধীনে ব্যক্তির সত্তা একরূপ বিনষ্টই হয়, ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ সামরিকীকরণ (regimentation) এবং চিন্তাহীন ও যুক্তিহীনভাবে নেতৃপূজা চলিতে থাকে। নাৎসী জার্মেনীতে ইহাই সংঘটিত হইয়াছিল। জার্মান জাতিকে শক্তিশালী করিবার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা, ব্যক্তিজীবনের সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ, ফ্যাসীবাদের অনুসরণে গণতন্ত্রের ধ্বংস এবং নেতৃপূজাই ছিল নাৎসী জার্মেনীর বৈশিষ্ট্য। হিটলারের অধীনে নাৎসী দল সোজাসুজি যুদ্ধের মহিমা প্রচার করিয়া বলিত "বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত যুদ্ধ অপরিহার্য"। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যুদ্ধের সহায়ক বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা। জার্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা, জার্মান ভাষা এবং সাহিত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্তও ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনেও জাতিকে শক্তিশালী করিবার জন্ত অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। গণতন্ত্রকে 'নির্বোধ, বিকৃত এবং ধীরগতিসম্পন্ন' বলিয়া অভিহিত করিয়া আড়ম্বরহীনভাবে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

হিটলারের অধীনে জার্মান জাতির বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল না হইলেও নাৎসীবাদের ধ্যানধারণা ও আদর্শের দিকে ঝোঁক কিছু কিছু দেশে এখনও পরিলক্ষিত হয়। অনেকে আশংকা করেন যে, এই পরিস্থিতির দরুন আবার বিশ্বশান্তিবিনাশক নাৎসী আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে পারে।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই গণতন্ত্র সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

২. গণতন্ত্রের প্রধান রূপ হইল (ক) গণতান্ত্রিক সমাজ, (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং (গ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার।

৩. গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপাদান হইল (১) সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসক, (২) জনমতভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা, (৩) ঐক্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা এবং (৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য।

৪. উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল (১) ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকার, (২) শাসিতের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার। অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিলেই উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমর্থনীয়।

৫. গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন (১) গণতান্ত্রিক জনগণ, (২) গণতান্ত্রিক পরিবেশ, (৩) গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা, (৪) যোগ্য নেতৃত্ব, (৫) দলীয় রাজনীতির সংকোচন, (৬) উপযুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক, (৭) জনগণের আত্মসংযম।

৬. অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

৭. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র = সমাজতন্ত্র + গণতন্ত্র।

৮. প্রকৃতিগত দিক দিয়া গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্র পরস্পরের বিপরীত।

৯. বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়নের ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে নায়কতন্ত্র কতকটা সমর্থনীয়।

১০. নায়কতন্ত্রের মূল আধুনিক রূপ হইল (১) ফ্যাসীবাদ, (২) নাৎসীবাদ এবং (৩) সমাজতান্ত্রিক নায়কতন্ত্র।

১. ১ম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

অনুশীলনী

1. Estimate strength and weakness of modern Democracy as a form of government. Do you think that Democracy will survive ?

[সরকারের অন্যতম রূপ হিসাবে আধুনিক গণতন্ত্রের শক্তি ও দুর্বলতার মধ্যে তারতম্য কর। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা পোষণ কর ?]

[ইংগিত : গুণ : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত গুণের উল্লেখ করা হয় : (১) সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রেই সম্ভব, (২) একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনেই জনসাধারণের মানসিক উন্নতি সম্ভব, (৩) অনেকের মতে, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা, কারণ ইহা শাসিতকে শাসক করিয়া সর্বাংগীণ মংগল সাধন করে, (৪) গণতন্ত্র দেশপ্রীতি ও দায়িত্ববোধ গভীর করে; (৫) ইহা অনেকাংশে বিপ্লবের আশংকা হইতে মুক্ত। ত্রুটি : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করা হয় তাহা হইল এই : (১) গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন, কারণ ঐ শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় বেশী, (২) ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা, কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে নূতন নূতন আবিষ্কার বা ধ্যানধারণা বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না; (৩) গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ নিম্নস্তরের; (৪) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক; (৫) দলপ্রথার জন্য দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়, (৬) গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান, (৭) গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলা হয়, (৮) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়, এবং (৯) গণতান্ত্রিক আদর্শ সংকীর্ণ বলিয়া গণ্য হয়।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে আশ্রয় না করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বর্তমানে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও সফলতার প্রধান সর্তকে তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহাকে বিশেষভাবে কার্যকর করিতে সমর্থ হয় নাই।... এবং ৪৯২-৫০২, ৫০৪-০৬ পৃষ্ঠা]

2 'Democracy, meaning thereby government by the people, is neither desirable nor possible' Discuss the statement.

['জনগণের দ্বারা সরকার—এই অর্থে গণতন্ত্র কাম্যও নহে, সম্ভবও নহে।' উক্তিটির পর্যালোচনা কর।]

[ইংগিত : 'জনগণের শাসন' (government by the people) বলিতে যদি বুঝায় যে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে তাহা হইলে বর্তমান বৃহদাকারের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র অচল, কারণ সকল নাগরিকের পক্ষে সমবেত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। ইহা ছাড়া, বর্তমান রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাসমূহ জনগণের সভা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। সুতরাং জনগণের শাসন বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্রেরই কথা বলা হয়—অর্থাৎ বর্তমানে গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন বলিতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে পরিচালিত পরোক্ষ শাসনকেই বুঝায়। এক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে অনেকে অসম্ভব এবং অকাম্য বলিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। উপরন্তু, আইনসভা জাতির প্রতিচ্ছবি একথাও বলা যায় না, কারণ আইনসভা সমাজের সর্বপ্রকার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। আরও বলা হয়, 'জনগণের শাসন' বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের অধিক কিছু বুঝায় না, উহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভূমিকা সামান্যই থাকে। জনগণের শাসন অকাম্য বলিয়া অভিহিত করা হয় এই কারণে যে ইহা অজ্ঞের শাসন। ইহাতে অপচয় ও দলাদলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং স্বার্থান্বেষীরা জনগণকে ভুলপথে চালিত করিয়া নিজেদের স্বার্থসাধন করে। অজ্ঞের শাসন বলিয়া আবার দেশের সাংস্কৃতিক দিকের অবনতি ঘটে। সরকারও বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানে অপারগ হয়। এই সমালোচনা সত্ত্বেও গণতন্ত্রকে সমর্থন না জানাইয়া পারা যায় না, কারণ একমাত্র গণতন্ত্রেই জনগণের অধিকার, ব্যক্তির মর্যাদা ও সরকারের কর্তব্য স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। জনগণ সচেতন থাকিলে তবেই তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।...৪৯১-৯৩, ৫০২-০৪ পৃষ্ঠা]

3. "Democracy is not complete without socialism." Discuss.

["সমাজতন্ত্রবাদ ব্যতীত গণতন্ত্র সার্থক হইতে পারে না।" আলোচনা কর।]

(৫০৭-০৮, ৫০২-০৩, ৫০৪-০৬ পৃষ্ঠা)

4. Briefly trace the development of Liberal Democracy.

[উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে বিবৃত কর।] (৫৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

5. Bring into focus the main points of difference between Liberal Democracy and Socialist Democracy.

[উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্যসমূহ পরিস্ফুট কর।]

(৫৯৫-৯৬, ৫০৭-০৮ পৃষ্ঠা)

6. Indicate the difference between Socialist Democracy and Social Democracy.

[সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও সামাজিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (৫০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

7. Distinguish between Democracy and Dictatorship and point out the conditions essential to the success of Democracy.

[গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং গণতন্ত্রের সফলতার জন্য অপরিহার্য সর্তগুলির উল্লেখ কর।] ৫১০-১১, ৫০২-০৪, পৃষ্ঠা)

8. Compare and contrast an absolute monarch with a dictator.

[চরম রাজতন্ত্রের অধিনায়কের সহিত (এক) নায়কের তুলনা করিয়া পার্থক্য নির্দেশ কর।]

(৫০,-১০ পৃষ্ঠা)

২৫ রাজনৈতিক দল
(POLITICAL PARTIES)

"*The distinctive characteristic of the modern political order is the constitutional status of parties, that is, the recognition of their 'governing' function in the modern state*" H. D. Clokie

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা কিরূপ হইতে পারে ?

২. দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে উহা 'দল' আখ্যা পাইতে পারে কি না ?

৩. দল এবং উপদলীয় চক্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৪. কেন বলা হয়, দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ ?

৫. দলীয় ব্যবস্থা কি পুরাপুরি সমর্থনীয় ?

৬. দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা যায় ?

৭. দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি কাম্য ?

৮. একদলীয় ব্যবস্থা কি গণতন্ত্রের অস্বীকার ?

রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় ? (What is a Political Party ?) : রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় সে-সম্পর্কে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিভেদ রহিয়াছে। কারণ, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি লইয়া রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সংজ্ঞা : আমরা কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া ইহার স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করিব।

বার্ক : বার্কের মতে, কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ প্রসার-কল্পে সম্মিলিত হইয়াছে এইরূপ জন-সমষ্টিকেই রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া যায়।[১]

এই সংজ্ঞারই প্রতিধ্বনি করিয়া স্যার আরনেস্ট বার্কার বলিয়াছেন, যদিও রাজনৈতিক দল বিশেষ মতধারা দ্বারা পরিচালিত তবুও ইহা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদের অনুমোদন পাইতে প্রয়াসী হয়।[২]

১. "Party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours, the *national interest* upon some particular principle in which they are all agreed." Edmund Burke

২. "A party is a *particular body of opinion* ... which is none the less concerned with the *general national interest* and which forms, and presents to the choice of the electorate, a programme of general national scope and width." Sir Earnest Barker

ডিসরেলীর (Disraeli) মতে, কতকগুলি নীতি অনুসরণের জন্য সম্মিলিত জনসমষ্টিকে দল বলা যায় (a party is a group of men banded together to pursue certain principles)।

ল্যাসওয়েল : অন্যতম আধুনিক লেখক ল্যাসওয়েল (Lasswell) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্বাচনে প্রার্থী ও কর্মসূচী উপস্থিত করে এরূপ সংগঠনকে দল আখ্যা দিতে পারা যায়। তাঁহার মতে একদলীয় সর্বাত্মক রাষ্ট্রগুলিতে কোন দল নাই, কারণ সেখানে প্রকৃত কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই।[১]

বৈশিষ্ট্য : উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলিতে লেখকগণ দলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন: (১) রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ সমমতাদর্শের দ্বারা এবং সমনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হয়; (২) ইহাদের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভংগি বা মতাদর্শ থাকিলেও ইহারা সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে; (৩) ইহারা যাহাতে সরকার গঠন করিয়া নিজ নিজ নীতিকে কার্যকর করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করে, প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং অধিক-সংখ্যক নির্বাচনের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে; (৪) কোন কোন লেখকের মতে, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক একাধিক দল নাই সেখানে দলকে প্রকৃতপক্ষে দল আখ্যা দেওয়া যায় না—অর্থাৎ একদলীয় ব্যবস্থায় দলকে দল বলা যায় না।[২]

সংজ্ঞাগুলির সমালোচনা : বিভিন্ন দিক দিয়া উপরি-উক্ত সংজ্ঞাসমূহের সমালোচনা করা হইয়াছে: (১) দলীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট নীতি, মতাদর্শ ও কর্মসূচী সর্বক্ষেত্রে থাকে না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাব্লিক ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে নীতিগত বা কর্মসূচীর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নাই। (২) প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য হইল সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণ বা স্বার্থসাধন করা বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু যেখানে বৈষম্যমূলক বা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন দল মূলত বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। (৩) যে-দেশে প্রতিযোগিতামূলক একাদিক দল নাই অথবা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হয় না সেই দেশের রাজনৈতিক দলকে 'দল' আখ্যা দেওয়া যায় না—এই মত স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে (সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন সহ) পৃথিবীর অনেক দেশেই কোন দল নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এই মতও স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। বরং এই সকল দেশের রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ তথাকথিত উদারনৈতিক দেশগুলির দলের তুলনায় ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্সবাদী লেখকগণের মতে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একাদিক দলের উদ্ভব ও অস্তিত্বের কারণ অর্থনৈতিক সংঘাত (conflict of economic interests)। সুতরাং সোবিয়েত

১. Lasswell : *The World Revolution of Our Time*

২. "A one-party system is a contradiction in itself. Only the coexistence of at least one other competitive group makes a political party real." S. Neumann : *Modern Political Parties*

ইউনিয়নের মত যে-দেশে অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম নাই সে-দেশে একাধিক দল থাকিবার যুক্তিও নাই।[১]

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগিতে দল : মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগি অনুসারে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের ভিত্তি হইল শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণীদ্বন্দ্ব (class struggle)। এই শ্রেণী-সংগ্রাম গড়িয়া উঠে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাতের ভিত্তিতে।

সুতরাং রাজনৈতিক দল হইল অর্থনৈতিক স্বার্থভিত্তিক। ইহা নির্দিষ্ট শ্রেণীর অধিক সচেতন ব্যক্তিসমূহকে লইয়া গঠিত;[২] ইহার কার্য হইল শ্রেণীস্বার্থসাধনের জন্য নেতৃত্ব প্রদান করা।

মার্ক্সীয় সংজ্ঞার সমালোচনা : প্রতিবাদে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখকগণ বলেন যে রাজনৈতিক দল গঠনের ভিত্তি একাধিক হইতে পারে—দ্রুত সংস্কার দাবি, ধর্মনীতি, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। সুতরাং একাধিক দল থাকিতেই পারে। তবুও কিন্তু বলা যায় যে দলের প্রকৃত ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক স্বার্থ।[৩] ম্যাডিসনের ভাষায় বলা যায়, "পৃথক স্বার্থসম্পন্ন দলগুলির উৎস হইল সম্পত্তি।"[৪] এই কারণেই দেখা যায় যে বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রক্ষণশীল দল এবং সম্পত্তিবিহীন জনগণের সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকে।

চূড়ান্ত সংজ্ঞা : সকল দিক বিবেচনা করিয়া সাধারণ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এমন জনসংগঠনকে যাহা এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে বা আয়ত্তাধীন রাখিতে চায়।[৫]

কোলম্যানের (J. S. Coleman) মতে, যখন কোন জনগোষ্ঠী এককভাবে কিংবা অন্যান্য অনুরূপ জনগোষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়া বা প্রতিযোগিতা করিয়া বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সরকারী নীতিপদ্ধতি ও কর্মচারীদের উপর আইনগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা বজায় রাখিবার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয় তখন ঐ জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া যায়।[৬] এই সংজ্ঞার মধ্যে দেশে একাধিক দলই থাকুক বা একটি দলই থাকুক সকল প্রকার রাজনৈতিক দলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১. "The existence of conflicting political parties is inconceivable without conflicting interests." Pat Sloan : *How The Soviet State is Run*

২. "A party is a part of a class, its most advanced part." J. Stalin

৩. "... national parties ... They must be founded upon permanent sectional interests, above all upon those of an *economic character*" Arthur Holcombe

৪. "... the only durable source of faction is property." Madison

৫. Political parties "seek political power either singly or in co-operation with other political parties." Alan R. Ball : *Modern Politics and Government*

৬. J. S. Coleman : *Political Parties and National Integration in Tropical Africa*

সহজ ভাষায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বা করায়ত্ত রাখিতে চায় এরূপ জনসংগঠনকে দল পর্যায়ে ফেলা যায়।

দল এবং উপদলীয় চক্র (Parties and Factions): অনেক সময় প্রকৃত দল এবং উপদলীয় চক্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। অতীত-কালে সকল প্রকার দলীয় কার্যাবলীকে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শৃংখলা ক্ষুন্ন করে বলিয়া মনে করা হইত বলিয়া সকল দলীয় গোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী চক্র হিসাবে দেখা হইত। ডেভিড হিউম (David Hume), রুশো এবং মার্কিন সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ দলীয় সংগঠনকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন। বর্তমানে অবশ্য দলীয় ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ বলিয়া গণ্য করা হয়।

দল ও উপদলীয় চক্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়া বলা হয় যে রাজনৈতিক দল সম-মতাদর্শের ভিত্তিতে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থসাধনে ব্রতী হয়। অপরদিকে উপদলীয় চক্র বিশেষ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থসাধন এবং সংকীর্ণ নীতির প্রসারসাধনে প্রবৃত্ত থাকে।[১]

উপরন্তু, দল সুসংহত ও সুসংগঠিত, দলীয় চক্রে সংগঠনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য অনেক সময় দল ও উপদলীয় চক্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব হয় না।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, কার্য ও গুণাবলী (Role, Functions and Merits of Political Parties): বলা হয়, দলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ।

স্বাধীনভাবে বিভিন্ন নীতির মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া এবং বিভিন্ন নীতির সমর্থনকারী নির্বাচনপ্রার্থীদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যতীত জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রের পক্ষে এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি।

(১) বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা: সমাজের সম্মুখে অগণিত সমস্যা বিশৃংখলভাবে ছড়ানো থাকে। তাহাদের মধ্য হইতে নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে অধিক গুরুত্ব-সম্পন্নগুলিকে বাছিয়া লইয়া বিভিন্ন দল তাহাদের কর্মসূচী ও নীতি নির্ধারণ করিয়া উহার ভিত্তিতে জনসাধারণের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে।

এইভাবে দলগুলি বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করিয়া জনসাধারণকে নীতি-নির্বাচনে সহায়তা করে।

---

১. "The term faction is commonly used to designate any constituent group of a larger unit which works for the advancement of particular persons or policies." Harold D. Lasswell

ইহাতে প্রতিনিধি নির্বাচনেও জনসাধারণের সুবিধা হয়। বিভিন্ন দল আপনাপন কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রার্থী দাঁড় করায়। নির্বাচকগণ যখন কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোটপ্রদান করে তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে তাহারা কোন্ কর্মসূচী ও নীতির পক্ষে ভোটদান করে তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে তাহারা কোন্ কর্মসূচী ও নীতির পক্ষে ভোটদান করিতেছে। দলীয় ব্যবস্থা থাকার জন্য অসংখ্য নির্বাচন-প্রার্থীর পরিবর্তে অল্পসংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ইহাতে নির্বাচকদের পক্ষে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে সুবিধা হয়। আবার একাধিক নির্বাচনপ্রার্থী থাকায় পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার স্বাধীনতাও ব্যাহত হয় না।

(২) রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষা: দলীয় ব্যবস্থার আরও কতকগুলি কার্য গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর বিভিন্ন দিকের আলোচনা ব্যতীত নির্বাচকগণ সুসিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে না। বলা হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদিত হয় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে। বিভিন্ন দল নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর পক্ষে প্রচারকার্য চালাইয়া জনসাধারণের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে, অন্যদিকে তেমনি আবার নির্বাচকগণ দলীয় নীতি ও কর্মসূচীসমূহের গুণাগুণ জানিয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারে।

(৩) স্বৈরাচারিতা প্রতিরোধ: আরও বলা হয় যে, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন স্বৈরাচারিতার উদ্ভব হইতে পারে না। নির্বাচনের ফলে কোন দল বা সম্মিলিত দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইলেও ঐ দলকে সংযত হইয়া শাসন পরিচালনা করিতে হয়। কারণ, বিরোধী দল শাসনভারপ্রাপ্ত দলের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জনসমর্থনকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে জনসমর্থন কোনক্রমে হ্রাস না পায় তাহার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যথাসম্ভব ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা একাধিক দলের উপযোগিতা সম্পর্কে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁহাদের মতে, একদলীয় ব্যবস্থা স্বৈরাচারিতার নামান্তর মাত্র।

---

(৪) জনমতের বাস্তব রূপ গ্রহণ: রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনমতের সমর্থন পাইতে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। যে-দল অধিক সংখ্যক নির্বাচকের সমর্থনপ্রাপ্ত হইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের দায়িত্ব থাকে নিজ কর্মসূচীকে আইনে পরিণত করিবার। এইভাবে জনমত দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে।

(৫) শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন: দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে নির্দেশিত পরবর্তী গুণ হইল যে, ইহার মাধ্যমে শান্তি ও শৃংখলা ভংগ না করিয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক

ও রাজনৈতিক পরিবর্তনসাধন করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে নিজ নিজ দলের পক্ষে পরিচালিত করিয়া নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। বিজয়ী দল নির্বাচনের পর নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া জনমত অনুমোদিত সামাজিক পরিবর্তনসাধন করে। এইভাবে সমাজের অভ্যন্তরে যে-স্বার্থের বিভিন্নতা বা সংঘর্ষ থাকে তাহার মীমাংসা শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়।

(৬) সরকারের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যে সহযোগিতা: সরকারের ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের কার্যের সমন্বয়সাধন ব্যাপারে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্বের উল্লেখ করা হয়। সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। দলীয় ব্যবস্থা থাকায় মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যে-সকল রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে সেখানে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধের ফলে শাসনকার্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। একমাত্র দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই দুই বিভাগকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভবপর। ইহা ছাড়া একই রাষ্ট্রে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে, স্থানীয় সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত যে সমস্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সরকার থাকে তাহাদের কার্য ও নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে দলীয় ব্যবস্থা সহায়তা করে। কারণ, একই দল যদি বিভিন্ন অংশের সরকারগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সকল সরকারই একই নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি (Demerits of Party System): দলীয় ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করা হইলেও উহার কতকগুলি দোষত্রুটির কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

(১) কৃত্রিমতা ও অগণতান্ত্রিকতা: সমাজের বিভিন্ন লোকের মতামত যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় তাহা মাত্র কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ দলের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় না।

এইজন্য দলীয় ঐক্য বা সংহতি কৃত্রিম এবং দলীয় কর্মসূচীও অগণতান্ত্রিক বলিয়া অভিযুক্ত হয়।

---

(২) ব্যক্তিত্বের বিনাশ: এই কৃত্রিম দলীয় বিরোধিতার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব সংগু হইয়া পড়ে। দলের সংহতি রক্ষাকল্পে সদস্যগণের পক্ষে নিজস্ব মতামতকে চাপা দিয়া দলীয় নীতিকে সমর্থন করিতে হয়। কারণ, অন্যথায় দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ভয় থাকে।

(৩) জাতীয় স্বার্থে ব্যাঘাত: দলীয় ব্যবস্থায়, বিশেষত ব্রিটেনের মত দ্বিদলীয় ব্যবস্থায়, কোন প্রশ্নের গুণাগুণ বিচার না করিয়াই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের বিরোধিতা করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। সুতরাং ইহা অনিষ্টকর।

(৪) বিভ্রান্তের প্রচেষ্টা : রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থই বড় করিয়া দেখে এবং দলগত স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থ বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে।

(৫) নৈতিক মানের অবনতি : দেশের কায়েমী স্বার্থভোগীরা অর্থসাহায্যে এবং সংবাদপত্রে প্রচারের সুযোগ প্রদান করিয়া কোন কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করিয়া থাকে। নির্বাচনে ব্যাপক প্রচারের সাহায্যে জনসাধারণকে দেশের প্রকৃত রূপ হইতে অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, যাহার ফলে নির্বাচনের পর কায়েমী স্বার্থভোগীরা স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে সরকারকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। এইভাবে মিথ্যাপ্রচার প্রবঞ্চনা দুর্নীতি প্রভৃতি প্রশ্রয় পাইয়া সমাজের নৈতিক মানকে নিম্নস্তরে টানিয়া নামায়।

(৬) অযোগ্যের শাসন : দলীয় ব্যবস্থার ফলে অনেক সময় যোগ্যতম ব্যক্তিগণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন, কারণ বিজয়ী দল নিজ দলের সমর্থকদের মধ্য হইতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদগুলি পূরণ করিয়া থাকে।

(৭) চমকপ্রদ কিন্তু অকল্যাণকর আইন : অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল জনসাধারণের সমর্থন ও ভোটসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এমন সমস্ত আইন পাস করে যাহা আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ হইলেও দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

(৮) অন্যান্য ত্রুটি : ইহা ব্যতীত বলা হয়, নির্বাচনের সময় জনসাধারণের মধ্যে যে-অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয় তাহাতে জাতীয় জীবনের মর্যাদার হানি করা হয়। হিংসা দ্বেষ মনোমালিন্য এবং অশোভনীয় বক্তৃতাদি প্রসারলাভ করিতে থাকে।

দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Party Systems) : সাধারণত সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। যেমন, দেশে একটি দল থাকিলে উহাকে একদলীয় ব্যবস্থা (one-party or single-party system), দুইটি দল থাকিলে উহাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (bi-party or bi-partisan system) এবং বহু দল থাকিলে উহাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা (multi-party system) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আধুনিক লেখকগণের মতে, মাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করা যুক্তিযুক্ত নয় কারণ ইহার দ্বারা কোন দেশের দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। এই কারণে অনেকের মত যে দলের রূপ, কার্য ও সংগঠন পদ্ধতি, কর্মসূচী ও মতাদর্শের দিকে নজর রাখিয়া বিভিন্ন দলীয় ব্যবস্থাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে-কোনভাবেই দলীয় ব্যবস্থাকে শ্রেণীবিভক্ত করা হউক না কেন কোন-না-কোন দিক হইতে উহা ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়াই যাইবে।

দলীয় ব্যবস্থার আধুনিক শ্রেণীবিভাগ : যাহা হউক, অধ্যাপক অ্যালমণ্ডকে (Almond) অনুসরণ করিয়া আধুনিক লেখকগণের অনেকে মোটামুটিভাবে দলীয় ব্যবস্থাসমূহকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া থাকেন : (১) অস্পষ্ট ধরনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (indistinct bi-party systems), (২) সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (distinct bi-party systems), (৩) কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা (working multi-party systems), (৪) অস্থায়ী ধরনের বহুদলীয় ব্যবস্থা (unstable multi-party systems), (৫) এক দলের প্রাধান্যবিশিষ্ট দলীয় ব্যবস্থা (dominant party systems), (৬) একদলীয় ব্যবস্থা (single-party systems), এবং (৭) সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থা (totalitarian one-party systems) ।

১। **অস্পষ্ট ধরনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা :** এইরূপ দলীয় অবস্থার অন্যতম দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা। এই দেশের দুইটি দল হইল রিপাবলিক দল এবং ডেমোক্র্যাট দল। দল দুইটির কর্মসূচী বা আদর্শের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই—দলীয় নিয়মশৃংখলা শিথিল ধরনের এবং দলীয় সংগঠনে কোন স্তরবিন্যাস নাই। যদিও দল দুইটির কেন্দ্রীয় সংস্থা রহিয়াছে, প্রচারকার্য পরিচালনা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কার্য নাই। বস্তুতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দল দুইটি ভোটসংগ্রহকারী নির্বাচনী সংস্থা।[১]

২। **সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা :** এরূপ দলীয় ব্যবস্থায় দুইটি দলের প্রচারিত কর্মসূচী ও আদর্শের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকটি দলের সংগঠন স্তরবিন্যস্ত (pyramidical) ও কেন্দ্রীয়প্রবণ। নিয়মশৃংখলাও দৃঢ়। ইহাদের সদস্য ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোটামুটিভাবে সামাজিক ও আর্থিক দিক হইতে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের (Conservative Party) সমর্থকরা আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী অপরপক্ষে শ্রমিক দলের (Labour Party) সাধারণ সমর্থকরা হইল প্রধানত শ্রমিক শ্রেণী। অবশ্য প্রচারিত উদ্দেশ্যে পার্থক্য থাকিলেও ব্রিটেনের দুই দলের নেতৃবৃন্দের ধ্যানধারণায় প্রকৃত ক্ষেত্রে সামান্যই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। **কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা :** এইরূপ ব্যবস্থায় দুই-এর অধিক দল থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া সরকার গঠন ও সরকার পরিচালনার ব্যাপারে দলগুলি দ্বিদলের মত আচরণ করে। যেমন, সুইডেনে একদিকে রহিয়াছে সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলি (Social Democratic Parties), অপরদিকে রহিয়াছে বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দল। দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক দলগুলি অথবা অন্যান্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া স্থায়ী সরকার গঠন করিতে সমর্থ হয়।

---

১. "Essentially the parties (American) are alliances of local electoral committees .... Central organs do exist but their main concern is with propaganda rather than with the control of the party machinery as a whole." J. Jupp : *Political Parties*

৪। অস্থায়ী ধরনের বহুদলীয় ব্যবস্থা: অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার ক্ষণস্থায়ী হয় কারণ বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। উদাহরণ হিসাবে ইতালীর দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে কমপক্ষে আটটি দল রহিয়াছে। উহারা সম্মিলিত সরকারই গঠন করে এবং দেখা গিয়াছে ঐ সরকার স্থায়ী হয় না।

৫। একদলের প্রাধান্যবিশিষ্ট দলীয় ব্যবস্থা: এই ধরনের দলীয় ব্যবস্থায় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হইয়া থাকে। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও একটি দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।[১] দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে একাধিক দল বর্তমান থাকিলেও বিশেষ করিয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস দলেরই প্রাধান্য বর্তমান।

৬। একদলীয় ব্যবস্থা: একদলীয় ব্যবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে বলা যায়, এই ব্যবস্থায় একটি দলই হইল শাসক দল। অনেক সময়ই অপর কোন বিপক্ষ দলকে স্বীকার করা হয় না। তবে একই দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এমনকি একদলভুক্ত সদস্যদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া হয়। কেনিয়া ও উহার আফ্রিকান জাতীয় দল (The Kenya African National Union) এ-ব্যাপারে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৭। সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থা: সর্বাত্মক দলীয় ব্যবস্থাও একদলীয় ব্যবস্থা। তবে বলা হয়, সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থায় দল সকলপ্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এই প্রকারের দলীয় ব্যবস্থায় মতাদর্শের (ideology) উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং দলের মাধ্যমে শাসনকর্তাদের মনোনয়ন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মেনীর নাৎসী দল (Nazi Party) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট দলের (The Communist Party) কথা উল্লেখ করা হয়। তবে একথা অবশ্য স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে উভয়কে এক পর্যায়ে ফেলা যুক্তিসংগত নয়। জার্মেনীর নাৎসী দল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের সময় উহাকে বাঁচাইবার জন্য সৃষ্ট হয়। ইহা জার্মেনী ও জার্মান জাতির প্রাধান্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইহাতে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। অপরদিকে সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট দলের উদ্দেশ্য হইল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এবং শ্রেণীশাসনের (class rule) অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র ও সমভোগবাদী সমাজ (communist society) প্রবর্তন করা। সমভোগবাদ সমাজগঠনের কার্যে নেতৃত্বপ্রদান ও জনসাধারণকে সরকারের সংগে সংযুক্ত করা ঐ দলের প্রধান কার্য।

---

১. "Dominant party systems are ones in which party competition is allowed but one party emerges to overshadow all the other parties." Alan R. Ball: *Modern Politics and Government*

দ্বিদলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Bi-Party and Multi-Party Systems): গণতন্ত্রের পক্ষে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, না বহুদলীয় ব্যবস্থা—কোন্‌টি কাম্য ? দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হিসাবে বলা হয়, ইহার মাধ্যমে সমাজে যে-বিভিন্ন মতধারা প্রচলিত থাকে তাহা সম্যকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং যদি বহুদল থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন মত উহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারে।

তবুও কিন্তু সমস্ত দিক বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে দেশের শাসনকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী।

---

(১) নীতি ও প্রতিনিধি নির্বাচনে নাগরিকগণের স্বাধীনতা, (২) আলোচনা এবং (৩) শাসনক্ষমতায় সংযম—এই তিনটি গুণকে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। এই তিনটি বিষয়েই বহুদলীয় ব্যবস্থা হইতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ: প্রথমত বলা হয় যে, নীতি নির্বাচন ব্যাপারে যদি দুইটি পরিষ্কার বিকল্প নীতি থাকে তাহা হইলে নাগরিকদের পক্ষে নির্বাচনকার্য খুব সহজ হইয়া দাঁড়ায়।[১] কিন্তু বহুদল যদি বহু রকমের নীতি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে তাহা হইলে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনকার্যও কঠিন হইয়া পড়ে।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণ হইল আলোচনার সুযোগ। এক্ষেত্রেও বহুদল অপেক্ষা দ্বিদল অধিকতর কাম্য। কারণ, সাধারণ লোকের পক্ষে দুই দলের দুইটি কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং অন্যের আলোচনা উপলব্ধি করা যত সহজ, বহু দলের বহু প্রকারের কর্মসূচীর বিচারবিবেচনা ও আলোচনা করা তত সহজ নয়।

তৃতীয়ত, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা থাকার দরুন একদিকে শাসনক্ষমতার অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেমন নির্দিষ্ট ও শক্তিশালী হয়, অন্যদিকে বিরোধী দলও সম্যকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের বিরোধিতা করিতে পারে। ইহাতে শাসকবর্গ সংযত থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু বহুদল থাকিলে সরকারও সুসম্বদ্ধ হয় না, বিরোধিতাও শক্তিশালী হয় না।

উপসংহার: বস্তুত, বহুদলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ অপেক্ষা ত্রুটিই অধিক। দুইটি দল থাকিলে নির্বাচকগণ সরাসরিভাবে নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রের শাসননীতি ধার্য করিয়া দিতে পারে। কারণ, তাহারা জানিতে পারে যে, দুইটি দলের মধ্যে যে-দলটিকে তাহারা অধিক সমর্থন জানাইবে সেই দলই শাসন-পরিচালনার ভার পাইবে। কিন্তু যেখানে বহুদল বর্তমান থাকে সেখানে নির্বাচকরা জানিতে পারে না সরকারের রূপ এবং সরকারী নীতি কি হইবে, কারণ এ-ক্ষেত্রে সাধারণত সম্মিলিত সরকার গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ সম্মিলিত সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী না হইয়া পারে

---

১. "The citizen will choose most freely, and his moral will can best be exercised, when he has a clear choice between two alternatives." Barker

না। এই কারণে অনেক রাজনীতিবিদ্ দ্বিদলভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকেই কাম্য বলিয়া মনে করেন।[১]

ইঁহারা আরও বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা একরূপ অপরিহার্য। কারণ, এই প্রকার সফলতা নির্ভর করে সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধতার উপর, যাহা মাত্র দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

ইংল্যাণ্ডে যে সংসদীয় গণতন্ত্র সার্থক হইয়াছে এবং ফ্রান্সে হয় নাই, তাহার মূলে আছে যথাক্রমে দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা। তবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সাফল্য বিশেষ দুইটি সর্তাধীন: (ক) জনসাধারণের মধ্যে দৃষ্টিভংগির ঐক্য ও (খ) বুঝাপড়ার মনোভাব। ইহাদের জন্য আবার প্রয়োজন সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা ও আর্থিক নিরাপত্তা। অন্যথায় দ্বিদলীয়ভিত্তিক ব্রিটিশ সরকারের মত পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র সফলভাবে কার্যকর হইতে পারে না।

একদলীয় ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র (One-Party System and Democracy): উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, একাধিক দল ব্যতীত কোন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

বার্কারের ভাষায় বলা যায়, একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার মাত্র।

স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক দল সংগঠন করিয়া জনমত গঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অধিকার করিয়া আপন নীতি অনুসারে আইকানুন প্রণয়ন ইত্যাদি হইল গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। এই সকল স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে এবং স্বৈরাচারিতার ফলে শাসকগোষ্ঠীর হস্তে নাগরিকগণ নিষ্পেষিত হয়। এই অবস্থায় শারীরিক মৃত্যু না ঘটিলেও মানসিক অপমৃত্যু ঘটে।

সোবিয়েত একদলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা: বলা হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি দেশে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মেনীতে নাৎসী দল, ইতালীতে ফ্যাসিস্ট দল এবং সোবিয়েত রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভবের ফলে ঐ দেশগুলিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের পথ প্রশস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মেনী ও ইতালীতে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট দলের অবসান ঘটে বটে, কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে সর্বগ্রাসী কমিউনিস্ট দল শুধু টিকিয়াই থাকে নাই, অধিকতর শক্তিশালী হইয়া সংবিধানেও একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌গণ ইহাতে শুধু হতাশাই প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন না, উহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, সোবিয়েত রাষ্ট্রে শুধু গণতন্ত্রই অস্বীকৃত

১. "... a political system is the more satisfactory, the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties." Laski

নয়, স্বাধীন চিন্তা ও অনিয়ন্ত্রিত সমালোচনার পবিত্র অধিকার হইতেও জনগণ বঞ্চিত। সুতরাং রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়া এই ব্যবস্থা কখনই সমর্থনীয় নয়।

সমালোচনার উত্তর : অপরপক্ষে অন্যান্য বহু চিন্তাশীল রাজনীতিবিদ্, বিশেষত সোবিয়েত নেতৃবৃন্দ, ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন এবং ফলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাদের মতে, সভ্যকারের দল কোন শ্রেণীর অংশমাত্রকে লইয়া গঠিত হয়। এই অংশ শ্রেণীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অগ্রগামী। ইহারা শ্রেণীর প্রকৃত স্থায়ী স্বার্থ কি সে-সম্পর্কে চেতনাসম্পন্ন হয় এবং ঐ স্বার্থ অনুযায়ী সমস্ত শ্রেণীকে পরিচালিত করে। সুতরাং যে সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী—যেমন, পুঁজিপতি ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক ইত্যাদি থাকে সেই সমাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে দ্বন্দ্বশীল দল থাকা সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে শোষণের অবসান করা হইয়াছে, সেখানে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দ্বন্দ্বশীল শ্রেণী থাকে না। ফলে সেখানে একাধিক দলও থাকিবার কারণ থাকে না।[১] সোবিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত শোষক শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষক এই যে দুই শ্রেণী বর্তমান আছে তাহাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। উভয় শ্রেণীরই স্বার্থ হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিয়া সমভোগী সমাজ (communistic society) প্রবর্তন করা। এই অবস্থায় উভয় শ্রেণীই যে একটিমাত্র দল—কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করিতে অগ্রসর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? সংবিধানে ইহাকেই স্বীকৃতি দিয়া বলা হইয়াছে যে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অংশের অধিকার রহিয়াছে কমিউনিস্ট দলে সংঘবদ্ধ হইবার (১২৬ অনুচ্ছেদ)।

কমিউনিস্ট দল বজায় রাখিবার কারণ. এখানে প্রশ্ন করা হয়, যদি শোষকশ্রেণীর অবসান করিয়া সমাজতন্ত্রই সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে তবে আদৌ কোন রাজনৈতিক দল থাকিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

উত্তরে বলা হয়, যে-পর্যন্ত না সম্পূর্ণভাবে সমাজ সমভোগবাদ বা কমিউনিজমের স্তরে পৌঁছায়, যে-পর্যন্ত না সমস্ত প্রকারের বিরোধী শক্তি ও প্রভাব হইতে সমাজ মুক্ত হয় সে-পর্যন্ত দলের প্রয়োজন আছে।

দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবসান হইলেও পুরাতন শোষণ ব্যবস্থা যে ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া যায় তাহার বিরুদ্ধে মেহনতী শ্রেণীর সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই সংগ্রামের সম্মুখভাগে থাকে শ্রমিক এবং অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও চেতনাসম্পন্ন অংশকে লইয়া গঠিত কমিউনিস্ট দল। সংগ্রামের

১. "The plurality of parties is certainly not a necessary feature of democracy .... The existence of plurality of parties is peculiar to bourgeois democracy." Their existence only reflects the social antagonisms inherent in capitalist society." C. Bettelheim in *Democracy in a World of Tensions*

উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী সংগঠনকার্যের প্রসার করা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনকার্যে সর্বত্র গণতন্ত্রের বিস্তার করা এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী শিক্ষার সাহায্যে ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগির বিলোপসাধন করা। সুতরাং সোবিয়েত ইউনিয়ন যে সামাজিক তত্ত্ব ও মানে বিশ্বাসী তাহার বিরুদ্ধে কার্যকলাপকে বরদাস্ত করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেখানে যদি কেহ সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার স্থলে ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে ধনতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রচার বা দল গঠন করিতে চায় তাহা হইলে উক্ত প্রচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সমভোগবাদী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে যে-সকল পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি সম্পর্কে কোন সমালোচনার স্থান সোবিয়েত ইউনিয়নে নাই—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং বলা হইয়াছে, যাহারা এই সমালোচনাকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে চায় তাহারা দলের শত্রু এবং তাহাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য।

পন্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা: পন্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার এই নীতি প্রতিফলিত হয় সহজ ও শান্ত পদ্ধতিতে শাসন-পরিবর্তনে।

স্তালিনের মৃত্যুর পর হইতে যখনই শাসকবর্গ ভুল পথে চলিয়াছেন বলিয়া কমিউনিস্ট দল মনে করিয়াছে তখনই তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া অন্যান্য নেতাকে গদিতে বসাইয়াছে।

দলের মধ্যে গণতন্ত্র: সুতরাং দলের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক নীতির কিছুটা কার্যকারিতা রহিয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপসংহার: অতএব, এই বলিয়া উপসংহার করা যায় যে, একটিমাত্র দল থাকিলেই যদি গণতন্ত্র অস্বীকৃত হয় তবে সোবিয়েত ইউনিয়নের ন্যায় দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তিত নাই। অপরদিকে যদি শ্রেণীহীন রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকাই স্বাভাবিক বিবেচিত হয় তবে সোবিয়েত ইউনিয়নও গণতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হইবে কি না-হইবে, তাহা অবশ্য নির্ভর করিবে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতির কার্যকারিতার উপর। সোবিয়েত ইউনিয়নে এই নীতি বেশ কিছুটা কার্যকর বলিয়া উক্ত দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ঐ দেশকে অন্যতম গণতন্ত্র (a democracy) বলিয়া অভিহিত করা মোটেই অযৌক্তিক নহে।[১]

সমাজতান্ত্রিক দেশে একাধিক দল: সম্প্রতি অনেক মার্ক্সবাদী লেখক স্বীকার করেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশেও একাধিক দল থাকিতে পারে।[২] ইহারা সকলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কার্যে লিপ্ত। উদাহরণ হিসাবে বুলগেরিয়া,

১. 'শাসন-ব্যবস্থা' গ্রন্থে 'সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা' আলোচনা প্রসংগে একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইয়াছে।

২. cf. V. Chkhikvadze: *The State, Democracy and Legality in the USSR* pp. 208-209

পোল্যাণ্ড, জার্মেনীর গণতান্ত্রিক রিপাবলিক (German Democratic Republic) প্রভৃতি দেশের দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারে ইচ্ছুক সমমতাবলম্বী জনগোষ্ঠীকেই রাজনৈতিক দল বলা যায়।

২. দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে উহাকে 'দল' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, সে-সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে।

৩. দল ও চক্রের মধ্যে পার্থক্য হইল লক্ষ্যের ব্যাপ্তি লইয়া। 'দল' জাতীয় স্বার্থসাধনে ব্যাহত থাকে, 'চক্র' বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে।

৪. দলীয় ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ বলা হয় এই কারণে যে উহা অগণিত সমস্যা ও অসংখ্য প্রার্থীর মধ্যে বাছাই করিয়া লইতে সাহায্য করে। উপরন্তু, ইহা রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতারও প্রসার ঘটায়।

৫. দলীয় ব্যবস্থা পুরাপুরি সমর্থনীয় নহে—উহার দোষত্রুটিও আছে।

৬. সাধারণত সংখ্যা কিন্তু বর্তমানে পরিমাণের ভিত্তিতেও দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ফলে আমরা একদলীয়, দ্বিদলীয়, বহুদলীয়, অস্পষ্ট, সুস্পষ্ট ইত্যাদি প্রকার দলীয় ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাই।

৭. সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই কাম্য।

৮. একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার কিনা, সে-সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে।

অনুশীলনী

1. Define a political party. What are the functions of political parties in a democracy?

[রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্য কি কি ?]

(৫১৯-২১, ৫২২-২৪ পৃষ্ঠা)

2. Define a Political Party. Evaluate the role of political parties in a democratic State.

[রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।]

(৫১৯-২১, ৫২২-২৪ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the nature and functions of political parties. Are political parties indispensable in democracies ? Give reasons for your answer.

[রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্যাবলী আলোচনা কর। দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে কি অপরিহার্য ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।]

(৫১৯-২১, ৫২২-২৪ পৃষ্ঠা)

4. Compare the advantages and disadvantages of the bi-party system with those of the multi-party system.

[দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর।]

(৫২৬, ৫২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

5. What is a Political Party ? Are parties indispensable in democracies ?

[রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে ? দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে কি অপরিহার্য ?]

(৫১৯-২১, ৫২২-২৪ পৃষ্ঠা)

6. **Point out the functions of Political Party. Can there be democracy with one-party rule? Give reasons for your answer.**

[রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। একদলীয় শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৫২২-২৪, ৫২৯-৩১ পৃষ্ঠা)

7. **Discuss the strength and weakness of the party system in the modern democratic States. What differences do you observe in this regard in dictatorial States?**

[আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে দলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। নায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ-বিষয়ে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?]

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত : নায়কতন্ত্রে দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা থাকে। একটিমাত্র দল থাকায় সেখানে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতির অবকাশ থাকে না; অপরদিকে নাগরিকের দল নির্বাচনের স্বাধীনতাও থাকে না ··· এবং ৫২২-২৫, ৫২৭, ৫২৯-৩১ পৃষ্ঠা]

২৬ | স্বার্থগোষ্ঠী
(INTEREST GROUPS)

"Although we may never have means of measuring political power accurately, it is by now generally recognised that interest groups weild a significant amount of power in the most varied political systems." Henry Ehrman

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. বহু স্বার্থসংঘবিশিষ্ট সমাজ কাহাকে বলে, এবং এই ধারণার গুরুত্ব কি ?

২. স্বার্থগোষ্ঠী বলিতে কি বুঝায় ? উহার অন্যান্য নাম কি কি ?

৩. স্বার্থগোষ্ঠী কি কি প্রকারের হইতে পারে ?

৪. কোন্ কোন্ বিষয় স্বার্থ-গোষ্ঠীর পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে ?

৫. স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যের মাধ্যম কি কি ?

৬. কোন্ কোন্ বিষয় স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রভাব নির্ধারণ করিয়া থাকে ?

উপক্রমণিকা : বর্তমান বৃহদায়তন ও কর্মমুখর রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের গোষ্ঠী (groups) পরিলক্ষিত হয়। ইহারা কোন-না-কোন ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহারা বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে অবশ্য সুসংগঠিত রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠী (organised political interest groups)—যেমন, মালিক-শ্রেণীর স্বার্থসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে।

বহুস্বার্থবিশিষ্ট সমাজ ও প্রভাবের বহুত্ব : কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে পাশ্চাত্য উদারনৈতিক দেশগুলিতে—যেমন, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিতে—সমাজ বহু সংঘ-সমন্বিত হওয়ায় গণতন্ত্র সম্যকভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুক্তি হইল যে বহু স্বার্থসংঘ-বিশিষ্ট সমাজে (pluralist society) কোন এক স্বার্থগোষ্ঠী রাষ্ট্র বা সরকারের কাজকর্মে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না—রাজনীতি বা রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে সকলপ্রকার স্বার্থের প্রভাবই প্রতিফলিত হয়।[১]

ধারণা কতদূর গ্রহণযোগ্য : এই অভিমতের পশ্চাতে অনুমান হইল যে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ক্ষমতা প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছড়ান—কোন এক বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর করায়ত্ত নয়। অতএব, সরকারকে সকল স্বার্থগোষ্ঠীর দাবিদাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে হয়।[২] কিন্তু এই অভিমত বাস্তবের

১. In democracies "... all the active and legitimate groups can make themselves heard at some crucial stage in the process of decision." R. A. Dahl : *A Preface to Democratic Theory*

২. Ralph Miliband : *The State in Capitalist Society*

সহিত সংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ক্ষমতা সকল গোষ্ঠীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইতে পারে না।

মালিকদের স্বার্থগোষ্ঠীর প্রাধান্য: অর্থনৈতিক ক্ষমতার দিক দিয়া মালিকশ্রেণী যত ক্ষমতাশীল শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণী তত ক্ষমতাশালী হইতে পারে না; মালিকশ্রেণীর স্বার্থসংঘগুলি যেভাবে সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও আর্থিকবলে বলীয়ান, শ্রমিকশ্রেণীর ইউনিয়নগুলি সেভাবে সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ বা আর্থিক দিক দিয়া বলীয়ান হয় না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পক্ষে ধনিক স্বার্থগোষ্ঠীর প্রবল শক্তিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মালিকশ্রেণীর স্বার্থগোষ্ঠী-সমূহই সরকারী নীতির ধারাকে নির্ধারিত করিয়া থাকে। অবশ্য সরকার অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। অবস্থিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত যতটুকু সংগতিপূর্ণ সরকার ততটুকুই অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীর দাবিদাওয়ার প্রতি সম্মতি জানায়।

মোটকথা, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিলেও ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম ও অপূর্ণাংগ (unequal and imperfect)। আর্থিক প্রতিপত্তিশালী মালিকশ্রেণীর স্বার্থগোষ্ঠীর অধিক প্রভাব ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।[১]

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় স্বার্থের প্রসার: আবার ইহাও স্মর্তব্য যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশগুলির—বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক সাহায্যপ্রার্থী অনুন্নত দেশগুলির—সরকার আন্তর্জাতিক চাপকে অতিক্রম করিয়া ব্যবসায়ী স্বার্থের পরিপন্থী কোন নীতি গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে। ফলে দেখা যায়, আভ্যন্তরীণ স্বার্থের প্রভাবকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী স্বার্থ বিশেষভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলে।[২]

স্বার্থগোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Interest Groups): সমাজে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী থাকে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ইহাদের দাবিদাওয়া যাহাতে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত হয় তাহার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এখন এই সকল গোষ্ঠীকে কি নামে অভিহিত করা হইবে এবং ইহাদের সংজ্ঞাও বা কিভাবে নির্দেশ করা যাইবে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে।

---

১. *Ibid*

২. **"Capitalism is now more than ever an international system.... As a result even the most powerful capitalist countries depend upon the good will and cooperation of what has become an international capitalist 'community'." Ralph Miliband: *The State in Capitalist Countries***

লবী, স্বার্থগোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী : কেহ বা এগুলিকে স্বার্থগোষ্ঠী (Interest Groups), কেহ কেহ আবার গোষ্ঠীগুলিকে 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' (Pressure Groups) বলিয়া নামকরণের পক্ষপাতী। অপরপক্ষে অনেক লেখক এগুলিকে 'লবী' (Lobby) অথবা রাজনৈতিক গোষ্ঠী (Political Groups) বলিয়া অভিহিত করেন।

অবশ্য 'স্বার্থগোষ্ঠী' এবং 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী—এই দুইটি বর্ণনাই অধিক প্রচলিত। স্বার্থগোষ্ঠী শব্দটি সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয় একারণে যে ইহার মধ্যে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের (self-interest) ইংগিত রহিয়াছে। অপরদিকে যাঁহারা 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' কথাটি ব্যবহারে আপত্তি করেন তাঁহাদের বক্তব্য হইল, ইহার দ্বারা বুঝায় যে গোষ্ঠীগুলি যেন চাপসৃষ্টি করিয়া লোকের স্বাধীন সিদ্ধান্ত এবং সরকারের জনস্বার্থমূলক নীতিকে বিকৃত করে।

স্বার্থগোষ্ঠী ও সমদৃষ্টিভংগিসম্পন্ন গোষ্ঠী : এই তর্কবিতর্কের সমাধানকল্পে ইংরাজ লেখক অ্যালান বল (Alan R. Ball) 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : (ক) স্বার্থগোষ্ঠী (Interest Groups) এবং (খ) সমদৃষ্টিভংগিসম্পন্ন গোষ্ঠী (Attitude Groups)। ডেভিড ট্রুম্যানকে অনুসরণ করিয়া বল বলিয়াছেন যে, সমভাবাপন্ন সদস্যবিশিষ্ট গোষ্ঠীকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা যায়।[১] চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সমদৃষ্টিভংগিসম্পন্ন গোষ্ঠী (Attitude Groups) হইল একই প্রকার মূল্যবোধসম্পন্ন সদস্য লইয়া গঠিত গোষ্ঠী।[২] যেমন, অনেকে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিবার পক্ষে একমত পোষণ করে। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা জন্তুজানোয়ারের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের পক্ষপাতী। ইহার সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে স্বার্থগোষ্ঠী হইল সেই প্রকারের গোষ্ঠী যাহার সদস্যগণ কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একমতাবলম্বী[৩]—যেমন, কৃষকশ্রেণী, ব্যাংকের পদস্থ কর্মচারিগণ, শ্রমিকগণ, শিল্পপতিগণ প্রভৃতি। ইহারা একই পেশাভুক্ত বা বৃত্তিভুক্ত বলিয়া ইহারা এক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হয়।

সমদৃষ্টিভংগিসম্পন্ন গোষ্ঠীর লক্ষ্য : উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য আরও ব্যাখ্যা করিয়া অধ্যাপক বল বলিয়াছেন যে, সমদৃষ্টিভংগিসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করা, কিন্তু স্বার্থগোষ্ঠী

১. "A *pressure group* can be defined as a group whose members hold 'shared attitude'." A. R. Ball

২. "*Attitude groups* are those groups in which the members hold certain values in common." A. R. Ball

৩. "Interest groups, can be defined as those groups in which the shared attitudes of the members result from common objective characteristics, i.e. all the members of the group are plumbers, bank executives, farmers, etc." A. R. Ball

গুলি (যেমন, শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ প্রভৃতি) সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন করে।

'স্বার্থগোষ্ঠী' শব্দটির সমীচীনতা : অধ্যাপক বুলের মতামত যাহাই হউক না কেন, গোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা কিন্তু 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' (Pressure Groups) কথাটির স্থলে 'স্বার্থগোষ্ঠী' (Interest Groups) বর্ণনাটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী। কারণ, আমাদের মনে হয় 'স্বার্থগোষ্ঠী' কথাটি 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' কথাটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত মূল্য-নিরপেক্ষ (value-neutral)। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কথাটির 'চাপ' (pressure) শব্দটি স্বভাবতই অবৈধ উপায়ের ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়।

সংজ্ঞা : এখন আমরা স্বার্থগোষ্ঠীর এরূপ সংজ্ঞা দিতে পারি : কোন বিষয় সম্পর্কে সমস্বার্থসম্পন্ন জনসমষ্টিকে স্বার্থগোষ্ঠী বলা যাইতে পারে।[১] এই সমস্বার্থের ভিত্তি দৃষ্টিভংগির সমতা হইতে পারে বা আবার বাহ্যিক পেশাগত বা অর্থনৈতিক বা অন্য ধরনের স্বার্থের সমতাও হইতে পারে। এই সংজ্ঞা যথেষ্ট ব্যাপক। সমদৃষ্টিভংগিসম্পন্ন গোষ্ঠী (attitude groups) সহ সকল প্রকারের গোষ্ঠীকেই ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থগোষ্ঠী (Different Kinds of Interest Groups): বিভিন্ন লেখক স্বার্থগোষ্ঠীসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া থাকেন। যেমন, ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman) রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর (political interest groups) এবং অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীগুলি হইল সেই প্রকারের গোষ্ঠীগুলি যাহা প্রতিনিয়ত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট নিজেদের সম্পর্কিত দাবিদাওয়া পেশ করে। অপরপক্ষে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বন্ধুবান্ধবের দল (friendship groups) প্রভৃতি হইল অ-রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর উদাহরণ। বলা হয় যে ইহারা রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। তবে এই প্রকারের বিভাগের অসুবিধা হইল যে কোন প্রকারের গোষ্ঠীই নিয়মিত না হইলেও সময়ান্তরে রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। যেমন, বন্ধুবান্ধবের দলের দ্বারা দলভুক্ত ব্যক্তিদের ভোটাচরণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইতে দেখা যায়। ধর্মীয় সংস্থাগুলি সময়ান্তরে সরকারী কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

আর একটি শ্রেণীবিভাগ : অধ্যাপক পাওয়েল (G. B. Powell) এবং অধ্যাপক অ্যালমণ্ড (G. A. Almond) স্বার্থগোষ্ঠীগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :

---

১. "We can say that an interest exists when we see some body of persons sharing common concern about particular matters," J. D. B. Miller

"By 'interest group' we mean a group of individuals who are linked by particular bonds of concern or advantage, and who have some awareness of these bonds." Almond and Powell

(১) স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হিংসাত্মক বা বিক্ষোভকারী গোষ্ঠী (Violent and Spontaneous Groups)—যেমন, দাংগাহাংগামার দল, বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীর দল, হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিতকারীর দল, প্রভৃতি। ইহারা কোন ঘটনা বা অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে। যেমন, আরব দেশগুলিতে এইরূপ হিংসাত্মক গোষ্ঠী গঠনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(২) সংগঠনবিহীন স্বার্থগোষ্ঠী (Non-associational Interest Groups)—এরূপ স্বার্থগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ভাষাভাষীদের গোষ্ঠীসমূহ (language groups), বিভিন্ন বর্ণের গোষ্ঠীসমূহ (caste groups) প্রভৃতি। এই প্রকারের স্বার্থগোষ্ঠী বিশেষ সংগঠিত নয় এবং অব্যাহতভাবেও কার্য করে না। ইহারা সময়ান্তরে ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে অথবা মুষ্টিমেয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ বা দাবিদাওয়া জানায়। নির্দিষ্ট ভাষাভাষী দল স্কুলকলেজে ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ বেসরকারী প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে জ্ঞাপন করিতে পারে।

(৩) প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থগোষ্ঠী (Institutional Interest Groups)—এইরূপ গোষ্ঠীর সন্ধান সৈন্যবাহিনী, আইনসভা—এমনকি রাজনৈতিক দলের মধ্যেও সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল সংস্থা নির্দিষ্ট কার্যের উদ্দেশ্যে গঠিত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন উপদল বা ব্লক বা চক্রীদলের সৃষ্টি হইতে পারে ও নিজেদের স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যেমন, আইনসভার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগোষ্ঠী নিজেদের বা অন্য কোন গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া জানাইতে পারে। এইরূপ স্বার্থগোষ্ঠীগুলিকে অনুন্নত দেশগুলিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়। যেমন, সামরিক কুচক্রী দল (military cliques), আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী (bureaucratic groups) প্রভৃতি স্বার্থগোষ্ঠীগুলি অনেক সময়ই অনগ্রসর দেশগুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে।

(৪) সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী (Associational Interest Groups)—ইহারা দাবিদাওয়া জ্ঞাপন ও গোষ্ঠীস্বার্থ সাধনের বিশেষীকৃত সংগঠন (specialised structures for interest articulation)। শ্রমিক সংঘ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংগঠন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংগঠন, শিক্ষকদের সংগঠন, ডাক্তারদের সমিতি প্রভৃতি এই প্রকারের স্বার্থগোষ্ঠীর উদাহরণ। এই সকল স্বার্থগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন, অফিসদপ্তর, বেতনভুক কর্মচারী থাকে। ইহারা সুশৃংখলভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে দাবিদাওয়া নির্ধারণ করে ও যথাস্থানে পেশ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকারের স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। এই কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই গোষ্ঠীগুলির আলোচনা অধিকমাত্রায় করিয়া থাকেন।[১]

রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী এবং স্বার্থগোষ্ঠীর কার্য (Political Parties and Interest Groups and Functions of Interest Groups): রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী পরস্পরের সহিত এত সম্পর্কিত যে

১. G. A. Almond and G. B. Powell, Jr.: *Comparative Politics, A Developmental Approach*

ইহাদের কার্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তৎসত্ত্বেও মোটামুটিভাবে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পার্থক্য: (ক) কার্যাবলীর দিক দিয়া: দলগুলির প্রাথমিক কার্য হইল নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করা, উহাদের নির্বাচিত করিবার জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নির্বাচনের পর সম্ভব হইলে এককভাবে বা অন্য এক বা একাধিক দলের সহিত মিলিত হইয়া সরকার গঠন করা। ইহার পরবর্তী কার্য হইল কর্মসূচী নির্ধারণ করিয়া উহার ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করা, এবং পরবর্তী নির্বাচনে কিভাবে সাফল্য অর্জন করা যায় তাহার প্রচেষ্টা করা। অপরপক্ষে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য হইল সরকারী ক্ষমতা লাভ করা নয়, গোষ্ঠীর স্বার্থকে বা উদ্দেশ্য বা কর্মসূচীকে সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত করা।[১] অবশ্য অনেক সময় গোষ্ঠীর কিন্তু নিজেদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনে দাঁড় করায় এবং নির্বাচনী প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এ-কার্য স্বার্থগোষ্ঠীর গৌণ কার্য।

(খ) প্রকৃতিগত দিক দিয়া: রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠী লইয়া গঠিত হয় কিন্তু অপরপক্ষে স্বার্থগোষ্ঠী সমস্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়।[২]

(গ) লক্ষ্যের দিক দিয়া অধ্যাপক অ্যালমণ্ড (Almond) ও অধ্যাপক পাওয়েলকে (Powell) অনুসরণ করিয়া বলা যায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রধান কার্য হইল বিভিন্ন স্বার্থকে অভিপ্রকাশ করা (interest articulation)।[৩] অর্থাৎ, স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তাহাদের স্বার্থসম্পর্কিত দাবিদাওয়া সরকারী বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা। অপরপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম প্রধান কার্য হইল বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর দাবিদাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক দল উহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া দলের সাধারণ নীতি ধার্য ও প্রকাশ করে। ইহাকে বলা হয় 'স্বার্থ-সমষ্টিকরণ' (interest aggregation)।[৪]

ইহা ব্যতীত স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলের মত জনগণকে রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় করিয়া এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিয়া তোলে। অবশ্য এ-বিষয়ে দলের তুলনায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলির শক্তি ও সামর্থ্য সীমাবদ্ধ।

---

১. "Interest groups are primarily concerned with achieving the programs they desire by having them adopted as the policies of government..." ১. L. Wasby

২. "Fundamentally pressure groups are the representation of homogeneous interests seeking influence. Political parties, on the other hand, seeking offices and directed towards policy decisions, combine heterogeneous groups." Neuman

৩. Almond and Powell: *Comparative Politics*

৪. "The function of converting demands into general policy alternatives is called *interest aggregation.*" Almond and Powell: *Comparative Politics*

স্বার্থগোষ্ঠীর পদ্ধতি নির্ধারক বিষয় (Factors on which the methods of Interest Group depend) : স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহার প্রকৃতি নির্ভর করে একাধিক বিষয়ের উপর।

তিনটি বিষয় : এই বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হইল : (১) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো (political institutional structure), (২) দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি (nature of political parties) এবং (৩) রাজনৈতিক কৃষ্টির প্রকৃতি (nature of political culture)।

(ক) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো : রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো বিভিন্নভাবে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, রাজনৈতিক কাঠামো এককেন্দ্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হইতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হয়। সুতরাং স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অধিক চাপ রাখার দিকে ঝুঁকে।

দৃষ্টান্ত : যেখানে শাসন বিভাগ (the executive) অধিক ক্ষমতাশালী সেখানে মন্ত্রী ও সরকারী দপ্তর বা আমলাদের সহিত অধিকমাত্রায় যোগাযোগ রাখিয়া স্বার্থগোষ্ঠীগুলিকে চলিতে হয়। যেমন, ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং শক্তিশালী শাসন বিভাগ শাসন পরিচালনা ও নীতি-নির্ধারণের প্রধান নির্ধারক। সুতরাং ব্রিটেনে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শাসন বিভাগগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রাখিয়া চলে। অপরপক্ষে যে সকল দেশে আইনসভা কিছুটা শক্তিশালী সে-ক্ষেত্রে স্বার্থগোষ্ঠী-গুলির দৃষ্টি পড়ে আইনসভার উপর। যেমন, চতুর্থ রিপাবলিকের সময় ফ্রান্সে আইনসভা অধিক শক্তিশালী হওয়ায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি আইনসভায় কার্য করিবার দিকে অধিক জোর দিত। বর্তমানে আবার শাসন বিভাগ অধিক শক্তিশালী। সুতরাং বর্তমানে ফ্রান্সে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শাসন বিভাগের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলি কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই কার্য করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কেন্দ্রে সুবিধা না হইলে রাজ্যগুলিতে চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং কেন্দ্রের নীতিকে অকার্যকর করার চেষ্টা হয়। অপরদিকে রাজ্যগুলিতে সুবিধা না হইলে স্বার্থগোষ্ঠী কেন্দ্রের সহায়তায় রাজ্যের নীতিকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(খ) দলীয় সংগঠনের প্রকৃতি : দলীয় সংগঠনের প্রকৃতি ও দলগুলির সহিত স্বার্থগোষ্ঠীর সম্পর্কও স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ব্রিটেনে দলগুলি স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সহিত যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলে। ব্রিটেনের সুসংগঠিত নিয়মানুবর্তী দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই ইহা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলগুলির প্রতি দলীয় সভ্যদের আনুগত্য সুদৃঢ় নয় বলিয়া স্বার্থগোষ্ঠীগুলির পক্ষে আইনসভার সদস্যদের প্রভাবান্বিত করিতে সুবিধা হয়। ইহা ছাড়া আইনসভার

সদস্যরা স্থানীয় চাপ অবহেলা করিতে পারে না, কারণ স্থানীয় স্বার্থগুলি নির্বাচনে প্রার্থীদের অর্থ ও প্রচারকার্যের দ্বারা সহায়তা করিয়া থাকে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ আইনসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কার্যকলাপের অধিক সুযোগ পায়। অনেক দেশে আবার স্বার্থগোষ্ঠী রাজনৈতিক দলসমূহের অংগ হিসাবেই কাজ করে।

একদলীয় ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের পক্ষে দলীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হয়। যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট দলই সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। উহার বিরুদ্ধে কোন স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে কিছু করা বা বলা সম্ভব হয় না। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি অতি মৃদুভাবে কিছু কিছু সীমাবদ্ধ সুপারিশ রাখিতে পারে। চাপা অসন্তোষ থাকিলে তাহা দলীয় নেতারা অনুভব করিয়া যাহা কিছু করণীয় তাহা করেন।

যে-দেশে একই দল নির্বাচনে একাধিকবার সফলতা অর্জন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন থাকে সে-দেশে অধিকাংশ সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী ঐ দলের মধ্যে স্থান করিয়া লয় এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলের উপর চাপসৃষ্টি করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী স্বার্থ অনেক সময় প্রকাশ্যে সরকারের বিপক্ষে প্রচার চালাইয়া অথবা আর্থিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিয়া দলের সহযোগিতা আদায় করিবার চেষ্টা করে।[১]

(গ) সমাজের রাজনৈতিক কৃষ্টি : পরিশেষে, স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যপদ্ধতি সমাজের রাজনৈতিক কৃষ্টির (political culture) উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভংগি, মূল্যবোধ, প্রবণতা (attitudes, beliefs, values. propen-sities) ইত্যাদি রাজনৈতিক কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু।[২] অনেক দেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি এমন যে সেখানে অনবরতই বিক্ষোভ প্রদর্শন, দাংগাহাংগামা প্রভৃতির পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করিবার দিকে অগ্রসর হয়। যেমন, পেরুতে (Peru) হিংসাত্মক কার্যকলাপ দাবিদাওয়া পেশ ও আদায় করার চিরাচরিত পদ্ধতি। ভারতেও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক ভাষাগত গোষ্ঠী দাংগাহাংগামার মারফত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অনেক দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ স্বার্থগোষ্ঠীগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া উহাদের সংগে নিয়মিত পরামর্শের সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহে না। অপরদিকে ব্রিটেনের ঐতিহ্য হইল বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট করা। এই কারণেই দেখা যায় যে ব্রিটেনে বিভিন্ন স্থায়ী পরামর্শ প্রদানকারী কমিটিতে (permanent advisory committees) আমলা ও স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে এবং সুপারিশ প্রদান করে।

---

১. J. B. D. Miller : *The Nature of Politics*

২. Almond and Powell : *Comparative Politics*

তবে সকল উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক সমাজীকরণ ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে এমন এক সাধারণ দৃষ্টিভংগি সৃষ্টি করা হয় যাহাতে শ্রমিক আন্দোলন দেশের স্বার্থবিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাহাদের আন্দোলনকে সংযত ও সীমিত করিয়া পরিচালনা করিতে হয়।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মত অনেক দেশ আছে যেখানে ধর্মীয় দলগুলির সহযোগিতা ব্যতীত কোন স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে কায করা সম্ভব হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক কৃষ্টি হইল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। যাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠী তাহাদের বক্তব্য বা চাহিদা পেশ করিয়া থাকে। অবশ্য অনেক সময় সরকারী রাজনৈতিক কৃষ্টিকে ভেদ করিয়া বৈজ্ঞানিক, পেশাগত শিল্পী, লেখক প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে এবং সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। ইহার জন্য প্রতিবাদকারীকে শাস্তিভোগও করিতে হয়।

স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যের বিভিন্ন মাধ্যম (Different Channels of Interest Groups Activity): স্বার্থগোষ্ঠীর অন্যতম লক্ষ্য হইল শাসকগোষ্ঠীকে প্রভাবান্বিত করিয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল করা। এই লক্ষ্য মনে রাখিয়া স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের কার্যের মাধ্যম ঠিক করিয়া লয়। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত মাধ্যমগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ: প্রথমেই আছে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ।[১] পেরুর মত অনেক দেশ আছে যেখানে এই প্রকারের মাধ্যমে স্বার্থগোষ্ঠী নিজেদের দাবিদাওয়া সরকারী সিদ্ধান্তকারীদের গোচরে আনিতে চেষ্টা করে। তবে সাধারণত যে-ক্ষেত্রে হতাশার ভাব ব্যাপক এবং দাবি জানাইবার ও আদায় করিবার অন্যান্য মাধ্যম বিশেষ থাকে না সে-ক্ষেত্রেই এই পন্থা অবলম্বন করা হয়।

(২) ব্যক্তিগত সম্পর্ক: অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের (personal connections) মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব অথবা স্থানীয় যোগাযোগের সূত্রে সরকারী মহলের সহিত জানাশুনা থাকিতে পারে। যেমন, একই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকে। ইহার সুযোগ লইয়া ব্যক্তি কিংবা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী নিজেদের কার্যসাধন অনায়াসে করাইয়া লইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান ও অন্যান্য দেশে উপরি-উক্ত ধরনের পদ্ধতির সম্যক ব্যবহার করা হয়।

(৩) সরকারী সংস্থায় প্রতিনিধি প্রেরণ: স্বার্থগোষ্ঠীগুলি আইনসভা সহ বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। এই সকল প্রতিনিধি সরাসরি স্বার্থগোষ্ঠীর দৃষ্টিভংগি বা দাবিদাওয়া সরকারী মহলে উপস্থাপিত করেন।

১. ৫৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪) জনমত গঠন : আন্দোলন এবং জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ অবলম্বনের (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাইয়া স্বার্থগোষ্ঠীরা সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করিতে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতি অধিক সংগঠিত ও শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠীরাই অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়। এ-ব্যাপারে সংগঠিত মালিক বা ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যত পারদর্শী অন্য কোন গোষ্ঠী ততটা নয়।

(৫) দলের মাধ্যমে স্বার্থসাধন : রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তাহাদের দাবিদাওয়া পেশ করিয়া থাকে। অনেক সময় দলীয় ছাপ লইলে সরকারী মহলে অসুবিধা হইতে পারে এই কারণে কোন কোন গোষ্ঠীর পৃথক রাজনৈতিক শাখা থাকে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের (The American Medical Association) পৃথকভাবে রাজনৈতিক কাযের জন্য কমিটি (American Medical Political Action Committee) রহিয়াছে। ভারতে 'কংগ্রেস' দল বহুদিন ক্ষমতায় আসীন থাকায় অনেক স্বার্থগোষ্ঠীই উহার মাধ্যমে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ব্রিটেনে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি পার্লামেন্টারী কমিটি-ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৬) আইনসভার সদস্যদের প্রভাবান্বিত করা : বিভিন্ন দেশে আইনসভাগুলি হইল স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের অন্যতম কর্মক্ষেত্র। আইনসভার সদস্যদের প্রভাবান্বিত করিয়া স্বার্থগোষ্ঠীর 'লবী' স্বার্থানুকূলে আইন করিয়া লইতে বা বিশেষ আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে প্রচেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় সহানুভূতিসম্পন্ন প্রার্থীদের নির্বাচনের মারফত প্রেরণ করিয়া স্বার্থগোষ্ঠীগুলি আইনসভায় প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। অনেক সময় আবার স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আইনসভার সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদাদি দিয়া সাহায্য করে। স্মর্তব্য যে শিক্ষাদীক্ষা, ঐতিহ্য ও স্বার্থের সূত্রে আইনসভার সদস্যগণ কোন-না-কোন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। ফলে সহজেই ইহারা সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর বক্তব্য গ্রহণ করে ও উহার সপক্ষে কার্য করে। যেমন ব্রিটেনে বি. বি. সি.-র (B. B C.) টেলিভিশনসংক্রান্ত ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার অবসান ঘটাইবার জন্য রক্ষণশীল দলের সাধারণ সদস্যরা শিল্পপতিদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিয়াছিল।

আইনসভায় কমিটিগুলির নিকট স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের বক্তব্য রাখিয়াও আইন-প্রণয়ন বা আইনের রদবদল করিতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্বার্থগোষ্ঠী কর্তৃক উৎকোচ (bribery) প্রদানের অভিযোগও শুনা যায়।

(৭) শাসন বিভাগকে প্রভাবান্বিত করার প্রচেষ্টা : বর্তমানে কিন্তু আইনসভা অপেক্ষা শাসন বিভাগকে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি প্রভাবান্বিত করিতে অধিক চেষ্টা করে।[১]

১. "Serious pressure group activity, now occurs much more at executive and administrative, rather than at legislative, level." Ralph Miliband

ইহার কারণ আধুনিক কালে সকল দেশেই শাসন বিভাগের হাতে অধিকমাত্রায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। কাজের চাপের দরুন আইনসভা অধিকাংশ সময়ই নিয়মকানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা শাসন বিভাগের হাতে ছাড়িয়া দেয়। আইনসভা আইনের কাঠামো তৈয়ার করিয়া দেয়, আর আইনের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাহা নিয়মকানুনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ পূরণ করিয়া লয়। ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি দেশে আইনপ্রণয়ন ও আইনপ্রয়োগের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট ও আমলাতন্ত্রের হস্তেই ন্যস্ত। এই অবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীর দৃষ্টি এখন অধিক-মাত্রায় শাসন বিভাগের উপর পড়িয়াছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিভিন্নভাবে শাসন বিভাগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। অনেক সময় সরাসরি মন্ত্রীদের এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আমলাদের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে। ব্রিটেনের মত দেশে আবার বিভিন্ন পরামর্শপ্রদানকারী কমিটি রহিয়াছে। এই কমিটিগুলিতে আমলা ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ থাকে। ফ্রান্সেও অনুরূপভাবে সরকারীভাবে স্বার্থগোষ্ঠীগুলিকে শাসন বিভাগের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে। তবে বেসরকারী-ভাবেও স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরা আমলাদের সংগে সম্পর্ক রাখিয়া চলে। শাসন বিভাগগুলি অধিকাংশ স্বার্থগোষ্ঠীর নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে চাহে এবং সহযোগিতা আকাংক্ষা করে।[১] ফলে বিশেষ করিয়া উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকারী নীতি ও আইনকানুনে বহুল পরিমাণে শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরামর্শ ও দৃষ্টিভংগি প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়।

(৮) বিচারালয়ের উপর স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচার বিভাগের মাধ্যমেও গোষ্ঠীস্বার্থ সাধন করিতে প্রয়াস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক আদালতগুলির (federal constitutional courts) আইনসভা বা শাসন বিভাগের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। অনেক সময়ই আইনের রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। এখন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি দুইভাবে বিচারালয়গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে: (ক) গোষ্ঠীগুলি যাহাতে সহানুভূতিসম্পন্ন লোক বিচারকপদে নিযুক্ত হয় তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন আইন-ব্যবসায়ীদের সমিতির (The American Bar Association) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্বার্থ-গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকদের নিয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকে। (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে পরীক্ষামূলকভাবে মামলা (test cases) দায়ের করিয়া নিজেদের স্বার্থানুযায়ী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিচারকদের প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করে।

স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রভাব-নির্ধারক বিষয়সমূহ (Factors on which the Influence of Interest Groups Depends): স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রভাব নির্ভর করে একাধিক পরস্পরসম্পর্কিত বিষয়ের উপর।

---

১. "Governments want advice, technical information and most of all cooperation from strong interest groups." Alan R. Ball

(১) দাবিদাওয়া পেশ করার পদ্ধতি: স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কিভাবে বা কোন্ ধরনের দাবিদাওয়া প্রকাশ বা পেশ করে—তাহারই উপর প্রথম নির্ভর করে উহাদের প্রভাব। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে তাহাদের দাবিদাওয়া জানাইতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন ও অস্পষ্টভাবে দাবিদাওয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে। যে-ক্ষেত্রে দাবিদাওয়াগুলি স্পষ্টভাবে শাসকগোষ্ঠীর নজরে আনা হয় সে-ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর কথা বিচারবিবেচনা করিতে সমর্থ হয়। অপরপক্ষে যদি দাবিদাওয়া অস্পষ্ট বা বিচ্ছিন্ন হয় তবে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সুনির্দিষ্ট পন্থা বা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(২) গোষ্ঠী-সংগঠন: গোষ্ঠী-সংগঠনের (organisation) প্রকৃতির উপরও স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের প্রভাব নির্ভর করে। ইহা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে-সকল স্বার্থগোষ্ঠী সুসংগঠিত নয় তাহাদের তুলনায় সুসংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সরকারের উপর চাপ প্রদানের সুযোগসুবিধা বহুল পরিমাণে অধিক। আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত স্বার্থগোষ্ঠী অপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ স্বার্থগোষ্ঠীরই প্রভাব অধিক হয়। ইহা ছাড়া একই স্বার্থসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের মধ্যে যদি মতবিভেদ থাকে তাহা হইলে ঐ স্বার্থসংগঠন দুর্বল হইয়া পড়ে। যেমন, ব্যবসায় স্বার্থগোষ্ঠী শ্রমিক স্বার্থগোষ্ঠী অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্যবদ্ধ। ব্যবসায়ের আকারপ্রকারভেদ সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের একজোট হইয়াই সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করিতে দেখা যায়। অপরপক্ষে, শ্রমিক-শ্রেণী একাধিকভাবেই বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন এবং অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া তাহাদের প্রভাবও অপেক্ষাকৃত কম না হইয়া পারে না।

(৩) নেতৃত্ব: স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সাফল্য ও প্রভাব উহাদের নেতৃত্বের প্রকৃতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। যে-পরিমাণে গোষ্ঠীগুলি সদস্যদের শক্তিসামর্থ্যকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করিতে পারিবে সেই পরিমাণে উহাদের প্রভাব শক্তিশালী হইবে।[১] ইহা নির্ভর করে স্বার্থগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সমঝতার উপর।

যে-ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সহিত সাধারণ সদস্যদের বিভেদ থাকে অথবা নেতৃবৃন্দ গোষ্ঠী অপেক্ষা অন্য স্বার্থসাধন করিবার দিকে ঝুঁকে সে-ক্ষেত্রে স্বার্থগোষ্ঠী দৃঢ়তার সহিত সরকারের স্বার্থসাধন হইতে পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে শিল্প ও ব্যবসায়ী স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শ্রমিক বা অন্যপ্রকারে স্বার্থগোষ্ঠী অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। কারণ, ব্যবসায়ী স্বার্থগোষ্ঠীতে নেতৃত্বের সহিত সদস্যদের বিরোধ থাকে না, শ্রমিক স্বার্থগোষ্ঠীগুলিতে কিন্তু এই সমস্যা রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত উদারনৈতিক দেশগুলির শ্রমনেতাদের অন্যতম দুর্বলতা হইল যে ইহারা শাসন-ব্যবস্থার স্বীকৃত নিয়মকানুনের শৃংখলায় আবদ্ধ।

১. "A group's ability to mobilise the support, energy and resources of its members will surely influence its effectiveness." Almond and Powell

একদিকে ইহাদের কর্তব্য হইল দৃঢ়তার সহিত শ্রমিকদের স্বার্থ সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করা, অপরদিকে আবার ইহাদের উপর চাপ আসে যে ইহারা যেন 'দায়িত্বপূর্ণভাবে' (responsibly) এবং 'জাতীয় স্বার্থে'র (national interest) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রম আন্দোলন পরিচালনা করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় স্বার্থে'র তাৎপর্য হইল অবস্থিত সামাজিক ও অর্থ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। আর দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করার অর্থ হইল যে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা। ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত প্রভৃতি দেশে শ্রমিক নেতাদের এই দুর্বলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ব্যবসায় ও শিল্পস্বার্থগোষ্ঠী যেভাবে দৃঢ়সংকল্প ও প্রভাবশীল হয় সেভাবে শ্রমিক স্বার্থগোষ্ঠীগুলি প্রভাবশীল হয় না।

(৪) স্বার্থগোষ্ঠীর আর্থিক সমস্যা: স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কৃতকার্যতা অনেক পরিমাণেই উহাদের আর্থিক সামর্থ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুসংবদ্ধভাবে দাবিদাওয়া পেশ করিতে হইলে এবং সরকারের উপর সফলতার সহিত অব্যাহত চাপ রাখিতে হইলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে, দপ্তর, কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হইবে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে স্বার্থানুকূলে তদ্বিরাদি করিবার জন্য সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করিতে হইবে, নিজস্ব বা সহানুভূতিশীল প্রার্থীদের আইনসভায় নির্বাচনের ব্যয় বহন করিতে হইবে এবং ব্যাপক জনসম্পর্ক স্থাপন বা জনমত গঠনের জন্য প্রচারকার্য চালাইতে হইবে।

বস্তুত, স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রভাবের তারতম্যের মূলে আর্থিক সামর্থ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়া গিয়াছে।[১]

এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইলে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে ব্যবসায়ী স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব ও শক্তি অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীর শক্তিসামর্থ্য হইতে অনেক অধিক। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সরকারের পক্ষে ব্যবসায়ী স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থকে সহজে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

ইহাও বলা হয় যে উদারনৈতিক দেশগুলিতে ব্যবসায় সম্প্রদায় যাহা অনুমোদন করে তাহা ব্যতীত অন্য কিছু করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের বিশেষ থাকে না।[২]

(৫) রাজনৈতিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ: পরিশেষে, সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধের (political attitudes and values) উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে প্রচলিত জাতীয় মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির বিরুদ্ধে যাইয়া নিজস্ব স্বার্থসাধন করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। অতএব, জাতীয় মূল্যবোধের

১. Almond and Powell, op. cit.

২. "Politics is indeed the art of the possible. But what is possible is above all determined by what the 'business community' finds acceptable."
Ralph Milliband

সহিত সংগতি রাখিয়া প্রত্যেক স্বার্থগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রণী হইতে হয়। অনেক দেশে কতকগুলি স্বার্থগোষ্ঠীকে জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় মূল্যবোধের সহিত সংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়, আবার কতকগুলি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থীই বলিয়া হয়।

মন্তব্য : উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাধারণত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ও ধ্যানধারণাকে জাতীয় স্বার্থের সহিত সংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়; অপরপক্ষে শ্রমিক সংঘগুলির কার্যকলাপকে জাতীয় মূল্যমান (values) বা স্বার্থের বিরোধী বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টা হয়। ইহার কারণও আছে। কোন সমাজের রাজনৈতিক কৃষ্টি বা রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ অকুনিরপেক্ষ বস্তু নয়। ইহা রাজনৈতিক সমাজীকরণের পদ্ধতির (political socialisation) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া থাকে। সমাজীকরণ বা লোকের দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধ সৃষ্টির ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা, সংবাদপত্র, বইপত্র ও পুস্তিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির অন্যতম ভূমিকা রহিয়াছে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে আর্থিক ক্ষমতায় প্রতিপত্তিশীল ব্যবসায়ীশ্রেণী নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে সমাজীকরণের উপরি-উক্ত উপায়সমূহকে ব্যবহার করিয়া যে-ভাবে সমাজের দৃষ্টিভংগিকে প্রভাবিত করিতে পারে অন্য কোন স্বার্থগোষ্ঠী তাহা পারে না। এই কারণেই জাতীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থকে ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উক্তি আছে যে যাহা জেনারেল মোটর কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর তাহাই জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর ('what is good for General Motors is good for America')। সুতরাং শ্রমিকদের আন্দোলনকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়—জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. বহুস্বার্থবিশিষ্ট সমাজ বলিতে বুঝায় যে সমাজে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, এবং ধারণার গুরুত্ব হইল যে ইহার ফলে গণতন্ত্র সংরক্ষিত হয়।

২. স্বার্থগোষ্ঠী বলিতে বুঝায় একই স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিসমুদয়ের জোট। উহার অন্যান্য নাম হইল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, 'লবী' এবং 'রাজনৈতিক গোষ্ঠী'।

৩. রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠী, বন্ধুবান্ধবের দল, বিক্ষোভকারী গোষ্ঠী, সংগঠনবিহীন স্বার্থগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থগোষ্ঠী এবং সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী—স্বার্থগোষ্ঠী এই কয় প্রকারের হইতে পারে।

৪. স্বার্থগোষ্ঠীর পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া থাকে (ক) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, (খ) দলীয় সংগঠনের প্রকৃতি এবং (গ) রাজনৈতিক কৃষ্টির প্রকৃতি।

৫. স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যের মাধ্যম হইল (ক) বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ, (খ) ব্যক্তিগত সম্পর্ক, (গ) সরকারী সংস্থায় প্রতিনিধি প্রেরণ,

(ঘ) জনমত গঠন, (ঙ) দলের মাধ্যমে স্বার্থসাধন, (চ) জনপ্রতিনিধিদের প্রভাবিত করা, (ছ) শাসক বিভাগকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা, (জ) বিচারালয়কেও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা।

৬. স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব নির্ধারণ করিয়া থাকে : (ক) দাবিদাওয়া পেশ করার পদ্ধতি, (খ) গোষ্ঠী-সংগঠন, (গ) নেতৃত্ব, (ঘ) স্বার্থগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা এবং (ঙ) রাজনৈতিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ।

অনুশীলনী

1. How would you define an Interest Group? Give an idea of the different kinds of interest groups.

[কিভাবে স্বার্থগোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর বিবরণ দাও।]

(৫৩৫-৩৬, ৫৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between Political Parties and Interest Groups and briefly describe the functions of the latter.

[রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (৫৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)

3. What are the factors that determine the methods of Interest Groups?

[কোন্ কোন্ বিষয় স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব নির্ধারণ করিয়া থাকে?] (৫৪০-৪২ পৃষ্ঠা)

4. Give a brief idea of different channels of Interest Groups activity.

[স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যের বিভিন্ন মাধ্যমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (৫৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

5. Briefly enumerate the factors on which influence of Interest Groups depends.

[যে যে বিষয় স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব নির্ধারণ করিয়া থাকে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ কর।]

(৫৪৪-৪৭ পৃষ্ঠা)

6. What are Interest Groups? How do they influence the decisions of a Government?

[স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে তাহারা সরকারের সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে?

(৫৩৬-৩৭, ৫৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

২৭ | নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব

(ELECTORATE AND REPRESENTATION)

"A democratic system is one in which the will of the average citizen has channels of direct access to the sources of authority." H. J. Laski

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. নির্বাচকমণ্ডলীর সমস্যা কয় প্রকারের ?

২. ভোটাধিকারের ভিত্তি লইয়া বাদানুবাদ বলিতে কি বুঝায় ?

৩. ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত ?

৪. স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার ব্যাপারে দৃষ্টিভংগি কি হওয়া উচিত ?

৫. নির্বাচন-পদ্ধতি বলিতে কি বুঝায় ?

৬. ভৌগোলিক ও পেশাগত প্রতিনিধিত্বের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ?

৭. প্রতিনিধি ও নির্বাচকগণের মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত ?

৮. সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় কি ?

৯. এই প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি কি কি ?

১০. প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায়, এবং এই তত্ত্ব কত প্রকারের ?

১১. প্রতিনিধিত্বের নিয়ন্ত্রিত করিবার পদ্ধতি কি কি ?

বর্তমান দিনের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের মৌল সমস্যা হইল শাসন-কর্তৃপক্ষের উপর জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। এই মৌল সমস্যা পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংগঠন-সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংগঠনসংক্রান্ত সমস্যা বলিতে (১) নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা, (২) জনগণ কর্তৃক শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সমস্যা এবং (৩) জনমত ও (৪) রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত সমস্যাই বুঝায়। বর্তমান অধ্যায়ে শুধু নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যারই আলোচনা করা হইবে (পূর্বেও অবশ্য এ-সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে ৩০১, ৪৯৪ পৃষ্ঠা।)

নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Electorate) :

নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা প্রধানত তিনটি : (ক) ভোটাধিকারের ভিত্তি, (খ) নির্বাচন-পদ্ধতি, এবং (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব। সমস্যা তিনটির নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন।

নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা : সংক্ষেপে নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সেই সকল অধিবাসীকে বুঝায় যাহারা আইনসভা অথবা নির্বাচন-সংস্থায় (The Electoral College) প্রতিনিধি নির্বাচনে আইনত ভোটদানের অধিকারী। ইহারা হইল ভোটদানের অধিকারী নাগরিকগণের সমষ্টি।

ভোটাধিকারের ভিত্তি : ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হইবে, ইহা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং ফলে বহু মতবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল মতবাদের মধ্যে দুইটিই হইল প্রধান। প্রথম মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রাধীন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের (universal adult suffrage) ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে সকলকে নয়, শুধু যোগ্য ব্যক্তিদিগকেই ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার—সপক্ষে যুক্তি : আঠার শতকে স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ[১] সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে বিশেষ প্রবল সমর্থন হইয়া দাঁড়ায়। এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, সার্বভৌমিকতা জন-সাধারণের মধ্যেই নিহিত এবং ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

---

(১) ভোটাধিকারের ফলেই নাগরিক সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনগণের সার্বভৌমিকতাকে সার্থক রূপদান করে।

আরও বলা হয় যে শাসননীতির ফল যখন সকলকেই স্পর্শ করে তখন শাসননীতি নির্ধারণে সকলেরই হাত থাকা উচিত (What touches all should be decided by all)। জনগণের যদি শাসন-ব্যবস্থা ও শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে গণতন্ত্রকে 'জনগণের শাসন' (Rule of the People) বলা যায় কিরূপে ?

---

(২) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যতিরেকে গণতন্ত্র অসার কল্পনাতে পরিণত হয়।

---

(৩) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে প্রদর্শিত তৃতীয় যুক্তি হইল সাম্যের যুক্তি। গণতন্ত্র শুধু স্বাধীনতা নহে, সাম্যের অবস্থাও কল্পনা করে। মানুষে মানুষে সাম্য ব্যতীত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অলীক। সুতরাং সকল নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। একমাত্র বয়স ব্যতীত অন্য কোন অজুহাতে ভোটাধিকার প্রদান ব্যাপারে নাগরিকগণের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করা গণতন্ত্রের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

(৪) উপরি-উক্ত রাজনৈতিক কারণসমূহ ছাড়া নৈতিক কারণেও সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারকে সমর্থন করা হয়। সমর্থনকারীরা বলেন, ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার না হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহা সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় অধিকার। ভোটাধিকার না থাকিলে নাগরিকের চরিত্রের একটা দিক—রাজনৈতিক দিক পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ফলে সে অপরিণত মানব থাকিয়া যায়। সুতরাং নৈতিক কারণেই সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত।

---

১. ২৩১-৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) পরিশেষে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে সমর্থন করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভাব সম্বন্ধে শাসন-কর্তৃপক্ষ কখনই সচেতন থাকেন না এবং তাহাদের অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করেন না। তাহাদের দাবি উপেক্ষিত হইবেই থাকে।

সুতরাং সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হয় তবে ইহাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে।

বিপক্ষে যুক্তি : সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল এইরূপ : (১) সমর্থকগণ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝেন তাহা কোন সময়েই বিশেষ স্পষ্ট নহে। যদি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী নহে এইরূপ প্রত্যেক সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকেই বুঝায় তবে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই মতের প্রতি শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না। আর যদি 'প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক' বলিতে উন্মাদ, দেউলিয়া গ্রহণকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিগণকেও বুঝায় তবে এই মতকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

(২) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ব্লুন্টস্‌লি, লেকী (Lecky), জন স্টুয়ার্ট মিল এবং স্যার হেন্‌রী মেইন প্রধান। ইহাদের মতে, ভোটাধিকার কখনই মানুষের জন্মগত অধিকার নয়—ইহা রাষ্ট্র-প্রদত্ত অধিকার এবং রাষ্ট্রের উচিত বিশেষ বিবেচনা সহকারে এই অধিকার প্রদান করা। যাহাদের অধিকার ব্যবহার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই তাহাদিগকে কখনই ইহা প্রদান করা উচিত নয়। ভোটাধিকার সাধারণ অধিকার নহে, ইহার সহিত উপযুক্তভাবে ব্যবহারের পবিত্র কর্তব্যও জড়াইয়া আছে। সুতরাং জনসাধারণকে এই অধিকার প্রদান করার অর্থ হইল গণতন্ত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে লইয়া যাওয়া।

ভোটাধিকার প্রদানের জন্য যোগ্যতার যে-সকল মানদণ্ডের নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সম্পত্তি—এই দুইটিই প্রধান।

মিল : মিলের মতে, শিক্ষাই ভোটাধিকার প্রদানের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। যে-ব্যক্তির সাধারণ অক্ষর-পরিচয়ও নাই—অর্থাৎ যে প্রাথমিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হয় নাই তাহাকে ভোটদানের অধিকার প্রদান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

সুতরাং সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সার্বিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন (Universal teaching must precede universal enfranchisement)।

মিলের মতের সমালোচনা : মিলের এই মত বিশেষ গ্রহণীয় নহে। মিল প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা মানুষকে রাজনৈতিক যোগ্যতা ও কর্তব্যের পথে কতদূর লইয়া যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, প্রাথমিক

ত্ত্ব হইতেও উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তার পথে ইহার সমাধান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড করা চলিতে পারে না। অবশ্য ইহা সত্য যে, নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি কাম্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল অশিক্ষিত ব্যক্তিকেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। নির্বাচনে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা উচিত যে, সার্বিক ভোটাধিকারের সংগে সংগে যেন সার্বিক শিক্ষার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।

যাঁহাদের মতে, সম্পত্তির মালিকানা ভোটাধিকারের যোগ্যতার ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত তাঁহারা বলেন, যাহাদের সম্পত্তি নাই রাষ্ট্রের উপর তাহাদের দরদ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা রাষ্ট্রকল্যাণের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। উপরন্তু, এই যুক্তি দেখানো হয় যে সম্পত্তিহীন লোকে কর প্রদান করে না এবং যাহারা কর প্রদান করে না তাহাদের পক্ষে অমিতব্যয়ী ও অপচয়ী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। মিল এই মতের সমর্থনে বলিয়াছেন, অপরের অর্থে অমিতব্যয়ী হইবার দিকে ঝোঁক সাধারণের সর্বদাই রহিয়াছে।

সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নীতি।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। কিন্তু বর্তমানে সামন্ততন্ত্রের এই নীতি অযৌক্তিক বলিয়া ক্রমশই বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। দেখা গিয়াছে, সম্পত্তিহীন ব্যক্তির রাষ্ট্রের প্রতি কোন অংশে কম দরদ থাকে না। দ্বিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক যুগে যখন শুধু প্রত্যক্ষ করই ধার্য করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইত তখন মাত্র সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণই কর প্রদান করিত। কিন্তু বর্তমানে পরোক্ষ করও প্রবর্তিত হওয়ায় সকলেই কিছু-না-কিছু কর প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং কর প্রদান না করিবার অজুহাতে সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না।

উপসংহার: পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। পূর্ণবিকশিত নাগরিকতাকে ভোটাধিকার প্রদান দ্বারা স্বীকার না করিলে ইহার স্বরূপ বজায় রাখা যায় না। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নাগরিক নিজ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই তাহাকে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। একমাত্র এইভাবেই গণতন্ত্র প্রকৃত জনগণের শাসনে পরিণত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Women Suffrage): নারীর ভোটাধিকার সমস্যা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সমস্যারই অংগীভূত। যদি সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোট দিবার অধিকার থাকে তবে নারীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সহজ যুক্তি সেদিন পর্যন্তও মানিয়া লওয়া হয় নাই। ১৮৬১ সালে

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার লইয়া সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই আন্দোলন ক্রমশ সমগ্র ইয়োরোপে প্রসারলাভ করে। ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিলে প্রথম ১৮৯৮ সালে ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৯২৮ সালে এই আইন সংশোধন করিয়া স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স পুরুষদের বয়সের সহিত সমান করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্স ও ইতালীতে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। বর্তমানে অবশ্য উভয় দেশেই তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। জাপানে সর্বপ্রথম ১৯৪৭ সালে স্ত্রীলোকদিগকে নির্বাচকমণ্ডলীভুক্ত করা হয়। গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলিয়া অভিহিত সুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার ১৯৭১ সালের পূর্বে সম্প্রসারিত হয় নাই।[১] ইয়োরোপের অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রেও স্ত্রীলোকগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে ভোট দিতে পারে, কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি : নারীর ভোটাধিকারের যাঁহারা বিরোধী তাঁহাদের মতে, নারীর স্থান গৃহের মধ্যে—রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তাহাদিগকে টানিয়া আনা অন্যায়। রাজনৈতিক জীবনের কঠোরতার সহিত সন্তান-পালন ও পারিবারিক কর্তব্যের সংগতিবিধান করা যায় না। একবার রাজনীতির মধ্যে নারীকে টানিয়া আনিলে গৃহের শান্তি নষ্ট হইবে, পারিবারিক জীবন ও সমাজের বুনিয়াদ ধ্বংস হইবে এবং নারীর স্বভাবজাত গুণাবলী বিকশিত হইতে পারিবে না। উপরন্তু, সমানাধিকারের জন্য সমকক্ষ হওয়া প্রয়োজন। শারীরিক কারণে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয় বলিয়া তাহারা পুরুষের সহিত সমানাধিকার দাবি করিতে পারে না।

জার্মান দার্শনিক নীটশের মতে, গণতান্ত্রিক সাম্য পুরুষকে ক্ষুদ্র করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই স্ত্রীলোক তাহার সমকক্ষ হইবার দাবি করিতেছে।[২] অতএব, গণতান্ত্রিক ক্ষুদ্রতার পরিবর্তে নায়কতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক মহৎ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই নারীর এই অযৌক্তিক দাবি বিলুপ্ত হইবে।

সপক্ষে যুক্তি : স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের সমর্থকগণ এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলেন যে নীতি ও যুক্তির ভিত্তিতেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়া থাকে, শারীরিক কারণে নহে। শারীরিক কারণে স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে দুর্বল পুরুষদের ক্ষেত্রেও উহা করিতে হয়। সিজউইক বলেন, কেবল নারীত্বের অজুহাতে কোন আত্মনির্ভরশীল স্ত্রীলোককে ভোটাধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না এবং যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র অবিবাহিত ও বিধবা স্ত্রীলোকগণকে সাধারণ শ্রমিক জীবনের অন্নসংস্থান প্রতিযোগিতায় কোনরূপ বিশেষ সুবিধা বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে না পারিতেছে ততদিন পর্যন্ত এইরূপ অস্বীকারের ফলে অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়াই যাইবে। শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে

১. ১৯৭১ সালে জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ক্রমে ক্যাণ্টনগুলিও উহা প্রবর্তন করে।

২. 'Feminism ... is the natural corollary of democracy." "Here is little of men, therefore women try to make themselves manly." *Thus Spake Zarathustra*

স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া এই কারণেই তাহাদের নির্বাচকমণ্ডলীভুক্ত করা উচিত। কারণ, দুর্বলের পক্ষেই অধিকতর সংরক্ষণের প্রয়োজন। নারীস্বার্থ-সম্পর্কিত কোন সমস্যা নির্ধারণের ভার স্ত্রীলোকগণের উপরই থাকা উচিত। ভোটাধিকার অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। ইহা ব্যতীত স্ত্রীলোকদের পক্ষে অন্যান্য সামাজিক অধিকারও উপলব্ধি করা কঠিন। সাম্য বা সমানাধিকারের নীতি যদি স্বীকার করা হয় তবে স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় কিরূপে? উপরন্তু, সামগ্রিকভাবে শারীরিক শক্তিতে নারী পুরুষের সমকক্ষ না হইলেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন শারীরিক শক্তির কার্যে তাহারা পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া নাই। গত মহাসমরে নারী রক্ষিবাহিনী বিভিন্ন স্থানে পুরুষবাহিনীর প্রায় সমান কার্যই করিয়াছিল শিক্ষা প্রভৃতিতেও নারী পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

পরিশেষে বলা যায় যে, নারীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সমাজের অর্ধাংশকে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখা হয়। প্রাচীন ভারতীয় বিখ্যাত কথাসাহিত্য 'কথাসরিৎসাগরে'র নায়িকা রত্নাবতীর (রত্নপ্রভা) অনুসরণে বলা যায়, ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষেরা নিবুদ্ধিতাবশতই এরূপ করিয়া থাকে।

উপসংহার: বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য পর্দা সংস্কার প্রভৃতির দরুন সকল দেশে নারী পুরাপুরি এখনও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইতে পারে নাই। তবে শোভাযাত্রা যে সুরু হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই

নির্বাচন-পদ্ধতি (Modes of Election): গণতন্ত্রের সফলতা শুধু নিবাচকমণ্ডলীর আয়তনের উপর নির্ভর করে না, প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি: প্রতিনিধি নির্বাচন দুইটি পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ সরাসরি প্রতিনিধিবর্গকে নির্বাচিত করে। পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে ভোটদাতৃগণ প্রথমে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন-সংস্থা (electoral college) মনোনয়ন করে এবং পরে এই নির্বাচন-সংস্থার সভ্যগণ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। অনেক সময় অবশ্য প্রতিনিধি মনোনয়নের উদ্দেশ্যেই নির্বাচন-সংস্থা গঠিত হয় না; ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণই পরে নির্বাচন-সংস্থা হিসাবে কার্য করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের বিশেষ উদ্দেশ্যেই নির্বাচন-সংস্থা গঠিত হয়, কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ ও রাজ্যের বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সভ্যগণকে লইয়া এক নির্বাচন-সংস্থার দ্বারা।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (Merits and Defects of Direct Election): প্রত্যক্ষ নিবাচনের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা নাগরিকগণের মধ্যে

রাজনৈতিক চেতনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। নির্বাচন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হইলে প্রতিনিধি ও ভোটদাতৃগণের মধ্যে সম্বন্ধ নিকটতর হইবে। সম্বন্ধের এই নৈকট্যের জন্য নাগরিকগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়, এবং প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিতেও সচেষ্ট হয়। ফলে জনমতের অনুপন্থী আইন প্রণীত হয় এবং অপরপক্ষে জনমতবিরোধী কার্য সহজে সাধিত হইতে পারে না।

(২) এই পদ্ধতি রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। যেহেতু নাগরিকগণকেই চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে হইবে এইজন্য তাহারা বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুশীলন করে। ইহাতে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

(৩) প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দুর্নীতির আশংকাও কম থাকে। প্রার্থী বা দলের পক্ষে নির্বাচন-সংস্থার কতিপয় সদস্যকে প্রভাবান্বিত করা সহজ, কিন্তু বিপুল নির্বাচক-মণ্ডলীকে প্রভাবান্বিত করা সহজ নহে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে নৈতিক পথে সুযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ত্রুটি. (১) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান ত্রুটি হইল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ত্রুটি। বলা হয়, অজ্ঞ জনসাধারণ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে আবেগ বা প্রচার দ্বারা পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা বিশেষভাবে রহিয়াছে। (২) উপরন্তু, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নানারূপ অসাধু ও অশোভন আচরণ করিতে হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচন পরিহার করেন। ইহার অর্থ হইল সমূহ জাতীয় ক্ষতি।

পরোক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (Merits and Defects of Indirect Election): (১) বলা হয়, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও উচ্ছৃংখল জনতার শাসনের (mob rule) ত্রুটিগুলি দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে নির্বাচন-সংস্থার সভ্যগণের হস্তে। সংস্থার সভ্যগণ বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া অজ্ঞ জনসাধারণ অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের মানুষ বলিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন তাঁহারা যেরূপ উপযুক্তভাবে করিতে পারেন সাধারণ নির্বাচকগণ তাহা পারে না। (২) চূড়ান্ত ভোটদাতৃগণ বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হইবার ফলে বিশেষভাবে নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রচারকার্য চালানো অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দলীয় প্রচারকার্য তীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে না। ফলে দলপ্রথার ত্রুটিগুলি কতকাংশে দূর হয়। (৩) আবার দুইবার নির্বাচন সময়সাপেক্ষ। এই সময়ের মধ্যে নির্বাচনজনিত তীব্রতা ও আবেগ দূর হইতে পারে এবং ইহার ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচকগণের পক্ষে ধীরভাবে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অবকাশ থাকে।

ইহাও বলা হয় যে, জনসাধারণের অধিকাংশ অশিক্ষিত হইলে নির্বাচনই সম্যক পদ্ধতি।

ত্রুটি: (১) উপরি-উক্ত গুণ সত্ত্বেও পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অগণতান্ত্রিক বলিয়া বর্তমানে ইহাকে আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয় না। গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন জনসাধারণ ও প্রতিনিধির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপন। কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে ইহা সম্ভব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি গণতন্ত্রকে বিকৃত করে বলা যায়। (২) এই পদ্ধতি রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তারেও সহায়তা করে না। জনসাধারণ ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে নির্বাচন-সংস্থার সভ্যগণের অবস্থানের ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক সমস্যা ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়াও পদ্ধতিটি কাম্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। (৩) উপরন্তু, ইহা দলপ্রথার ত্রুটিগুলি দূর না করিয়া ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। মধ্যবর্তী ভোটারগণ থাকার জন্য উৎকোচ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য নানারূপ গূঢ় অভিসন্ধি ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অধিক সম্ভাবনা থাকে। (৪) আবার দলপ্রথা থাকিলে পরোক্ষ নির্বাচন কার্যক্ষেত্রে একরূপ অপ্রয়োজনীয় বহিরংগ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ প্রাথমিক ভোটারদের নিকট দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংবিধান অনুসারে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে এক নির্বাচন-সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু বর্তমানে কার্যত এই নির্বাচনে যখন কেহ ভোটদান করে তখনই সে জানে যে, মধ্যবর্তী নির্বাচক রাষ্ট্রপতির পদের জন্য তাহার দলীয় প্রার্থীকেই সমর্থন করিবে। (৫) পরিশেষে, যুক্তির দৃষ্টিকোণ হইতেও পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য নহে।

এই ব্যবস্থা এই ধারণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রাথমিক নির্বাচক নির্বাচন-সংস্থার সভ্য নির্বাচন করিবার যোগ্য, কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি নির্বাচক মনোনয়নে যোগ্য সে প্রতিনিধি মনোনয়নে অযোগ্য হইবে কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

ভৌগোলিক এবং কর্মগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial and Functional or Occupational Representation):

বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকই সমান অধিকার ভোগ করে।

ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব: নির্বাচনের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন নির্বাচন-এলাকায় বিভক্ত করিয়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই সকল ভৌগোলিক নির্বাচন-এলাকা হইতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়।

সমর্থন. এইরূপ ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের প্রধান যুক্তি হইল যে নির্বাচন-এলাকায় অন্তর্ভুক্ত সকল লোকের স্বার্থ মূলত একপ্রকার। সুতরাং ভৌগোলিক

ভিত্তিতেই নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় বৃহত্তর সাধারণ স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করিবে।

সমালোচনা : অপরদিকে সমালোচকদের মতে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্র-সম্মত নয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী সকল লোকের স্বার্থ এক নয় এবং বর্তমান দিনে সমাজ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত বলিয়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি এই সকল বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না।

সুতরাং আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকার ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কখনই প্রতিনিধি-মূলক (বা গণতান্ত্রিক) হইতে পারে না।

একজন ডাক্তার অপর আর একজন ডাক্তারের প্রতিনিধি হইতে পারেন, উকিল উকিলের হইতে পারেন, কৃষক কৃষকের হইতে পারে কিন্তু পেশাগত বা স্বার্থগত সম্পর্কবিহীন রাম শ্যামের প্রতিনিধি হইতে পারে না।

পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচনের যুক্তি : সমাজ যখন বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থগোষ্ঠীতে বিভক্ত তখন গণতন্ত্রকে সার্থক রূপ দিতে হইলে আইনসভাকে পেশাগত ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে।

পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচিত ব্যক্তিই প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে ও বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সম্যক সংরক্ষণ করিতে পারেন। ইহাতে আইনসভাও সার্থকভাবে প্রতিনিধিমূলক হইবে, কারণ সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিন্যাস অথবা কর্মগত বা পেশাগত বিভাগ দেখা যায় তাহা আইনসভায় প্রতিফলিত হইবে।

অনেকে আবার বলেন যে আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করিয়া এক কক্ষকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং অপরপ কক্ষকে পেশার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা সমীচীন।

পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থাকে যাঁহারা সমর্থন করেন তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী লেখক ডুগুই (Duguit), অষ্ট্রিয়ান লেখক শ্যাফ্‌ল (Albert Shaffle), ইংরাজ লেখক কোল (G. D. H. Cole) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোল বলেন, জাতীয় জীবনে যতগুলি পৃথক কার্য থাকিবে আইনসভাতেও ততগুলি সংঘের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ডুগুই-এর মতে, সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের (groups) প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমেই সাধারণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে পারে। তাঁহার ভাষায় বলা যায়, শিল্প সম্পত্তি ব্যবসায় কারখানা পেশা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল প্রধান শক্তির প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।[১]

পেশাগত প্রতিনিধিত্বের নীতিকে অনেক লেখকই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

১. "All the great forces of the national life ought to be represented—industry, property, commerce, manufacturing, professions, etc." M. Duguit : *Droit Constitutional*

সমালোচনা : ফরাসী লেখক ইজমি' (Esmein) ইহাকে অলীক ও ভ্রান্ত নীতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে ইহার ফলে সংঘর্ষ, বিশৃংখলা এবং এমনকি অরাজকতার সৃষ্টি হইবে।[১]

(১) পেশাগত প্রতিনিধিত্ব যে সাধারণ স্বার্থের হানি না করিয়া পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। পেশা বা বিভিন্ন সংঘের ভিত্তিতে আইনসভা গড়িয়া উঠিলে উহাতে বিভিন্ন দল নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংঘস্বার্থের প্রতিই লক্ষ্য রাখে, ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বা সমগ্র দেশের কল্যাণ অবশ্যই ব্যাহত হইবে। মানুষের পেশাগত স্বার্থই সব নয়—নাগরিক হিসাবেও সমগ্র সমাজের প্রতি তাহার কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে যদি তাহার পেশা বা সংঘের স্বার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া নাগরিক কর্তব্যকে অবহেলা করে তবে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

(২) ইহা ব্যতীত পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থার ফলে সমাজ কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত লাগিয়াই থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে এবং জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়।

(৩) পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচিত আইনসভাও তাহার কাজ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, ইহা নিছক বিতর্কসভায় (a debating society) পরিণত হয়। উপরন্তু আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে চুক্তি ও বুঝাপড়া চলিতে থাকে।

(৪) যেখানে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা থাকে সেখানে সরকারও অস্থায়ী ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

উপসংহার—ভৌগোলিক নির্বাচন-ব্যবস্থাই কাম্য : উপসংহারে বলা যায় যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আঞ্চলিক নির্বাচন-ব্যবস্থার ত্রুটি থাকিলেও উহা পেশাগত নির্বাচন-ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কারণ, প্রথমোক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থায় সাধারণ স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ইহার ফলে সাধারণ লোকে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট হয়।[২]

ল্যাস্কির মন্তব্য : *এই প্রসংগে ল্যাস্কির মন্তব্য হইল : সমাজজীবনের মতবিরোধের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকা হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া সংগঠিত আইনসভাই প্রকৃষ্টতম পন্থা।*[৩]

১. The principle of representation of interests is 'an illusion and a false principle, which would lead to struggles, confusion and even anarchy."

২. "The very idea of the common welfare irradiates the consciousness of sectional aims." MacIver : *The Modern State*

৩. "The territorial assembly built upon universal suffrage seems ... the best method or making final decisions in the conflict of wills within the community."

অবশ্য আইনসভাকে বিভিন্ন পেশাগত সংঘ ও স্বার্থের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য আইনসভায় বিভিন্ন পেশা বা স্বার্থের প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজন নাই। পরামর্শদান সংস্থার (advisory bodies) মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা বা স্বার্থসমূহের সহিত আইনসভার সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

প্রতিনিধি ও নির্বাচকগণের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Representative and his Constituency):

গণতন্ত্রে প্রতিনিধি ও নির্বাচকগণের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে, তাহা লইয়া বিতর্কের অবসান আজও হয় নাই।

দুই প্রকার অভিমত: (ক) অনেকের মতে, সরকারের পরিবর্তন এবং বিকল্প সরকারের ব্যবস্থা করার সম্ভাবনাকেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া গণ্য করা হইবে। (খ) অনেকের মতে আবার ইহাই পর্যাপ্ত নহে—ইহার উপর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যে প্রতিনিধিগণ সকল সময় নির্বাচকগণের ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিবেন।

রুশোর জনগণের সার্বভৌমিকতা: এই দ্বিতীয়োক্ত অভিমত রুশোর মতবাদে জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় জনগণের পক্ষে 'রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা' (freedom *for* political action)। 'রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ' বলিতে রুশো সময়ান্তরে নির্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া শুধু ভোটপ্রদানের ক্ষমতা বুঝেন নাই, বুঝিয়াছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার ক্ষমতা। এইজন্য তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সময়ান্তরে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা ছাড়া ইংরাজদের আর কোন স্বাধীনতা নাই; মধ্যবর্তী সময়ে তাহারা তাহাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ অধীন থাকে।

বর্তমান দিনে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দাবি: আজিকার দিনের বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে প্রতিনিধিকে নির্বাচকদের ইচ্ছার অনুবর্তী রাখার 'আদর্শ' কার্যক্ষেত্রে যে বিশেষ সার্থক হইতে পারে না, তাহা ইহার সমর্থকগণ স্বীকার করেন।

তবুও এই দিকে যে-কোন ব্যবস্থাকে তাঁহারা প্রগতির লক্ষণ বলিয়াই মনে করেন।

এইজন্য তাঁহারা গণভোট, পদচ্যুতি ইত্যাদি ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান এবং দাবি করেন যে প্রতিনিধিকে নির্বাচকদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে, দলের ও প্রার্থীর কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করিতে হইবে এবং ঐ কার্যক্রম ও প্রতিশ্রুতি হইতে প্রতিনিধি কোনরূপ বিচ্যুত হইলেন কি না—তাহার বিচার নির্বাচকগণ বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত 'পোলে'র (gallup-poll) সাহায্যে নিয়মিত-ভাবে করিয়া যাইবে।

দাবির বিচার: এই সকল ব্যবস্থা যে অধিকতর গণতান্ত্রিক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এগুলি কতদূর 'প্রগতি'র সহিত সংগতিপূর্ণ? রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন স্তর পার হইয়া নাগরিক আজ যে পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে

প্রতিনিধিকে এইভাবে বাঁধিয়া রাখা সুশাসনের অনুপন্থী কি না, তাহা অবশ্যই হইল বিচার্য বিষয়।

বার্ক: বার্ক-ই (Burke) প্রথম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, প্রতিনিধির আচরণকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অযৌক্তিক ও অকাম্য— উভয়ই।

তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে "পার্লামেন্টের একজন নির্বাচিত সদস্য তাঁহার নির্বাচকগণের প্রতিনিধি মাত্র, ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ নন" (...a member of Parliament is a *representative* and not a *delegate*)।

প্রতিনিধি তাঁহার বুদ্ধিবেবেচনা অনুযায়ী 'দেশে'র সেবা করিয়া যাইবেন, দেশেরই স্বার্থসাধন করিবেন—ইহাতে যদি তাঁহার নিজের এলাকার স্বার্থ কিছুটা ব্যাহত হয় ত' হোক।

বার্কের অনুসরণে ইংল্যাণ্ড: পরবর্তীকালে বার্কের অনুসরণে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এইভাবে নির্বাচকগণের নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতাই করিয়া আসিতেছেন। ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের অধীনে জন-নিয়ন্ত্রণের (popular control) আধিক্যের ফলে যে কুফল দেখা দিয়াছিল তাহাতে উক্ত বিরোধিতা আরও শক্তিশালী হয়। ফ্রান্সে নির্বাচকগণের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিনিধিবর্গ প্রয়োজনীয় কর ধার্য করিতেই সমর্থ হন নাই। ফলে, সুশাসনও সম্ভব হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাও অন্তত কিছু পরিমাণে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে বলিয়াই ইংরাজদের ধারণা। অতএব, ইংল্যাণ্ড এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রতি কোনদিনই আকৃষ্ট হয় নাই। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে পরিহার করিয়াই যে গণতন্ত্রও অগ্রগতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব—ইহাই হইল ঐ দেশের সাধারণ ধারণা।

আংশিক প্রয়োগের সমর্থন: তবুও সকল দিক বিচার করিয়া উক্ত জন-নিয়ন্ত্রণের আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করা যায়।

ল্যাস্কির মতে, এই আংশিক প্রয়োগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল 'সীমাবদ্ধ পদচ্যুতি-পদ্ধতি' (system of limited recall)।

প্রতিনিধি তাঁহার নির্বাচকদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূ নন সত্য, কিন্তু গণতন্ত্র বা জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় তাঁহাকে মূলত জনমতের অনুবর্তী হইয়াই চলিতে হইবে। অনেক সময়ই নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধি বা তাঁহার দলকে জনমতের সহিত সম্পূর্ণভাবেই সংগতি হারাইয়া ফেলিতে দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকদের পরবর্তী নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতএব, মাত্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যখন তখন প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থা অকাম্য হইলেও সীমাবদ্ধ পদচ্যুতি-পদ্ধতিতে—যেমন, মোট নির্বাচকের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে তাঁহার অপসারণের ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। সময় অতিক্রান্ত

হইবার পূর্বেই যে পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে এই চেতনাই প্রতিনিধিকে অনেকাংশে সংযত রাখে।

এই উদ্দেশ্যেই পদচ্যুতির ব্যবস্থা সোবিয়েত সংবিধানের অংগীভূত করা হইয়াছে। তবে অনেকে বলেন, বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া সোবিয়েত ইউনিয়নের ঐ ব্যবস্থা তাৎপর্যহীন।

প্রতিনিধিকে একটিমাত্র কেন্দ্রে আবদ্ধ রাখার প্রশ্ন: পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেকের মতে, প্রতিনিধি-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষেত্রকেও সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। অর্থাৎ, নাগরিক যে এলাকায় অধিবাসী মাত্র সেই এলাকা হইতেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। ইহা না হইলে এলাকার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ থাকিবে না এবং তিনি জন-নিয়ন্ত্রণকে এড়াইয়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রার্থী হইবেন।

এই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত।

কিন্তু একাধিক কারণে এই নির্দেশ অকাম্য বিবেচিত হয়। প্রথমত, একটি নির্বাচন-এলাকায় পরাস্ত হইলেই নেতার রাজনৈতিক জীবন শেষ হইয়া যাইতে পারে। গ্ল্যাডস্টোন অক্সফোর্ডে হারিয়া দক্ষিণ ল্যাংকাশায়ারে এবং চার্চিল ম্যাঞ্চেস্টারে হারিয়া ডাণ্ডীতে সরিয়া গিয়াছিলেন। ইহা যদি সম্ভব না হইত তবে ইতিহাসে হয়ত গ্ল্যাডস্টোন ও চার্চিলের সাক্ষাৎই মিলিত না। দ্বিতীয়ত, একই এলাকায় একাধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকিতে পারেন। তাঁহাদের সকলকে যদি ঐ নির্বাচন-এলাকা হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়, তবে একজন ছাড়া বাকী সকলকেই রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে সরিয়া যাইতে হইবে। দেশের স্বার্থের দিক দিয়া ইহা কোনমতেই সমর্থনীয় নহে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সমস্যা ও পদ্ধতি (Problems and Methods of Minority Representation):

এক দিক দিয়া দেখিলে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের সংগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সমর্থন: শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সর্বসাধারণের সরকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে বর্তমান গণতন্ত্রগুলি সকলের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের নহে, উহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার মাত্র।

(১) অনেকের মতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এইভাবে মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠভিত্তিক হইলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না এবং ইহাকে অন্যতম রাজনৈতিক অন্যায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

বস্তুত, সংখ্যালঘিষ্ঠের ব্যবস্থা না থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ জানিবে যে, তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। তাহারা নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সংখ্যার শতকরা ৪৯

ভাগ হইলেও তাহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে ভোটদান অর্থহীন কার্য হইয়া পড়িবে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের এরূপ মনোভাব ও সুশৃংখল রাজনৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক নহে।

(২) বলা হয়, আইন প্রণয়নকারীরা যদি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি হয় তবে এইরূপ আইনকে উহার আকাংক্ষিত রূপে সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যাইবে কিরূপে? আইন মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ হইলে তত্ত্বের দিক দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে এইরূপ আইনকে অস্বীকার করিবার। ফলে অন্তর্বিপ্লবের অভ্যুত্থানও ঘটিতে পারে।

সুতরাং যুক্তি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়া প্রয়োজন হইল সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সুবন্দোবস্ত করিবার।

বিরোধিতা. সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতাও করা হইয়াছে। (১) বলা হয় এরূপ ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অযথা বিভেদের সৃষ্টি করে। দল বা স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে প্রত্যেক নির্বাচক ও প্রতিনিধি দলীয় স্বার্থের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতেই জাতীয় সমস্যার আলোচনা করে। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং ব্যবস্থাপক সভা বিরোধী দলসমূহের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। (২) উপরন্তু, এই ব্যবস্থা জটিল বলিয়াও ইহাকে পরিহার করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

উপসংহার—সমস্যার অনস্বীকার্য গুরুত্ব: সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ যতই মূল্যবান হউক না কেন, এই সমস্যার গুরুত্বকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক ন্যায়ের দিক ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন যে আছে তাহা অনস্বীকার্য।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Methods of Minority Representation):

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, (খ) সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি, (গ) স্তূপীকৃত ভোট-পদ্ধতি, এবং (ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিই প্রধান।

ক। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation): এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক, জাতিগত, ভাষাগত সম্প্রদায়গত প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর প্রত্যেকেরই উহার সমর্থনের সমানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল ও লেকী (Lecky) ছিলেন এইরূপ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সর্বপ্রধান সমর্থক। অবশ্য তাঁহারা উভয়েই 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' বলিতে প্রধানত রাজনৈতিক সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই বুঝিয়াছিলেন।

লেকী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার গুরুত্ব কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। "যখন কোন নির্বাচন-এলাকায় দুই-তৃতীয়াংশ একদলের পক্ষে এবং এক-তৃতীয়াংশ অপর দলের পক্ষে ভোটদান করে তখন ন্যায্যত সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ আসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসন অধিকার করা উচিত।" মিল স্বীকার করিয়াছিলেন, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের দলই শাসনকার্য পরিচালনা করিবে—কিন্তু ইহার উপর জোর দিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছিলেন · "যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহ তাহাদের সংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে না পারে তবে সরকার সাম্যাভিত্তিক না হইয়া অসাম্য ও বিশেষ সুযোগসুবিধারই দ্যোতক হইয়া দাঁড়ায়।"

দুইটি পদ্ধতি : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রধান পদ্ধতি দুইটি : (ক) হেয়ারের পদ্ধতি (The Hare System) এবং (খ) তালিকা পদ্ধতি (The List System)। হেয়ারের পদ্ধতিকে একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional representation by means of the single transferable vote) বলা হয়। পদ্ধতিটি ১৮৫১ সালে ইংরাজ লেখক টমাস হেয়ার-লিখিত 'প্রতিনিধি নির্বাচন' (*Election of Representatives*) নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রচার করা হয় বলিয়া ইহা হেয়ারের নামের সহিতই বিশেষভাবে জড়িত।

(ক) হেয়ারের পদ্ধতি : হেয়ারের পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক এলাকা হইতে দুই-এর অধিক প্রতিনিধিকে নির্বাচন কবিতে হইবে। আসনের সংখ্যা অনুসারে নির্বাচক প্রার্থিগণের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তাহার মনোনয়ন বা পছন্দ (preferred) প্রকাশ করিতে পারে। তবে ১ সংখ্যা দ্বারা প্রথম পছন্দের ভোট তাহাকে দিতেই হইবে।

কোটা ও ড্রুপ কোটা : এই ব্যবস্থায় সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট বা কোটা (Quota) নির্ধারণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে যত ভোটদান করা হইয়াছে সেই সংখ্যাকে যত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে কোটা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এই প্রতিনিধিসংখ্যার সহিত এক যোগ করিয়া যে সংখ্যা হয় তাহার দ্বারা বৈধ মোট প্রদত্ত ভোটসংখ্যাকে ভাগ করিয়া এই কোটা নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতির এই কোটাকে 'ড্রুপ কোটা' (The Droop Quota) বলে।

প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়া কোটা সংগ্রহ করিতে পারেন তাঁহারা সরাসরি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হন। নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে কোটায় অতিরিক্ত প্রথম মনোনয়ন থাকিলে তাহা যে যে

প্রার্থী দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছেন তাঁহাদের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে কোটা পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় পছন্দের পর প্রয়োজন হইলে তৃতীয় পছন্দও গণনা করা হয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন পূর্ণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গণনাকার্য চলিতে থাকে।

(খ) তালিকা পদ্ধতি: হেয়ারের পদ্ধতিতে উপরি-উক্ত সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ইংরাজরা পছন্দ করিলেও ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক দেশ তালিকা পদ্ধতিরই (The List System) পক্ষপাতী। তালিকা পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে তাহার প্রার্থীদের একটি করিয়া তালিকা প্রদান করে। নির্বাচক তাহার পছন্দ অনুসারে যে কোন একটি তালিকাকে ভোটদান করে। অবশ্য সে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তাহার পছন্দ জানাইতে পারে। ভোটদান সমাপ্ত হইলে দলগুলি তাহাদের তালিকাতে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত হিসাবে আসন সংগ্রহ করে।

কোথায় প্রবর্তিত: সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বর্তমানে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বেলজিয়াম হল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং মধ্য-ইয়োরোপের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রবর্তিত আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের পদ্ধতিকেও 'একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার কয়েকটি নগরীর পৌরসভার নির্বাচনেও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণাগুণ (Merits and Defects of Proportional Representation): সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণাবলী একরূপ স্বতঃপ্রকাশিত।

গুণ: (১) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাহার শক্তি অনুসারে প্রতিনিধিত্ব পায়। ফলে ব্যবস্থাপক সভা জাতির প্রকৃত প্রতিফলন হইয়া দাঁড়ায় এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে। (২) আরও বলা হয়, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকে রূপদান করিতে পারে না। (৩) হেয়ারের পদ্ধতিতে প্রত্যেক নির্বাচক তাহার পছন্দ জ্ঞাপন করিতে পারে। পছন্দ জ্ঞাপন করিতে হয় বলিয়া সে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করে এবং ইহার ফলে তাহার রাজনৈতিক ও পৌর চেতনা জাগ্রত হয়।

ত্রুটি: বর্তমানে কিন্তু সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। (১) ল্যাস্কির মতে, প্রতিনিধিত্ব প্রথার সংস্কারসাধন দ্বারা সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সাধারণ নাগরিকের আর্থিক, নৈতিক, মানসিক অবস্থার উন্নয়ন।[১] (২) কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সমানুপাতিক

১. The difficulties of the modern state ... should be met more "by the elevation of the popular standard of intelligence and the reform of the economic system, than by making men choose in proportion with neatly graded volume of opinion."

প্রতিনিধিত্ব রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই ঘটাইয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্তিত থাকায় লোকে জাতির পরিবর্তে দল বা গোষ্ঠীর কথাই চিন্তা করে। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়, জাতীয় স্বার্থ পদে পদে ব্যাহত হয় এবং সুচিন্তিত জনমতের কল্পনাই করা যায় না। (৩) উপরন্তু, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে যে সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই তাহাদের সংখ্যা অনুযায়ী সমান প্রতিনিধিত্ব পাইবে এমন কোন কথা নাই। দেখা গিয়াছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুচিন্তিত পদ্ধতিতে কাজ করিলে নির্বাচন-এলাকায় সকল বা অধিকাংশ আসনই সংগ্রহ করিতে পারে। তালিকা পদ্ধতিতে নির্বাচকের পছন্দ যে তালিকাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় তাহাও আদর্শের দিক দিয়া কাম্য নহে। তালিকায় অনেক অযোগ্য প্রার্থী থাকিতে পারেন। অপরদিকে হেয়ারের পদ্ধতি জটিল পদ্ধতি—সাধারণ নির্বাচকগণের বোধগম্যের বাহিরে। এই সকল কারণে অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করিয়াছেন।

উপসংহার—বিরোধিতার সংক্ষিপ্তসার : বিরোধিতা করিতে গিয়া ফাইনার (Dr. Herman Finer) বলিয়াছেন, "সংখ্যালঘিষ্ঠের দিক্-চক্রবাল নির্বাচন-এলাকার মধ্যে কোনমতেই সীমাবদ্ধ নহে" (The horizon of a minority is not limited by the boundaries of a constituency)। ফরাসী লেখক ইজমিঁ (Prof Esmein) বলেন, "সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিলে দ্বিপরিষদত্ব দ্বারা যে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাকে প্রকৃত হলাহলে পরিণত করা যায় : ইহাতে বিশৃংখলার সৃষ্টি করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভার শক্তি হরণ করা হয় ; ইহাতে মন্ত্রি-পরিষদের একদলীয় রূপ নষ্ট করিয়া উহাকে অস্থায়ী করিয়া তোলা হয় এবং ফলে পার্লামেন্টীয় সরকারও অসম্ভব হইয়া পড়ে।"

খ। সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি (Limited Vote Plan) : এই পদ্ধতিতেও প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্র বহু আসনসমন্বিত করা হয়। নির্বাচনে যতগুলি আসন থাকে নির্বাচক তাহা অপেক্ষা একটি কম ভোটদান করিতে পারে। ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে অন্তত একটি করিয়া আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ধরা যাক, কোন নির্বাচন কেন্দ্রে পাঁচটি আসন আছে। সেখানে নির্বাচক চারিটি করিয়া ভোট দিতে পারে এবং ইহাতে একটি আসন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অধিকারে আসিবে।

অবশ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যায় বহু হইলে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যায় বিশেষ অধিক হইলে সীমাবদ্ধ ভোট-পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে না। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুচিন্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সকল আসনই সংগ্রহ করিতে পারে।

গ। স্তূপীকৃত ভোটদান-পদ্ধতি (Cumulative Vote Plan) : এই পদ্ধতিতে নির্বাচন-এলাকায় যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক নির্বাচকের ততগুলি করিয়াই ভোট থাকে। নির্বাচক ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারে বা

একজন প্রার্থীকেই স্তূপীকৃতভাবে ভোটগুলি দান করিতে পারে। এইভাবে স্তূপীকৃত ভোটদানের ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কিছু আসন গ্রহণ করিতে পারে। সমস্ত ভোট যদি একটিমাত্র প্রার্থীকেই দেওয়া হয় তবে তাহাকে plumping বলে।

ঘ। দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (The Second Ballot System): এই পদ্ধতিতে নির্বাচনে দুইজনের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে কেহ যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করিতে না পারেন তবে দ্বিতীয়বার ব্যালট গ্রহণের সাহায্যে অধস্তন স্থানাধিকারী ছাড়া অপর সকলের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ধরা যাক, কোন একটি আসনসমন্বিত কেন্দ্রে তিনজন প্রার্থী আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম জন ৪০০০, দ্বিতীয় জন ৩০০০ এবং তৃতীয় জন ২০০০ ভোট পাইয়াছেন। প্রথম জন অধিক সংখ্যক ভোটলাভ করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রার্থীর মিলিত ভোট ইহার অপেক্ষা অধিক—আবার প্রথম প্রার্থী অপর দুইজন প্রার্থীর তুলনায় অধিকসংখ্যক ভোট পাইলেও মোট ভোটদাতার অধিক সংখ্যকের সমর্থন পান নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভোটগ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়বার ভোটগ্রহণ কালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিম্নসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হইবে। ফলে বর্তমান উদাহরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীর মধ্যে। এই দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া দ্বিতীয় প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারেন। অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে, তিন বা ততোধিক প্রার্থী থাকিলে দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিতে সমস্ত নির্বাচকের মত অধিকতর সঠিকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে।

উপসংহার : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া অন্য সকল পদ্ধতি সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে না; সাধারণভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে মাত্র। এইজন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের মনোভাব যেখানে প্রবল সেখানে এই সকল পদ্ধতি গ্রহণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় নাই। বরং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উপর আসন-সংরক্ষণ, পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ইহার অন্যতম উদাহরণ।

প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব (Theories of Representation):

আধুনিক গণতন্ত্র বিশেষভাবে প্রতিনিধিমূলক (Represenative Democracy)।

প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সীমিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আবার জনগণের রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ও উদ্যোগ বৃদ্ধির দরুন পরোক্ষ তথা প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অধিক মাত্রায় কার্যকর করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইতেছে। ফাইনার যথার্থই বলিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও আনুষ্ঠানিক মাধ্যম হইল প্রতিনিধিত্ব—সরকারী কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল এই

ব্যবস্থা।[১] আধুনিক আচরণবিদ্‌গণ (behaviourists) মনে করেন, 'যোগাযোগ' (communication) হইল আধুনিক রাজনীতির মূলকথা।[২] জনসাধারণের আচার-আচরণ, রাজনৈতিক মনোভাব, সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতি ইহার প্রতিক্রিয়া, সরকারী সিদ্ধান্তের উপর জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও চিন্তাধারার প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি হইল প্রতিনিধিত্ব। যোগাযোগই জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে।

প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমেই সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (political participation) প্রশ্নটির গুরুত্ব প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটির সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

গণতন্ত্রীকরণ ও প্রতিনিধিত্ব: রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের (Democratisation) গুরুত্ব নির্ভর করে এই ব্যবস্থা কতটা প্রতিনিধিমূলক (Representative) তাহার উপর। জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা ও চিন্তাভাবনাকে কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব তাহার উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভরশীল। আধুনিক কালে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। জনসাধারণ ও প্রতিনিধির মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া তোলাই আধুনিক কালে প্রতিনিধিত্বের প্রধান কথা। প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি, সরকারের প্রতি জনগণের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুবিধা সৃষ্টি করার মধ্যেই গণতন্ত্রীকরণের সার্থকতা। প্রতিনিধিত্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই গণতন্ত্রীকরণে বিশেষ সাহায্য করে।

প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ. প্রতিনিধিত্ব বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি ধারণা করা হয় ইহা লইয়া রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের অবসান এখনও ঘটে নাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভাকে জনসাধারণের প্রতিনিধিকক্ষ বলা হয় এবং ইহার মাধ্যমেই জনসাধারণের ইচ্ছা ও আশা-আকাংক্ষাকে রূপ দেওয়া হয়। নায়কতন্ত্রে 'নায়ক' (Dictator) নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করেন। প্রাচীনকালে রাজা নিজেকে একাধারে ঈশ্বর এবং প্রজার প্রতিনিধিরূপে প্রচার করিতেন। গোষ্ঠী-শাসিত সমাজে বলশালী গোষ্ঠীর দলপতি নিজেকে শাসন-কর্তৃপক্ষ তথা জনপ্রতিনিধি হিসাবে প্রচার করিত। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আইনসভাকে জনসাধারণের 'প্রতিনিধিসভা' (Representative Assembly) বলিয়া আখ্যা দিতে রাজী নন। ইহাদের মতে, রাষ্ট্র হইল শ্রেণীশাসনের

---

১. "The principal formal mode of securing popular participation in, or at least, control of the activities of the government is by the institution of representation." S. E. Finer

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'যোগাযোগ তত্ত্ব'টি বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে Karl Deutsch-এর '*The Nerves of the Government*' পুস্তকে। জনসাধারণের আচার-আচরণ অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

যন্ত্র। আইনসভা প্রকৃতপক্ষে বিত্তশালী ও আর্থিক দিক দিয়া প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। উদার-গণতান্ত্রিক (Liberal Democratic) ব্যবস্থার সমর্থকগণ অবশ্য একথা মনে করেন না যে, আইনসভা সামগ্রিকভাবে সমস্ত শ্রেণী পেশা বা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রতিনিধিত্বের অর্থ: প্রতিনিধিত্বের সাধারণ অর্থ হইল, নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের দায়িত্বশীলতা—অর্থাৎ জনসাধারণ ও প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সুস্থ ও সহজ সম্পর্ক যে-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত তাহাই প্রতিনিধিত্ব। প্রতিনিধি জনসাধারণের এবং শাসন-কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। জনসাধারণের আনুগত্য তাহার মূলধন, সরকারী সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব খাটানোর উপর তাহার ভূমিকার সাফল্য নির্ভরশীল।[১]

প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Representation): আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বকে দুইটি বিশেষ দৃষ্টিভংগির দিক হইতে বিচার করেন: (ক) উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং (খ) সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভংগি তত্ত্ব।

ক। প্রতিনিধিত্বের উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব (Liberal-Democratic Theory of Representation): প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকদের আলোচনা হইতে সুরু করিয়া আধুনিককালে ব্রিটেন আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে একই ধরনের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আলোচনায় উদারনীতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে বিচার করা হইয়াছে। আদর্শবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, হিতবাদ (Utilitarianism) ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার (Liberalism) আলোকে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিকে ইহারা কতকগুলি মৌল নীতির মানদণ্ডে বিচার করেন।

অ্যালান বল: অ্যালান বল তাঁহার '*Modern Politics and Government*' পুস্তকে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব যে-সকল মৌল নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) প্রতিনিধিত্বের উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ব্যক্তির অধিকারের প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করে।[২]

মানুষ প্রকৃতিতে স্বাধীন—স্বাভাবিক অধিকারের (natural rights) এই ধারণা প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত ও পৌর অধিকার (জীবন ও সম্পত্তির অধিকার) অবাধ এবং অলংঘনীয়—এই মতকে উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব সমর্থন করে। মানব-অধিকার সম্পর্কে জন লকের তত্ত্ব প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে উদার-

১. A. H. Birch: *Representative and Responsible Government*

২. ... "there is the emphasis on the importance of individual rights ..." Alan R. Ball

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতিফলন। এই তত্ত্ব মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, ভোটাধিকার প্রভৃতি নীতির দ্বারা প্রভাবিত। ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় (American Declaration on Independence) এই সকল অধিকারের কথা বলা হইয়াছে।

উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ঘোষণা করে যে নির্বাচিত প্রতিনিধি (Representative) বিশেষ কোন সামাজিক শ্রেণী বা স্বার্থ বা পেশার প্রতিনিধিত্ব করিবেন না, নির্বাচন-কেন্দ্রের জনসাধারণের স্বার্থ ও মতামতেরই প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

(২) উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মানুষের যুক্তি ও বিবেচনার উপর আস্থা প্রদর্শন করে।[১] এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে মানুষের দাবি ও স্বার্থের বিষয়টি সুবিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও বিবেচনার সাহায্যে নিবাচকমণ্ডলী (the electorate) সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি করিতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রশ্নে সর্বজনীন অধিকারের গুরুত্বকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি সংখ্যা অপেক্ষা যুক্তি ও বিবেচনার ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করার সপক্ষে অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

(৩) উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌমিকতার (People's Sovereignty) উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রসার সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রকাশ্যে বিশেষ সাহায্য করে। গ্রেট ব্রিটেনে সংস্কারমূলক আইনের প্রসার, লর্ড সভার ক্ষমতা সংকোচন, সুইজারল্যাণ্ডে নারী-সমাজের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি জন সার্বভৌমিকতার বিকাশে অভূতপূর্ব সাহায্য করিয়াছে।

আরও কতকগুলি বিষয় : উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনা করিয়াছে : (ক) আইনসভা হইল জনসাধারণের প্রতিনিধিসভা। ইহার প্রয়োজন হইল শাসন-বিভাগের স্বৈরাচার ও নাগরিক অধিকারের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ দমনের জন্য। বস্তুত, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। আইনসভার এই ভূমিকা উহার গঠন-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের সঠিক সমন্বয় না ঘটিলে আইনসভা তাহার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব, একাধিক ভোটাধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারে। ভোটাধিকারের প্রসার ঘটাইলেও স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখিবার প্রয়োজনে ইহার উপর সর্ত আরোপ করার কথাও কেহ কেহ বলেন। অনেকেই সীমিত ভোটাধিকারের পক্ষে। অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোকের ভোটাধিকার গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে বলিয়াই তাহাদের ধারণা। জন স্টুয়ার্ট মিল ভোটাধিকার প্রসারের এই কুফলকে পরিস্ফুটিত করিয়াছেন।

১. There is in liberal democratic theories of representation a rationalist strand." Alan R. Ball

(খ) উদার-গণতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল থাকিলেও তাঁহারা নির্বাচকমণ্ডলীর মুখপাত্র (spokesman) নন। তাহাদের নিজেদের মতামতকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত বিবেচনা ও নির্বাচকমণ্ডলীর বিবেচনার মধ্যে সুস্থ সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

(গ) রবার্ট ডাল জনপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ম্যাডিসনীয় (Madisonian) ও (Populistic) গণতন্ত্রের ধারণা প্রচার করিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয়, নাগরিকগণের রাজনৈতিক সমতার কথা বলা হয়। পারস্পরিক চুক্তি ও আপস এক্ষেত্রে গণ-সার্বভৌমিকতার অঙ্গীকার। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সাম্য এবং গণ-সার্বভৌমিকতা অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১]

উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্বের অন্যান্য দিক : ভাববাদী দার্শনিকগণ (Idealist Philosophers) প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থে উপনীত হওয়ার কথা বলেন। হিতবাদী দার্শনিকগণ (Utilitarian Philiosophers) প্রতিনিধিকে নির্বাচকমণ্ডলীর সামাজিক দর্পণ হিসাবে গণ্য করেন। নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধির কাছে কি আশা করে, প্রতিনিধির কর্তব্য কি—এই সকল বিষয় সম্পর্কেও উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখা হয়। (হিতবাদী দার্শনিক) বেন্থাম মনে করেন, নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধির কাছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চায়—এই নিরাপত্তা শুধুমাত্র বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও বটে। কেহ কেহ বলেন, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়াই প্রতিনিধির একমাত্র লক্ষ্য নহে, শৃংখলা বজায় রাখা ও পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া জনকল্যাণের দায়িত্ব পালন করাও প্রতিনিধির লক্ষ্য হওয়া উচিত। অবশ্য প্রতিনিধির সঠিক লক্ষ্য কি হইবে এ-প্রসংগে উদার-গণতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌গণ একমত নহেন।

গণতন্ত্রের প্রতিফলনের প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতিনিধিত্বের নীতিকে সঠিকভাবে পালন করা হয় না। অনেক প্রতিনিধিই জনমত অপেক্ষা 'ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত স্বৈরাচারিতার' পথ ধরিয়া নিজস্ব নীতি ও চিন্তা-ধারাকে কার্যকর করার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। আবার অনেক প্রতিনিধি আমলাতান্ত্রিক তথা স্থায়ী কর্মচারীদের মনোভাব ও নীতি দ্বারাও পরিচালিত হন। এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের নীতি কতটা গণতান্ত্রিক তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নহে।

সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভংগিতে প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব (Collectivist Theories of Representation) : সমষ্টিবাদী প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব মুখ্যত প্রচার করেন ইয়োরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ। উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপই এই সমষ্টিবাদী তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

---

১. Dahl's "definition of populistic democracy is that it postulates only two goals to be maximised—political equality and popular sovereignty." Alan R. Ball

উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা: সমাজতন্ত্রবিদ্‌গণ মনে করেন, প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আদর্শবাদ ও হিতবাদী দর্শন দ্বারা পরিচালিত। শ্রেণী-অধ্যুষিত সমাজে প্রতিনিধি যে বিত্তশালী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন—এই ধারণা উদার-গণতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌গণের মধ্যে অনুপস্থিত।

সমাজতন্ত্রিগণের মতে, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌমিকতা বা অধিকার রক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও প্রতিনিধিত্ব প্রকৃতপক্ষে বিশেষ শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব হইয়া দাঁড়ায়।

মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণের মতে, রাষ্ট্র শ্রেণীশাসনের ও শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণকার্য এক বিশেষ পর্যায়ে উপস্থিত হয়। উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ব্যক্তিগত অধিকার, সম্পত্তির অধিকার বা সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিত্তশালী শ্রেণীর অধিকার রক্ষারই প্রতিশ্রুতি। এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব করেন সমাজের এক বিশেষ স্তরের বা শ্রেণীর প্রতিনিধি। ইঁহারা সংখ্যাগুরু অপেক্ষা বিশেষ সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করেন।

সমষ্টিবাদী তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ: সমষ্টিবাদী প্রতিনিধিত্বের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিভাত: (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব যাহার ভিত্তি হইল জনগণের সার্বভৌমিকতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা। (২) প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমতার বিষয়টি বিচার্য নহে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের দৃষ্টিকোণও প্রতিফলিত। (৩) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, সমাজতন্ত্রিগণ কিন্তু মনে করেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট দলই জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক সংগঠন। এই দলই সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী তথা সর্বহারার আন্দোলন ও স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট। প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ইঁহারা কমিউনিস্ট দলের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (৪) সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণের মতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিভিন্ন গণ-সংগঠনের (শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি) গুরুত্ব বড় কম নয়। (৫) পেশাগত প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও সমষ্টিবাদী তত্ত্বে গুরুত্ব লাভ করে।

নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন: এল. জি. চার্চওয়ার্ড (L. G. Churchward) সমষ্টিবাদী প্রতিনিধিত্বের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন:

(১) সমষ্টিবাদী তত্ত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বা নাগরিক অধিকারের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিলেও সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। (২) সমষ্টিবাদী প্রতিনিধিত্বের সমর্থকগণ 'ক্ষমতাবণ্টন', 'ক্ষমতা-বিভাজন', 'মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা' প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেন না। (৩) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র অপেক্ষা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপরে এই তত্ত্ব অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

ব্যক্তিদের নির্বাচন, দায়িত্বশীলতা, অপসারণ প্রভৃতি নীতিতে বিশ্বাসী এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপরই অধিক আস্থাশীল।

এল. জি. চার্চওয়ার্ডের উপরি-উক্ত ধারণাগুলি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে জাতিগত, ভাষাগত প্রশ্নে সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ আছে। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ্‌গণ প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে প্রচলিত নীতিগুলি (ক্ষমতাবণ্টন ইত্যাদি) অপেক্ষা সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকেই গুরুত্ব দেন। সমাজতান্ত্রিক আইন, সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল জনগণ, গণ-সংগঠন ও রাজনৈতিক দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে ইহারা অধিক গুরুত্ব দেন। প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে ইহারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার কতকগুলি পদ্ধতি (Some Instruments of Control over Representatives):

ইতিপূর্বেই প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিছুটা ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির কিছুটা বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলিতে এমন সকল ব্যবস্থাকে বুঝায় যাহাদের দ্বারা প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ: এই সকল ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষও (Relics of Direct Democracy) বলে।

এইরূপ ব্যবস্থা প্রধানত চারিটি: গণভোট (Referendum), গণ-অভিমত (Plebiscite), গণ-উদ্যোগ (Initiative) ও পদচ্যুতি (Recall)। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলি, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি স্থানে এই পদ্ধতিগুলির অল্পবিস্তর প্রয়োগ দেখা যায়।

ক। গণভোট (Referendum): গণভোট হইল এমন এক পদ্ধতি যাহার দ্বারা নির্বাচকগণ আইনসভাসমূহের কার্যাকার্যের বিচারবিবেচনা করিতে পারে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ নির্দেশ থাকিতে পারে যে, সকল আইনের খসড়া জনসমীপে—অর্থাৎ নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে এবং নির্বাচকদের দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হইবে। সংবিধানে এইরূপ নির্দেশ থাকিলে ইহাকে বাধ্যতামূলক গণভোট (Obligatory Referendum) বলা হয়। গণভোট বাধ্যতামূলক নাও হইতে পারে। প্রত্যেক খসড়াকে গণভোট দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হইবে—এই ব্যবস্থার পরিবর্তে সংবিধানে নির্দেশ থাকিতে পারে যে, কিছুসংখ্যক ভোটদাতা আবেদন করিলেই আইনের খসড়াটি নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ গণভোটকে ইচ্ছাধীন গণভোট (Facultative or Optional Referendum) বলা হয়। আবার এরূপ ব্যবস্থাও থাকিতে পারে যে,

কোন কোন বিষয় জনসমীপে উপস্থাপিত করিতে হইবেই এবং বাকী বিষয়গুলি নির্বাচকগণের এক নির্দিষ্ট অংশ দাবি করিলে তবে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

খ। গণ-অভিমত (Plebiscite): কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য যে ভোটগ্রহণ করা হয় তাহাকেই গণ-অভিমত বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। প্রধানত কোন স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মোটামুটিভাবে এরূপ ভোটগ্রহণ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।[১]

ইহার তত্ত্বগত ভিত্তি হইল জনগণের সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty)। অর্থাৎ, কোন স্থায়ী ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন অথবা সার্বভৌম শক্তির পরিবর্তন করিতে হইলে সরাসরি জনগণের সাহিত পরামর্শ করিতে হইবে।[২]

প্রযোজ্যতা: কিন্তু এরূপ ভোটগ্রহণ গণতন্ত্রসম্মত মনে হইলেও ইহার অন্যতম ত্রুটি হইল যে ইহা একবার গ্রহণ করা হইলে ইহার কুফলের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানমূলক উপায় অবলম্বন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অনেক সময় ক্ষমতালিপ্সু নায়ক (Dictator) এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁহার অবৈধ শাসনকে বৈধ শাসনে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের (national self-determination) নীতিতে কার্যকর করার উপায় হিসাবে এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

গ। গণ-উদ্যোগ (Initiative): গণ-উদ্যোগ বলিতে বুঝায় নির্বাচকগণের উদ্যোগে আইন প্রণয়ন করা। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক কোন আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দান করিতে পারে অথবা আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আইনসভার নিকট প্রেরণ করিতে পারে অথবা শুধু অনুরোধ করিতে পারে। এইরূপ নির্দেশ, খসড়া বা অনুরোধ প্রাপ্তির পর আইনসভা ইহাকে সাধারণত জনসমীপে উপস্থিত করিয়া গণভোট গ্রহণ করে।

ঘ। পদচ্যুতি (Recall): পদচ্যুতি পদ্ধতির প্রয়োগে প্রতিনিধিকে জনমতের চাপে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই পদত্যাগ করিতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচকের পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবি করিয়া এই দাবি সকল নির্বাচকের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকগণ ইহা সমর্থন করিলে প্রতিনিধির পক্ষে সরাসরি পদত্যাগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ: প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহের সপক্ষে যুক্তি হইল প্রধানত দুইটি: (১) বর্তমানে একমাত্র ইহাদের মাধ্যমেই

---

১. "The term plebiscite means literally decree of the people. The plebiscite is a decree to obtain a direct popular vote on a matter of political importance, but chiefly in order to create some more or less permanent political condition." Dr. Strong

২. "A plebiscite is literally a popular referendum on any question; but the term is gradually acquiring the more precise connotation of a referendum concerning *changes of sovereignty*." Sarah Wambaugh

জনগণের শাসন জনগণের দ্বারা শাসন হইয়া উঠিতে পারে। (২) বিশেষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, গণভোট দ্বারা আইনসভার অসাধুতা দূর করা হয়, প্রতিনিধি ও নির্বাচকগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বজায় রাখা হয় এবং জনমত-বিরোধী আইন প্রণয়নের আশংকার অবসান করা হয়। এই গুণগুলির সন্ধান গণ-উদ্যোগ ও পদচ্যুতিতে মিলে। উপরন্তু, গণ-উদ্যোগ হইল জনপ্রিয় প্রস্তাবকে আইনে রূপান্তরিত করিবার প্রত্যক্ষ পন্থা।

বিপক্ষে যুক্তি· বিপক্ষে বলিবার বিষয় হইল যে, (১) এই সকল পদ্ধতি মন্থরগতি গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রকে আরও মন্থরগতি করিয়া তুলে। প্রত্যেক বিষয়ই যদি গণভোট দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, আইনের উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য আর বর্তমান নাই। (২) উপরন্তু, বর্তমানের বিশাল রাষ্ট্রসমূহে ধারণা ও মতের এরূপ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যে, সকল ক্ষেত্রে নির্বাচক-গণের মত গ্রহণ করিয়া কার্য করিলে বহু পরস্পরবিরোধী আইনের সৃষ্টি হইবে এবং ইহার ফলে প্রকৃত প্রগতিশীল আইনের কার্যকারিতা নষ্ট হইবে। (৩) ইহাও অনস্বীকার্য যে বর্তমানে রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ বিশেষভাবে জটিল এবং শাসনকার্য পরিচালনা বর্তমানে বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞের কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় 'জনগণ' দ্বারা আইন প্রণয়ন, সরকারী কার্যনীতির বিচার প্রভৃতির ফল কার্যক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে না। (৪) পরিশেষে, এই সকল পদ্ধতির ফলে অনেক সময় সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী 'নেতৃবর্গ' দায়িত্বহীন জনসাধারণকে নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে পরিচালিত করে—ইহাও দেখা যায়। ফলে বৃহত্তর স্বার্থ ব্যাহত হয়।

উপসংহার—বর্তমান যুগে অনুপযোগী: গুণাগুণ বিচারের ত্রুটির সংখ্যা ও গুরুত্ব অধিক হওয়ায় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আর বিশেষ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সপক্ষে প্রচার করিয়া বেড়ান না, বরং বিপরীত কার্যই করেন।

ল্যাস্কির ভাষায়, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা শাসন এত স্থূল বিষয় যে ইহা সূক্ষ্ম শাসন-পদ্ধতিতে—যাহা বর্তমানে একরূপ চারুকলায় পরিণত হইয়াছে—স্থান পাইতে পারে না।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর :

১. নির্বাচকমণ্ডলীর সমস্যা চার প্রকারের : (ক) নির্বাচকমণ্ডলী সংক্রান্ত সমস্যা, (খ) শাসন-কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যা, (গ) দলমত সম্পর্কিত সমস্যা এবং (ঘ) রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত সমস্যা।

২. ভোটাধিকারের ভিত্তি লইয়া বাদানুবাদ বলিতে বুঝায় সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার লইয়া মতবিরোধ।

৩. ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত (ক) নাগরিকতা ও (খ) বয়স।

৪. স্ত্রীলোকদের সমান ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

৫. নির্বাচন-পদ্ধতি বলিতে বুঝায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য।

৬. ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বই গ্রহণীয়।

৭. নির্বাচক ও প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া উচিত—প্রতিনিধিত্বের প্রতিভূর নয়।

৮. অন্তত রাজনৈতিক ন্যায়ের দিক দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সমর্থনীয়।

৯. সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন ব্যবস্থা হইল (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, (খ) সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি, (গ) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি এবং (ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি।

১০. প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব বলিতে বুঝায় প্রতিনিধির ভূমিকা সম্বন্ধে তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দুই প্রকারের (ক) উদার-গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং (খ) সমষ্টিবাদী তত্ত্ব।

১১. প্রতিনিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পদ্ধতি হইল (ক) গণভোট, (খ) গণ-অভিমত, (গ) গণ-উদ্যোগ ও (ঘ) পদচ্যুতি।

অনুশীলনী

1. Discuss, in brief, the arguments for and against universal adult suffrage.

[সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।] (৫৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the relative merits and demerits of territorial representation and functional representation in the modern state.

[আধুনিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব ও কর্মগত প্রতিনিধিত্বের পারস্পরিক গুণাগুণ আলোচনা কর।] (৫৫৬-৫৯ পৃষ্ঠা)

3. What are the different methods by which electorates exercise control over their representatives in modern democracies ?

[আধুনিক গণতন্ত্রে কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচকগণ তাহাদের প্রতিনিধিদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারে ?] (৫৫৯-৬১, ৫৭২-৭৪ পৃষ্ঠা)

4. What, according to you, should be the relationship between the representative and voters in his constituency ? State your reasons fully.

[তোমার ধারণায় নির্বাচনপ্রার্থীর সহিত নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাদের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত ? তোমার যুক্তিগুলি বিস্তারিতভাবে দাও।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তর)

5. Briefly describe the various methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislature.

[আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য যে-সকল পদ্ধতির কথা বলা হইয়া থাকে উহাদের বর্ণনা দাও।] (৫৬২-৬৬ পৃষ্ঠা)

6. Analyse the principles of proportional representation and discuss its advantages and disadvantages.

[সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি বিশ্লেষণ কর এবং ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।] (৫৬২-৬৫ পৃষ্ঠা)

7. Explain the underlying theory of proportional representation.

[সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর।] (৫৬২-৬৪ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the case for minority representations and write an analytical note on the different methods of minority representation in modern democracies.

[সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য আধুনিক গণতন্ত্রসমূহে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহাদের উপর একটি বিশ্লেষণমূলক টীকা লিখ।]

(৫৩১-৬৪, ৫৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)

9. Analyse different theories regarding the nature of representation.

[প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।] (৫৬৮-৭২ পৃষ্ঠা)

10. Discuss in brief some of the instruments of control over representatives.

[প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার কয়েকটি পদ্ধতির সংক্ষেপে আলোচনা কর।] (৫৭২-৭৪ পৃষ্ঠা)

২৮ | জনমত
(PUBLIC OPINION)

> *"Opinion has really been the chief and ultimate power in nearly all nations at nearly all times .... I mean the opinion, unspoken, unconscious, but not less real and potent, of the masses of the people."* James Bryce

অধ্যায়ের জিজ্ঞাসা

১. গণতন্ত্রে জনমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় কেন ?

২. জনমত কাহাকে বলে ?

৩. কাম্য জনমত কিভাবে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে ?

৪. জনমত গঠনের উৎস ও মাধ্যম কি কি ?

৫ (ক) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, (খ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং (গ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা কি ?

গণতন্ত্র ও জনমত বা জনমতের গুরুত্ব (Democracy and Public Opinion or Importance of Public Opinion) : পূর্বেকার উপেক্ষিত জনসাধারণ আজ রাজনৈতিক ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান দিনে শাসকের ক্ষমতা যে অন্য দেবতার পরিবর্তে গণদেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, ইহা তত্ত্বের দিক দিয়া আর বড় একটা কেহ অস্বীকার করে না। যে শাসনকার্য পরিচালনা একসময় সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞেয় সমস্যা এবং অগম্য পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত সেই শাসনকার্য যে তাহাদের নির্দেশেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন—এই তত্ত্ব আজ সর্ববাদীস্বীকৃত। একসময় যাহাদের কর্তব্য ছিল বিনা প্রশ্নে এবং বিনা দ্বিধায় প্রভুশ্রেণীকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও আনুগত্য জানানো তাহারাই আজ প্রভু হইয়া উঠিয়াছে। আজ শাসকের কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে জনসাধারণের ইচ্ছাকে বলবৎ করা। সম্পত্তি বা বংশের আভিজাত্যের দাবির পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের দাবি অলংঘনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দিক হইতে বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার ও সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রয়োজনীয়তা : জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার অধিকার বর্তমান থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র মানুষের আচরণকে নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত করিবার যন্ত্রস্বরূপ। আইনকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি এই পরিচালনাকার্য সম্পাদন

করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্ম প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করা, কারণ যেখানে সরকার অনুভব করে যে শাসন-ক্ষমতার উৎস হইল জনসাধারণ সেখানে সাধারণের আশা-আকাংক্ষা রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রভাবান্বিত করিতে বাধ্য।

ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, রাষ্ট্রশক্তি যখনই কোন বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ত হয়, তখনই সেই বিশেষ শ্রেণী ঐ শক্তিকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত করে এবং ঐ স্বার্থকে সামাজিক কল্যাণ বলিয়া প্রচার করে। সেইজন্য প্রাচীনকালে দাসপ্রভুরা দাসত্বপ্রথাকে দাসদের পক্ষে কল্যাণজনক এবং নিজেদের প্রভুত্বকে স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিত। আবার সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্তপ্রভুরা সামন্ত-প্রথাকে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিত। তারপর স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নামে সামন্তপ্রথার উপর আঘাত হানা হইল—সামন্তপ্রথা বিপ্লবের ঢেউয়ে ভাসিয়া গেল। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা: এইভাবে জন্মগ্রহণ করিল যাহাকে বলা হয় উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)। সরকার পরিচালনায় চরম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে সাধারণের স্থান নির্দিষ্ট হইল। শাসন পরিচালকবৃন্দ হইয়া দাঁড়াইলেন জনসাধারণের সেবক মাত্র। তাঁহাদের কর্তব্য হইল সাধারণের কল্যাণ, সাধারণের মতামত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। গণতন্ত্রকে এইজন্যই জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয়।[1]

জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি: জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে (১) সমাজের মংগলসাধন করিতে হইলে সমাজস্থ সকলের বুদ্ধিবিবেচনা ও অভিজ্ঞতাকে রাষ্ট্রকার্যে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্রেই এই সর্ত পূরণ হইয়া থাকে, কারণ ইহাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকায় প্রত্যেকে তাহার ধ্যানধারণা, আশা-আকাংক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারে। (২) রাষ্ট্রও সাধারণের অভিমত ও অভিজ্ঞতা জানিয়া তদনুযায়ী নীতি-নির্ধারণ ও আইনকানুন প্রণয়ন করিতে পারে। (৩) গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী। প্রত্যেকেরই সমাজকে কিছু-না-কিছু দান করিবার আছে। শিক্ষাদীক্ষা এবং সুষ্ঠু পরিবেশের সাহায্যে ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে মানুষের সম্ভাবনা অপরিমেয়। (৪) ইহা ব্যতীত বলা হয় যে, গণতন্ত্রে জনমতের ভয়ে শাসন-পরিচালকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহসী হন না। জনসাধারণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সরকারী নীতির সমালোচনার সুযোগ থাকায় শাসন-পরিচালকবর্গকে সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ক্ষমতা জনমতের সমর্থনের উপরই নির্ভর করে। অতএব, তাঁহাদের পক্ষে জনমতের সহিত সংগতি রাখিয়া

---

১. ৪৯১-৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

আইনকানুন রচনা করিতে হয়—অবস্থাবিশেষে প্রস্তাবিত আইন বা নীতি পরিহারও করিতে হয়। অপরদিকে আবার জনমতের চাপে নূতন নীতি, সংস্কার বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। যে-সকল গণতান্ত্রিক দেশের ভিত্তি হইল দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে বিরোধী দল সরকারী দলের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরে যাহাতে জনমত বিরোধী দলের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে সরকারী দল যাহা খুশি তাহা করিতে পারে না—উহাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত থাকিয়াই কাজ করিতে হয়।

জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন হইল সুচিন্তিত ও সতর্ক জনমত গঠনের। জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ করিবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্র, অধিকারের সনদ, আদালতের স্বাধীনতা ইত্যাদি যত প্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাই করা যাউক না কেন, কিছুই কার্যকর হয় না—যদি-না জনসাধারণ তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, যদি-না তাহারা বুঝিতে পারে যে কোন্ কোন্ শক্তি সমাজের মধ্যে কার্য করে, যদি-না তাহাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।

গণতন্ত্রের সফলতার সর্ত : মোটকথা, গণতন্ত্রের সফলতার প্রধান সর্ত হইল সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠন এবং উহা দ্বারা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ। অতএব বলা যায়, কোন রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উৎকর্ষের উপর।

আবার জনমতের উৎকর্ষ হইল জনগণের উৎকর্ষ।

বলিষ্ঠ ও কল্যাণকর জনমত সৃষ্টির সর্ত : বলিষ্ঠ ও কল্যাণকর জনমত সৃষ্টির জন্য কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, ভোটাধিকার বিস্তার এবং মতামত গঠনের উপায়সমূহের উন্নতির ফলে একদিকে যেমন জনমতের গুরুত্ব ও শক্তি বাড়িয়াছে, অপরদিকে তেমনি অনিষ্টের সম্ভাবনাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিনেমা-সংবাদপত্র-আকাশবাণী-দূরদর্শন ও প্রচারের অন্যান্য কলাকৌশল এত শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং জনমতকে বিপথে পরিচালিত করাও স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে বিশেষ সহজ হইয়া পড়িয়াছে।[১] সুতরাং বলিষ্ঠ জনমত গঠনের জন্য কি কি সর্তের প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহার পূর্বে 'জনমত' বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

---

১. "... public opinion is a formidable weapon. The methods of organising it, crystallizing it, and inflaming it to the point of hysteria are so well understood and the technique is so perfect that, ... there appears to be no limit beyond which they cannot be led." Andre Siegfried

জনমত কাহাকে বলে ? (What is Public Opinion ?) : 'জনমত' শব্দটির সংজ্ঞা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। অধ্যাপক আর্থার হোলকম্বে (Arthur Holcombe) এই প্রসংগে এক মজার বর্ণনা দিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কোন এক সভায় 'জনমতে'র অর্থ কি তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হয়। আলোচনা আরম্ভ হইতে না হইতেই কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন যে জনমত বলিয়া কোন কিছু নাই ; কেহ কেহ জনমতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন ; আর কেহ কেহ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া কোন্ অর্থ গৃহীত হইবে সেই সম্পর্কে একমত হইতে পারিলেন না। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে জনমত শব্দটির সংজ্ঞা নির্ণয় খুব সহজসাধ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া জনমতের অস্তিত্ব ও প্রভাবকে সন্দেহ করাও ভুল।

একটি সাধারণ সংজ্ঞা : সাধারণত সমাজসংক্রান্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে জনগণ বা সমাজের অভিমতকে 'জনমত' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন প্রশ্ন সম্পর্কে সাধারণ জনমত (general public opinion) কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইল একই সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত।

অর্থাৎ, কোন একটি জনমত নাই, আছে একাধিক জনমত (There is no single public opinion... . There are public opinions.—J. D. Miller)।

লাওয়েল : অধ্যাপক লাওয়েল (Lowell) বলেন, জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য অভিমত সমগ্র সমাজের ঐক্যমত হওয়ার প্রয়োজন হয় না ; অপরদিকে আবার ইহার জন্য কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়।[১] বলা হয়, সমাজসংক্রান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে ঐক্যমত না থাকাই স্বাভাবিক—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া বিভিন্ন লোক প্রশ্নটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। যখন এইভাবে মতামত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন কোন কোন মত অন্যান্যগুলি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবল অভিমতগুলিকে তখন জনমত আখ্যা দেওয়া হয়।

আবার কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই উহা জনমত বলিয়া স্বীকৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।[২]

১. "... a majority is not enough and unanimity is not required."

২. "An intense-feeling minority can 'triumph' over a majority composed of those with weakly-held views." Stephen L. Wasby : *Political Science—The Discipline and Its Dimensions*

অধিক সংখ্যক লোকে কোন মত পোষণ করিলেও উহাতে তাহাদের আস্থা দৃঢ় না হইলে উহা জনমত বলিয়া গৃহীত হয় না।

ভি ও কি ব্যাখ্যা : জনমতের ব্যাখ্যা প্রসংগে অন্যতম লেখক ভি. ও. কি (V. O. Key) মন্তব্য করিয়াছেন যে লোকের সেই মতামতকেই জনমত বলা যাইতে পারে যাহা সরকার অগ্রাহ্য করা সমীচীন বলিয়া মনে করে না।

এখন কোন সমাজে যে মতামত সরকার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হয়, তাহা সুসংবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীর অভিমত। এইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সুসংগঠিত সংখ্যালঘুর সুদৃঢ় মতামত জনমত বলিয়া পরিচিত হয়। সুতরাং এই উপসংহারে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর মতামতই জনমত বলিয়া দাঁড়াইয়া যায়, কারণ ইহারা সুসংগঠিত ও তথ্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমগুলি ইহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বর্ণনার সমালোচনা—জনগণের নয়, মতও নয় : জনমতের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেক চিন্তাবিদ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 'জনমত' 'জনগণের নয়' এবং 'মতও নয়' (neither public, nor an opinion)। জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাসীন বা অজ্ঞ হয়, অথবা সমস্যা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত থাকে না। এই অবস্থায় যাহা 'জনমত' নামে পরিচিত তাহা প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন অথবা স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর মত।

মতামত গঠনে অনুকরণ-প্রবণতাও বিশেষ কার্যকর। এইজন্য ফরাসী লেখক টার্ডে (Tarde) তাঁহার 'অনুকরণের ধারা' (*Laws of Imitation*) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, মতামত স্বল্পসংখ্যক লোক কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া সমস্ত সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

আবার বলা হয়, জনমত মতও নয়। ইহার অর্থ হইল মতগঠনের পিছনে থাকা চাই জ্ঞান যুক্তি ও চিন্তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের অভিমত হইল সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ ইত্যাদি উপাদানের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এইগুলির কোনটাই যৌক্তিকতার লক্ষণ নয়।

জনমত-নির্ধারক তিনটি বিষয় : মোটামুটিভাবে অধ্যাপক ফাইনারের অনুসরণে বলা যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমত তিনটি বিষয় লইয়া গঠিত : (১) তথ্যাদি (facts), (২) তথ্যাদির মূল্যায়ন এবং উহার ভিত্তিতে ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে ধারণা গঠন, এবং (৩) কাম্য পন্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ।[১]

অর্থাৎ, তথ্যাদির বিচারবিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশকেই জনমত বলা যায়।

১. "Politics is most concerned with public opinion as *will* .... Public opinion as *will* includes facts, include the *valuation* of them to found a belief, and then goes beyond it to assert that it is worth while to *pursue a course of action*." Finer : *Public Opinion and Parties*

কিভাবে সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে: এখন সুষ্ঠ, সবল ও সুচিন্তিত জনমত কিভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, তথ্যাদির সম্যকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ এবং নৈতিক ব্যাখ্যা করিবার জনসাধারণের ক্ষমতার উপর জনমত নির্ভর করে।[১]

(১) সুতরাং প্রথমেই বলা যায় যে জনসাধারণের ভালমন্দ, সত্যাসত্য, সমাজগতির ধারা ও সমাজাভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

ব্যাপক শিক্ষার প্রসারের ফলেই এই প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। আবার বাস্তব সমাজজীবনের সহিত অবশ্যই এই শিক্ষার সংগতি থাকা চাই। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলাফল বিষময়। বর্তমান সময়ে প্রচারপদ্ধতি এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, কাম্য শিক্ষাপ্রসূত রাজনৈতিক চেতনা না থাকিলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজসাধ্য।

(২) আবার শুধু শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার ফলকে সমাজজীবনের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, সভাসমিতির গঠন ইত্যাদির সুযোগ বর্তমান থাকা প্রয়োজন।

(৩) ইহার পর মতামত গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশের উপায়সমূহ—যেমন, মুদ্রাযন্ত্র-চলচ্চিত্র-আকাশবাণী-দূরদর্শন—যাহাতে স্বাধীনভাবে জনসাধারণের হিতার্থে কার্য করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাদের মাধ্যমে যে খবরাখবর জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করা হয় তাহার ভিত্তিতেই জনমত গড়িয়া উঠে। সুতরাং অকৃত্রিম ও অবিকৃত সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহার জন্য মতামত গঠনের যন্ত্রসমূহকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) পরিশেষে, মৌলিক রাজনৈতিক ধ্যানধারণাদি এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্যও থাকা আবশ্যক।

সমাজে সহিষ্ণুতা ও বুঝাপড়ার মনোভাব না থাকিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না। একদিকে যেমন সংখ্যালঘু দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়া লইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংখ্যালঘু দলের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সমালোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

উপরে জনমত গঠনের জন্য যে-সমস্ত শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কার্যকর হওয়া সম্ভব হয় না যদি-না সমাজ-ব্যবস্থা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্য শুধু রাজনৈতিক নহে, সামাজিক ও আর্থিকও বটে। যে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত—যেখানে মুষ্টিমেয়ের হস্তে দেশের সমস্ত সম্পদের মালিকানা কেন্দ্রীভূত, সেখানে আর্থিক

১. "Public opinion is compounded of perception of the facts, logical inferences from them and moral interpretation of them." Finer

প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং শ্রেণীস্বার্থ কায়েমী করিবার উপযোগী ধ্যানধারণা ও আদর্শের সৃষ্টি করিয়া উহা জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেয়। বলা যায়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনমত প্রকৃত আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীরই মত।[১]

এমত অবস্থায় সুস্থ ও বলিষ্ঠ জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া গণতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিতে হইলে সামাজিক ও আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বৈষম্যমূলক সমাজে জনমতের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না।[২]

জনমত গঠনের উৎস ও মাধ্যম (The Sources and Agencies of Public Opinion): জনমত গঠনের বিভিন্ন উৎস ও মাধ্যমের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল: (১) পরিবার (The Family), (২) বন্ধুবান্ধব ও সংগীদের দল (Friendship or Peer Groups), (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions), (৪) কর্মস্থলের অভিজ্ঞতা ও তৎসংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন, ক্লাব ইত্যাদি (Experiences in Employment, the Union, the Social Club, etc.), (৫) মুদ্রাযন্ত্র (The Press), (৬) চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, আকাশবাণী (The Cinema, the Television and the Radio), (৭) সভাসমিতি (The Platform), (৮) রাজনৈতিক দল (Political Parties) এবং (৯) আইনসভা (The Legislature)।

১। **পরিবার (The Family):** লোকের দৃষ্টিভংগি, ধ্যানধারণা ও মতামত অতি অল্পবয়স হইতেই গঠিত হইতে থাকে। এ-বিষয়ে প্রথমেই পরিবারের ভূমিকার উল্লেখ করিতে হয়। মাতাপিতার আদেশ-উপদেশ পালন, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি হইতে প্রথমে লোকে আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়মশৃংখলা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে।[৩] রাজনৈতিক জগৎ সম্বন্ধে পরিবারের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যেমন, দেখা গিয়াছে যে সাধারণত পরবর্তী জীবনে ছেলেমেয়েদের ভোটদানের গতিপ্রকৃতি মাতাপিতার ভোটাচরণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।[৪] অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে পারিবারিক প্রভাব কতটা কার্যকর হইবে-না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে পরিবারের মধ্যে মাতাপিতার সম্পর্ক এবং মতামত সৃষ্টির অন্যান্য সংস্থার প্রভাবের উপর। যেমন, শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যত অধিক ও স্থায়ী হইবে পারিবারিক প্রভাব ততটা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইবে।

১. "It is difficult ... to avoid the conclusion that was aptly formulated by Marx when he said that 'the ruling ideas of an age are the ideas of its ruling class'." H. J. Laski

২. "Public opinion in an unequal society cannot make its claims in terms of its moral character." H. J. Laski

৩. Almond and Powell: *Comparative Politics*

৪. Alan R. Ball: *Modern Politics and Government*

২। বন্ধুবান্ধব বা সংগীদের দল (Friendship or Peer Groups) : বয়স বাড়ার সংগে সংগে বন্ধুবান্ধবের সংগও বাড়িতে থাকে। বন্ধুবান্ধবের সহিত রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের ফলে ছেলে-মেয়েদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও মতামত প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া যে-ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় নয়, সে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের রাজনৈতিক মতামত সংগীদের মতামত দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।[১]

৩। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) : জনমত গঠনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আজিকার ছাত্রবৃন্দ আগামী দিনের সক্রিয় নাগরিক, চিন্তানায়ক এবং শাসনকার্য পরিচালক। স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা যে ধ্যানধারণা, আদর্শ ও নৈতিক মূল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়।

শিক্ষার বলিষ্ঠতার উপর জাতির বলিষ্ঠতা নির্ভর করে। গণতন্ত্রে এই শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রসম্মত।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করার পথে অনেক বাধা রহিয়াছে, কারণ সমাজে আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হয়। পাঠ্যবস্তু যাহাতে তাহাদের ধ্যানধারণার অনুকূল হয় তাহার দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় কোথায় কি গলদ আছে তাহা ছাত্রসমাজের দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার চেষ্টা হয়।

৪। কর্মস্থলের অভিজ্ঞতা ও তৎসংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন, ক্লাব ইত্যাদি (Experiences in Employment, the Union, the Social Club, etc) : বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কার্যে জীবিকার্জনের জন্য নিযুক্ত থাকে। ইহাদের রাজনৈতিক মতামত ও বিশ্বাস অনেক পরিমাণে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে। কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে বিভিন্ন ইউনিয়ন ক্লাব সমিতি ইত্যাদি। এই সংস্থাসমূহের কার্যকলাপের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যাদি সম্পর্কে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং মতামত গড়িয়া উঠে।[২]

৫। মুদ্রাযন্ত্র (The Press) : জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শিক্ষার বিস্তারের সংগে সংগে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, পুস্তক ইত্যাদির পাঠকের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় এবং যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা জনসাধারণের মতামতকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। সরকারও জনসাধারণের মুখপত্র হিসাবে সংবাদপত্রের সমালোচনার ভয়ে সংযত থাকে। এইজন্যই বলা হয় যে, গণতন্ত্রের

১. Almond and Powell : *Comparative Politics*

২. Almond and Powell : *Ibid*

অন্যতম প্রধান ভিত্তি হইল স্বাধীন সংবাদপত্র। এইখানেই রহিয়াছে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রগুলিতে বিপদের সম্ভাবনা। এই সকল দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হয়। বর্তমানে মালিকানাস্বত্বও ক্রমশ সংকুচিত হইয়া মুষ্টিমেয় মূলধন-মালিকদের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সংবাদ পরিবেশনের প্রকৃতি নির্ধারিত হইতেছে। প্রথমত, সংবাদপত্রের আয়ের অধিকাংশ আসে ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন হইতে। সুতরাং পুঁজিপতিদের স্বার্থবিরোধী কোন সংবাদ যে প্রকাশিত হইবে তাহা আশা করা বৃথা। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মালিকরা নিজেরাই পুঁজিপতি। সুতরাং তাঁহারা যে সমাজ-ব্যবস্থায় মুনাফা করিতেছেন সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ধনিকশ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে এবং তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংবাদকে বিকৃত করে এবং সত্য ঘটনাকে চাপিয়া যায়। পুস্তক, সাময়িক পত্র ইত্যাদি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। সামাজিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

৬। **চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ও আকাশবাণী (The Cinema, the Television and the Radio)**: চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ও আকাশবাণী সংবাদপত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ইত্যাদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ও আকাশবাণীর মাধ্যমে বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের নিকট সংবাদাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়। উহাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের হিতাহিত করিবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদপত্রের মত চলচ্চিত্র ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। আবার সেন্সর-ব্যবস্থার মাধ্যমে (censor) কোন্ প্রকারের চিত্র দেখানো হইবে না-হইবে তাহা সরকার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, সরকার চিত্রগৃহগুলিকে নিজ প্রযোজিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করিতে বাধ্য করে। ইহার দ্বারা যে দল সরকারী ক্ষমতা পরিচালনা করে সেই দলের সুবিধা হয়।

আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সহিত সরকারের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ। হয় তাহারা সরকারী যোগাযোগ-ব্যবস্থার অংগ, না হয় বিশেষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে ইহারা ঠিক জনমতের উৎস ও বাহন হিসাবে কাজ করিতে পারে না।

৭। **সভাসমিতি (The Platform)**: সভাসমিতি করিয়াও জনসাধারণকে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হয়। আবার এইরূপ সভাসমিতি হইতে জনসাধারণ নিজেদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। সভাসমিতিতে জন-মনোভাবের গতিপ্রকৃতিও প্রতিফলিত হয়।

সভাসমিতির স্বাধীনতা: এই সকল কারণে বলা হয় যে, সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগস্বরূপ।

বৈষম্যমূলক সমাজে কিন্তু এই স্বাধীনতা সকলে সমভাবে ভোগ করিতে পারে না। সভাসমিতি সংগঠনের জন্য যে আর্থিক শক্তির প্রয়োজন তাহা দরিদ্র শ্রেণীর নাই।

ইহা ছাড়া আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শাসকশ্রেণী রাজদ্রোহিতা, শান্তিশৃংখলা ভংগের অজুহাতে প্রগতিশীল সভাসমিতিকে দমন করিবার প্রচেষ্টাও করিয়া থাকে।

৮। **রাজনৈতিক দল** (**Political Parties**): রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য হইল আপনাপন দলের সমর্থনে জনসাধারণকে প্রভাবিত করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ এবং শাসনক্ষমতা অধিকার করা। সুতরাং প্রত্যেক দলই আপন কর্মসূচী নির্ধারণ করিয়া তাহার সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও বক্তৃতা, প্রচারপুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। জনসাধারণ দলীয় আলোচনা সমালোচনার মধ্য হইতে বিভিন্ন কর্মসূচীর গুণাগুণ বিচার করিয়া আপন মতামত গঠন করিতে সমর্থ হয়।

দল-ব্যবস্থার ভূমিকা: বলা হয়, দলীয় ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসার এবং বহুমুখী সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করে।

উপরন্তু, মতবিরোধ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হিংসাত্মক কর্মকলাপ ব্যতীতই নির্বাচনের মারফত দলীয় ব্যবস্থার সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন সমাজ ও দলভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সমাজের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে মতৈক্য। আর্থিক বৈষম্যমূলক সমাজে এই মতৈক্য থাকিলেও উহা স্থায়ী হয় না—অর্থ-ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হইলেই বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যে দেখা দেয় সংঘাত। এই স্বার্থের সংগ্রামে আর্থিক প্রতিপত্তিশালী দলেরই সুবিধা হয় বেশী, কারণ ইহা প্রচারের মাধ্যম—সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি—আপন শ্রেণী-স্বার্থে সহজেই নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয়। তখন সমাজ-কল্যাণকর সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

৯। **আইনসভা** (**The Legislature**): আইনসভা হইল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্ষেত্র (forum)। এখানে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করে। আইনসভার কার্যপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সভাসমিতি অপেক্ষা আইনসভা জনমত গঠনে কোন অংশে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে না।

জনমতের গঠন ছাড়া জনমতের প্রতিফলনক্ষেত্র হিসাবে আইনসভাই বোধ হয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা (**Nature and Role of Public Opinion in Different Political Systems**): যে-কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে ইহা জনগণের সহিত কতটা যোগাযোগ রক্ষা করে তাহার উপর। সুস্থ, সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া তোলার সুষ্ঠু মাধ্যম (agencies) কি হইবে, জনমতের গতি ও গভীরতা (direction and

intensity), রাষ্ট্রশক্তি কতটা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া তোলার সর্ত (conditions) কি প্রভৃতি প্রশ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত, গবেষক ও পাঠকমহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলিয়াছে।

বর্তমানে যে প্রশ্নটি রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণের মধ্যে বিশেষ তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইল : বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের ভূমিকা বা গুরুত্ব কি ?

রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্‌মহলে সাধারণভাবে এই ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই জনমত সৃষ্টি ও প্রচারে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং এই ব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য ও ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব: রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতটা জনমত নিয়ন্ত্রিত সে প্রশ্নের অবতারণা না করিয়াও বলা যায়, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই শাসন-কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাংক্ষা, প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নটি কমবেশি বিবেচনা না করিয়া পারেন না। নায়কতন্ত্রেও (Dictatorship) শাসন-কর্তৃপক্ষকে জনসংযোগ রক্ষার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে জনমতের সমর্থন লাভের জন্য অন্তত বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে দেখা যায়।

প্রত্যেক শাসন-কর্তৃপক্ষকেই জনমতকে একটি সবল ও শক্তিশালী শক্তি হিসাবে গণ্য করিতে হয়।[১]

ইতিহাসের দিক দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, "প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান। নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত ?"[২] অবশ্য একথা ঠিক যে যুগের পরিবর্তনে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের সংগে সংগে শাসন-ব্যবস্থা জনমতকে অধিক গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিতেছে।

গুরুত্ব বিচারের সাধারণ মাপকাঠি: বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিভিন্নভাবে বিচার্য হইলেও একটি সাধারণ ত্রিমুখী মাপকাঠির নির্দেশ করা যায় : (ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক-অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, (খ) জনসাধারণের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং (গ) জনমত গঠনের অপরিহার্য মাধ্যমগুলির কার্যকারিতা।

একথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজ-ব্যবস্থা (সামাজিক ও আর্থিক) সাম্যভিত্তিক না হইলে জনমত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না—বৈষম্য-মূলক সমাজে জনমতের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের বিশ্লেষণী ক্ষমতার উপর জনমতের গুরুত্ব নির্ভরশীল। সুতরাং সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যতীত জনমত গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, জনমত সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত মাধ্যম—

১. "All government and most political actors ... treat public opinion as a mighty force." Austin Ranney: *The Governing of Men*

২. ভক্তির পাত্র

অর্থাৎ জন-সংযোগের মাধ্যম গড়িয়া তোলা দরকার। কোন্ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কি পরিমাণ জনমতের প্রতি গুরুত্ব দেয় তাহা নির্ভর করে এই সকল মাধ্যমের গণতন্ত্রীকরণের উপর, যাহা আবার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাসন-কর্তৃপক্ষের মানসিকতার উপর নির্ভরশীল।

উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System), কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা (Authoritarian Regime) এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় (Socialist System) জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

ক। উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি (Nature of Public Opinion in Liberal Democratic Systems): উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকদের মতে, জনমত হইল কেন্দ্রীয় শক্তি—গণতন্ত্র জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতের প্রভাব ও প্রাধান্যকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সকলের ধ্যানধারণার প্রতিফলন, সাধারণের স্বার্থের অনুপন্থী আইনকানুন প্রণয়ন, মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়া, স্বৈরাচারিতার পথ রোধ করার মধ্যেই উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রভাব ও প্রাধান্যের গুরুত্ব। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন, জনগণের অবাধ ভোটাধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, একাধিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি, বিভিন্ন স্তরের স্বার্থগোষ্ঠী ও অন্যান্য চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর গুরুত্ব, নিরপেক্ষ বিচারালয়, সুসংগঠিত জনসংযোগ-ব্যবস্থা উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

জনমতের ধারণা: জনমত বলিতে কি বুঝায় এ-সম্পর্কে উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থকগণ ঐক্যমত পোষণ করেন না। কেহ কেহ বলেন, লোকের সেই মতামতকেই জনমত বলা যাইতে পারে যাহা সরকার অগ্রাহ্য করা সমীচীন বলিয়া মনে করে না।[১] কাহারও কাহারও মতে জনমত হইল বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সমষ্টি।

বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণসমূহ: জনমতের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যায়: (১) **ঐক্যমত ও বিরোধ:** সম্পূর্ণ ঐক্যমত থাকিতে হইলে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের অস্তিত্বও থাকা দরকার। বিভিন্ন বিরোধী মতের সমন্বয়ে জনমত গঠিত হয়। সকল ধরনের মত বা স্বার্থ যাহাতে গ্রহণযোগ্য হয় তাহার ব্যবস্থা এই ধরনের ব্যবস্থায় রাখিতে হয়। (২) **তথ্যসংগ্রহ:** উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবাদ ও তথ্যাদি পরিবেশনের ভিত্তিতে জনমত গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। (৩) **রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ:** জনসাধারণ রাজনৈতিক কার্যাবলীতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিলে সুষ্ঠু জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে—উদার-গণতান্ত্রিক

১. "Public opinions consists of those opinions held by private persons which governments find it prudent to heed" V. O. Key

তত্ত্ব এই মত পোষণ করে। (৪) স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন: জনমত কখনই সম্পূর্ণ স্থায়ী মত হইতে পারে না—পরিবর্তনশীল সমাজের পটভূমিতে জনমতও পরিবর্তিত হয়। (৫) জনমতের অবিকশিত ও সুপ্ত অবস্থা: জনমত সর্বক্ষেত্রে জাগ্রত হয় একথা মনে করিবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জনমত অস্পষ্টই থাকে; এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে এ-ব্যাপারে সচেতন থাকিতে হয়। সুপ্ত বলিয়া এই ধরনের মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়।

জনমত পরিমাপের পদ্ধতি: উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি বিচার করিতে গিয়া কেহ কেহ সংখ্যার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন, কেহ কেহ আবার সংখ্যা অপেক্ষা অবস্থা এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিকেই অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। জনমতের স্বরূপ হইতেই প্রতীয়মান হয় যে উহার সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Direct Democratic Checks) জনমত যাচাইয়ের স্বার্থক ব্যবস্থা, কিন্তু আধুনিক বৃহদাকার রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। অবশ্য আধুনিককালে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ভোটাভুটি, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে জনমতকে প্রকাশ করার চেষ্টা চলিতেছে।

আধুনিক আচরণবিদ্‌গণ (Behaviourists) প্রশ্নজিজ্ঞাসা, পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং অন্যান্য পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে জনমত পরিমাপের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমের ভূমিকা: উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংবাদপত্র, দূরদর্শন, আকাশবাণী ও চলচ্চিত্র, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (pressure groups), শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আইনসভা এবং সভাসমিতির গুরুত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরিসীম। জনসংযোগের এই সকল মাধ্যমের আধুনিকীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণের সার্বিক প্রচেষ্টা এই ব্যবস্থায় করা হয়। জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের মতের গুণগত দিকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার জন্য এই সকল মাধ্যম নিরপেক্ষভাবে কাজ করে বলিয়া দাবি করা হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই দাবি বহুলাংশেই অসার। কারণ, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম প্রতিপত্তিশালী-শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণেই সচেষ্ট থাকে।

রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থগোষ্ঠিগুলিও বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক। রাষ্ট্রশক্তি মালিকশ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া এই শ্রেণী প্রচারের মাধ্যমগুলিকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার কার্যে নিয়োজিত করে। আইনসভাও বিশেষ শ্রেণীস্বার্থকে রক্ষা করে। আইনসভার বিতর্ক বা অন্যান্য পদ্ধতি প্রকৃত জনমত গঠনের প্রতি সচেষ্ট না হইয়া বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতটা সাধারণের ধ্যানধারণাকে প্রতিফলিত করে বা এই ব্যবস্থায় সাধারণের

স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণীত হয় কিনা? শাসকশ্রেণীর নিজস্ব মনোভাব প্রাধান্য পায় বলিয়া জনমতের প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

জনমতের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বলা হইলেও কার্যত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত নয়, কারণ ইহাতে বিশেষ শ্রেণীর ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সাম্যভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা জনমত প্রকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সামাজিক ও আর্থিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি দেয় কি? প্রচারযন্ত্র বা জনমতের বিভিন্ন মাধ্যমের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই সকল মাধ্যম রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও জনসাধারণের চিন্তাভাবনার মধ্যে সংযোগ সাধন করিতে ব্যর্থ হয়। এই সকল মাধ্যমের উপর তাহাদেরই ব্যক্তিগত মালিকানা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যাহারা প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীভুক্ত। এবং দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থ ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় সুষ্ঠু ও সবল জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না। ধনতান্ত্রিক সমাজে সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

খ। কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি (Nature of Public Opinion under Authoritarian Regimes): কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থায় জনসংযোগের মাধ্যম বা বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ন্যায় এখানে জনমতের প্রাধান্য কতটা স্বীকৃত তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। এই ব্যবস্থা নাগরিক-অধিকার ও সামাজিক কার্যকলাপের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং গণসংযোগ ব্যবস্থার উপর শাসন-কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

দমনমূলক শাসন নীতির প্রয়োগ এই ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টিতে বাধাপ্রদান করে।

উদার-গণতন্ত্রের বিকল্প বৈশিষ্ট্য : কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল নয়। মত অপেক্ষা শক্তিই এখানে অধিক প্রাধান্য পায়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ইচ্ছার স্বার্থে সাধারণের ইচ্ছাকে দমন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও চাপ-গোষ্ঠীর প্রাধান্য, বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা, সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জনমত গঠনের পক্ষে অপরিহার্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জনমতের প্রাধান্যের সূচক বলিয়া চিহ্নিত। কিন্তু কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা স্বৈরাচারিতার পথে শাসন-পরিচালনা করে। জনমতের অপরিহার্য লক্ষণগুলি—অর্থাৎ ঐক্যমত ও বিরোধের পরিবর্তে এই ব্যবস্থায় বলপূর্বক ঐক্য সৃষ্টি করা হয়। জনসাধারণকে সুস্পষ্ট মতপ্রকাশের কোন সুযোগই এখানে দেওয়া হয় না। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। জনমনে সুপ্ত বিক্ষোভ থাকার ফলে (এই ব্যবস্থায়) শাসন-কর্তৃপক্ষ বিপ্লব বা বিরোধিতার সম্ভাবনায় দমন-পেষণের নীতিকে জোরদার করে; রাজনৈতিক

অস্থিরতা এই ব্যবস্থায় থাকিয়াই যায়। নেতৃত্বের পরিবর্তন হইলেও শাসন-প্রণালীর পরিবর্তন হয় না। রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও সঠিক বিকাশ ঘটে না।

প্রচার-মাধ্যমসমূহের নিয়ন্ত্রণ : জনমত গঠনের মাধ্যমগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা এই ব্যবস্থায় নাই। সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচারযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত থাকে। শাসন-কর্তৃপক্ষের নীতিকেই পরিবেশন করা ইহাদের কাজ। প্রকৃত জনসংযোগ ঘটে না। জনসাধারণ সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহাতে নির্লিপ্ত থাকে তাহার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত প্রচারযন্ত্র কাজ করে। সরকারী শিক্ষানীতি শাসন-কর্তৃপক্ষের মতাদর্শকেই প্রতিফলিত করে। সভাসমিতি বা মতপ্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমও সরকারী স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত। ভোটাভুটি, বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনার কোন স্থান এই ব্যবস্থায় নাই, থাকিলেও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত।

গ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি (Nature of Public Opinion in Socialist System) : উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত যে অর্থে চিহ্নিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত ঠিক সেই অর্থে বিবেচিত হয় না।

বিভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের বিভিন্ন রূপ : রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্‌গণ সমাজতন্ত্রকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। (ক) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র-বাদের প্রবক্তাগণ (State Socialists) বিবর্তনের পথে সমাজ-পরিবর্তনের ধারণাকে প্রকাশ করিয়া কিভাবে এই ব্যবস্থায় জনগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার ব্যাখ্যা দেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে জনগণের নির্দিষ্ট ভূমিকার কথা তাঁহারা উল্লেখ করেন। (খ) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের (Guild Socialists) সমর্থকগণ বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের গুরুত্ব প্রচার করিয়া এই সমস্ত সংঘের মাধ্যমে জনমত গঠনের পক্ষপাতী। পেশাগত ভিত্তিতে আইনসভার সংগঠন, শাসন-পরিচালনায় বিভিন্ন পেশাভুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব এই ব্যবস্থায় জনমতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে। ভোক্তা পারিষদ (Consumers' Council), আঞ্চলিক সংস্থা প্রভৃতির প্রতিও ইহা গুরুত্ব আরোপ করে। (গ) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্র (Syndicalism) শ্রমিকসংঘগুলির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে এবং সাধারণ মানুষের গণচেতনা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ঘ। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ হইতে জনমত : সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাগুলি জনমতের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেও জনমতের প্রকৃত পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি হইতে পারে সে-সম্পর্কে কোন দৃঢ় ধারণা পোষণ করে না। মার্ক্সীয় রাষ্ট্রচিন্তায় বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌গণ সমাজতন্ত্রের এক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কিভাবে এই ব্যবস্থা জনমত প্রকাশ ও প্রসারে সহায়ক হয় তাহার আলোচনা করেন। ইঁহাদের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জনমতের পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে এ-ধারণা ভ্রান্ত। বৈষম্যমূলক সমাজে গণ-সার্বভৌমিকতার প্রশ্ন অবান্তর। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রবাদের যুগে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির মতামত গ্রাহ্য হয়, সম্পত্তিশালীর

স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, রাষ্ট্র এই শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হইয়া সাধারণের মতামত ও ইচ্ছাকে রুদ্ধ করে।

মাত্র সমাজতন্ত্রের পরিবেশেই প্রকৃত জনমতের পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সমাজতন্ত্র জনগণকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকারই দেয় না, ইহা অর্থনৈতিক অধিকারের কথাও ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক সীমা ব্যতিরেকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয় এবং স্বতই এই অবস্থায় প্রকৃত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সমাজতন্ত্র জনসাধারণের উপযোগী ব্যবস্থা—ইহা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। বিশেষ শ্রেণী বা স্বার্থের মতকে প্রকাশ করা ইহার লক্ষ্য নয়। ইহা শ্রেণী-শাসনের অবসানের কথাই ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থা শুধু জনমতের স্বীকৃতিই দেয় না, কিভাবে জনমত সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে প্রকাশিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণ-সংযোগের মাধ্যমগুলি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য—অর্থাৎ সমাজের সবস্তরের মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর দিকে মনোযোগী হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুদৃঢ়করণ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ব্যাপক মান-উন্নয়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সযত্ন সংরক্ষণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা সুদৃঢ় জনমত গড়িয়া তোলার প্রয়াসী হয়।

জনমত প্রকাশের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহ: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত প্রকাশের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি হইল: (১) জনগণের সংগ্রাম প্রয়াসকে সমন্বিত (co-ordinate) করিবার জন্য জনগণের দল হিসাবে একটি রাজনৈতিক দল গঠন। এই দল জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে, চেতনাবৃদ্ধিতে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণে জনগণের সংগ্রামী বাহিনী হিসাবে কাজ করিবে; (২) গণ-সংগঠনগুলির স্বীকৃতি: এই সংগঠনগুলি গণচেতনা বৃদ্ধিতে, জনগণের বিভিন্ন স্বার্থরক্ষায় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করিবে; (৩) মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দর্শনের শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনগণের মধ্যে বাস্তবদৃষ্টি ও সামাজিক চিন্তাবোধের প্রকাশ ঘটানো; (৪) আইনসভার গঠন ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি গ্রহণ—দুর্নীতির অবসান, বৈধ নির্বাচন, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি, সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি।

---

(৫) ইহা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন জনমত সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করা হয় অন্যদিকে তেমনি জনমত যাহাতে বিপথে পরিচালিত না হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কথাও বিবেচনা করা হয়।

জনসংযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য একদিকে যেমন এই সকল মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবেশাধিকার আছে, অন্যদিকে তেমনি

মাধ্যমগুলি সঠিকভাবে যাহাতে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য ইহাদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণেও রাখা হয়।

জনমতের অনুকূলে দুইটি পদ্ধতি: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের অনুকূলে সাধারণত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়: (ক) জনগণের অভিমত, ইচ্ছা ও মতামতের সহিত সংগতি রাখিয়া আইন প্রণয়ন; (খ) জনগণের চেতনা ও ইচ্ছাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসারকার্যের সহিত যুক্ত করা। গণচেতনার জাগরণে ও প্রকাশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেও গণচেতনা ও ইচ্ছাকে রূপ দেওয়া হয়।

সমালোচনা: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবক্তাগণ বলেন, এই ব্যবস্থায় জনমতের পরিবর্তে দলীয় মত পরিবেশন করা হয়—বিশেষ রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার কাছে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বলি দেওয়া হয়। সরকারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলি পরিচালনায় ক্ষেত্রেও দলীয় নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ লক্ষণীয়। সর্বহারার শাসনের নামে দলীয় শাসনকেই রূপ দেওয়া হয়। এই অবস্থায় এই ব্যবস্থায় জনমত কতটা প্রকৃত তাহা লইয়া সন্দেহের অবকাশ আছে।

সমালোচনার উত্তর: সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল চিন্তাবিদ্‌দের মতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের কোন মূল্য নাই—এরূপ ধারণা করার কোন যুক্তি-সংগত কারণ নাই। জনমত প্রকাশের প্রধান উপায় হইল জনমত গড়িয়া তোলার পরিবেশ সৃষ্টি। একটি দলের পরিচালনায় এই পরিবেশ সৃষ্টিরই আহ্বান জানানো হয়, এবং উহারই মাধ্যমে জনমত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মোটকথা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইয়া প্রয়োজনীয় পরিবেশের মাধ্যমে সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় করা হয়।

স্মর্তব্য—জিজ্ঞাসার উত্তর:

১. সুষ্ঠু, সুচিন্তিত ও সবল জনমত ব্যতীত গণতন্ত্র সার্থক হইতে পারে না—এই অনুমান বা বাদের (thesis) ভিত্তিতেই গণতন্ত্রে জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২ জনমতের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। তবুও বলা যায়, লোকের সেই মতামতই জনমত যাহা সরকার সরাসরি উপেক্ষা করিতে ইতস্তত না করিয়া পারে না।

৩. কাম্য জনমত গড়িয়া তুলিতে হইলে (১) কাম্য শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (২) মতামত প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, (৩) প্রচার-মাধ্যমসমূহকে জনহিতার্থে নিয়োজিত করিতে হইবে, (৪) মৌল বিষয়সমূহের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ঐক্যমত থাকা প্রয়োজন, যাহার জন্য সমাজকে অর্থনৈতিক সাম্যভিত্তিক করিতে হইবে।

৪. জনমত গঠনের উৎস ও মাধ্যম হইল (১) পরিবার, (২) বন্ধুবান্ধব, (৩) শিল্প-প্রতিষ্ঠান, (৪) কর্মস্থল, (৫) মুদ্রাযন্ত্র, (৬) দূরদর্শন-আকাশবাণী ইত্যাদি, (৭) সভাসমিতি এবং (৮) রাজনৈতিক দল।

৫. (ক) উদার-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতকে ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করা হয়, (খ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টির প্রতিবন্ধক করা হয় এবং (গ) বিভিন্ন প্রকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

অনুশীলনী

1. Explain the nature of Public Opinion. What is its importance in popular government?

[জনমতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থায় (গণতন্ত্র) ইহার গুরুত্ব কোথায়?]

(৫৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by Public Opinion? Discuss the role of the political parties, the press and the platform in moulding public opinion.

[জনমত বলিতে কি বুঝ? জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল, মুদ্রাযন্ত্র ও সভাসমিতির ভূমিকার পর্যালোচনা কর।] (৫৮০-৮১ এবং ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা)

3. What is Public Opinion? What are the conditions of an enlightened and active public opinion?

[জনমত কাহাকে বলে? সুচিন্তিত এবং কার্যকর জনমতের সর্তাবলী কি কি?] (৫৮০-৮৩ পৃষ্ঠা)

4. What do you mean by Public Opinion? How is it formulated and moulded?

[জনমত বলিতে কি বুঝ? কিভাবে ইহা গঠিত ও পরিস্ফুট হয়?] (৫৮০-৮১, ৫৮৩-৮৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss in brief the nature and role of Public Opinion in different Political systems.

[বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

(৫৮৮-৯০, ৫৯০-৯২ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট
(Appendix)
ক

কল্পনাবিলাসমূলক এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ*
(Utopian and Scientific Socialism)

"*Marx, the prophet of capitalism doomed, gave a scientific bent to socialism.* R. L. Heilbroner

ক। কল্পনাবিলাসমূলক সমাজতন্ত্রবাদ: কল্পনাবিলাসমূলক (Utopian) শব্দটি ১৫১৬ সালে প্রকাশিত টমাস মোরের (Thomas More) বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউটোপিয়া' (Utopia) হইতে গৃহীত। গ্রন্থখানিতে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সমন্বিত একটি দ্বীপের কল্পনা করা হইয়াছে। এই দ্বীপের সকল অধিবাসীই সম্পূর্ণ সুখী। সমাজতন্ত্রবাদের পরিকল্পনায় উনিশ শতকের লেখকগণ মোটামুটি এই আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন শিল্পযুগের নিষ্পেষণ হইতে বিদায় লইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন গোষ্ঠীজীবন গঠন করা যেখানে প্রতিযোগিতা বলিয়া কিছু থাকিবে না, অথচ সমবায়ের মাধ্যমে সকলের সকল অভাবই পরিতৃপ্ত হইবে।

এই সমাজতন্ত্রবাদিগণের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অবাধ প্রতিযোগিতা মানব-কল্যাণের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল সংগঠনই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সারা ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের তরংগ উঠিলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উহা অন্যতম ভাবাদর্শে (ideology) পরিণত হইতে পারে নাই। সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথনির্দেশ করিতে পারেন নাই। ফলে বিপ্লবের সূচনা করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

খ। মার্ক্সীয় বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ: কার্ল মার্ক্সই প্রথম সমাজতন্ত্রবাদকে ভাবাদর্শে পরিণত করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে সমাজতন্ত্রবাদের কোন সম্ভাবনাই নাই।[১] এইরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন মাত্র কাম্য বলিয়া দেখাইবে না, বিলোপসাধন যে নিশ্চিত তাহাও প্রমাণ করিবে। এঙ্গেলসের সহযোগে মার্ক্স এইরূপ তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন।

তিনি দেখান যে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে ইতিহাসের প্রতিটি বিবর্তনশীল যুগ আসিয়া সমাপ্ত হয় বিপ্লবে। ইতিহাসের এই অবশ্যম্ভাবী গতিকে তিনি 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' (Dialectical Materialism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে পূর্ণ বিশ্বাসের ফলে মার্ক্স সমাজ-বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে বা পরে আর কোন সমাজ-

* বিশেষ করিয়া উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের জন্য।

১. M. N. Roy : *From Savagery to Civilization*

তন্ত্রবাদীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিল্প-শ্রমিক ও সর্বহারাদের তিনি মাত্র সংগ্রামের মন্ত্রই প্রদান করেন নাই, সংগ্রামে জয়লাভের পূর্ণ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। সংগ্রামে জয়লাভের ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গড়িয়া উঠিবে শ্রেণীহীন বর্ণহীন সমাজ-ব্যবস্থা, যে সমাজ-ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগের কোন ক্ষেত্রই থাকিবে না—কোন কারণই থাকিবে না। সুতরাং বলপ্রয়োগের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিধি-ব্যবস্থা লইয়া রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে।

বিজ্ঞান ও কল্পনাবিলাসের সমন্বয়: সমালোচকগণ বলেন, মার্ক্সের এই ধারণা—এই প্রতিশ্রুতি আশাবাদেরই দ্যোতক, কিন্তু ইহার মধ্যেই রহিয়াছে কল্পনা-বিলাসের উপাদান (elements of utopianism)। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যেও কল্পনাবিলাস থাকিতে পারে; আবার কল্পনাবিলাসমূলক তত্ত্বও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বলা হয় প্লেটো, টমাস মোর প্রভৃতি প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদীর তত্ত্বে সামাজিক সম্বন্ধের (social relations) এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা উত্তরসূরীদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদেও লক্ষ্য করা যায় না।

"*Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite!*"

Communist Manifesto (1848)

"*Some form of socialism is coming on the boards.*"

Swami Vivekananda (in 1896)

পরিশিষ্ট
(Appendix)
খ

সমাজকল্যাণকর বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র*
(The Social Welfare State)

"The failure of planning and nationalization has not eliminated to pressure for an ever bigger government. It has simply altered its direction The expansion of government now takes the form of welfare programs and of regulatory activities." Milton and Rose Friedman

ইতিপূর্বেই গ্রন্থের অন্যত্র (৩৩৯-৪৩ পৃষ্ঠা) সমাজ-কল্যাণকর বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে ঐ প্রকার রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের আরও কিছুটা আলোচনা করা হইতেছে।

বর্তমান শতকের পঞ্চম দশকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধারণার সৃষ্টি করা হয়। বস্তুত, ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসার পর হইতেই ঐ দেশকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State) আখ্যা দেওয়া হইতে থাকে। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রও এই ধারণা গ্রহণ ও প্রচার করে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রকে এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা : এখন প্রশ্ন, কল্যাণকর বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলিতে সঠিক কি বুঝায়? এ-সম্পর্কে আমরা আশা ব্রিগস (Asha Briggs) প্রদত্ত সংজ্ঞা আলোচনা করিয়াছি (পাদটীকা, ৩৪০ পৃষ্ঠা)। স্বরূপ বুঝিবার জন্য আরও কয়েকজন লেখকের বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইবেনস্টাইনের (Ebenstein) মতে, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের নীতি হইল : (ক) প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ; (২) রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা।[১] অনুরূপভাবে পেনলোপ হল (Penlope Hall) ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে রাষ্ট্রকে সেই সকল সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার ফলে লোকে নিরাপত্তা, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান ও সভ্য জীবন ভোগ করিতে পারে।[২]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থান : এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র একদিকে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে এবং অপরদিকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ, ইহা দুই মতবাদের মধ্যবর্তী স্থান

* বিশেষ করিয়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।

১. 'The main principles of the welfare state are relative : first, the recognition that every member of the community is entitled ... to a *minimum standard of living* ; second, the welfare state is committed to putting *full employment* at the top of social goals to be supported by public policy." Ebenstein : *Today's Isms*

২. Penlope Hall : *The Social Services of Modern England*

অধিকার করে।[১] কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সমর্থকরা মনে করেন যে অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে কতকগুলি বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় : বেকারত্ব, দারিদ্র্য, বার্ধক্য ও অসুস্থাবস্থায় নিরাপত্তার অভাব, বাণিজ্যচক্র, প্রকট ধনবৈষম্য, প্রভৃতি। এগুলিকে পরিহার ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। রাষ্ট্র কিছুটা পরিকল্পনা, করধার্য, বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকামী রাজস্ব-ব্যবস্থা (contra-cyclical fiscal policy) ইত্যাদির মাধ্যমে লোককে অসহায় অবস্থার হাত হইতে সংরক্ষিত করিতে প্রচেষ্টা করে। অপরপক্ষে ইঁহারা আবার পূর্ণাংগ সমাজতন্ত্রকে বা কমিউনিজমকে স্বীকার করিয়া লইতে চান না। কারণ, মনে করেন যে ইহার ফলে গণতন্ত্রের স্থলে সর্বগ্রাসী বা সর্বাত্মক রাষ্ট্রের (totalitarian State) উদ্ভব হইবে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অবসান ঘটিবে।

কল্যাণকর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Some Characteristics of a Welfare State): কল্যাণকর রাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে : (ক) কল্যাণকর রাষ্ট্র হইল কর্মমুখর রাষ্ট্র (a positive State)। কল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিদের মত রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান মনে করেন না—ইঁহারা রাষ্ট্র ন্যূনতম কার্য করিবে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। ইঁহাদের বক্তব্য হইল যে রাষ্ট্র সক্রিয় হইয়া মানুষের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। তবে ইঁহারা পূর্ণাংগ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রবর্তনের পক্ষপাতীও নন।

(খ) কল্যাণকর রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা উদারনৈতিক গণতন্ত্র-ভিত্তিক। সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন, নির্বাচিত পার্লামেণ্ট, সর্বজনীন ভোটাধিকার, দলীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি) ব্যতীত লোকে তাহাদের মতামত প্রকাশ ও কার্যকর কবিতে সমর্থ হয় না।

অন্যভাবে বলা যায়, কল্যাণকর রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট।

এদিক দিয়া দেখিলে সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের আওতায় ফেলা যায় না। বস্তুত, কল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থকগণ সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে বা বুর্জোয়াদের অবসান ঘটাইতে চাহে না।[২]

(গ) কল্যাণকর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল নিয়ন্ত্রণসহ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (mixed with control economy)।[৩]

১. "In a sense the welfare state represents a middle position on a scale with perfect socialism at the left extreme and perfect laissez-faire at the right." Austin Ranney

২. "... the welfare state is not the dictatorship of the proletariat and is not pledged to liquidate bourgeoisie." T. H. Marshall : *Sociology at Crossroads*

৩. বর্ণনাটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসনের।

কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তাগণ অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন।

তাঁহারা স্বীকার করেন যে এরূপ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাণিজ্যচক্র (Business Cycles)—অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্থানপতন—ঘটায়। ইহার ফলে লোকের দুঃখদুর্দশা বাড়িয়া যায় ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। যখন বাজার মন্দা হইয়া পড়ে তখন অগণিত লোক কর্মচ্যুত হইয়া দুঃখদুর্দশা দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়, এবং সমাজের উৎপাদন-শক্তি অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে। এই অপচয়, দুর্দশা ও লোকের দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কল্যাণকর রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন এবং কল্যাণমূলক কার্যাদি (যেমন, শিক্ষা, দুরবস্থায় পড়িলে সাহায্যদান, বেকার-বীমা, বসবাসের ব্যবস্থা, উৎপাদনে উৎসাহ যোগাইবার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সাহায্য করা প্রভৃতি) সম্পাদন অধিক মাত্রায় করিয়া চলে। অনেক দেশেই পরিকল্পনা ও সরকারী উদ্যোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান চায় না, চায় ইহার সংস্কারসাধন যাহাতে অর্থনৈতিক সংকটকে এড়ান যায়।

মূল্যায়ন: কল্যাণকর রাষ্ট্রের সমর্থকগণ দাবি করেন যে সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে সংগঠিত কল্যাণকর রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে অপসারিত করিয়া দেশের ও দশের সর্বাংগীণ উন্নয়নসাধনে সমর্থ। এরূপ রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সর্বজনের মংগল সাধন করে। ইহাও বলা হয়, সর্বাত্মক রাষ্ট্রের তুলনায় কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ। আরও দাবি করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে জীবনধারণের মানের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, উৎপাদন বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে—এমনকি পূর্বের তুলনায় অর্থনৈতিক সাম্য অধিকতর মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইত্যাদি।[১]

মূলত বুর্জোয়া রাষ্ট্র: অপরদিকে মার্ক্সবাদী ও অন্যান্য বহু লেখক আছেন যাঁহারা উপরি-উক্ত দাবিকে স্বীকার করেন না। মার্ক্সবাদী লেখকগণের মতে, কল্যাণকর রাষ্ট্র হইল মূলত বুর্জোয়া রাষ্ট্র (Bourgeois State)। অর্থাৎ, কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি যাহার প্রেরণা হইল ব্যক্তিগত মুনাফা। সুতরাং বণ্টন-পদ্ধতি এই উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল বলিয়া সমাজ অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে পারে না। বরং আর্থিক সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে। বহু লেখকই ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া উপরি-উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন জানাইয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে ধনবৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট। বলা হয়, ঐ দেশে ১০ শতাংশ লোকের হাতে ৮৩ শতাংশ সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং ৮ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করিতেছে। ইহা ছাড়া

১. Ebenstein, *Today's Isms*

আছে ব্যাপক বেকারত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ঐ দেশে ৮ শতাংশের মত লোক বেকার জীবন কাটায় এবং ২০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে (below the poverty line) অবস্থিত।[১] ভারতের অবস্থা বিশেষভাবে সংকটজনক। প্রায় ৫০ শতাংশের মত (৪৮-৪৪ শতাংশ) লোক দারিদ্র্যসীমার নিম্নে অবস্থিত[২] এবং মুষ্টিমেয় লোক বা পরিবারের হাতে বেশীর ভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে কল্যাণকর রাষ্ট্র ও নিয়ন্ত্রিত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (Mixed Economy with Control) মাধ্যমে আসল সমস্যার (যথা—বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ধনবৈষম্য প্রভৃতি) সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র সামাজিক মালিকানা ও বণ্টন-ব্যবস্থা—অর্থাৎ প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রবর্তন ছাড়া এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ক্ষয়িষ্ণু একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্যই কল্যাণকর রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করিয়া চলিয়াছে। অনেকে ইহা অবশ্য অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ বলিয়াই মনে করেন।

"State intervention in economic life in fact largely means intervention for the purpose of helping capitalist enterprise."

—R. Miliband

১. *Poverty, Inequality and Class Structure* (Edited by Dorothy Wedderburn)

২. ১৯৮০-৮৫ সালের ষষ্ঠ পরিকল্পনার খসড়ায় প্রদত্ত হিসাব। A. R. Desai: *State and Society*

বর্তমানে অবশ্য দাবি করা হইতেছে যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার ফলে কিছু লোক দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠিয়া আসিয়াছে।

পরিশিষ্ট
(Appendix)
গ

রাজনৈতিক পরিবর্তন*
(POLITICAL CHANGE)

"Political change is a universal phenomenon, yet the speed and the extent varies from political system to political system"
Allan R. Ball

সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অবশ্য এই পরিবর্তনের গতি কম বা বেশী হইতে পারে। কোথাও বা ইহা ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে ঘটে, আবার কোথাও কোথাও ইহা বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। উদার-নৈতিক চিন্তাবিদরা মনে করেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়েই কাম্য পরিবর্তন আনয়ন করা যায়। অন্য দিকে বিপ্লববাদীদের ধারণায় যাঁহারা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির কথা বলেন তাঁহারা অবস্থিত ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করিতে চাহেন (wants to maintain the status quo)। কারণ, অবস্থিত ব্যবস্থাতেই তাঁহাদের—অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। অপরপক্ষে যাঁহারা অবস্থিত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নন, বা মনে করেন যে ঐ ব্যবস্থায় তাঁহারা অবহেলিত, তাঁহাদের মতে বৈপ্লবিক পদ্ধতি ছাড়া প্রগতিমূলক সামাজিক পরিবর্তন আসিতে পারে না।

কিন্তু পরিবর্তন কেন ঘটে—কি কি কারণে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় সে-সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কোন সুস্পষ্ট তত্ত্বেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়টি এতকাল ঐতিহাসিকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

পরিবর্তনসাধক বিষয়সমূহ: যাই হোক, বলা যায় যে বিভিন্ন পরস্পর-সম্পর্কিত বিষয়ের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। বিষয়গুলি হইল ব্যক্তি, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রসার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা, রাজনৈতিক আদর্শ (political ideologies), যুদ্ধ, জাতীয়তা-বাদ, বর্ণবৈষম্য, ধর্ম ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনসাধক: এই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া বলা যায় যে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক—উভয় প্রকার বিষয়ই ক্রিয়া করিয়া থাকে। অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ দাবিদাওয়ার দরুন বা বিপ্লবের ফলে পরিবর্তন ঘটিতে পারে, অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'চ্যালেঞ্জের' (challange) ফলেও কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

* মাত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের জন্য।

ক। আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ: আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ঔপনিবেশিক নীতি-বিরোধী আন্দোলন বা মতাদর্শ প্রসারের প্রয়াস অথবা অর্থনৈতিক শোষণের প্রচেষ্টা, ইত্যাদি। বর্তমানে কমিউনিস্ট ও উদারনৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতেছে—পরমাণুবিক কলাকৌশল পৃথিবীকে ক্রমশ সংকটের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

তত্ত্বগত বিশ্লেষণ: তত্ত্বের দিক দিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই আছে চিরাচরিত বা গতানুগতিক বিশ্লেষণ। এই চিরাচরিত বিশ্লেষণ কতকটা স্থিতিশীল আলোচনা। সাম্প্রতিক কালে আচরণবাদী (Behaviourists) ও অন্যান্যরা গণতন্ত্রের সংকট দেখা দেওয়ায় পরিবর্তনের কারণগুলি সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন।

অ্যালমণ্ড ও ইষ্টন: বর্তমানে পশ্চিমী লেখকগণের মধ্যে অ্যালমণ্ড (Almond) ও ইষ্টনের (Easton) ক্ষেত্রে মডেল (models) বা তত্ত্বের সাহায্যে পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ (domestic environments) হইতে উহার উপর দাবিদাওয়ার চাপ আসে—এগুলির মধ্য হইতে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা হইল রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র হইতে চাপ আসিতে পারে; উহার মোকাবিলা করাও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যপরিধির অন্তর্গত। রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি নির্ভর করিবে কতটা ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই প্রকার সমস্যার মোকাবিলা করিতে পারে—তাহার উপর।

অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল—তিনটি কারণ: অ্যালমণ্ড ও পাওয়েলের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সন্ধান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য বা কার্যকারিতার (capabilities or performance) মধ্যে পাওয়া যায়। তিনটি কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে: (১) প্রথমত স্বয়ং রাজনৈতিক ব্যবস্থা—অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর চাহিদা বা দাবিদাওয়ার ফলে পরিবর্তন আসিতে পারে; (২) দ্বিতীয়ত আভ্যন্তরীণ সামাজিক গোষ্ঠীর চাপের বা চাহিদার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এবং (৩) পরিশেষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের রাজনৈতিক চাপের বা কার্যকলাপের ফলে কোন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে। ইষ্টন ও অ্যালমণ্ড—উভয়ের মতেই আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার—উভয় প্রকার চাপের ফলেই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে। উভয়েই অবস্থিত অবস্থাকে (status quo) বজায় রাখিবার জন্য যে পরিবর্তন দরকার তাহার দিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন। ইষ্টনের অভিমত হইল যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অদ্ভুত ক্ষমতা রহিয়াছে বিভিন্ন চাপ ও পরিবর্তনের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার। রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত (self-regulating) এবং প্রতিবেদনশীল। স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত বলিয়া পরিবেশ হইতে যে-সকল চাপ আসে বা পরিবেশের যে-সকল পরিবর্তন ঘটে

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংগসমূহ বা সদস্যগণ তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে সমর্থ।

পশ্চিমী লেখকগণ ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইল ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাম্য পন্থা হইল উপরি-উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া।

এইরূপ অনুসরণপ্রিয়তার দরুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবনতি, অবক্ষয় বা পতন কিভাবে ঘটে তাহার বিশ্লেষণ এই সকল তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

বস্তুত, অনেক সমালোচকই মন্তব্য করিয়াছেন যে ধনতন্ত্রকে কিভাবে টিকাইয়া রাখা যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইষ্টন ও অ্যালমণ্ড তাহাদের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা: মার্ক্সবাদীরা দাবি করেন যে পরিবর্তন কিভাবে ও কোন্ সূত্রে আসে—মাত্র মার্ক্সবাদই তাহার সন্ধান দিতে পারে।

মার্ক্সবাদীদের মতে, রাজনীতির গোড়ার কথা হইল মীমাংসাতীত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব হইল শ্রেণীদ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের সূত্র হইল উৎপাদন-শক্তির সহিত উৎপাদন-সম্পর্কের অসংগতি। উৎপাদন-শক্তি চিরপরিবর্তনশীল। ইহার সহিত উৎপাদন-সম্পর্ক তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। ফলে মালিকশ্রেণীর সহিত শ্রমজীবীদের বাধে সংঘর্ষ। কারণ, অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে সংখ্যালঘিষ্ঠ মালিকশ্রেণী শোষণ করে এবং শোষণের হাতিয়ার হইল বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার জন্য শ্রমজীবীরা সংগ্রাম করিতে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাজার ও প্রভাব বিস্তারের জন্যও রাষ্ট্র সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে। এইভাবে উদ্ভব হয় সাম্রাজ্যবাদের। ইহার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং পদ্ধতির পরিবর্তন না ঘটিয়া পারে না। যাই হোক মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে বিপ্লব ঘটিয়া থাকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে। যেমন, বলা হয় ধনতান্ত্রিক দেশে মালিকশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর সংঘর্ষের ফলে ঘটে বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রও পরিবর্তিত হয় এবং গোড়াপত্তন হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রেণীদ্বন্দ্বই সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের কারণ।

পরিবর্তন ও অগ্রগতি: এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, পরিবর্তন এবং অগ্রগতি বা বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, ইংল্যাণ্ড কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাতন্ত্র্যবাদ হইতে বিদায় লইয়া মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বা জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকিয়াছে। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে ইহা পরিবর্তন হইলেও ইহা সমাজ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রগতির দ্যোতক নয়। ইহা বিপ্লবও নয়। বিপ্লব বলিতে মার্ক্সবাদীরা বুঝাইতে চাহেন কোন এক ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে যাহার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়, যাহার মাধ্যমে এক শাসকশ্রেণীর পতন হইয়া এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়া যাইবে, যে

শ্রেণী পুরাতন শ্রেণী অপেক্ষা উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রগতিশীল শক্তি ও সম্ভাবনার অধিকারী। মার্ক্সবাদীদের মতে, কোন মৌলিক পরিবর্তন বিপ্লব ছাড়া সংঘটিত হইতে পারে না। অথচ ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট দলের (যেমন, ইতালী ফ্রান্স ইত্যাদি) মতে, পার্লামেন্টীয় পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও প্রগতিশীল পরিবর্তন আনয়ন করা যায়।

ইয়োরো-কমিউনিজম : এই মতধারাকে ইয়োরো-কমিউনিযম (Euro-Communisom) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

Revolution is "an historical process leading to and culminating in social transformation, wherein one ruling class is displaced by another, with the new class representing, as compared to the old, enhanced productive capacities and social progressive potentialities."
Herbert Aptheker

পরিশিষ্ট তিনটির উপর অনুশীলনী

1. Bring out points of distinction betwen Utopion and Scientific Socialism ?

[কল্পনাবিলাসমূলক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে যে পার্থক্য আছে তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেখাও।] (৫৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

2. What are the main features of Social Welfare States ? What do you think to be the basic nature of such States ?

[সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের মৌল বৈশিষ্ট্য কি কি ? এইরূপ রাষ্ট্রের মৌল প্রকৃতি কি বলিয়া তুমি মনে কর ?] (৫৯৮-৬০০ পৃষ্ঠা)

3. Explain the different viewpoints concerning political change. Which of them do you think to be supportable and why ?

[রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি ব্যাখ্যা কর। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে কর এবং কেন কর ?] (৬০১-০৪ পৃষ্ঠ)

অনুধাবন-পরীক্ষা

(Comperhension Test—অনুধাবন-পরীক্ষা বলিয়া প্রশ্নাবলীকে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় নাই ?)

[ব্রাকেটে পৃষ্ঠাসংকেত দেওয়া হইল]

1. What do you mean by traditional approaches in political Science ?

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরম্পরাগত পদ্ধতি বলিতে কি বুঝ ?] (২৪-২৬ পৃষ্ঠা)

2. In what ways has the scope of Political Science expanded today ?

[কিভাবে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হইয়াছে ?] (২-৭ পৃষ্ঠা)

3. Political Science is a science.

Political Science is not a science.

Which one of the above statements do you accept ? Give reasons for your answer.

[রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানপর্যায়ভুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্য নয়।

এই দুইটি বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি গ্রহণ কর ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। (১২ ১৫ পৃষ্ঠা)

4. Should a political scientist involve himself in practical activity ? Give reasons for your answer.

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে কি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা সমীচীন ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।] (৯-১০ পৃষ্ঠা)

5. Can politics be value-free ?

[রাজনীতি কি মূল্য-নিরপেক্ষ হইতে পারে ?] (১৪-১৬ পৃষ্ঠা)

6. Is there any difference between political philosophy and political theory ? Give a brief answer to the question.

[রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে ? সংক্ষেপে প্রশ্নটির উত্তর দাও।] (১৮-২৩ পৃষ্ঠা)

7. David Easton defines political system as that system of interactions in any society through which binding or authoritative allocations are made. What is meant by this 'authoritative allocations' ?

[ডেভিড ইস্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম ও বিষয়সমূহ লইয়া গঠিত এবং ইহার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বা কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টনকার্য সম্পাদিত হয়। এই 'কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টন' বলিতে কি বুঝায়।] (৩১-৩৬ পৃষ্ঠা)

8. Give a brief description of Structural-functional Approach.

[সাংগঠনিক কার্যগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।] (৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

9. What are Inputs and Outputs in David Easton's *Systems Analysis* ?

[ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থামূলক আলোচনায় 'অন্তঃনিবেশকারী উপকরণ' এবং 'উৎপন্নের' দ্বারা কি বুঝায় ।] (৩০-৩৪ পৃষ্ঠা)

10. Name some of the approaches which are included in :

(*a*) Traditional Approaches and (*b*) Recent Approaches.

[পরম্পরাগত পদ্ধতিসমূহ এবং আধুনিক পদ্ধতিসমূহের অন্তর্গত কয়েকটি পদ্ধতির নাম কর ।] (২৬-২৭, ২৮-৩০, ৩৬ পৃষ্ঠা)

11. In what sense is the Marxist Approach a pervasive approach ?

[কোন্ অর্থে মার্ক্সীয় পদ্ধতি ব্যাপক ধরনের পদ্ধতি ।] (৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

12. How do the Marxists differentiate between economic 'base' and 'superstructure' ?

[কিভাবে মার্ক্সবাদিগণ অর্থনৈতিক 'ভিত' এবং উপরিস্থ কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন ?] (৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

13. "Although theory is essential in Marxism, Marx proclaimed the primacy of practice over theory." Explain the significance of the statement.

["যদিও মার্ক্সবাদে তত্ত্ব একান্তভাবে অপরিহার্য, মার্ক্স তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।" এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর ।]

(৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

14. "At the core of Marxist politics, there is the notion of conflict." Explain nature of this conflict in Marxism.

[মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের গোড়ার কথাই হইল 'বিরোধ' বা 'সংঘর্ষ'। মার্ক্সবাদে এই বিরোধের প্রকৃতি কি তাহা ব্যাখ্যা কর ।] (৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

15. In the Marxist Theory the mode of production has *two* aspects : (*a*) the *forces of production* and (*b*) the *relations of production*. What do the Marxists mean by (*a*) the forces *of* production and (*b*) the relations of production ?

[মার্ক্সবাদে উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক রহিয়াছে : (ক) উৎপাদন-শক্তি ও (খ) উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক বলিতে মার্ক্সবাদিগণ কি বুঝেন ?]

(৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)

16. Society and the individual are inseparable. Explain the statement in brief.

[সমাজ ও ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। উক্তিটির সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।]

(৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)

17. Sociality is the defining characteristic of human nature. Do you agree with this view ? Give reasons in support of your answer.

[মানব-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সামাজিকতা। তুমি কি এই বক্তব্য স্বীকার কর ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৭১-৭২, ৭১ ৮৮ পৃষ্ঠা)

18. Which ones of the following social systems are regarded by the Marxists as exploitative ? :

(a) The Primitive Communal System ;

(b) The Slave System ; (c) The Feudal System ;

(d) The Capitalist System ; (e) The Socialist System.

[নিম্নলিখিত সমাজ ব্যবস্থাগুলির কোন্‌গুলিকে মার্ক্সবাদিগণ শোষণমূলক বলিয়া মনে করেন ? :

ক) আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ; (খ) দাস-ব্যবস্থা ;

(গ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ; (ঘ) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ;

(ঙ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা।]

(১১১-১৩, ১১৫-১৭, ১১৯-২০, ১২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

19. The concept of the soverign State is obsolete today. Do you agree with this view ? Give reasons for your answer.

[বর্তমানে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা অপ্রচলিত। এই উক্তিটি কি তুমি গ্রহণ কর। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।] (১৭৩, ১৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা)

20. Fill in the blanks :

(a) Man is a — animal.

(b) A cording the Marxists the State is an organ of — —.

(c) Political Science has not the axiomatic quality of —.

(d) Marx proclaimed primacy of practice over —.

(e) For Hegel State is a march of — on earth.

[শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) মানুষ অন্যতম—জীব। (৮৮ পৃষ্ঠা)

(খ) মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র—যন্ত্র। (১৪০ পৃষ্ঠা)

(গ) —মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থির নির্দেশের গুণাবলী নাই। (১৫ পৃষ্ঠা)

(ঘ) মার্ক্স বাস্তবের গুরুত্বকে—উপর স্থান দিয়াছিলেন। (৩৪৮ পৃষ্ঠা)

(ঙ) হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হইল বিশ্বে—পদক্ষেপ।] (১৩৯ পৃষ্ঠা)

21. A man is born to social heritage. What is the significance of the statement ?

[ব্যক্তি জন্ম হইতে সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই বক্তব্যটির তাৎপর্য কি।] (৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

22. Fill in the blanks :

(*a*) Language is the vehicle for the transmission of social — .

(*b*) In capitalist society a worker sells his labour-power and not his — .

(*c*) In communist society each will get according to his — .

(*d*) He that does not work, neither shall be — .

[শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ভাষা হইল সামাজিক—বাহক। (৮৮ পৃষ্ঠা)

(খ) ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করে, তাহার—বিক্রয় করে না। (৩৫৭ পৃষ্ঠা)

(গ) কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেকে তাহার—মিটাইবার দ্রব্যাদি ভোগ করে। (১৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

(ঘ) যে ব্যক্তি কার্য করিবে না সে—পাইবে না।] (১২৮ পৃষ্ঠা)

23. How and when did the State originate ? Will the State wither away in future ? Give the Marxist view.

[কিভাবে এবং কখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যতে কি রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটিবে। এ-বিষয়ে মার্ক্সবাদিগণের অভিমত কি।] (১১২-১৪, ১২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

24. What are the main laws of dialectics ?

[দ্বন্দ্ববাদের প্রধান সূত্রগুলি কি কি ?] (৩৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

25. What is the distinction between Abstract Monism and Concrete Monism ?

[তত্ত্বগত একত্ববাদ এবং বাস্তব একত্ববাদের মধ্যে পার্থক্য কি।] (১৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

26. What do you mean by the following terms ? : (*a*) Co-operative Federalism, (*b*) Decentralisation, (*c*) Classes, (*d*) Historical Materialism, (*e*) Surplus-value.

[নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ কি ? :

(ক) সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র, (খ) বিকেন্দ্রীকরণ, (গ) শ্রেণী, (ঘ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, (ঙ) উদ্বৃত্ত মূল্য।] (৪১০, ৪১৬-১৮, ৩৬০-৬২, ৩৫০-৫১, ৩৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা)

27. How do you classify laws ? Name some of them.

[কিভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিবে। কতকগুলির নাম কর।] (২৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা)

28. The State is permanent.
The State is not permanent.
Which one of the above views do you accept and why ?
[রাষ্ট্র স্থায়ী।
রাষ্ট্র স্থায়ী নয়।
এই দুইটি উক্তির কোন্‌টি তোমার মতে গ্রহণযোগ্য এবং কেন গ্রহণযোগ্য।]
(১০৩ পৃষ্ঠা)

29. In contrast to the Bourgeois concept of Liberty, the Marxists do not view it negatively, but positively. Explain the statement.
[স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার সহিত পার্থক্য করিলে দেখা যায় যে মার্ক্সবাদিগণ স্বাধীনতাকে নেতিমূলকভাবে দেখেন না, দেখেন ইতিমূলকভাবে। এই বক্তব্যটির ব্যাখ্যা প্রদান কর।] (৩১২-১৩ পৃষ্ঠা)

30. Explain in brief the Marxist view of Rights.
[অধিকার সম্পর্কে মার্ক্সবাদিগণের ধারণা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।]
(২৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা)

31. 'Freedom is the appreciation of necessity'. What is the significance of this statement ?
['প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হইল স্বাধীনতা।' বক্তব্যটির তাৎপর্য কি ?]
(৩১২-১৪ পৃষ্ঠা)

32. Can there be equality in capitalist systems ? Give reasons for your answer.
[ধনতান্ত্রিক সমাজে সাম্য কি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৩১২-১৪ পৃষ্ঠা)

33. What is the nature of liberty and equality in different social systems ?
[বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি কি ?] (৩০৬-১৪ পৃষ্ঠা)

34. Is there economic equality in a socialist society ? Give reasons for your answer.
[সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি অর্থনৈতিক সাম্য বর্তমান থাকে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।] (৩০৯-১১ পৃষ্ঠা)

35. Name some of social and economic rights.
[কতকগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের নাম কর।]
(২৭১-৭২ পৃষ্ঠা)

36. What does Barker mean when he says the ideally law ought to have both *validity* and *value* ?

[আদর্শগতভাবে আইন হইতে উহার বৈধতা এবং নৈতিক মূল্য—বার্কারের এই বক্তব্যের তাৎপর্য কি ? (২৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

• 37. Under what circumstances are the citizens of a State justified in resisting the government ?

[কোন্ কোন্ অবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে সরকারের বিরোধিতা করা যুক্তিযুক্ত ?] (২৭৮-৮১ পৃষ্ঠা)

38. (*a*) Rights are natural, absolute and permanent.

(*b*) Rights arise out of society and broaden with the development of society.

Which one of the above statements seems to you to be correct ? Give reasons for your answer.

[(ক) অধিকার প্রাকৃতিক, অবাধ এবং চিরন্তন।

(খ) অধিকার সমাজ-উদ্ভূত এবং সমাজের অগ্রগতির সহিত সম্প্রসারিত হয়।

বক্তব্য দুইটির কোন্‌টি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে কর ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।] (২৬১-৬৪ পৃষ্ঠা)

39. What is revolution ? What is the difference between bourgeois revolution and socialist revolution ?

[বিপ্লব বলিতে কি বুঝায়। বুর্জোয়া বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য কি। (৩৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা)

40. Give in brief Lenin's contribution to Marxism.

[মার্ক্সবাদে লেনিনের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (৩৬৯-৭১ পৃষ্ঠা)

41. Can socialism be established by peaceful means ?

[সমাজতন্ত্র কি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ?] (৩৭৩-৭৪, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

42. Describe the main features of 'democratic socialism'. In what respects does the concept of democratic socialism differ from the Marxist view of socialism ?

[গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দাও। কোন্ কোন্ দিক দিয়া গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধারণা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।] (৩৭৩-৭৭, ৩৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা)

43. What is difference between liberal democracy and socialist democracy ?

[উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?]

(৪৯৫-৯৬, ৫০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

44. Choose the correct answers :
(*a*) The USA is a federal/a unitary state.
(*b*) India is a unitary/a federal state.
(*c*) The United Kingdom is a federal/a unitary state.
(*d*) The Constitution of China is unitary/federal.
[সঠিক উত্তর বাছিয়া লও :
(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয়/এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।
(খ) ভারত এককেন্দ্রিক/যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র।
(গ) যুক্তরাজ্য (U. K.) যুক্তরাষ্ট্রীয়/এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।
(ঘ) চীনের সংবিধান এককেন্দ্রিক/যুক্তরাষ্ট্রীয়।] (৪০৬ ০৭, ৪০১, ৪০১ পৃষ্ঠা)

45. What is the distinction between (*a*) democratic socialism and (*b*) socialist democracy? Give your answer in brief.
[গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? সংক্ষেপে তোমার উত্তর দাও।] (৩৭৩-৭৪, ৫০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

46. Name some of the methods of control of bureaucracy.
[আমলাতন্ত্রের কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির নাম কর।] (৪৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা)

47. What do you understand by delegated legislation?
[অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন বলিতে কি বুঝ?] (৪৭৪ পৃষ্ঠা)

48. Which ones of the countries : Great Britain, the USA, the Soviet Union, China and India have liberal democracy?
[গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভারত—দেশগুলির কোন্ কোন্‌টিতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র চালু রহিয়াছে?] (৪৯০-৯৬, ৫০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

49. Language is the vehicle for the transmission of the social heritage of experience. Explain in brief the statement.
[সামাজিক অভিজ্ঞতার বাহক হইল ভাষা। সংক্ষেপে বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।] (৮৮ পৃষ্ঠা)

50. The State may set the keynote of social order, but it is not identical with it. Explain briefly the statement
[রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূলসূত্র নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নয়। বক্তব্যটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।] (৩১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

51. The sovereignty of the State has two aspects : internal and external. What are these two aspects?
[রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার এই দুইটি দিক আছে : আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। এই দুইটি দিক কি কি?] (১৫১-৫৩ পৃষ্ঠা)

52. **Fill in the blanks :**

(*a*) Rights have, as their correlatives — .

(*b*) In a Cabinet System of Government ministers are collectively responsible to — .

(*c*) According to Lenin, without a revolutionary theory there cannot be a — .

(*d*) According to Marx, the ruling ideas of an age are the ideas of its — .

[শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) অধিকারের সংগে—সম্পর্কযুক্ত।

(খ) ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা——যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

(গ) লেনিনের মতে, বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়া —— সম্ভব নয়।

(ঘ) মার্ক্সের মতে, কোন যুগের প্রচলিত ধ্যানধারণা হইল—ধ্যানধারণা।]

(২৮১ ও ২৬৯, ৪২৫, ৩৬১-৭০, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

53. Choose the correct answers and rewrite them :

(*a*) Right to elect and to be elected is an *economic*/a *political* right.

(*b*) Right to life is a *civil*/an *economic* right.

(*c*) Right to work is a *political*/an *economic* right.

[সঠিক উত্তর বাছিয়া লও এবং পুনরায় লিখ :

(ক) নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার হইল অর্থনৈতিক অধিকার/রাজনৈতিক অধিকার।

(খ) জীবনের নিরাপত্তার অধিকার হইল ব্যক্তিগত অধিকার/অর্থনৈতিক অধিকার।

(গ) কর্মের অধিকার হইল রাজনৈতিক অধিকার/অর্থনৈতিক অধিকার।]

(২৭১-৭২ পৃষ্ঠা)

54. Describe, in brief, the main traits of authoritarian or autocratic political system.

[কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (৩১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

55. What does Mahatma Gandhi mean by *Ahimsa* ?

[মহাত্মা গান্ধী 'অহিংসা' বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?]। (৩৮৭ পৃষ্ঠা)

56. Did Mahatma Gandhi advocate Anarchism ?

[মহাত্মা গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদকে সমর্থন করিয়াছিলেন ?] (৩৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

57. What is imperialism ? Is imperialism a half-way house between nationalism and internationalism ?

[সাম্রাজ্যবাদ বলিতে কি বুঝায় ? সাম্রাজ্যবাদ কি জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার অন্তর্বর্তী অবস্থা ?] (২০৩, ২০৪-০৫, ২০৬ পৃষ্ঠা)

58. What are the main characteristics of imperialism as defined by Lenin

[লেনিনের সংজ্ঞা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?] (২০৩-০৪ পৃষ্ঠা)

59. How are nationalism, militarism and racism associated with imperialism ?

[কিভাবে জাতীয়তাবাদ, সামরিকবাদ ও বর্ণগত ভেদাভেদ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্পর্কিত ?] (২০৪-০৬ পৃষ্ঠা)

60. Write a short note on national liberation movement.

[জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।] (২০৮-০৯ পৃষ্ঠা)

61. What are interest groups ? How do these interest groups influence the decisions of a Government ?

[স্বার্থগোষ্ঠী বলিতে কি বুঝায় ? কিভাবে স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ সরকারের সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে ?] (৫৩৫-৩৬, ৫৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

62. Answer in brief the following questions :

(*a*) Is the right to private property a fundamental right under the Indian Constitution ?

(*b*) Is there private property right in the Soviet Union and China ?

(*c*) Is there right to private property in the USA and Great Britain ?

[সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কি মৌলিক অধিকার ?

(খ) সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনে কি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ?

(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেনে কি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আছে ?]

(২৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা)

63. (*a*) The citizens of a State have no right of resistance.

(*b*) The citizens of a State have the right of resistance.

Which one of the above views do you accept and why ?

[(ক) রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরোধিতার অধিকার নাই।

(খ) রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরোধিতার অধিকার আছে।

উপরি-উক্ত মত দুইটির মধ্যে কোন্‌টি স্বীকার কর এবং কেন স্বীকার কর ?]

(২৭৮-৮১ পৃষ্ঠা)

64. In what sense, according to the Marxists, labour power under capitalism is a commodity ?

[কোন্ অর্থে মার্ক্সবাদীদের মতে ধনতন্ত্রে শ্রম-শক্তি হইল পণ্য ?] (৫৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

65. Choose the correct answers and rewrite :

(*a*) The Indian Parliament is unicameral/bicameral.

(*b*) The Supreme Soviet of the Soviet Union is unicameral/bicameral.

(*c*) The American Congress is unicameral/bicameral.

(*d*) The British Parliament is unicameral/bicameral.

(*e*) The National People's Congress of China is unicameral/bicameral.

[সঠিক উত্তরগুলি বাছিয়া লও এবং পুনরায় লিখ :

(ক) ভারতীয় পার্লামেন্ট এককক্ষবিশিষ্ট / দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

(খ) সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত এককক্ষবিশিষ্ট / দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

(গ) আমেরিকার কংগ্রেস এককক্ষবিশিষ্ট / দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

(ঘ) ব্রিটেনের পার্লামেন্ট এককক্ষবিশিষ্ট / দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

(ঙ) চীনের জাতীয় কংগ্রেস এককক্ষবিশিষ্ট / দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।] (৪৫০-৫১ পৃষ্ঠা)

66. What, according the marxists, is a class ? Give a brief answer.

[মার্ক্সবাদিদের মতে, শ্রেণী বলিতে কি বুঝায় ? সংক্ষেপে উত্তর দাও।]

(৩৬১-৬২ পৃষ্ঠা)

67. Which of the following countries have plural executive ?

(*a*) Great Britain, (*b*) The USA, (*c*) The Soviet Union, and (*d*) Switzerland.

[নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ দেশে একাধিক ব্যক্তিবিশিষ্ট শাসক রহিয়াছে ?

(ক) গ্রেট ব্রিটেন, (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (গ) সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং (ঘ) সুইজারল্যাণ্ড।] (৪৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)

68. Name some of the methods of representation of minorities.

[সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের কয়েকটি পদ্ধতির নাম কর।] (৫৬২-৬৬ পৃষ্ঠা)

69. In what directions does the Welfare State seeks to control the play of market forces ?

[সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বাজারের শক্তিকে কোন্ কোন্ দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায় ?] (৩৪০-৪৪ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট খ)

70. Explain in brief the nature of public opinion in (*a*) a capitalist democracy and (*b*) a socialist system.

[ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের প্রকৃতি কি তাহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।] (৫৮৮-৯০ এবং ৫৯১-৯৩ পৃষ্ঠা)

71. How would you distinguish between a police state and a socialist state ?

[পুলিশী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্দেশ করিবে ?]
(৬৬ ও ৩২৪, ৫৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

72. A one-party system is a contradiction in itself. Do you agree with this statement ? Give your answer in a few lines.

[একদলীয় ব্যবস্থা কথাটি অসংগতিপূর্ণ। তুমি কি এই মতকে সমর্থন কর ? কয়েকটি পংক্তিতে উত্তর দাও।] (৫২৯-৩২ পৃষ্ঠা)

73. What, according to the Marxists, is a political party ? Give your answer in brief.

[মার্ক্সবাদী লেখকগণের মতে, রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় ? সংক্ষেপে উত্তর দাও।] (৫২১-৫২২ পৃষ্ঠা)

74. Is a one-party system an obligatory feature of socialism ? Give a short answer to the question.

[সমাজতন্ত্রে একদলীয় ব্যবস্থা কি বাধ্যতামূলক ? সংক্ষেপে উত্তর দাও।]
(৫৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

75. Choose the correct statements and rewrite them :

(*a*) Great Britain is a socialist state/Great Britain is a liberal democratic state.

(*b*) The USA is a socialist state/The USA is a liberal democratic state.

(*c*) The Soviet Union is a liberal democratic state/The Soviet Union is a socialist state.

(*d*) China is a liberal democratic state/China is a socialist state.

[সঠিক বক্তব্যগুলি বাছিয়া লও এবং পুনরায় লিখ :

(ক) গ্রেট বৃটেন হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র/গ্রেট ব্রিটেন হইল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(গ) সোবিয়েত ইউনিয়ন হইল একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র/সোবিয়েত ইউনিয়ন হইল একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(ঘ) চীন হইল একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র/চীন হইল একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।] (৪১৫, ৪১৫, ৫০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

CALCUTTA UNIVERSITY'S MODEL QUESTIONS

[কতকগুলি নমুনা প্রশ্ন—সংক্ষিপ্ত উত্তর ও সমস্যাবোধক ধরনের প্রশ্ন]

প্রথম পত্র

1. Choose the correct answer from the alternatives given within brackets :

(*a*) Political Science is a branch of the (social, moral, physical) sciences.

(*b*) Suffrage is a (social, political, economic) right.

(*c*) Universal adult suffrage if (unnecessary/absolutely necessary) for the success of representative democracy.

(*d*) The chief exponent of the theory of Separation of Powers was (Hobbes, Montesquieu, Rousseau).

(*e*) A person can simultaneously be a member of more than one (state, association).

(*f*) (Hobbes, Locke, Rousseau) is the author of the Social Contract.

(*g*) Right to work is a (political, economic) right.

(*h*) A state has (only internal, only external, both internal and external) sovereignty.

(*i*) (Aristotle, Rousseau, Hegel, Karl Marx, Green) said that the state is an organ of class rule.

(*j*) Sovereignty is (alienable, inalienable).

[বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত বিকল্পগুলি হইতে সঠিক উত্তর বাছিয়া লও :

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক, নৈতিক, পদার্থ) বিজ্ঞানের একটি শাখা।

(১৪ পৃষ্ঠা)

(খ) ভোটাধিকার হইল একটি (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) অধিকার। (২৯৭ পৃষ্ঠা)

(গ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকা (অপ্রয়োজন, একান্তভাবে প্রয়োজন)। (৫৫০-৫২ পৃষ্ঠা।)

(ঘ) ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের নীতির প্রধান প্রবক্তা হইলেন (হবস্‌, মণ্টেস্কু, রুশো)।

(২৯৯ পৃষ্ঠা)

(ঙ) কোন ব্যক্তি একই সংগে একাধিক (রাষ্ট্রের, সমিতির) সদস্য হইতে পারেন। (১০৭ পৃষ্ঠা)

(চ) 'সামাজিক চুক্তি' নামক পুস্তকের লেখক হইলেন (হবস্, লক, রুশো ।

(ছ) কর্মের অধিকার অন্যতম (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) অধিকার ।

(২৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

(জ) (এ্যারিস্টটল, রুশো, কার্ল মার্ক্স, গ্রীণ) বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র হইল শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র। (১৪৩ পৃষ্ঠা)

(ঝ) সার্বভৌমিকতা হইল (অ-হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য) (১৫৫ পৃষ্ঠা)

2. Complete the following sentences by writing the appropriate words in the blank spaces :

(*a*) The theory of individualism regards the state as.. and holds that state power should be confined to....

(*b*) In a small state with homogeneous population a... legislature is probably superior to a.. legislature.

(*c*) In the opinion of J. S. Mill . must precede universal enfranchisement.

(*d*) If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives...from the bulk of a given society, that determinate superior is.. in the society.

[নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান যথোপযুক্ত শব্দ বসাইয়া পূরণ কর :

(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রকে ··· মনে করে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ··· করিয়া সীমাবদ্ধ করিতে চাহে।

[ইংগিত : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রকে 'প্রয়োজনীয় অমংগলসূচক প্রতিষ্ঠান' (a necessary to evil) বলিয়া মনে করে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ন্যূনতম করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়।] (৩২৪, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

(খ) সমজাতীয় জনগণসমন্বিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ··· আইনসভা অপেক্ষা ··· আইনসভা শ্রেয়।

[ইংগিত : সমজাতীয় জনগণসমন্বিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপেক্ষা এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা শ্রেয়। (৪৫৩, ৪৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা ও 'শাসন-ব্যবস্থা'র (১১শ সংস্করণ) সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন- ব্যবস্থার ৭৬ পৃষ্ঠা)]

(গ) যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি অপর কোন ঊর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে কিন্তু নির্দিষ্ট সমাজের অধিকাংশের ··· পায় তাহা হইলে সেই সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ··· । (১৬৭ পৃষ্ঠা)

3. Each word or expression in column A is in some way associated with one of the words or expressions in column B. Indicate the pairs of words/expressions so associated.

Column A	Column B
Jean Bodin	Citizenship
French Revolution	Aristotle
Jus soli	Fascism
Classification of Governments	Sovereignty
Italy	Liberty, Equality, Fraternity

['ক' স্তম্ভের প্রত্যেক শব্দ বা বাক্য কোন না কোন ভাবে 'খ' স্তম্ভের একটি শব্দ বা বাক্যের সহিত সম্পর্কিত। এই সম্পর্কযুক্ত শব্দ বা বাক্য দুইটি কি তাহা বল।

স্তম্ভ 'ক'	স্তম্ভ 'খ'
জিন বোঁদা	নাগরিকতা
ফরাসী বিপ্লব	অ্যারিষ্টটল
জন্মস্থান নীতি	ফ্যাসীবাদ
সরকারের শ্রেণীবিভাগ	সার্বভৌমিকতা
ইতালী	স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী

[ইংগিত :

জিন বোঁদা এবং সার্বভৌমিকতা। (১৫৭ পৃষ্ঠা)

ফরাসী বিপ্লব এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। (২৮৯ পৃষ্ঠা)

জন্মস্থান নীতি এবং নাগরিকতা। —

সরকারের শ্রেণীবিভাগ এবং অ্যারিষ্টটল। (২৮৯ পৃষ্ঠা)

ইতালী ও ফ্যাসীবাদ।] (৫১৪ পৃষ্ঠা)

4. (*a*) What are the four main characteristics of a state ?

(*b*) What are the five main characteristics of sovereignty ?

(*c*) Enumerate the main political rights in a liberal democracy.

[(ক) রাষ্ট্রের চারিটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ? (৯৭ পৃষ্ঠা)

(খ) সার্বভৌমিকতার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কি ? (১৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

(গ) উদারনৈতিক গণতন্ত্রে প্রধান রাজনৈতিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর।

(২৭১-৭২ পৃষ্ঠা)

উত্তর-সংকেত সহ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের* প্রশ্নাবলী

বিষয় অনুসারে সাজানো

ক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি, আলোচনাক্ষেত্র ও আলোচনা-পদ্ধতি

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে কর? (ক. বি.—১৯৮০)
(২৫-৩২, ৩৬-৪০ পৃষ্ঠা)

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন আলোচনা-পদ্ধতি বর্ণনা কর। (ব. বি—১৯৮০)
(২৫-৩২, ৩৬-৪০ পৃষ্ঠা)

৩. আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আজিকার দিনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধির পর্যালোচনা কর। (উ. বি.—১৯৮০) (৪৭-৫৩ পৃষ্ঠা)

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনার আচরণমূলক দৃষ্টিভংগি বলিতে কি বুঝ? এই দৃষ্টিভংগিব (বা পদ্ধতির) প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা নির্দেশ কর।
(উ. বি.—১৯৮০) (২৮-৩২ পৃষ্ঠা)

৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় পরম্পরাগত পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্যসমূহ নির্দেশ কর। (ক. বি.—১৯৮১) (২৪-২৫, ২৬-২৭ ও ২৮-৩১ পৃষ্ঠা)

৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ মন্তব্যসহ আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮৪) (২৮-৩১ পৃষ্ঠা)

৭ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় পরম্পরাগত দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ ব্যাখ্যা কব।
(ক. বি.—১৯৮৫ (২৬-২৮ পৃষ্ঠা)

a. রাষ্ট্রবিজ্ঞানেব সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। (ব. বি.—১৯৮৫) (২৭, ২৬ ২৮ পৃষ্ঠা)

৯. রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর (উ. বি. ১৯৮৩)
(১৮-২৩ পৃষ্ঠা)

খ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত (ক) ধনবিজ্ঞান (অর্থবিদ্যা) এবং (খ) সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। (উ. বি.—১৯৮৩) (৬৫-৬৮, ৬১-৬২ পৃষ্ঠা)

গ। সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় ও রাষ্ট্র

১. ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
(ক. বি.—১৯৮০) (১১৯-২৪ পৃষ্ঠা)

---

* ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ব. বি.—বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; উ. বি.—উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়।

২. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাহাকে বলে? অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়? (ক. বি.—১৯৮২) (১২৭-৩০ পৃষ্ঠা)

৩. ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মৌল পার্থক্যসমূহ নির্দেশ কর। (ক. বি.—১৯৮৫) (১১৯-২০, ১২৭-৩০ পৃষ্ঠা)

ঘ। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

১. রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদ ব্যাখ্যা কর। (ক. বি.—১৯৮৪) (১৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা)

২. রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদের (আদর্শবাদের) পর্যালোচনা কর। (ক. বি. ১৯৮১, '৮৩) (১৩৭-৩৮, ১৩৯-৪২ পৃষ্ঠা)

৩ রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় ধারণার পর্যালোচনা কর। (ব. বি.—১৯৮০) (১৪২-৪৩, ১৪৪-৪৮ পৃষ্ঠ)

৪. সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদের পর্যালোচনা কর। (উ. বি.—১৯৮০) (১৪২-৪৩, ১৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা)

৫. রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮৫) (১৪২-৪৩, ১৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা)

৬. রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। (ব. বি.—১৯৮৫) (১৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

৭. আদর্শবাদী (ভাববাদী) তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। (উ. বি. ১৯৮৩) (১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

ঙ। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা

১. সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। (ক. বি.—১৯৮০) (১৭২-৭৪পৃষ্ঠা)

২. রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদের সম্বন্ধে বহুত্ববাদী আক্রমণের উপর সমালোচনামূলক টীকা রচনা কর। (উ. বি.—১৯৮০) (১৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা)

৩. সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আলোচনা কর। (ক. বি —১৯৮১) (১৭৯-৮১ পৃষ্ঠা)

৪. জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূল্যায়ন কর। (ক. বি.—১৯৮৫) (১৬২-৬৪ পৃষ্ঠা)

৫. রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। (ক. বি.—১৯৮৩) (১৭৪-৭৭ পৃষ্ঠা)

চ। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

১. জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮২) (১৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

২. আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ক. বি.—১৯৮৫) (১৮৫-৮৬, ১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

৩. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ কর। (ব. বি.—১৯৮৫) (১৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

৪. জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পরিপন্থী? (উ. বি.—১৯৮১) (১৯১-৯২, ১৯৪-৯৭ পৃষ্ঠা)

৫. তুমি কি স্বীকার কর যে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও। (উ বি.—১৯৮৩) (১৯১-৯২, ১৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা)

ছ। সাম্রাজ্যবাদ

১. সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

(ক. বি.—১৯৮০) (২০৩-০৪ পৃষ্ঠা)

জ। বিশ্বশান্তি ও জাতিপুঞ্জ

১. বিশ্বশান্তি রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস্) ভূমিকা আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮৩) (২১৬, ২১৭-১৮, ২২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

ঝ। আইন

১. আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা দেখাও। (ব. বি.—১৯৮০) (২৩৬-৩৭, ২৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

২. আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮১)

(২৩৮-৪১ পৃষ্ঠা)

৩. আইনের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। আইন সম্পর্কে সমাজতত্ত্বমূলক মতবাদের সমালোচনা কর। (উ. বি.—১৯৮৩) (২৩৬-৩৭ ২৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

৪. আন্তর্জাতিক আইনকে কি অর্থে আইন বলিয়া গণ্য করা যায়? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। (ক. বি.—১৯৮০) (২৪৯-৫২ পৃষ্ঠা)

ঞ। অধিকার

১. নাগরিকের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করিবার অধিকার আছে কি? তোমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। (ক. বি.—১৯৮২) (২৭৮-৮১ পৃষ্ঠা)

ট। স্বাধীনতা ও সাম্য

১. নিম্নলিখিত দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে যে কোন একটিতে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর: (ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র, (খ) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

(৩০৭-১১ পৃষ্ঠা)

২. স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা ব্যাখ্যা কর এবং স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি তাহা দেখাও। (উ. বি.—১৯৮০) (২৯১-৯৩, ২৯৮-৩০২ পৃষ্ঠা)

৩. উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ক. বি.—১৯৮৫) (৩০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

ঠ। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

১. কল্যাণমূলক (সমাজ-কল্যাণকর) রাষ্ট্রের কার্যাবলী আলোচনা কর।

(ক. বি.—১৯৮৪) (৩৪০-৪৩ পৃষ্ঠা)

২. রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

(ক. বি.—১৯৮৫) (৩২৪-২৫, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

৩. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।
(ব. বি.—১৯৮৫) (৩২৪-২৭ পৃষ্ঠা)

৪. রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর একটি নিবন্ধ রচনা কর। (উ. বি.—১৯৮৩) (৩৩০-৩২, ৩৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা)

ঙ। মার্ক্সবাদ

১. বিপ্লব সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। (ক. বি.—১৯৮১-৮৪)
(৩৬৫-৬৯ পৃষ্ঠা)

২. মার্ক্সবাদের বিকাশে লেনিনের অবদান আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮৩)
(৩৬৯-৭১ পৃষ্ঠা)

৩. শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।
(ক. বি.—১৯৮৫) (৩৬০-৬৩ পৃষ্ঠা)

চ। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ

১. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (সমাজতন্ত্রবাদ) বলিতে কি বোঝ? গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (ক. বি.—১৯৮১।
(৩৭৩-৭৪, ৩৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

২. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের (সমাজতন্ত্রবাদের) উপর একটি টীকা লিখ।
(ক. বি.—১৯৮৫) (৩৭৩-৭৬ পৃষ্ঠা)

ণ। গান্ধীবাদ

১. সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর।
(ক. বি.—১৯৮০) (৫৮৩-৮৬ পৃষ্ঠ)

২. রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বিশ্লেষণ কর।
(ক. বি.—১৯৮২, '৮৪) (৩৮০-৮২ পৃষ্ঠা)

ত। রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ

১. রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায়? কিভাবে উহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে? (ক. বি.—১৯৮০) (৩৮৯-৯১, ৩৯১-৯৩ পৃষ্ঠা)

২. রাজনীতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ কর।
(ক. বি.—১৯৮৩) (৩৯১-৯৮ পৃষ্ঠা)

থ। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা কর। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ কি কি? (ব. বি.—১৯৮০) (৪০৩, ৪০৯-১৩ পৃষ্ঠা)

২. আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(ক. বি.—১৯৮২) (৪১০, ৪১৩-১৫ পৃষ্ঠা)

৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি? এই ধরনের সরকারে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ দর্শাও। (উ বি.—১৯৮৩) (৪০১-১০, ৪১৩-১৫ পৃষ্ঠা)

দ। পার্লামেন্টীয় (সংসদীয়) ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

১. পার্লামেন্টীয় (মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত) সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়া শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ নির্দেশ কর। (উ. বি.—১৯৮০) (৪২৪-২৯ পৃষ্ঠা)

২. সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ইহার গুণ কি কি ?
(ব. বি.—১৯৮৫) (৪২৪-২৭ পৃষ্ঠা)

ধ। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

১. আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্যাবলী বর্ণনা কর। (ক. বি. ১৯৮০, '৮৩)
(৪৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)

২. (আইনসভার) দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির পর্যালোচনা কর। (উ. বি.—১৯৮০) (৪৫০-৫৬ পৃষ্ঠা)

৩. আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলী বিশ্লেষণ কর।
(ক বি.—১৯৮১) (৪৬৮ ৭১ পৃষ্ঠা)

৪. বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা নির্দেশ কর। (ক. বি.—১৯৮৫)
(৪৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

৫. আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার-ব্যবস্থার গুরুত্ব নির্দেশ কর। বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা কিরূপে নিশ্চিত করা যাইতে পারে ? (উ. বি.—১৯৮৩) (৪৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে নিশ্চিত করা যাইতে পারে ?
(ক. বি.—১৯৮২) (৪৮১-৮৫ পৃষ্ঠা)

ন। গণতন্ত্র ও নায়কতন্ত্র

১. উদারনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। (ক. বি.—১৯৮২) (৪৯১ ৯৩, ৪৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

২. গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য সর্তগুলির পর্যালোচনা কর।
(ব. বি.—১৯৮০) (৫০২-০৪ পৃষ্ঠা)

৩. সমাজবাদী গণতন্ত্রের (socialist democracy) বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৮৪) (৫০৭-০৯ পৃষ্ঠা)

৪. একনায়কতন্ত্র (নায়কতন্ত্র) কাহাকে বলে ? একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা কর। (ক. বি.—১৯৮১) (৫০৯-১১, ৫১৬-১৬ পৃষ্ঠা)

৫. রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ফ্যাসীবাদের প্রধান বৈশিষ্টগুলি ব্যাখ্যা কর।
(উ. বি.—১৯৮৬) (৫১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

প। রাজনৈতিক দল

১. রাজনীতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিকভাবে ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (ক.বি.—১৯৮০) (৫২২-২৫ পৃষ্ঠা)

২. বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক জনব্যবস্থাগুলির একটি বিবরণ দাও।
(উ. বি.—১৯৮৩) (৫২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

ক। স্বার্থগোষ্ঠী

১. স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে তাহারা সরকারের সিদ্ধান্ত-সমূহকে প্রভাবিত করে? (ক. বি.—১৯৮০) (৫৩৫-৩৭, ৫৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

২. স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ কিভাবে সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে?
(ক. বি.—১৯৮৩) (৫৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

ব। নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব

১. আধুনিক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব ও কর্মগত প্রতিনিধিত্বের পারস্পরিক গুণাগুণ আলোচনা কর। (ক, বি.—১৯৮০) (৫৫৬-৫৯ পৃষ্ঠা)

২. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ধারণ কর। (ক. বি.—১৯৮৪) (৫৭২-৭৪ পৃষ্ঠা)

ভ। জনমত

১ জনমতের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় উপর ভূমিকা নির্দেশ কর। (ক. বি.—১৯৮১) (৫৮০-৮১, ৫৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা)

ম। কল্পনাবিলাসমূলক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ

(মাত্র উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য)

১. বৈজ্ঞানিক (বিজ্ঞানসম্মত) সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝায়? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের পার্থক্য নির্দেশ কর।
(উ. বি.—১৯৮০) (৫৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

অনুধাবন-পরীক্ষা

ক। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

(উত্তর সাধারণত ১০টি বাক্যের অধিক হইবে না।)

১. রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (ব. বি.) (১০৪-০৭ পৃষ্ঠা)

২. কার্যত সার্বভৌম (*de facto sovereignty*) বলিতে কি বুঝায়?
(ব. বি.) (১৬১-৬২ পৃষ্ঠা)

৩. জাতীয় জনসমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
(ব. বি.) (১৮৯-৯১ পৃষ্ঠা)

৪. সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (সংবিধান) কাহাকে বলে? ৮
(ব. বি.) (৪৩৮ পৃষ্ঠা)

৫. সাম্যের বিভিন্ন রূপ কি কি? (ব. বি.) (৩০৪-০৬ পৃষ্ঠা)

৬. প্রতিনিধি ও তাহার নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা দেখাও
(ব. বি.) (৫৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

৭. রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সংঘের পার্থক্যের মূল ভিত্তিগুলি কী কী?
(ব. বি.) (১০৭-০৮ পৃষ্ঠা)

৮. আইনসভাসমূহের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্যের কারণ নির্দেশ কর। (ব. বি.) (৫৫৬-৫৯ পৃষ্ঠা)

৯. রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কিত তত্ত্ব হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ব. বি.) (৩২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

১০. রাজনৈতিক আচরণবাদের সীমাবদ্ধতা কি কি? (ব. বি.) (৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

১১. স্বাধীনতার সংজ্ঞা কিভাবে নির্ধারণ করবে? (ব. বি.) (২৯০-৯২ পৃষ্ঠা)

১২. ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা বর্ণনা কর। (ব. বি.) (২৯৯, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)

১৩. কোন অর্থে মানুষ সামাজিক জীব? (ক. বি.) (৮৮-৯১ পৃষ্ঠা)

১৪ উৎপাদন-সম্পর্ক কাহাকে বলে (ক. বি.) (৩৫১ পৃষ্ঠা)

১৫. বিপ্লব কাহাকে বলে? (ক. বি.) (৩৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)

১৬. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলিতে কি বোঝায়? (ক. বি.) (৩৭৩ পৃষ্ঠা)

১৭. কর্মগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্ব বলিতে কি বোঝায়? (ক. বি.) (৫৫৭ পৃষ্ঠা)

১৮. কি কি বিষয় সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার ভোগ করে? (ক. বি.) (২৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা)

১৯. স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা কি ছিল? (ক. বি.) (২৬২ পৃষ্ঠা)

২০. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? (ক. বি.) (৩৭৩ পৃষ্ঠা)

২১. এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা কাহাকে বলে? (ক. বি.) (৪০১ পৃষ্ঠা)

২২. ফ্যাসীবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি? (ক বি.) (৫১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

২৩. রাজনীতিক দল কাহাকে বলে? (ক. বি.) (৫১৯-২০ পৃষ্ঠা)

২৪. ব্যবস্থামূলক দৃষ্টিভংগি অনুসারে পুনরাবর্তন কাহাকে বলে? (ক. বি.) (৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

২৫. কোন্ সমাজ-ব্যবস্থায় প্রথমে শোষণের উদ্ভব হয় এবং কেন? (ক. বি. ১১২-১৩ পৃষ্ঠা)

২৬. আংশিক অধিকার (quasi right) বলিতে কি বোঝায়? (ক. বি.) (২৬১ পৃষ্ঠা)

২৭. একটি রাষ্ট্রকে কি কি কারণে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায়? (ক. বি.) (৩৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

২৮. ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে 'বস্তুবাদী' বলা হয় কেন? (ক. বি.) (৩৫০ পৃষ্ঠা

২৯. অর্পিত আইন বলিতে কি বোঝায়? (ক. বি.) (৪৫৯ পৃষ্ঠা)

৩০. সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি কাহাকে বলে? (ক. বি.) (৫৬৫ পৃষ্ঠা)

খ। বাস্তবভিত্তিক প্রশ্নসমূহ

১. রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে দুটি মৌল পার্থক্য উল্লেখ কর।
(ক. বি.) (১০৬ পৃষ্ঠা)

২. পাঁচজন ভাববাদী (আদর্শবাদী) রাষ্ট্রচিন্তাবিদের নাম লেখ।
(ক. বি.) (১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)

৩. 'সাম্রাজ্যবাদ মুমূর্ষু পুঁজিবাদ।' কে বলেছিলেন এবং কেন ?
(ক. বি.) (২০৩ পৃষ্ঠা)

৪. বিকেন্দ্রীকরণ কাহাকে বলে ? (ক. বি.) (৪০১ পৃষ্ঠা)

৫. কর্মগত প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে ? (ক. বি.) (৫৫৭ পৃষ্ঠা)

৬. আচরণবাদের প্রবক্তা দুইজনের নাম কর। (ক. বি.) (২৮-২৯ পৃষ্ঠ)

৭ আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দুইজন প্রবক্তার নাম কর।
(ক. বি.) (৩২০ পৃষ্ঠা)

৮. চার ধরনের সমাজতন্ত্রের নাম কর। (ক. বি.) (৩২২ পৃষ্ঠা)

৯. ফ্যাসীবাদের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (ক. বি.) (৫১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

১০. সাম্যের বিভিন্ন রূপগুলি লেখ (ক. বি.) (৩০৫-০৬ পৃষ্ঠা)

১১. আইনসভার প্রশাসনিক কাজের একটি দৃষ্টান্ত দাও। (ক. বি.) (১৪১ পৃষ্ঠা)

১২. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে দুইটি অন্তরায় কি তাহা উল্লেখ কর।
(ক. বি. (২২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

১. বন্ধনীর ভিতর প্রদত্ত বাক্যাংশ হইতে সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্ন বাক্যগুলি পুনরায় লিখ:

(ক) (হবস, রুশো, হেগেল) সাধারণ ইচ্ছার প্রধান প্রবক্তা
(ক. বি) (২৪১ পৃষ্ঠা)

(খ) (ড্যুগুই, বোঁদা, মেইন) আইন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানমূলক চিন্তাধারার প্রধান প্রবক্তা। (ক. বি.) (২৩৯ পৃষ্ঠা)

(গ) ওপেনহাইম, হল্যাণ্ড) আন্তর্জাতিক আইনকে আইন পদবাচ্য বলিয়া মনে করেন। (ক. বি.) (২৫১ পৃষ্ঠা)

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজ করিবার অধিকার (মৌলিক অধিকার / মৌলিক অধিকার নয়) (ক. বি.) (২৭২ পৃষ্ঠা)

(ঙ) (এডয়ার্ড বার্ণষ্টিন সিডনি ওয়েব, বেনিতো মুসোলিনী, জন স্টুয়ার্ট মিল) গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মুখ্য প্রবক্তা। (ক. বি.) (৩৭৫ পৃষ্ঠা)

(চ) (তোক্‌ভিল, লর্ড অ্যাকটন, কার্ল মার্ক্স, আর. এইচ, টনি)-এর মতে, সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী নয়—ইহা স্বাধীনতার জন্য আবশ্যক।
(ক. বি.) (৩০২ পৃষ্ঠা)

২. শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) " — ব্যতীত, — উত্তরাধিকার ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না, হইতে পারে না।" (ক. বি.) (৮৯ পৃষ্ঠা)

(খ) "জৈব মতবাদ—প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা — — কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ নয়।" (ক. বি.) (১৩৬ পৃষ্ঠা)

(গ) "সার্বভৌমিকতার" সীমাবদ্ধতা হইল ইহার নিজস্ব — এবং — অন্য।" (ক. বি.) (১৫৪ পৃষ্ঠা)

(ঘ) যখন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া অপ্রতিহত ও নিরংকুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখন উহাকে — আখ্যা দেওয়া হয়। (ক. বি.) (৫১০ পৃষ্ঠা)

(ঙ) "কোন বিষয় সম্পর্কে সমস্বার্থসম্পন্ন জনসমষ্টিকেই"—বলা যাইতে পারে। (ক. বি.) (১৮৬ পৃষ্ঠা)

(চ) জন টুয়ার্ট মিলের মতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে——একান্ত প্রয়োজন। (ক. বি.) (৫৫১ পৃষ্ঠা)

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সালের প্রশ্নাবলী

৭নং প্রশ্ন এবং অন্য তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।

২। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

৪। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ কর।

৫। জনমত বলতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ইহার গুণ কি কি?

৭। যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
(প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশটি বাক্যের মধ্যে লিখতে হবে)

(ক) আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নির্দেশ কর।
(খ) 'সাম্য' সম্পর্কে টিকা লেখ।
(গ) জনপ্রতিনিধি ও তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর।
(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
(ঙ) নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
(চ) আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক আলোচনা কর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সালের প্রশ্নাবলী

Group A

প্রান্তলিখিত সংখ্যা পূর্ণমান নির্দেশক

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিতে কি বোঝায় ?

(খ) ব্যবস্থামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পুনরাবর্তন কাহাকে বলে ?

(গ) কোন্ সমাজব্যবস্থায় প্রথম শোষণের উদ্ভব হয় এবং কেন ?

(ঘ) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী (আদর্শবাদী) তত্ত্বকে কেন ধনতন্ত্রের কলাকৌশলের অংশ বলা হয় ?

(ঙ) অস্টিন কিভাবে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন ?

(চ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে দুইটি অন্তরায় কি তাহা উল্লেখ কর।

(ছ) আন্তর্জাতিক আইন কাহাকে বলে ?

(জ) 'আংশিক অধিকার' বলিতে কি বোঝায় ?

(ঝ) একটি রাষ্ট্রকে কি কি কারণে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হয়

(ঞ) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে 'বস্তুবাদী' বলা হয় কেন ?

(ট) সর্বোদয় বলিতে কি বোঝ ?

(ঠ) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

(ড) অরাজনীতিক শাসক বলিতে কি বোঝায় ?

(ঢ) অর্পিত আইন বলিতে কি বোঝায় ?

(ণ) সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি কাহাকে বলে ?

Group B

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় পরম্পরাগত দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ ব্যাখ্যা কর।

৩। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে মৌল পার্থক্য সমূহ নির্দেশ কর।

৪। জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূল্যায়ন কর।

৫। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৬। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রকৃতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

৮। শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।

৯। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উপর একটি টীকা লেখ।

১০। বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা নির্দেশ কর।